বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য

আহমদ শরীফ

বর্ণমিছিল ॥ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৭৮
ডিসেম্বর ১৯৭১

প্রকাশনায়
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৬৫ প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১

মুদ্রণে
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৪২এ কাজী আবদুর রউফ রোড
ঢাকা-১

প্রচ্ছদশিল্পী
কাইয়ুম চৌধুরী

BĀNGĀLEE-O-BĀNGLĀ SĀHITYA : [Men & Literature of Bengal] by Dr. Ahmed Sharif. Published by Tajul Islam, Barnamichhil, 65 Pyari-das Road, Dacca-1 and printed by Tajul Islam at Barnamichhil, 42A Kazi Abdur Rouf Road, Dacca-1. First published in December 1971.

পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-এর
অপূর্ণ বাঞ্ছার অক্ষম রূপায়ণ মুহূর্তে
তাঁকেই স্মরণ করছি

নিবেদন

মধ্যযুগের কবি ও কাব্যের পরিচিতিমূলক একখানা ইতিহাস রচনার প্রবল আগ্রহ জেগেছিল জীবনের অন্তিমলগ্নে পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের। ভূমিকাস্বরূপ 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিক্রমা' নামের একটি প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন তিনি। বিরাশী বছরের জীবন-পরিসরে ষাট বছরের লেখক-জীবনে বিভিন্ন কবি ও কাব্যের পরিচিতিমূলক পাঁচশতাধিক প্রবন্ধও ছিল তাঁর আয়ত্তে। কাজেই দেহ বার্ধক্যজীর্ণ না-হলে এবং প্রকাশকের সন্ধান পেলে হয়তো কাজ শুরু করে দিতেন; কিন্তু বহু চেষ্টায়ও সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'র প্রকাশক না-পেয়ে তিনি এ বাসনা ত্যাগ করেন।

১৯৫৩ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর অপূর্ণ অন্তিম বাসনা আমাকে অনুপ্রাণিত করে এবং অক্টোবর মাসেই তাঁর আবিষ্কৃত কবি ও কাব্যের পরিচিতিমূলক ইতিহাস রচনার কাজ শুরু করি। কিন্তু মাস খানেকের মধ্যেই অমুদ্রিত পুথিভিত্তিক এ ধরনের কাজের অসার্থকতা উপলব্ধি করি এবং তাঁর আবিষ্কৃত প্রধান ও বিশিষ্ট কাব্যগুলোর সম্পাদনা ও প্রকাশনাই প্রাথমিক কর্তব্য বলে স্বীকার করি। সুখের বিষয় উল্লেখযোগ্য পুথির অধিকাংশই সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

গত চৌত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করি। সাহিত্যের ইতিহাস পড়াচ্ছি প্রায় সাতাইশ বছর ধরে। এক্ষেত্রে আমার সঞ্চিত জ্ঞান, উপলব্ধ তত্ত্ব, লব্ধ প্রজ্ঞা, অর্জিত বোধি এবং তজ্জাত প্রত্যয়গুলো লিপিবদ্ধ করার বাসনাবশে এ গ্রন্থের সূত্রপাত। বাঙালীর রচনায় বাঙালীর চিত্ত-চরিত্রের যে প্রকাশ ঘটেছে, তা-ই মুখ্যত জানবার-বুঝবার প্রয়াস পেয়েছি এ গ্রন্থে। তাই গ্রন্থের নাম রেখেছি 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য'।

এ গ্রন্থস্থ যে সব তথ্য ও সিদ্ধান্ত, মত ও মন্তব্য নতুন, সেগুলো আমার। আমার কোন কোন মন্তব্যে ও সিদ্ধান্তে তথ্য-প্রমাণের তেমন স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ সমর্থন নেই বটে; তবু সেগুলো জিজ্ঞাসু ও সান্ধিৎসুকে তথ্য উদ্‌ঘাটনে ও সত্য উদ্ধারে প্রবর্তনা দেবে—এমনি এক প্রত্যাশাপ্রসূত। তাছাড়া, ব্যক্তিক চিন্তা-চেতনা যেহেতু ব্যক্তির দেশ, কাল ও অবস্থানসঞ্জাত, সেহেতু তথ্যমাত্রই তত্ত্বজাত ও তত্ত্বপ্রসূ। তাই নিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনায় বা ব্যাখ্যা-বিচারে

মন-মতের অভিব্যক্তি দান কিংবা ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। আপেক্ষিকতার সে-দোষ এ বইতেও রইল। অন্য সব তথ্য ও সিদ্ধান্তের জন্যে আমি উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত-নাম বিদ্বানদের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

এ-খণ্ডটি ১৯৭৬ সনের গোড়ার দিকেই, আরো দুটো অধ্যায়— 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য এবং ভাববিপ্লব ও বৈষ্ণব সাহিত্য'-সহ প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে মুদ্রণ কার্যে মাঝে মাঝে ছেদ পড়ার দরুণ দুই বছর বিলম্বে বের হল। এই দীর্ঘ কাল-পরিসরে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়েছে বারবার, একাগ্রতাও হয়েছে বিনষ্ট। তাই বর্ণে, বাক্যে ও বক্তব্যে কিছু ভুল রয়ে গেল,— একটানা ছাপা হলে এ সব ভুল হয়তো এড়ানো যেত। সাধারণ পাঠকের হিতার্থে পরিচ্ছেদকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার গরজে কোথাও কোথাও তথ্যের ও তত্ত্বের, মন্তব্যের ও সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে। পরিশিষ্টে দেয়া সংশোধনীর আলোকে পাঠশোধন করে গ্রন্থপাঠ বাঞ্ছনীয়।

বহু বছর ধরে বিস্মৃত-নাম বহু ছাত্র ও স্বজন-সুজনের আগ্রহের ও প্রবর্তনার প্রসূন আমার এই গ্রন্থ। এ-গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যবস্থায় ও কর্মে সহায়তা করেছেন সহকর্মী মনসুর মুসা, আহমদ কবির, মোহাম্মদ আবু জাফর, আবুল কাসেম ফজলুল হক, সাঈদউর রহমান, নুরুর রহমান খান ও বাঙলা একাডেমীর মুহম্মদ হবীবুল্লাহ ও আবুল হাসানাত প্রমুখ অনেকেই।

এ মুহূর্তে সবাইকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আহমদ শরীফ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

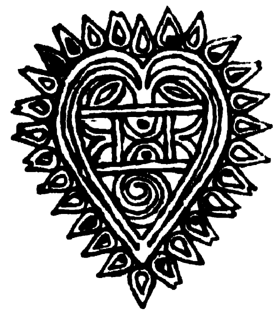
দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

আদি কবি ও কাব্য [পনেরো শতক অবধি]

পরিশিষ্ট



লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বিচিত চিন্তা / সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা / স্বদেশ অন্বেষা / জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে/যুগযন্ত্রণা/ কালিক ভাবনা / সূফী সাহিত্য / মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ / সৈয়দ সুলতান ও তাঁর যুগ / বাউল তত্ত্ব / মুসলিম কবির পদসাহিত্য / রাগতালনামা / সওয়াল সাহিত্য / বাঙলার সূফী সাহিত্য প্রভৃতি।

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য

[প্রাচীন ও মধ্যযুগ]

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

সাহিত্য জীবন-বিচ্ছিন্ন কোন সৃষ্টি নয়। জীবন আবার জীবিকা-ভিত্তিক। তাই মানুষের সর্ব প্রকার ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ জীবিকা-সম্পৃক্ত ও জীবন-প্রসূত। কাজেই জীবনের জন্যেই জীবন থেকে সাহিত্য উৎসারিত। অতএব জীবন নিয়েই সাহিত্য। জীবন নিরবলম্ব নয়। দেশ-কাল প্রতিবেশের ছাঁচে গড়ে উঠে জীবন। সেই জীবনের শিকড় থাকে অতীতে এবং আলো হাওয়া থাকে সমকালে। এ তাৎপর্যে সাহিত্য প্রতিবেশ-উদ্ভূত জীবনকথা। তাই সাহিত্য মাত্রই শাস্ত্র-সমাজ, লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার এবং দেশ-কাল-প্রতিবেশ প্রভাবিত। এই জন্যে কোন ব্যক্তির বা গোত্রের বা জাতির সাহিত্য বিচারে তার দৈশিক, কালিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শাস্ত্রিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান প্রয়োজন। নইলে কাণ্ডজ্ঞান প্রসূত খণ্ডদৃষ্টির বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকে না কোন সিদ্ধান্ত। তাই আমরা সর্বাগ্রে দেশ, জাত ও কালের সন্ধান নেব।

দেশ-কাল

আজ আমরা ভৌগোলিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে যে জনগোষ্ঠীকে বাঙালী এবং যে ভূখণ্ডকে বাঙলা বা বাঙলাদেশ বলে জানি, তা আধুনিক কালের। প্রাচীন কালে এই দেশে একক নামের ও অভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের কোন পরিচয় মেলে না। মোটামুটিভাবে বলা যায় গৌড়, রাঢ় ও পুণ্ড্র অঞ্চলই প্রাচীন জনপদ। এইসব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বর্বর বুনোমানুষ গোষ্ঠী-জীবনে অভ্যস্ত ছিল। বসতি ছিল বিরল।

নদী সেকালে রোগের প্রতিষেধক অজ্ঞাত ছিল বলে নানা ব্যাধিতে—মহামারীতে এবং গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লোকক্ষয় হত। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত অত্যন্ত মন্থর গতিতে। ফলে গোষ্ঠীর মিলনে গোত্রীয় সমাজগঠন বিলম্বিত হয়েছিল। মনে হয় খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শতকের পূর্বেই গৌড়া:, পুণ্ড্রা:, বঙ্গা: প্রভৃতি গোত্রীয় সমাজ দৃঢ়মূল হয়ে উঠে। তাই আমরা ঐতরেয় আরণ্যক (আনু:-খ্রীস্ট পূর্ব পাঁচ শতক) গ্রন্থে বঙ্গা: এবং প্রাচীনতর সংস্কৃত রচনায় গৌড়া:, রাঢ়া:, পুণ্ড্রা: (বঙ্গবগধশ্চের) প্রভৃতি গোত্রীয় সমাজের উল্লেখ পাই। উত্তর ভারতের কৌশাম্বীর নিকটে পভোসায় প্রাপ্ত গুহালিপিতে (আনু: ১ম শতক) 'বঙ্গপাল' নামের রাজার উল্লেখ রয়েছে। মানসোল্লাসে 'গৌড়-বঙ্গাল' নাম মেলে। হাজার বছরের পুরোনো চর্যাগীতিতে 'বঙ্গালী', বঙ্গালদেশ' (দঙ্গাল?)-এর উল্লেখ রয়েছে। তার আগেই গোত্রজ্ঞাপক 'গ্রাম' যে অর্থান্তর লাভ করে নিবাসস্থল রূপে নির্দেশিত হচ্ছিল, তাও নানা সূত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতেই বোঝা যায় খ্রীস্ট পূর্ব প্রায় হাজার বছর আগেই ওদের অধিকাংশ মানুষ যাযাবর জীবন পরিহার করে কৃষি-নির্ভর জীবিকায় অভ্যস্ত হয় এবং স্থানীয় নিবাস গড়ে তোলে। প্রাচীন দেশী দেবতা শিবের কাহিনীর মধ্যেই এই তথ্য মেলে।

ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদির প্রমাণে মনে হয় খ্রীস্টপূর্ব হাজার বছরের গোড়ার দিকেই উত্তর ভারতীয় আর্য সমাজ এই অঞ্চল সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে এবং দাক্ষিণাত্যের মতো এই অঞ্চলকেও অবজ্ঞা ও কিছুটা ঈর্ষার চোখে দেখত তারা। 'শতপথব্রাহ্মণে' পূর্বাঞ্চলের মানুষকে অসুর (বিকৃত আর্যভাষী?) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদের দস্যু-বলে আখ্যাত করা হয়েছে। পাণিনি (খ্রীস্টপূর্ব ৭ম শতক) অষ্টাধ্যায়ীতে যে 'গৌড়'-এর উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের গৌড় নয়। ঐ গৌড় 'গোণ্ড' জাতি বাচক উত্তর বা মধ্যভারতীয় কোন গোত্র হবার সম্ভাবনা। পরবর্তী কালের পঞ্চগৌড় নামই একাধিক গৌড়ের অস্তিত্ব নির্দেশ করছে। রাজতরঙ্গিণীতে গৌড়, সারস্বত দেশ, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকলকে 'পঞ্চ গৌড়' বলা হয়েছে। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি 'অঙ্গ-বঙ্গ' এবং কাত্যায়নও অঙ্গা:, বঙ্গা:, সুহ্মা:, পুণ্ড্রা:র উল্লেখ করেছেন। বোধায়ন সূত্রেও (১।২।১৪) পুণ্ড্র ও বঙ্গের অবজ্ঞার্থে উল্লেখ রয়েছে। রামায়ণে বঙ্গ এবং মহাভারতে বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তির উল্লেখ মেলে। আচারাঙ্গ সূত্র (আয়ারাঙ্গ সুত্ত) নামের জৈন গ্রন্থে সুহ্মের নাম আছে। বৌদ্ধ 'মহাবগেগ' রাঢ়-এর (লাঢ়) ও মিলিন্দ পঞ্‌হে বঙ্গের আর দিব্যাবদানে পুণ্ড্রের উল্লেখ মেলে। তাছাড়া 'ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু'-তে বঙ্গ ও বঙ্গলিপির কথা আছে। গ্রীকসূত্রে প্রাপ্ত গঙ্গারিডই রাজ্য সম্ভবত গৌড়ে পুণ্ড্রে বিস্তৃত ছিল।

'পাণ্ডববর্জিত' দেশ বলে এর নিন্দার মধ্যেই এর অস্তিত্বের প্রতি ঈর্ষ্যার স্বীকৃতির স্বাক্ষর মেলে। প্রমাণে ও অনুমানে প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে যে মহাবীর স্বয়ং এবং জৈন ও বৌদ্ধ শ্রাবক ভিক্ষুরাই প্রথম গৌড়ে রাঢ়ে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তার আগে হয়তো পূর্বাঞ্চলীয় কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্যবাদী নানা কাজে এসেছে। কিন্তু ব্রাত্য দোষ এড়ানোর প্রয়াসে ব্রাহ্মণ্য সমাজে তা অস্বীকৃত রয়েছে। আর্য গৌরব-গর্বী আর্যাবর্ত-ব্রহ্মাবর্ত নিবাসীরা বহুকাল অনার্য স্পর্শ দোষ এড়িয়ে চলবার প্রয়াসী ছিল—তা আদিশূর সংপৃক্ত কিংবদন্তী ও বল্লালী কৌলীন্য-চেতনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। অতএব জৈন বৌদ্ধ শ্রাবক ভিক্ষুর মাধ্যমেই উত্তর-ভারতের শাস্ত্র-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সমাজ-শাসন, অস্ত্র-বস্ত্র প্রভৃতি জীবন পদ্ধতির ও সভ্যতার সর্বপ্রকার আয়োজনের সঙ্গে এদেশীয়দের পরিচয় ঘটে। এ-ভাবে এদের জীবন-জীবিকার আর্যায়ণ সম্ভব হয়। মৌর্য আমলে এ আর্যায়ণ হয়তো গৌড়ে, রাঢ়ে ও পুণ্ড্রে সীমিত ছিল। গুপ্ত যুগে তা সুহ্মে, বঙ্গে, সমতটে ও প্রাগজ্যোতিষপুরে তথা আধুনিক উড়িষ্যা বাঙলা আসাম অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ছিল—যদিও মৌর্য, কণ্ব, সুঙ্গ, গুপ্ত, পাল বা সেন কোন শাসনই সমগ্র বঙ্গে চালু ছিল না। এঁদের মধ্যে কোন কোন রাজবংশের প্রশাসনিক বিভাগ ছিল বর্ধমানভুক্তি, কঙ্কগ্রামভুক্তি, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, ও শ্রীহস্তভুক্তি। তুর্কী আমলে বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র আলাদাভাবে চিহ্নিত হত। মুঘল আমলে এক বিস্তৃত পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলীয় ভূখণ্ড 'সুবাহ বাঙ্গালাহ্' নামে পরিচিত হয়। শাহজাহান আওরঙ্গজীবের আমল থেকে সাধারণভাবে এর মধ্যে বিহার উড়িষ্যাও থাকত এবং ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি এই তিন অঞ্চল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। তবু উনিশ শতক অবধি গৌড় ও বঙ্গ নামে দুইভাগে নির্দেশিত হত এই ভূভাগ। তুর্কীপূর্ব কালে গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, সমতট, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিখেল, [চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম] ও কামরূপ (আসাম)নামে পরিচিত হত বিভিন্ন অঞ্চল। এবং স্বাধীন শাসক বা সামন্তের রাজ্যসীমানুসারে এসব এলাকার পরিসরের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত। আশ্চর্য চিরকালের অবজ্ঞেয় বঙ্গ-বঙ্গাল-বাঙ্গলা শেষ অবধি গোটা অঞ্চলের মাটি ও মানুষের নাম ও পরিচয়ের অবলম্বন হল। মোটামুটি ভাবে গৌড়—রাজশাহী-মালদহ-রাজমহল মুর্শিদাবাদ, রাঢ় -বর্ধমান বিভাগ, সুহ্ম—প্রেসিডেন্সি বিভাগ, পুণ্ড্র-বরেন্দ্র-বগুড়া রঙ্গপুর দিনাজপুর কোচ•বিহার, বঙ্গ—ঢাকা ময়মনসিংহ পাবনা, সমতট—কুমিল্লা নোয়াখালি, হরিখেল-[<yarikriya]—চট্টগ্রাম পার্বত্য ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, বঙ্গাল-সোমদ্বীপ> চন্দ্রদ্বীপ>সন্দ্বীপ (বাকলা শহর—বরিশাল ?) তাম্রলিপ্তি—তমলুক ছিল বলে মনে করা চলে। সুতরাং আজকের সংহত বাঙালী জাতি

গড়ে উঠেছে বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষীর শাস্ত্র-সংস্কৃতি এবং জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনচর্যা গ্রহণ করেই। কাজেই তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অন্যরকম হলেও তার ব্যবহারিক জীবন উত্তর-ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রসূত।

২

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতি জটিল। তাছাড়া এ বিষয়ে আজো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। কাজেই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তবু বলা চলে এদেশে রক্ত সাঙ্কর্য একটু বেশি পরিমাণেই হয়েছে। তাই নৃতাত্ত্বিক গবেষণায়ও হয়তো নির্ভুল তথ্য মেলা ভার। আনুমানিক তেরো শতকে সংকলিত বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বাঙালীকে বর্ণভেদে ছত্রিশ জাতে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিভাজন নৃতাত্ত্বিক নয়---বৃত্তিসংপৃক্ত সমাজভিত্তিক। এছাড়া আধুনিক কালে রিজলি, রমা প্রসাদ চন্দ, বিরজা শঙ্কর গুহ প্রমুখ অনেকেই বাঙালীর আঙ্গিক বিচার করেছেন ও করছেন। মাথা-কপাল-নাক-ঠোঁট কিংবা চোখ-চুল-চামড়া এ পরীক্ষার অবলম্বন। কিন্তু প্রায় তিন হাজার বছরের সাঙ্কর্য কারুর কোন লক্ষণই অবিকৃত রাখেনি। তাই সমস্যা রয়েই গেছে। মোটামুটিভাবে বলা চলে নেগ্রিটো, আদি-অস্ট্রেলীয় (ভেডিডড) ও মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীরই মিশ্রণ ঘটেছে বেশি। তাই শতকরা ষাট ভাগ অস্ট্রেলীয়, বিশ ভাগ মোঙ্গলীয়, পনেরো ভাগ নেগ্রিটো এবং পাঁচ ভাগ অন্য নানা নরগোষ্ঠীর রক্ত মিশেছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। নিষাদ, কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সঙ্কর আদি অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড। আর কিরাত, রাজবংশী, নাগা, কোচ, মেচ, মিজো, কুকী, চাকমা, আরাকানী প্রভৃতি হচ্ছে স্বল্প সঙ্কর মোঙ্গলীয়। তাছাড়া কাল প্রবাহে কত কত গৌড়, মালব, চৌড়, খশ, হূন, কুলিক, কর্ণাট, লাট, (মনহলিপট্টোলী– মদন পাল দেব) দ্রাবিড়, মুরণ্ডা, শক, কুষাণ, ইউচি, আরব, ইরানী, হাবসী, গ্রীক, তুর্কী, আফগান, মুঘল, পর্তুগীজ ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ-রক্ত মিশ্রিত তো হয়েইছে। তবে তা পরিমাণে বেশি নয়। পুণ্ড্র, রাঢ়, বঙ্গ, সুহ্ম নামের অস্ট্রিক গোত্রগুলোই ছিল ভৌগোলিক বাঙলাদেশে প্রধান। অপ্রধানের মধ্যে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডালেরা ছিল নিজিত। পশ্চিমবঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত নানা সামগ্রী দৃষ্টে মনে হয় জৈন ও বৌদ্ধদের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেও এদেশে উন্নয়নশীল গোত্র ও বিকাশমান সংস্কৃতি ছিল। এই রক্ত-সঙ্কর মানুষের স্বভাব-চরিত্র হয়েছে অনন্য।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের ধারণায় প্রাচীন বাঙালীর চরিত্র এইরূপ :

"শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য...আবর্তন ও বিপ্লব, দুঃসাহসী সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাঙলার ঐতিহ্য ধারায়, বাঙালীর বৃত্তি যথার্থত বৈতসী। যে আদর্শ, যে ভাব-স্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাঙলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বার বার বাঁচাইয়াছে।"

বাঙালীর জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম গ্রহণের এবং গ্রহণ করেও আন্তরিকভাবে বরণ না করার রহস্য এবং জৈব-জীবনের তাগিদে তাকে প্রয়োজন মতো রূপ দেবার তত্ত্ব এখানেই নিহিত। বিভিন্ন বৌদ্ধযান, যোগ, দেহতত্ত্ব, কায়াসাধন ও পার্থিব জীবনের মিত্র ও অরি দেবতার পূজা প্রবণতার কারণ এ-ই। ডক্টর রায় তাই বলেন :

"প্রাচীন বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার ইঙ্গিত তাহার প্রতিমা শিল্পে ও দেব-দেবীর রূপ-কল্পনায় ধরা পড়িয়াছে।...সিদ্ধারা বলিতেন বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য নাই।...অরূপের ধ্যান এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অধ্যাত্ম সাধনার স্থান বাঙালী চিত্তে স্বল্প এবং শিথিল। বাঙালীর বুদ্ধি একটা শাণিত দীপ্তি লাভ করিয়াছিল...বাঙালী তাহার এই বুদ্ধির দীপ্তিকে সৃষ্টি কার্যে নিয়োজিত করে নাই।... তখন (মুসলিম বিজয় কালে) রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যৌথ অনাচার নির্লজ্জ কাম-পরায়ণতা, মেরুদণ্ডবিহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিতারল্য এবং অলঙ্কার বাহুল্যের বিস্তার—সমাজদেহে দুষ্টক্ষতের মতো প্রকট হইয়াছিল।"

[বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব]

•

বাঙালী-চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণাও কখনো ভাল ছিল না। মিথ্যা কথন, ভীরুতা, মামলা-প্রিয়তা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বাঙালী চরিত্রে ছিল সুলভ।

বাঙালী ভোগলিপ্সু কিন্তু কর্মকুন্ঠ। বৈরাগ্য-প্রবণ জৈন-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব মতবাদ বাঙালী চিত্তে কর্ম কুণ্ঠা আরো প্রবল করেছে। এমন মানুষ ভিক্ষা বৃত্তি বা চৌর্যবৃত্তি

অবলম্বন করে। বাঙালীচরিত্রে যে একদিকে মিথ্যা ভাষণ, প্রবঞ্চনা, চৌর্য, ছদ্ম বৈরাগ্য ভাব, চাতুর্য, সুবিধাবাদ ও সুযোগসন্ধান, তোয়াজ ও তদ্বিরপ্রবণতা প্রভৃতির প্রাবল্য এবং আত্মসম্মান বোধের অভাব, অন্যদিকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যে দেবানুগ্রহ জীবিতা রয়েছে, তা ঐ কর্মকুণ্ঠারই প্রসূন। তাই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য যুগে আমরা বাঙালীকে কেবল তুক-তাক, দারু-উচাটন, ঝাড়-ফুক, বাণ-মারণ, বশীকরণ, কবচ-মাদুলি, যোগ-তন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনী নির্ভর দেখতে পাই। তার সাহিত্যে পাই দেবতার স্তুতি ও মাহাত্ম্যকীর্তন। তার গানে গাথায় পাই বৈরাগ্য মহিমা ও পারত্রিক-চেতনা। চিরকাল বিদেশী শাসন-শোষণের ফলে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ মেলেনি বলেই হয়তো বঞ্চিত দরিদ্রের নিঃস্ব জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের এ প্রয়াস, দৈবশক্তির সাহায্যে অলৌকিক উপায়ে বাঞ্ছা সিদ্ধির ও প্রয়োজন পূর্তির এই আগ্রহ এবং বাঁচার তাগিদেই অনন্যোপায় মানুষের ভিক্ষাবৃত্তি, মিথ্যার আশ্রয় ও প্রতারণার পথ বরণ আবশ্যিক হয়েছে। সম্রাট বাবুর তাঁর আত্মচরিতে বাঙালী মানসের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন,—"বাঙালীরা 'পদ'-কেই শ্রদ্ধা করে। তারা বলে আমরা তখতের প্রতি বিশ্বস্ত। যিনি সিংহাসন অধিকার করেন আমরা তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করি।"

প্রতীচ্য মানুষ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বাঞ্ছাসিদ্ধির ও জীবনের নিরাপত্তার বাস্তব উপায় বের করেছে। আর আত্মপ্রত্যয়হীন প্রাচ্য মানুষ অলৌকিক উপায়ে বাঞ্ছাসিদ্ধির ও জীবনের নিরাপত্তার উপায় সন্ধানী।

প্রাচ্যের এই নিষ্ক্রিয় দলের জীবন-স্বপ্ন মানুষকে করেছে কল্পনাবিলাসী। ভূত-প্রেত-দেও-দানব, গন্ধর্ব-পরী-অপ্সরা তাদেরই কল্পলোক সহচর। মন্ত্র বলে আকাশে উড়তে কিংবা পাতালে প্রবেশ করতে অথবা নদ-নদী উল্লঙ্ঘনে কিংবা মরু-কান্তার উত্তরণে বাধা নেই কোথাও সেই কল্পনা ও বাসনার জগতে। রূপকথা, উপকথা, ধর্ম কথা, পুরাণ কথা প্রভৃতি এদেরই সৃষ্টি।

যারা উদ্যমশীল তারা জ্ঞান, বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসে বাস্তবক্ষেত্রে বাঞ্ছাসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে। তারা আকাশে উড়বার যন্ত্র, পাতালের খবর জানার কৌশল; সাগর তলা দেখবার দৃষ্টি, রোগ নিরাময়ের নিদান, কর্মে সাফল্যের কল এবং অন্যান্য বাঞ্ছা সিদ্ধির সামর্থ্য অর্জনে হয় ব্রতী। এমনি মানুষের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে মানুষের বৈষয়িক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান। এরাই করেছে প্রয়োজনীয় সব বস্তু আবিষ্কার ও নির্মাণ। শস্য-উৎপাদন অথবা মৃতে প্রাণ সঞ্চার থেকে আনবিক শক্তি সন্ধান কিংবা গ্রহলোকে গমন অবধি সব কিছুই উদ্যমশীল আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের দান। এরাই মিটিয়েছে অলস মানুষের সুখ-স্বপ্ন ও সাধ।

আজ উদ্যমশীলতা ও আত্মপ্রত্যয় প্রতীচ্যের সম্পদ আর উদ্যমহীনতায় ও দৈব-নির্ভরতায় প্রাচ্য-মানবের পরিচয়। প্রাচ্যে যা কল্পনা, পাশ্চাত্যে তাই বাস্তব, প্রাচ্যে যা আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, প্রতীচ্যে তাই যান্ত্রিক সম্পদ। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে প্রতীচ্য মানুষের শোনা কথায় সন্দেহ ও অনাস্থা এবং কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও অবিরাম প্রয়াস, আর প্রাচ্য মানবের প্রয়াসহীন প্রাপ্তিলিপ্সা, আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সংস্কারে নিষ্ঠা, প্রশ্নহীন প্রত্যয় এবং আত্মসামর্থ্যে অনাস্থা। জিজ্ঞাসার ও আকাঙ্ক্ষার, আত্মপ্রত্যয়ের ও উদ্যমের মেলবন্ধন না হলে জীবনে ও জীবিকায়, মনে ও মননে যে-জীর্ণতা আসে, তা থেকে হাজার হাজার বছরেও যে ব্যক্তির বা সমাজের মুক্তি ঘটে না, তার সাক্ষ্য আফ্রো-এশিয়ার অনুন্নত ও আরণ্য সমাজ।

৩

বাঙলা ভাষা—গোত্রপরিচয়

আমরা আজ যে-ভাষাকে আমাদের মাতৃভাষা বলে জেনে গর্ববোধ করছি, তা উত্তর ভারত হয়ে আসা আর্যভাষা। আগেই বলেছি আমরা কেবল রক্ত-সঙ্কর জাতি নই, মিশ্র সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষও। গ্রহণে বরণেই আমরা আজকের স্তরে এসে পৌঁছেছি। এক হিসেবে আমরা আত্মবিস্মৃত ও স্বকীয়তা বিরহী মানুষ। আমাদের শাস্ত্র, সংস্কৃতি, সভ্যতা, রীতিনীতি সবটাই বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিধর্মী থেকে পাওয়া। তা সত্ত্বেও বাঙালী তার মৌলিক স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। আপাতদৃষ্টে তার পৈত্রিক ভাষা হারিয়ে গেছে বটে, তবে নানাভাবে নিদর্শনও রয়ে গেছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মত এবং ইসলাম গ্রহণ করলেও সে তার আদিম ধর্মসংস্কার কখনো ছাড়েনি। সংখ্যা-যোগ-তন্ত্র ও লৌকিক সংস্কার-পুষ্ট মননে ও জীবনে তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য সে উক্ত ধর্মাচারের আবরণে সযত্নে রক্ষা করেছে। যথাস্থানে আমরা তা আলোচনা করব।

এখানে কেবল ভাষার কথাই বলছি। ঐতরেয় আরণ্যকের 'বায়াংসি বঙ্গ বগধশ্চেরপাদাঃ'—এই উক্তিতে আমাদের অনার্য ভাষার ইঙ্গিত মেলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদের বলা হয়েছে দস্যু। তবু বৈদিক যুগ থেকেই দেশী, বিভিন্ন অনার্য শব্দ ও বাকভঙ্গী ঋকবেদীয় ভাষাকেও প্রভাবিত করেছিল। আমাদের অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ও পদগঠন রীতির প্রভাব দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতে ও প্রাকৃত ভাষায় নেহাত কম মেলে না। পশীলস্কি, শিলভ্যাঁ লেভী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্,

প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বানদের গবেষণার ফলে আজকাল এসব তথ্য আর কারো অজানা নয়। যেমন—

ক. ফল ফসল—ধান, ডাল, কলা, নারিকেল, পান, সুপারি, লাউ, বেগুন, আদা, হলুদ এদেরই আবিষ্কার।

খ. গণনা পদ্ধতির—কড়ি, পণ, গণ্ডা, কড়া, গুটি, গুঁড়া, ঘুটি প্রভৃতি।

গ. ভাব ও বস্তুবাচক- খাঁখার, ঠেঙ, ঠোঁট, ছাঁচ, কলি, পেট, ঝাড়, ঝোপ, চোঙ প্রভৃতি।

ঘ. জলবাচক— দামদাক (দামোদর), কবদাক (কপোতাক্ষ)। দহ—ঝিনাইদহ, নাশদহ। ড়া-বাঁকুড়া, হাওড়া, বগুড়া। গুড়ি—শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি। জুলি—নয়নজুলি প্রভৃতি।

ঙ. ধ্বন্যাত্মক অনুকার, শব্দদ্বৈত-- খাঁখাঁ, হনহন, ভনভন, টলটল, ফলাফল, ঝিরি, শিরশির, শোঁ শোঁ, ভেঁ ভেঁ ইত্যাদি।

চ. আসবাব তৈজস—ঢেঁকি, কুলা, ডালা, লাঙ্গল, কার্পাস, কম্বল, বাণ, ধনু, পিনাক, দাও, ডোঙা।

ছ. পশু-পাখি—মেড়া, কাক, গণ্ডার, মাতঙ্গ ইত্যাদি।

ঝ. তিব্বতী-চীনা তথা মোঙ্গলীয় কিছু কিছু দেশ ও বস্তুবাচক শব্দও দুর্লভ হবে না। যেমন, ফা (>পা>পাদ), নাথ, ফুঙ্গী, লুঙ্গী, সাম্পান, গঙ্গা, বঙ্গ, বানিয়াচঙ্গ, বুড়িচঙ্গ, এবং সোয়াঙ, পালঙ অন্তক দক্ষিণ চট্টগ্রামের গ্রামনাম।

কল্পনা করা যাক এ দেশের বিভিন্ন গোত্রের লোকগুলো গোত্রীয় ভাষা ও আঞ্চলিক বুলিতে কথা বলত। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রচারক-প্রশাসকরা যখন এই-দেশে পালি প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা (অধিকাংশের মুখের বুলি মাগধী প্রাকৃতও) নিয়ে এল, তখন নিশ্চয়ই ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে একদিনে বা এক পুরুষে গোটা দেশের মানুষ প্রাকৃত, পালি বা সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করতে পারেনি। এই জন্যে প্রায় দুই তিন পুরুষের প্রয়াস প্রয়োজন ছিল। শিক্ষিত জন অধ্যুষিত আধুনিক ইসরাইল রাষ্ট্রে কৃত্রিমভাবে লেখা-পড়ার মাধ্যমে হিব্রু শেখানো যত সহজ হয়েছে নিরক্ষতার সেই যুগে তা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। প্রায় দু-হাজার বছর আগে বাঙালীরা মুখে মুখে অল্প অল্প করে মন্থর গতিতে আর্যভাষা শিখে নিয়েছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। যেমন—এযুগে বুনো মানুষেরা খ্রীস্টান প্রচারকদের কাছে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-সংস্কৃতিতেও শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করে,

কিংবা আফ্রিকার জঙ্গল থেকে ধৃত আরণ্য নিগ্রোরা যেমন করে অল্প সময় পরিসরের মধ্যে আমেরিকায় য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষা শিখে নিয়ে ছিল (তেমন দ্রুত না হলেও) সুদূর অতীতের বাঙালীরাও শাস্ত্রের ও শাসকের ভাষা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি শিখে নিয়েছিল। তবু স্বদেশে স্ব-সমাজে স্থায়ীভাবে বাস করত বলে তারা উত্তর ভারতীয় ভাষা অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কোন বিদেশীই তা পারে না। তাই তাদের গৃহীত ভাষার শব্দে, উচ্চারণে, ব্যাকরণে ও বাক্‌রীতিতে নিজেদের ভাষার লক্ষণীয় প্রভাব রয়েই গেছে। বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজো আমাদের অস্ট্রিক জ্ঞাতি কোল, খাসি, মুণ্ডা, ভীল, সাঁওতালী, হো, কুরকু, শবর, গদব প্রভৃতি গোত্রীয় কৌম রয়েছে। তাদের ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বাঙলা ভাষায় যে আমাদের অস্ট্রিক ভাষার সর্বাত্মক প্রভাব পড়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন—ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাঙলা ভাষার উপর মুণ্ডা ভাষার প্রভাব নিরূপণ করেছেন নিম্নরূপ ভাবে:

বাঙলা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব

॥ ক ॥ ধ্বনিগত

১. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও যুগ্ম স্বরধ্বনি রয়েছে। যেমন—ঐ ঔ ও আও আই ইত্যাদি।

২. মুণ্ডার ভাষার মতো বাঙলায়ও যে কোন স্বরবর্ণে নাসিক্য উচ্চারণ সম্ভব।

৩. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও শব্দে স্বরসঙ্গতি ও অপিনিহিতি বহুল প্রচলিত। যেমন—গোলা-গুলি, ছোরা-ছুরি, তুমি-তোমার, দেখা-দেখি, লেখা-লিখি ইত্যাদি। এই স্বর-সঙ্গতি ও অপিনিহিতির লক্ষণ কুরকু ও সাঁওতালী ভাষায়ও লক্ষণীয়। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কোন কোন ভাষাতেও এই লক্ষণ সুলভ।

৪. মুণ্ডা ভাষার মতো যুক্তাক্ষর দিয়ে বাঙলা কোন শব্দ আরম্ভ হয় না। তেমনি য় ব-ও কোন বাঙলা শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয় না, অর্থাৎ শব্দে আদ্যক্ষর রূপে ব্যবহৃত হয় না।

৫. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও শ ষ স তিনটেই শ রূপে উচ্চারিত হয়। সাঁওতালী ও কুরকু ভাষাতেও এই বিকৃতি বর্তমান।

৬. বাঙলা বুলিতে বিশেষত অশিক্ষিতা নারী ও শিশুদের উচ্চারণে ল-ন এবং ন-ল রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—লবন-লুন-নুন, লাল-নাল, লঙ্গর-নঙ্গর, লোষ্ট্র-নোড়া, লাঙ্গা-নাঙ্গা, লাচার-নাচার, লোকসান-নোকসান ইত্যাদি।

৭. মুণ্ডা ভাষার মতো কোন বাঙলা শব্দেই ণ ও ঋ আদ্যক্ষর রূপে ব্যবহৃত হয় না।

।। খ ।। শব্দ ও ব্যাকরণগত

১. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও বচনে, লিঙ্গে এবং কারক চিহ্নে বিশেষণ বিশেষ্যের অনুগত হয় না। যেমন—ছোট ছেলে, ছোট মেয়ে, ছোট গ্রাম ইত্যাদি।

২. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও ভিন্ন শব্দ যোগে লিঙ্গান্তরের নিয়ম চালু রয়েছে। যেমন—বেটা ছেলে, মেয়ে ছেলে, পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষ, নর কবুতর, মাদী কবুতর, লোক, মেয়ে লোক ইত্যাদি।

৩. কারক-বিভক্তি যোগের ব্যাপারেও মুণ্ডা ভাষার সঙ্গে বাঙলার ঐক্য রয়েছে। বাঙলা কে, তে, র, এর প্রভৃতি মুণ্ডা ভাষার প্রভাব প্রসূত এবং মুণ্ডা ভাষার মতোই এগুলো বচন নিরপেক্ষ।

৪. বাঙলা টা, টি যেমন ছেলেটা, একটি ইত্যাদি মুণ্ডা প্রভাব প্রসূত বলে বিদ্বানদের ধারণা।

৫. সম্বন্ধের 'র' 'এর' যোগে বিশেষণ পদের প্রয়োগও মুণ্ডা ভাষার প্রভাবজ। যেমন সোনার কলম, সোনার বাঙলা, লোহার খাট, কলমের আঁচড় ইত্যাদি।

।। গ ।। বাক্য গঠনরীতি

১. বাঙলায় যেমন একটি বাক্যে (১) সম্বোধন, (২) সম্বন্ধ পদ (৩) কর্তা, (৪) কর্ম (৫) ক্রিয়াপদ বসে। যেমন— (২) রামের (৩) ছেলে (৪) গাছ (৫) কাটে। মুণ্ডা ভাষাতেও বাক্যে এই ভাবেই পদ বিন্যস্ত হয়।

২. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলাতেও পরোক্ষ উক্তি (Indirect narration) নেই।

৩. বাঙলা ভাষাতে যেমন সে ভাল ছেলে বলিয়া সকলে তাহাকে ভালবাসে—এইরূপ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। মুণ্ডা ভাষাতেও এই ভাবে দেখিয়া (seeing in this way)—এইরূপ বাক্য গঠিত হয়।

৪. বাঙলা ভাষাতে যেমন শব্দদ্বৈত বহুল ব্যবহৃত, মুণ্ডা ভাষাতেও তাই। যেমন—অলি-গলি, আবল-তাবল, এবড়ো-খেবড়ো, আশে-পাশে, গোল-গাল, হৈ-চৈ, আলা-ছালা, আঁকু-বাঁকু সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও এমনি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৫. বাঙলা ভাষাতে যেমন ক্রিয়াবাচক বিশেষণ রয়েছে যথা—চেনা লোক, আসছে কাল, প্রাচীন ও মধ্য বাঙলায় দুহিল দুধ, ছুঁড়িল তীর, কাটিল কদলী, ফুকিল কাক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে, মুণ্ডা ভাষাতেও এমনি ব্যবহার দুর্লভ নয়।

৬. আমাদের বাঙলা ভাষায় কিছু মুণ্ডা শব্দ এখনো ব্যবহৃত হয়। যেমন—কাঁড়া (মহিষ), মেনি (বিড়াল), মেড়া (ভেড়া)। মুণ্ডা ভাষার শব্দ বলে অনুমিত তথা খাসী, মোনক্ষ্মের প্রভৃতি অস্ট্রিক গোত্রীয় ভাষার শব্দ বলে অনুমিত এইরূপ কিছু শব্দ আকাল, আখড়া, বড়শি, বট, বেঁটে, ভেড়া, বোকা, চাউল, কুটা, চুলা, ঢাল, ডোঙা, হ্যাঁ, হাড়, হুডকা, কালা, খচচর, খুঁটি, লড়াই, মোটা, রাঁড়, ঠোঙা, তোতলা ইত্যাদি।

৭. সংখ্যাবাচক কুড়ি, গণ্ডা, কড়া, পণ প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ।

মধ্যযুগে উন্নাসিক ব্রাহ্মণ্য অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'ভাষা'। যেমন 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ/ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।' 'উন্নাসিক মুসলিমদের কাছে এ ছিল 'হিন্দুয়ানী ভাষা'। যেমন—হিন্দুয়ানী লেখা তারে না পারি লিখিতে (হাজী মুহম্মদ)। কারুর চোখে এভাষা 'প্রাকৃত ভাষা' (দ্বিজশ্রীধর কবিরাজ ও রাম চন্দ্র খান, ১৬ শতক)। কারো মতে এ 'লোক ভাষা' (মাধবাচার্য, ১৬ শতক) এবং কেউ বলেছেন একে 'লৌকিকভাষা' (কবিশেখর ১৭ শতক)। আর অধিকাংশ লেখক যেমন শ্রীকরনন্দী, দৌলত কাজী একে 'দেশী ভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্র রায় উল্লেখ করেছেন কেবল 'ভাষা' বলে—অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল। আবার কিছু সংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাষা' বলেও আখ্যাত করতেন। বহিরাঞ্চলে এ ভাষার নাম ছিল 'গৌড়িয়া'। উনিশ শতকে রামমোহন প্রমুখ কেউ কেউ একে 'গৌড়ীয় ভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গৌড়, গৌড়জন, গৌড়দেশ'-এর মতো ভাষার গৌড়ীয় নামও টেকেনি। দেশের নামে জাতি ও ভাষা আখ্যাত হয়। তাই বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী, বাঙ্গলাভাষা, বাঙলাদেশ, বাঙালীজাতি, বাঙ্গালী ভাষা 'বঙ্গভাষা ও বাঙলা ভাষা' নামই অবশেষে টিকে গেল।

নিকট অতীতেও যে বিহারে, উড়িষ্যায, বাঙলায়, আসামে বিশেষ করে উড়িষ্যায় বাঙলায়, আসামে অভিন্ন 'প্রাকৃত-অবহট্ট' বুলি রূপে ব্যবহৃত হত, এমন কি চর্যাগীতির আমলেও অর্থাৎ হাজার বছর আগেও বিহার-উড়িষ্যা-বাঙলা-আসাম-ব্যাপী একটি অভিন্ন লেখ্যভাষা (বুলির পার্থক্য সত্ত্বেও) চালু ছিল তার প্রমাণ মেলে অবহট্ট রচনায়, প্রমাণ পাই বিভিন্ন অঞ্চলের পদকার রচিত চর্যাগীতিতে। ভাষাবিদ বিদ্বানেরা বলছেন—তেরো শতক অবধি বাঙলা-উড়িয়া-আসামীতে কোন ভেদ ছিল না এবং ষোল শতক অবধি বাঙলা আসামী অভিন্ন ছিল। কাজেই বারো-তেরো শতকে যদি বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম কোন একচছত্র শাসনে থাকত এবং এখানকার যে কোন অঞ্চলের ভাষা যদি প্রশাসনিক তথা দরবারী লেখ্য ভাষারূপে (শৌরসেনীর বদলে) ব্যবহৃত হত তাহলে আজ ঐ বিরাট দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে একভাষী একটি জাতিসত্তা (Nationality) গড়ে উঠত তাতে

রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে অভিন্ন স্বার্থবশে একটি বিশিষ্ট বলিষ্ঠ ও স্বয়ম্ভর রাষ্ট্রিক জাতি গড়ে উঠতে পারত। সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতাও স্বাতন্ত্র্যে এবং বৈচিত্র্যে বিশিষ্টতা লাভ করত। আজো লেখ্য বাঙলা-উড়িয়া-আসামীতে প্রভেদ সামান্য। আজো এই তিন ভাষা ও সাহিত্যকে অভিন্ন করে দেখা সম্ভব। বাঙলা ও আসামী হরফে পার্থক্য সামান্য। উড়িয়া বর্ণমালা ভিন্ন হলেও উড়িয়া ও বাঙলা বাক্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে কেবল ক্রিয়া পদে এবং আসামীর সঙ্গে লেখ্য বাঙলার পার্থক্য মুখ্যত স-হ উচ্চারণে। এ-যুগ মিলনের যুগ, দূরকে নিকটিস্থ করার এবং পরকে ভাই করার যুগ। বাঁচার তাগিদেই বিশ্ব মানব আজ কেবল বাণিজ্যে কিংবা বৈষয়িক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয় — আত্মার ক্ষেত্রেও আত্মীয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও মন মানসের ঐক্য ও সংহতি কাম্য। এ আন্তর্জাতিকতাব যুগে আজো আমরা মিথ্যা অহমিকা ও ছদ্ম স্বাতন্ত্র্যবোধ বশে আমাদের সহজবোধ্য দুটো প্রতিবেশী ভাষা-সাহিত্যকে অবহেলা ও ঔদাসীন্যে দূরে ঠেলে রাখছি—অপরিচয়ের প্রাচীর নিরন্তর উঁচু করে তুলছি। আজো চর্যাগীতিকারদের নিয়ে কাড়াকাড়ি করছি, মনসামঙ্গলের কবি নারায়ণদেব সমভাবে বাঙলা আসামের গর্ব। আজো বাঙলা ও আসাম কবিশঙ্কর-দেবের দাবীদার। জয়দেবকে নিয়ে উড়িয়া-বাঙালীর বিবাদ চলছে। আন্তরাঞ্চলিক আত্মীয়তার চিহ্ন বিমোচনে ও যোগসূত্রের অস্বীকারে উদ্বেগ নেই আমাদের, যদিও আজকাল বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ করে করে আমাদের সাহিত্যকে ঋদ্ধ করার সাধনায় আমরা সদা নিরত।

অর্জিত সম্পদের অধিকার হেলায় হারিয়ে অর্জনের ঔৎসুক্য পাকা বিষয়ীর লক্ষণ নয়। আজো আমরা হরফের ব্যবধান স্বীকার করেও বাঙলা উড়িয়া আসামী ভাষার চর্চা করতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা সাহিত্য বিভাগে বাঙালীরা উড়িয়া-আসামী এবং অন্যেরাও স্বভাষার সঙ্গে অন্য দুটো ভাষা ও হরফ আবশ্যিকভাবে শিখে নিলে আজো তিনটে ভাষাকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-বন্ধনে বাঁধা সম্ভব। এতে ভাবীকালে এই বিস্তৃত অঞ্চলবাসীর বৈষয়িক ও আত্মিক কল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা অশেষ।

জাতি পরিচয়ে বাঙলা ভাষা ইন্দো-য়ূরোপীয় আর্যভাষার প্রাচ্য শাখার অন্তর্গত। প্রকৃতির কোলে লালিত প্রাকৃত জনের তথা লোক সাধারণের মৌখিক বিকৃতি জাত বলে কথ্যরূপের নাম প্রাকৃত। বাঙলাও আঠারো শতক অবধি প্রাকৃত ভাষা বা শুধু ভাষা নামে অভিহিত হত। ঋগ্বেদীয় ভাষার কথ্যরূপ থেকে মুখে মুখে কালিক বিবর্তনের ফলে আজকের লিখিত বাঙলার ও বিভিন্ন অঞ্চলের বর্তমান বুলির উদ্ভব। ছকে এই বিবর্তন ধারা নিম্নরূপ :

১। লেখ্য বা লিখিত

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

বৈদিক ভাষা

(আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-৬০০ খ্রীঃ প)

কৃত্রিম লেখ্য সংস্কৃত

(আনুঃ ৬০০ খ্রীঃ পূ থেকে)

পালি

(মধ্য দেশীয় কৃত্রিম লেখ্য ভাষা)

অশোক লিপি ও বৌদ্ধ শাস্ত্র সাহিত্য

(আনুঃ খ্রীঃ প ৬০০— ২০০ খ্রীঃ)

প্রাকৃত (মধ্যদেশীয় লেখ্য বিবর্তিত প্রাকৃত = শৌরসেনী)

(আনুঃ ২০০---৬০০ খ্রীঃ)

অপভ্রংশ (লেখ্য বিবর্তিত শৌরসেনী-অবহট্ঠ)

(আনুঃ ৬০০—৯৫০ খ্রীঃ)

নব্য বা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা

লেখ্য বাঙলা

(আনুঃ ৯৫০ খ্রীঃ থেকে)

২। কথ্য বা কথিত প্রাচীন ভারতীয় ভাষা

আর্যভাষার কথ্য রূপ (ঋগ্বেদের)

(আনুঃ ১৫০০ খ্রীঃ পূঃসমকালীন)

আর্যাবর্তের কথ্য প্রাকৃত (বিকৃত পালি)

(আনুঃ ৬০০ খ্রীঃ পূঃ—২০০ খ্রী)

কথ্য মাগধী প্রাকৃত
(আনুঃ ২০০—৬০০ খ্রীঃ)
|
কথ্য অবহট্‌ঠ
(আনুঃ ৬০০—৯৫০ খ্রীঃ)
|
কথ্য বাঙলা
(৯৫০ খ্রীঃ থেকে)

একালে কথ্য আর্যভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক বিকৃতি জ্ঞাতিত্ব চিহ্ন অস্পষ্ট করে তুলেছে।

৪

বাঙালীর সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি

জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। জীবন জীবিকাগত নয় কেবল, স্থান, কাল এবং গোষ্ঠীগতও। মানব সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, বিবর্তন ও বৈষম্য ঘটে একারণেই। বিভিন্ন প্রতিবেশে জীবন জীবিকার নিরাপদ নিরুপদ্রব রক্ষণ-লালন লক্ষ্যেই মানুষের মানস সংস্কৃতি ও তজ্জাত ব্যবহারিক উপকরণ এবং বৈষয়িক আচরণ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুভূতি ও মননের অভিব্যক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন-চেতনার বহিরূপই সংস্কৃতির সাক্ষ্য। সংস্কৃতির আবর্তন নির্বতন-উদবতন কিংবা বিকাশ-বিবতন তাই শাস্ত্রিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈল্পিক ও প্রশাসনিক সাবলীলতা-স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা দৌর্বল্য-দুর্দশার উপর নির্ভরশীল। যেখানে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসারের অনুকূল পরিবেশ, সেখানে সংস্কৃতি জীবনের সর্বাঙ্গীন ও সর্বাত্মক বিকাশের এবং জীবিকার স্বচ্ছন্দ প্রসারের লাবণ্যে বর্ধিষ্ণু, যেখানে পরিবেষ্টনী প্রতিকূল, সেখানে সংস্কৃতি জড়তায়, জীর্ণতায় ও চিরন্তনতায় বিকৃত, প্রথাগত নিষ্প্রাণ আচার ও আচরণ মাত্র। কারণ বেঁচে বর্তে থাকার পদ্ধতিই জন্ম দিয়েছে শাস্ত্রের, সমাজের, সংস্কৃতির, সভ্যতার ও রাষ্ট্রের। সেই বাঁচার প্রয়াস যখন কোন বিরুদ্ধ বিরূপ শক্তি রোধ করে দাঁড়ায়, তখন জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা-কর্ম-প্রয়াস ও আচরণ আবর্তনধর্মী হয়েই জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে।

আমাদের বাঙলাদেশ তথা গোটা ভারতবর্ষ চিরকাল অন্তত ঐতিহাসিক যুগে বিদেশী-বিজাতি বিজিত দেশ। এদেশের মানুষ কখনো স্বকীয় মেজাজে আত্মবিকা-

শের সহজ ও স্বাভাবিক পথ পায়নি। সৃজনে নয়—অনুকৃতি ও অনুশাসনের বশে গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে কোথাও অন্ধের মতো কোথাও পঙ্গুর মতো সে এগিয়েছে স্থান কালের দাবী স্বীকার করেই। তাই আমাদের সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি, অস্থি ও মজ্জা আজো আদিম। মেদ-মাংসের স্ফীতি ও লাবণ্য তাকে আড়াল করেছে বটে কিন্তু লোপ করতে পারেনি।

বাঙালী সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিল অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও মনন। বাঙালীর মননে ও অধ্যাত্মবুদ্ধিতে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব বরাবর প্রবল রয়েছে। সর্বপ্রাণবাদে তথা জড়বাদে ও যাদুতে তার আস্থাও অবচেতন ও নিঃসঙ্গ মনে ক্রিয়াশীল থেকেছে চিরকাল। বৃক্ষ দেবতা, নারী দেবতা, পশু-পাখী দেবতা, দেহচর্যা ও জন্মান্তরে বিশ্বাস তাদেরই সৃষ্টি। তুক-তাক-দারু-টোনা, ঝাড়া-ফুক, বাণ-উচাটন, কবজ-মাদুলী ও বশীকরণে আস্থা তাদের আজো অবিচল। সভ্য বাঙালীর অস্ট্রিক মোঙ্গলীয় জ্ঞাতি পার্বত্য আরণ্য কৌম—কোল, সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী, গাড়ো, হাজঙ, খাসিয়া, মণিপুরী, লুসাই, নাগা, মিজো, খুমি, তিপরা, মুরঙ, কুকী, কোচ প্রভৃতির মধ্যে যে-সব নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ, চালু রয়েছে, তাদের অনেক গুলোই ভিন্নাকারে বা সামান্য রূপান্তরে সভ্য বাঙালীর প্রথাসিদ্ধ আচারে রয়ে গেছে। আমাদের ঘরোয়া ও সামাজিক অনেক আচারে-অনুষ্ঠানে প্রথায় পার্বণে, মৃতের সৎকারে, শ্রাদ্ধে, বিশ্বাসে-সংস্কারে আদিম রীতি-নীতির ছিটে-ফোঁটা এখনো মেলে।

জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-খ্রীস্টান ধর্ম এবং ইসলাম গ্রহণ করেও বাঙালী তার আদিম ঐতিহ্য কখনো সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে পারেনি। তাই গাছের মধ্যে বট, অশ্বথ, তাল, তেঁতুল, তুলসী প্রভৃতি, পাখীর মধ্যে কাক, পেচক, শকুন, শালিক প্রভৃতি, পশুর মধ্যে গাভী, শেয়াল, সরীসৃপের মধ্যে সাপ, টিকটিকি, নৈসর্গিক তিথি নক্ষত্র-দিনা-ক্ষণ-মাস অশরীরী ভূত প্রেত পিশাচ-(জীন-পরী) ডাইনী প্রভৃতি বাঙালীর চেতনায় রোগের চিকিৎসায়, শুভাশুভ চিন্তায় এবং সিদ্ধি-সাফল্য কামনায় আজো উপযোগ হারায়নি।

আচারিক জীবনে ধান, দূর্বা, হলুদ, আমপাতা, কলাগাছ, কলসী, ঘট, কুলা, দীপ ধূপ, মাছ, দই, আজো মনোজীবনে বাঞ্ছাসিদ্ধির ভরসা জাগায়। ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী কিংবা সাপ, হাতী, বাঘ, কুমীর আজো সভয় শ্রদ্ধা পায়।

নৈতিক সামাজিক জীবনে গোত্রে বিবাহ, বহু-বিবাহ, অগোত্রীয় বিবাহ, বাল্য বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, ত্যাগ, তালাক প্রভৃতি বিধি-

নিষেধও আদিম। গোত্রপতি, সমাজপতি ও গৃহপতির দাপট ও নেতৃত্ব আজো নিম্নতর সমাজে অবিলুপ্ত। গুরুবাদ ও মন্ত্রগুপ্তি সর্বসমাজে আজো প্রবল। হাতিয়ারের মধ্যে লাঙ্গল, যোয়াল, ফাল, ঈষ, দা, দড়ি, মই, কোদাল, বর্শা, বাঁটুল, ঝুড়ি, চুপড়ি, চেঙাড়ি, ডিঙ্গি, ডোঙ্গা, তৈজস আসবাবের মধ্যে হাঁড়ি, সরা, পাতিল, ঝিনুক, ডাবা, (নারিকেলের মালা), মাচা, নল, পেটি, ঘটি, চাটাই, চাটি, ঝাঁটা, বাখারি প্রভৃতি, নেশার মধ্যে গাঁজা, ধেন্ মদ, চরস, সিদ্ধি প্রভৃতি, ফলমূলের মধ্যে ধান, বেগুন, ঝিঙা, কলা, তাম্বুল, গুবাক, গাওারী, জাম্বুরা, শিমূল, তেঁতুল প্রভৃতি অস্ট্রিক দ্রাবিড় মোঙ্গলীয় বাঙালীর আবিষ্কৃত। ধানের জিজিরা, ককচি, করা, তুতীয়া, বাদল, শুকুই, লেম্বরু, গেলড, মইদল প্রভৃতি এবং মাছের পুঁটি, টেঙরা, শিঙ্গি, গজাড়, কই, মাগুর, টাকি, পাঙ্গাস প্রভৃতি অস্ট্রিক-দ্রাবিড় মোঙ্গলীয় নাম।

খাদ্যবস্তুর মধ্যে গুড়, ভাত, মাড়, খই, চিড়া, মুড়ি, চচ্চড়ি, ভর্তা, আচার প্রভৃতিও অস্ট্রিক হওয়ার কথা।

কড়া, পণ, গণ্ডা, কুড়ি, কাহন, গণনা পদ্ধতি অস্ট্রিক। এমনকি কয়েকশত শব্দ ঢিল, ঢাক, ঢোল ডাঙর, ডাঁশাল, ডাহা চোঁয়াল, খাড়ু, টোপা, খোকা, খুকী, খাড়ি, খোটা, খামার, ঘড় আডডা লাডডু প্রভৃতি অস্ট্রিক সংস্কৃতির স্মারক।

এ-সব ছাড়াও ধর্মমত সূত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা-পদ্ধতি সূত্রে বিদেশীর জ্ঞান ও চিন্তা এবং বিদেশে আবিষ্কৃত ও উদ্ভূত দ্রব্য ও ভাবচিন্তার নাম ও ব্যবহার সম্পৃক্ত আচার-সংস্কৃতি অনুকৃতি-অনুসৃতির মাধ্যমে বাঙালীর সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ ও রূপান্তরিত করেছে। যেমন—জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণ এক সময় জৈন বৌদ্ধ বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও জীবনদর্শন কিংবা ইসলাম ও খ্রীস্টান শাস্ত্র তেমনি ভাবে যথাক্রমে হিন্দু মুসলিম ও খ্রীস্টান জীবন প্রভাবিত করেছে। বস্তুত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় শতকরা পঞ্চাশভাগই নিয়ন্ত্রণ করে—বিশ্বাসরূপে, সংস্কার রূপে, ঘরোয়া ও সামাজিক আচার আচরণরূপে, ন্যায়-অন্যায় চেতনারূপে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ রূপে। এক কথায় জীবনের মূল্যবোধ মুখ্যত ধর্মমত থেকেই জাগে। কাজেই বাঙালী নির্বিশেষের অভিন্ন মানস-সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করার মতো কচিৎ কিছু মেলে। তবু সাধারণভাবে কিছু আদিম বিশ্বাস-সংস্কার রূপান্তরে, তথা ধর্মীয় সংস্কারে সমন্বিত হয়ে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নির্বিশেষ বাঙালীর সাধারণ আচরণের অবলম্বন হয়েছে। এবং সেখানেই কেবল বাঙালীর অভিন্ন সত্তার সন্ধান মেলে। তাই আমরা আজো হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বৌদ্ধ যুগের ও বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের কিংবা অস্ট্রিক মোঙ্গলীয় ঐতিহ্যের ও আচারের অনেক কিছুরই রেশ

দেখতে পাই। আবার সাধারণভাবে বলতে গেলে যেহেতু সংস্কৃতি জীবিকাপদ্ধতি তথা আর্থিক নৈতিক শৈক্ষিক কালিক ও প্রাতিবেশিক পরিবেষ্টনী নির্ভর—সেহেতু সংস্কৃতিরও আঞ্চলিক, সামাজিক, কালিক, শ্রেণীক ও ব্যক্তিক ভেদ থাকে। এই ক্ষেত্রে জানবার বুঝবার জন্যে সামান্যীকরণের রেওয়াজ চালু থাকলেও তা কখনো বিজ্ঞানসম্মত হয় না। অতএব ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন অঞ্চলের ও ধর্মমতবাদীর আচরণে কিংবা জীবিকার ক্ষেত্রে আপাত অভিন্নতা থাকলেও মানস ক্ষেত্রে তথা জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য থেকেই যায়। যেমন—ব্রিটিশ আমল থেকে প্রতীচ্য বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকগুলো য়ুরোপীয় আচার আচরণ ব্যক্তিক, ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনে গ্রহণ করেছে, তবু স্বাতন্ত্র্য-চেতনা হারায়নি। এতেই বোঝা যায় শাস্ত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কারই মানুষের মন মত অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই আমরা আজো জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক পার্থক্য কিংবা স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট দেখতে পাই। পাক-প্রণালীতে, খাদ্যাখাদ্য নিরূপণে, তামা পিতল ও মাটির থালা-বাসন-গ্লাসের ব্যবহারে, ঘর-দোর স্থাপন পদ্ধতিতে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, মসজিদ-মন্দির গীর্জার আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যে এ পার্থক্য সুপ্রকট। আসন ও শয্যাবিন্যাসে, দিক্ নির্বাচনে যেমন শাস্ত্রীয় স্বাতন্ত্র্য সুপ্রকট, তেমনি সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, বক্তব্যে, আদর্শে এবং লক্ষ্যেও এ স্বাতন্ত্র্য অলক্ষ্য নয়। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ প্রসূত মূল্যবোধ ও সমস্যাই সাহিত্যে রূপায়িত হয়। তাই গল্পে উপন্যাসেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জীবন-সমস্যা ও সমাধান-পন্থা অভিন্ন নয়। তা ছাড়া শাস্ত্রীয় প্রভাবে চিত্রশিল্পে, মূর্তিশিল্পে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে কারো অনীহা আবার কারো আগ্রহ জেগেছে। কেউ চর্চা করেছে, আবার কেউ বিরত থেকেছে। ফলে দৈশিক শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ভাস্কর্য স্থাপত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্ম ও ঐতিহ্য নির্বিশেষ বাঙালীর অবদান নয়—আর্থিক-শৈক্ষিক অবস্থানভেদে অঞ্চল ও সম্প্রদায়ভেদে শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য ভাস্কর্য সংস্কৃতি সভ্যতা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। বাঙলাদেশেও সেই সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক রূপ সর্বত্র দৃশ্যমান।

বিদেশ-বিভাষার সাহিত্য ঋণ*

ভারতবর্ষ কখনো এক দেশ ছিল না। এশিয়া-য়ুরোপ-আফ্রিকা বলতে যা বোঝায়, ভারতবর্ষ বলতেও তেমনি বহু জাত বর্ণ-ধর্ম-ভাষা সংস্কৃতির লোক অধ্যুষিত একটি বিশাল ভূখণ্ড বোঝায়। ১৮৫৭ সন থেকে ১৯৪৭ সন অবধিই কেবল গোটা ভারতবর্ষ একচ্ছত্র

শাসনে ছিল। তখন অবশ্য ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-নির্মিত মানচিত্রে ছিল ভারত বহির্ভূত ব্রিটিশ-অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুরও। তার আগে ভারতবর্ষ ছিল য়ুরোপের মতোই বিভিন্ন দেশে ও রাজ্যে বিভক্ত। অধিবাসীদের মধ্যেও গৌত্রিক ভাষিক ও শাস্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ছিল প্রবল। তবে তখনো এক প্রকারের ধর্মীয় ঐক্যবোধ ছিল, এবং সে-টাই ছিল প্রাচীন 'জাতি', চেতনার উৎস। এর সাধারণ নাম দেওয়া যায় 'ধর্মীয় জাতীয়তা'। সে-তাৎপর্যে ভারতবর্ষে আর্য জাতি, হিন্দুজাতি, বৌদ্ধ-জাতি ও মুসলিম জাতি ছিল। ঐ সংকীর্ণ সড়কেই বিভিন্ন ধর্মমতবাদীর একটা সংহত ভারতও ছিল—যেমন আর্যভারত তথা হিন্দুভারত, জৈনভারত, বৌদ্ধভারত ও মুসলিম ভারত। এ চেতনা কিংবা ঐক্যবোধ অনেকটা—বৌদ্ধ জগৎ, মুসলিম-দুনিয়া কিংবা খ্রীস্টান বিশ্বের মতোই, তাতে শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক কিংবা মতবাদীর দলীয় ঐক্য বা একাত্মবোধ থাকলেও তা জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে কেজো ছিল না। কাজেই এই ঐক্য-চেতনা আদর্শিক—দেশ-কাল-জীবিকা ও পারিবেষ্টনী-নিয়ন্ত্রিত জীবনের সমস্যা-সম্পদ প্রসূ বাস্তব কিছু নয়। অতএব মনে-মেজাজে, চিন্তায়-চেতনায়, বিষয়ে-ব্যবহারে ভারত বর্ষের বিভিন্ন দেশের মানুষ ছিল জাত-বর্ণ, ভাষা-গোত্র, শাস্ত্র-সমাজ-সরকার এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র। আন্তর্ভাষিক, আন্তর্ধার্মিক, আন্তর্জাতিক, আন্তর্দৈশিক যোগাযোগে ও প্রশাসনিক সম্পর্কে পারস্পরিক প্রভাব যতটা গভীর, ব্যাপক ও বিচিত্র হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক কেবল ততটুকুই হয়েছিল—য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে যেমনটি দেখা যেত প্রাচীন ও মধ্যযুগে—এখানেও প্রায় তেমন এবং ততটুকু প্রভাবই অনুমান করা চলে।

ব্রিটিশ ভারতে একচ্ছত্র শাসকের প্রজা ও প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষেরা স্বদেশ-প্রীতি ও জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে অভিন্ন ও অখণ্ড ভারত-চেতনার অনুশীলন করতে থাকে, যদিও তাদের 'জাতীয়তাবোধ' ছিল স্বধর্মীর ঐক্যবোধের নামান্তর মাত্র। এই সময় থেকেই 'দেশ' বলতে 'সিঙ্গাপুর থেকে খাইবারপাস' অবধি বিস্তৃত ভুবন নির্দেশিত হচ্ছিল, আর পূর্বেকার দেশগুলো হল 'অঞ্চল' মাত্র—যার প্রশাসনিক নাম 'প্রদেশ'।

রাজনৈতিক স্বার্থে কৃত্রিম উপায়ে অখণ্ড দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির জিগির তুলতে হয় এবং ষাট সত্তর বছর ধরে তথা দুই পুরুষ ধরে ক্রমাগত উচ্চারণে তা' প্রায় প্রাতিভাসিক সত্য হয়ে উঠেছিল। এই মিথ্যা ধারণা শেষাবধি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিষ্ফল হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতরাষ্ট্রেও ভাষিক ও গৌত্রিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনা তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠে—যার ফলে ভাষা ও গোত্র-ভিত্তিক প্রশাসনিক প্রদেশ বা 'রাজ্য'বিন্যাস আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ভারতে সদুদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা আবেগ

তথা ভারত-চেতনা এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য ও একাত্মবোধ ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়েছে। ঐ আবেগ তথ্য-নিরূপণে ও তত্ত্ব-উদঘাটনে প্রজ্ঞাদৃষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যেই এতো কথা বলা। উত্তর ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও শাসনের কবলে পড়ে বাঙালীরা উত্তর ভারতীয়দের আদলে জীবনগড়াব প্রয়াসী ছিল। কিন্তু এসব কোন উপসর্গই দক্ষিণভারতীয় ছিল না বলে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবি ় প্রভাব আমাদের জীবনে দুর্লক্ষ্য। বলা বাহুল্য আমাদের ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠেছে উত্তর-ভারতীয় প্রভাবে ও আদলে। বৈদিক জৈন বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য মতবাদ ও সাহিত্যের প্রভাব তো ছিলই, তাছাড়া খ্রীস্টীয় শতকগুলোতে লেখ্য সংস্কৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ ভাষা-সাহিত্যের প্রভাবও ছিল সর্বাত্মক। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় রচনায় তো বটেই, তা ছাড়াও আমাদেব জৈন বৌদ্ধ রচনায়ও ঐ প্রভাব গভীর। শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধন, হলায়ুধ কিংবা সুভাষিতরত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, আর্যগাথা সপ্তশতী প্রভৃতির স্রষ্টিশীল কবিগণ যে সাহিত্য রচনা করেছেন, তাতে বাঙালীত্ব সামান্য। প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ধর্মতত্ত্বে ও জীবন জিজ্ঞাসামূলক দোহায় কিংবা প্রকীর্ণ কবিতায় বাঙালীয়ানা বেশী নয়। প্রাকৃতপৈঙ্গল, চর্যাগীতি, দোহা প্রভৃতিতে বাঙালীর অংশ আছে, কিন্তু বিশিষ্ট বাঙালী-চেতনা নেই। বাঙলা রচনার ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যে—শূন্যপুরাণে ধর্মমঙ্গলে নাথসাহিত্যে-সহজিয়া বাউল সাহিত্যে ধর্মীয়তত্ত্ব কথার আবরণে এবং লোকায়ত দেব মহিমাকীর্তনচ্ছলে হিন্দুর মঙ্গলকাব্যগুলোতে কিংবা পীর নারায়ণ সত্য ও তাঁর অনুসারীদের কথায় বাঙলা ও বাঙালীকে পুরোপুরি পাওয়া যায় আর আংশিকভাবে মেলে চৈতন্য চরিতসমূহে ও তাঁর পার্ষদচরিত গ্রন্থগুলোতে। অন্যত্র অনুবাদ সাহিত্যে যেখানে মূলানুগত্য শিথিল হয়েছে সেখানেই বাঙলা ও বাঙালী দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত উত্তর ভারতীয় প্রাচীন আর্য জীবন চেতনার ও জগৎ ভাবনারই বাহন এবং লোকায়ত ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য আর মুসলিম কবি রচিত শাস্ত্র কিংবা প্রণয়োপাখ্যানগুলো দেশ কাল নিরপেক্ষ শাস্ত্রীয় বা মানবকাহিনী মাত্র।

পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক অবধি সংস্কৃত, আওধী-হিন্দি, ফারসী ও আরবী থেকে নানা গ্রন্থ বাঙলায় অনূদিত হয়ে বাঙলা ভাষা সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়ে ও দৃঢ় করে এবং বিকাশ বিস্তারেরও পথ নির্দেশ করে। এতে নতুন ভাব ও বস্তুবাচক নতুন নতুন শব্দ ঋণে ও নির্মাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, চালু হয়েছে সাহিত্যের নানা অনুকৃত আঙ্গিক। নানা ছন্দও সৃষ্টি করতে হয়েছে। এরূপে নতুন ভাবে, শব্দে, ব্যঞ্জনায়, আঙ্গিকে ও অলঙ্কারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। হিন্দি আওধী থেকে এসেছে আখ্যায়িকা বা প্রণয়োপাখ্যান—ময়না-লোর-চন্দ্রানী, পদ্মাবতী, মনোহর-

মধুমালতী, গুলেবকাউলি প্রভৃতি। ফারসী থেকেও উপাখ্যানই অনূদিত হয়েছে—ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল, সিকান্দরনামা সপ্তপয়কর জেবলমুলুক-সামারোখ, লালমতী-সয়ফুলমুলুক, শাহপরী মালিকজাদা মিশরী-জামাল, শাহনামা প্রভৃতি।

আরবী থেকে শাস্ত্রীয় নানা গ্রন্থও অনূদিত হয়েছে, সে সঙ্গে আলেফ-লায়লা থেকে দু' একটি উপাখ্যানও। উল্লেখ্য যে আরবীর সঙ্গে মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানের কখনো সাহিত্যিক যোগ ঘটেনি।

মহারাষ্ট্রের হাল রচিত গাহাসত্তসই' বাঙলায় অনূদিত হয়নি বটে, তবে পদ রচনার ক্ষেত্রে ঐ গ্রন্থের এবং ফারসী দিওয়ান ও গজলের প্রভাব পড়েছিল। এছাড়াও আন্তর্দেশিক সংযোগের ফলে শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমে আরো নানা ভাবগত ও বস্তুগত ছিটেফোঁটা প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছিল; খুঁটিয়ে-খতিয়ে দেখলে হয়তো তার কিছু নিদর্শন বের হবে। যেমন—দক্ষিণভারতের অদ্বৈতবাদ, নেপালী-ভক্তিবাদ, তিব্বতী-চীনা তন্ত্রাচার প্রভৃতি।

অতএব আমাদের সাহিত্যিক চিন্তা-চেতনায় স্ব-স্ব ধর্মমত ও দর্শন ছাড়াও উত্তর ভারতীয় এবং ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির, চিন্তা ও চেতনার প্রভাব ছিল এবং তা' সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙালীর স্বকীয় চিন্তা-চেতনা ও ভাব-কল্পনা ছিল অব্যাহত।

৬

বাঙলা সাহিত্যের আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীরূপ

॥ ১ ॥

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক এবং বোধায়ন ধর্মসূত্র মতে আজকের বাঙলা-দেশে খ্রীস্টপূর্ব যুগে অবৈদিক ও অনার্য দস্যু (পুণ্ড্রা) প্রভৃতি বাস করত। রামায়ণ-মহাভারতের কালে তথা মহাকাব্য যুগে সুহ্ম বঙ্গ আর তেমন অবজ্ঞেয় নয়—যদিও তখনো ওরা ম্লেচ্ছ মাত্র। জৈন গ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রেও রাঢ়, সুহ্ম, বজ্রভূমি, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি ও কোটিবর্ষ প্রভৃতির উল্লেখ মেলে। বৌদ্ধ 'সংযুক্ত নিকায়' গ্রন্থে সুহ্মের এবং 'মিলিন্দ পঞ্হো'তে রয়েছে বঙ্গের নাম। গৌড়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ-সমতটের নিশ্চিত সীমা নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। আজকের বাঙলাভাষী অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া অভিন্ন নয়। ঊষর ও জলাভূমির পার্থক্য মাটির উৎপাদন শক্তিরও পার্থক্য ঘটিয়েছে।

আওরঙজীব কর্তৃক ১৬৬৬ সনে চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্বাবধি আধুনিক বাঙলা-ভাষী অঞ্চল কখনো একক শাসনে সংহত ছিল না। তাই শাস্ত্র, সমাজ, সরকার,

বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, রুচি-সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে অভিন্ন বাঙালী সত্তা কখনো গড়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া বর্ণে ও বিত্তে বিন্যস্ত সমাজে এক অঞ্চলের লোকও সমস্বার্থে ও সমমর্যাদায় আত্মিক ও আর্থিক ঐক্য অনুভবের সুযোগ কখনো পায়নি। তাই জীবন ও জীবিকার, শাস্ত্র ও সমাজের, উপাদান ও উপভোগের সবক্ষেত্রেই দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া করে রেখেছিল। মাঠে ঘাটে বাটে হাটে তারা বৈষয়িক প্রয়োজনে সর্বক্ষণ একত্রিত হয়েছে, কিন্তু মিলিত হয়নি কখনো। শ্রম ও পণ্য বিনিময় করেছে, কিন্তু মন দেয়া-নেয়া করেনি। তাদের পরস্পরের নাম জানা ছিল, মুখ চেনা ছিল, কিন্তু সহানুভূতি ও প্রীতি প্রসূত যে হৃদ্যতা ও আত্মীয়তা, স্বশ্রেণী বহির্ভূত মানুষের মধ্যে তা গড়ে উঠার উপায় ছিল না। কাজেই জীবনের, শাস্ত্রের, চিন্তার, কর্মের, স্বার্থের ও অনুভূতির কোন ক্ষেত্রেই আমরা বাঙালী নির্বিশেষের সমধর্মিতা বা সহধর্মিতা দেখিনে। এ অবস্থায় বাঙলার ও বাঙালীর বলে কোন তত্ত্ব, কোন ঐতিহ্য, কোন সম্পদ বা কোন অবদানের পরিচয় দেয়া চলে না। সবটাই শ্রেণীর, দলের, সম্প্রদায়ের বা অঞ্চলের ছাপযুক্ত। সবটাই খণ্ড ও ক্ষুদ্রের প্রতীক, সবটাই দ্বন্দ্বসংঘাতের ইঙ্গিতবাহী। কাজেই সাহিত্যের ইতিহাসেও সামান্যীকৃত কোন সিদ্ধান্ত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন অবাঞ্ছিত ও অসম্ভব। তবু এক জায়গায় বাস করলে অন্যের ভাব-চিন্তা-কর্মের অনুকৃতিজাত প্রভাবও পারস্পরিক হয়। সে ক্ষেত্রেই কেবল সাধারণীকরণ সম্ভব এবং চরিত্র ক্ষেত্রে তা সুপ্রকট। আসলে সেকালে দেশ, জাতি ও রাজ্য বলতে বোঝাত রাজা, সামন্ত, শাসক ও সওদাগর। এঁদের ধন, মান, সুখ, ঐশ্বর্য, গৌরব, গর্ব, দুঃখ, বিপর্যয়, জয়-পরাজয়ই ছিল দেশ-কাল-মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা ও গৌরব-গ্লানির প্রতীক ও প্রতিভূ। তাঁদের চোখে দাস ও বৃত্তিধারী দেশের মানুষ ছিল তাঁদেরই সুখ ও সেবার জন্যেই। তাঁরাই কেবল মানুষ। অন্যদের অস্তিত্ব রয়েছে শ্রমে-সেবায় তাঁদের অসংখ্য প্রয়োজন মিটানোর জন্যেই। আজকের দিনেও উচ্চবিত্তের মানুষের এ মনোভাব বিলুপ্ত হয়নি। আজো শিক্ষিত ও শাসকরা, বেনে ও বুর্জোয়ারা দেশ বলতে দেশের মানুষ বলতে নিজেদেরই বোঝেন এবং সমাজে সরকারে নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার বলতে, নাগরিকের প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ বলতে তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সামগ্রীই বোঝেন। তাই সমাজের নিম্ন বর্ণের ও নিম্ন বিত্তের লোকগুলো তাঁদের কাছে গৃহগত হাতিয়ার ও প্রাণীর মতো। সেই মানুষ দাস, ভৃত্য, কর্মী ও শাসনপাত্র প্রজার উপরে কিছু নয়। এই অবজ্ঞাই বর্ণভেদ ও বৃত্তিভেদ দুস্তর করেছে। নইলে ব্যবহারিক জীবনে বর্ণে বর্ণে জাতে জাতে ও হিন্দু মুসলমানে একটা কেজো সহযোগিতা ও সাহচর্য ছিল। যেমন নাপিত-

ধোপা-তাঁতী-তিলি-মাঝি-চাষী-মালী প্রভৃতির সঙ্গে প্রায় প্রাত্যহিক ঘরোয়া সম্পর্ক রাখা যেখানে অপরিহার্য ছিল, সেখানে অস্পৃশ্যতার, অবজ্ঞার, ঔদাসীন্যের, অপ্রেমের ও বিদ্বেষের এই আন্তরিক দুস্তর ব্যবধান সম্ভব হত না। তা সত্ত্বেও হাজার হোক মানুষ তো! ব্যক্তি মানুষ তাই ক্ষণে ক্ষণে নানা প্রতিবেশে মানবিক গুণের এবং উদার ও মহৎ অনুভূতির বশীভূত হয়ে পড়েই। ফলে আমরা বিভিন্ন বর্ণের, সম্প্রদায়ের ও ধর্মাবলম্বীর মধুর মিলন ও আত্মীয়তা দেখতে পাই এবং এসব দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তাছাড়া স্বার্থবুদ্ধিও মানুষের মিলন ও ঐক্য ঘটায়, তখন দেশ, জাত, ধর্ম ও বর্ণ কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আঠারো শতক অবধি তার বহু দৃষ্টান্ত মেলে। অধিকন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে এদেশের যোগ-সাংখ্য-তন্ত্রবাদী অস্ট্রিক-মোঙ্গলীয় সন্তান মানুষের ছিল জৈন বৌদ্ধের সাম্য-সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য ও সংস্কার—যে ঐতিহ্য ও সংস্কার প্রাণী নির্বিশেষের প্রাণের মর্যাদা ও সহাবস্থানের অধিকার স্বীকার করে এবং করুণা, প্রীতি, মৈত্রী, সাম্য ও সহন-শীলতা যার ভিত্তি।

চৈতন্যদেবের মধ্যে আমরা নতুন করে এই তত্ত্বেরই প্রকাশ দেখেছি। কাজেই বাঙলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস দ্বন্দ্ব ও মিলনের, ঘৃণার ও গ্রহণের, গ্লানির ও গরিমার, হানাহানির ও মাখামাখির। বস্তুত ১৮০১ সনের আগেকার বাঙালীর ভাব-চিন্তা-কর্মের কোন সর্বজনীন রূপ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহার-উত্তর কলকাতা-কেন্দ্রী ও প্রতীচ্য বিদ্যাপ্রভাবিত ভাব-চিন্তা-কর্মেই ক্রমে ক্ষেত্র বিশেষে অবিশেষ বাঙালী চেতনা ও সত্তা অবয়ব পেতে থাকে।

আগুনের যেমন নিরবলম্ব কোন রূপ নেই, তেমনি মানুষের চিন্তা-চেতনা-কর্মও নিরপেক্ষ নয়। স্থান-কাল-প্রতিবেশই মানুষের ভাব-চিন্তা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিবেশ নিয়ন্ত্রিত জীবন-জীবিকাই মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়াস-প্রযত্নের উৎস। কিন্তু এই স্থান-কাল-পাত্র-প্রতিবেশের কোন অভিন্নরূপ বা স্তর নেই। শাস্ত্রিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান কারো অভিন্ন নয়। কাজেই বোধ-বুদ্ধি-রুচি-সংস্কৃতি, প্রয়োজনচেতনা প্রভৃতি ব্যক্তিভেদে পৃথক হয়ই। আমরা সাধারণভাবে শাস্ত্র সমাজ সরকার প্রভৃতির কথা বলি বটে, কিন্তু এ সবের প্রত্যেকটির প্রভাব প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান ভেদে বিভিন্ন হয়। তাই সমাজে কোন ব্যক্তিক কর্মেরই সামগ্রিক প্রভাব প্রতিক্রিয়া থাকে না।

একই দেশে ও কালে রচিত হলেও শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কারের প্রভাবেই সাহিত্যের বক্তব্য ও জীবনের পরিণাম এবং অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এক শাস্ত্রশাসিত

সমাজে যা সমস্যা, অন্য শাস্ত্রীয় সমাজে তা সুখকর পরিবেশ। যেমন অহিন্দু সমাজে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল কিংবা চন্দ্রশেখর এবং শরৎ সাহিত্যের একটা বিরাট অংশই রচিত হতে পারত না। কেননা বিধবা বিবাহ সেখানে সমস্যাই নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যে শ্যালিকা-প্রেম (দুইবোন, মালঞ্চ) বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম ঘরেও ঐ প্রেম সম্ভব কিন্তু বৈধ নয় বলেই তা সাহিত্যের বিষয়গত হতে পারত না কোন মুসলিম লেখকের হাতে। অষ্টম হেনরীর স্ত্রী হত্যা কিংবা বার্ট্রাণ্ড রাসেলের স্ত্রী বদল অনিবার্য হয়েছে কেবল খ্রীস্টীয় শাস্ত্রের একপত্নীক ব্যবস্থার ফলেই। অতএব, শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কার শাসিত মানুষে কখনো মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তির স্বাধীন প্রকাশ-বিকাশ সম্ভব হয় না। তাই মানুষের জীবনের সমস্যার ও যন্ত্রণার, পাপবোধের ও বিবেক-দংশনের উৎস—জীবনের ট্র্যাজেডীর কারণ শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কার ভেদে বিভিন্ন। এ কারণেই জাত ধর্ম-দেশ-কাল ভেদে সাহিত্য বক্তব্যে ও জীবনদৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য লাভ করে।

জ্ঞান-বিদ্যা সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতি সমাজের উচ্চবিত্তের ও উচ্চবর্ণেরই অনুশীলনে ও প্রয়োজনে সৃষ্ট। লোক বা প্রাকৃতজন নামের নিম্নবিত্তের ও নিম্নবর্ণের গণমানবের এতে অধিকার ছিল না। তেমনি শাস্ত্র শাসন সভ্যতা প্রভৃতি বিত্তবান মানুষের স্বার্থে বিত্তবান মানুষই সৃষ্টি করেছে, গণমানব কেবল শ্রম দিয়েছে এবং শাসন মেনেছে। দুনিয়ার বহুদেশে গণমানব আজো হাজার বছরের পুরোনো জীবন জীবিকা পদ্ধতির নিগড়ে আবদ্ধ। আজকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রসাদ ভোগ করছে কারা—কাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য সুখ এনেছে ঐসব আবিষ্ক্রিয়া। গণমানব এমনকি পরোক্ষেই বা তার কতটুকু প্রসাদ পায়!

রামায়ণ মহাভারতে বিধৃত যে-জীবন, দ্বন্দ্ব ও সমস্যা তা বিত্তবান একশ্রেণীর মানুষেরই মাত্র। কালিদাসের রচনার উদ্দিষ্ট পাঠক কারা? তেমনি গীতগোবিন্দ যে শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন করত, জীমূতবাহনের স্মৃতি কিংবা বল্লাল সেনের দান-সাগর ও অদ্ভুতসাগর তাদের জন্যে ছিল না, অথবা শেখ শুভোদয়া অন্য শ্রেণীর মানুষের জন্যে রচিত কিংবা পবনদূতের পাঠক ছিল অন্যরুচির এবং সবটাই ছিল শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষের জন্যে। এ ভাবে দেখলে জাতীয় ঐতিহ্য বলে অভিহিত সভ্যতা বলে চিহ্নিত ও আলোচিত অতীতের শিল্প, স্থাপত্য, দর্শন, শাস্ত্র, সমাজ, রাজা-রাজ্য বিগ্রহ-সন্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলোর সঙ্গে গণমানবের কোন যোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ এদের ঘর্মের প্রসূন, রক্তের ফসল থেকেই গড়ে উঠেছে সবকিছু। এদেরই শ্রমলব্ধ উদ্বৃত্ত সম্পদে ভাগ বসিয়ে অবসরভোগী শ্রেণী হয়েছে

রাজা উজির শিল্পী সাহিত্যিক স্থপতি দার্শনিক সমাজপতি শাস্ত্রবিদ রাজ্যপতি। যে গণমানব ক্ষুন্নিবৃত্তির ধাক্কায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অপচয় করে মরে গেল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যারা—

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি ;
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে—কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া—

—বাল্মীকি-ব্যাস-কালিদাস, মন্দির-মসজিদ-দুর্গ, রাজকীয় জয়-পরাজয় তাদের জীবনে কি দিল? দশকোটি নিরক্ষর মানুষের পক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্য থাকা না-থাকা সমান নয় কি? অথচ নির্বিশেষ মানুষের কাছে অন্নই আনন্দের উৎস। জীবমাত্রেই পেটের চাহিদা পূরণে প্রয়াসী। এটিই জীবনের ভিত্তি। আশ্চর্য জীব-জগতে অনাহারে মৃত্যু প্রায় অসম্ভব; আর মনুষ্যজগতে তাই চিরন্তন সমস্যা! রাজেই শাসক-শোষক শ্রেণীর কৃতিকীর্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ-আরামকে দেশ, জাতি ও মানুষের নামে চালিয়ে দেওয়া শুধু অমানবিক নির্মমতা নয়, সত্যেরও অপলাপ।

॥ ২ ॥

আমরা যে-সাহিত্যের ইতিকথা রচনা ও পাঠ করতে চাই, সে সাহিত্য সব বাঙালীর সম্পদ নয়। এ সাহিত্যে রয়েছে শ্রেণীর রূপ, রয়েছে আঞ্চলিক রূপ, রয়েছে সাম্প্রদায়িক ও শাস্ত্রিক রূপ।

সেকালের বর্ণে ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত সমাজে গ্রামীণ কৃষি ও কুটির শিল্প নির্ভর জীবনে ভাগ্যান্বেষণে গণমানবের অঞ্চলান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন কিংবা সুযোগ সহজে হত না। এ যুগের মতো সেকালে যান্ত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হয়নি, পুরোনো হাতিয়ার নিয়ে হাতেই করতে হত কাজ। কাজেই কোন পেশায় বেকার সমস্যা ছিল না। বিনিময়ের মাধ্যমে মিলত শ্রম ও পণ্য। মুদ্রার প্রয়োজন আজকের মতো এমন গুরুতর হয়ে উঠেনি তখনো।

যদিও শাসক-সওদাগর ব্যতীত অন্যশ্রেণীর মানুষের আর্থিক জীবন থাকত দৈন্যক্লিষ্ট এবং পরিবর্তনবিরল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে উৎপাদনে উপভোগে বিপর্যয় ঘটত ঘন ঘন, কিন্তু অভাবিত সৌভাগ্য ছিল অজ্ঞাত।

তা ছাড়া যানবাহনের অভাব ছিল, তাই বড় বেনে, উচচ রাজ কর্মচারী ও সৈনিক ব্যতীত অন্যদের জীবন ছিল অঞ্চলের সীমায় সংকীর্ণ ও সীমিত। ফলে শাস্ত্র-সমাজ, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, রুচি-সংস্কৃতি প্রভৃতির ছিল আঞ্চলিক রূপ ও প্রয়োগ। এমনকি ইষ্টদেবতার পূজা-প্রতিষ্ঠার কাহিনীর, প্রবাদ-প্রবচন-কিংবদন্তীর ও কথা-কাহিনীর উদ্ভব এবং প্রচার-প্রসারও ছিল আঞ্চলিক। এ কারণেই এবং বুলির ভিন্নতা ছিল বলেই লোকসাহিত্য ও লোকায়ত বিশ্বাস ও রীতিনীতি চিরকালই অঞ্চলের সীমানায় ছিল নিবদ্ধ।

আমাদের লিখিত সাহিত্যেও এই আঞ্চলিকতা ছিল প্রবল। তাই ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্গল রাঢ় অঞ্চল কখনো অতিক্রম করতে পারেনি। চণ্ডীমঙ্গলও রাঢ় অঞ্চলের। মনসামঙ্গল মুখ্যত পূর্ববঙ্গে এবং বৈষ্ণব পদাবলী পশ্চিম বঙ্গেই সৃষ্ট। গাথার বিকাশ ময়মনসিংহে, সিলেটে, কুমিল্লায়, নোয়াখালীতে ও চট্টগ্রামে। পীর-নারায়ণ সত্যের প্রভাব-প্রসার দক্ষিণবঙ্গে তথা সুন্দরবন সংলগ্ন নিম্নবঙ্গে ও দক্ষিণ রাঢ়ে।

আবার হিন্দুর ও মুসলমানের সাহিত্যও ছিল পৃথক। রামায়ণ-মহাভারত-ভগবত ও দেব-পাঁচালীর রচক হিন্দু। ইসলামী শাস্ত্রের রচয়িতারা মুসলমান। প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছেন মুখ্যত মুসলমানেরা। আঠারো উনিশ শতকে কয়েকজন হিন্দুও রোমান্স রচনায় হাত দেন। অবৈষ্ণবে বৈষ্ণবপদ, দর্শন ও চরিতগ্রন্থ রচনা করেননি। তেমনি অশাক্ত রচনা করেন নি শাক্তপদ। অবশ্য ক্বচিৎ ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়। সহজিয়া পদ রচনা করেছেন সহজিয়া বৈষ্ণবরা। বাউলপদ রচনা করেছেন বাউলেরা। ঢাকা, কুমিল্লা নোয়াখালী, চট্টগ্রামে বাউল ছিল না, বাউলের প্রভাবও পড়েনি কখনো। কলকাতা বন্দরের আধা-বাঙালী মুসলমানেরা আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকে রচনা করেছেন দোভাষী রীতিতে রোমান্স ও অন্যান্য গ্রন্থ। এ অঞ্চলের হিন্দুরা একালে রচনা করেছেন কবিগান।

অবশ্য পীর-নারায়ণ 'সত্যের' মাহাত্ম্যজ্ঞাপক দ্বন্দ্বমিলনমুখী সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন দক্ষিণ বঙ্গের হিন্দু মুসলমান ষোল শতকের শেষ পাদ থেকেই। আবার হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার সন্ধান মেলে বেদনা-মধুর প্রণয়গাথায় ও মানবিক দুর্ভোগ দুর্ভাগ্য চিত্রণে। আরো এক ধরনের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান অভিন্ন অনুভবে ও বিশ্বাসে মিলিত হয়েছিল তা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যে। নাথ সাহিত্য ও তান্ত্রিক তত্ত্ব সাহিত্যের চর্চা করেছেন হিন্দু-মুসলমান সমান উৎসাহেই। অধ্যাত্ম

সাধনার ক্ষেত্রে মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও সাধনপন্থা পরিহার করেনি। তাই ভিন্ন নামের আবরণে সেই পুরোনো বৌদ্ধ যোগ-তান্ত্রিক সাধনাই করেছে তারা। এবং ঐ সাধনার তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য পুষ্ট ময়নামতী মানিকচাঁদ-গোপীচাঁদ-হাড়ি পা-মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনীর স্মরণে ও অনুসরণে মধ্যযুগের হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থ রচনা করেছেন, আর কথকতার মাধ্যমে চালু রেখেছেন সেই গূঢ় তত্ত্ব ও সাধনা।

চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান বৈষ্ণবতত্ত্ব নিরপেক্ষ রাধাকৃষ্ণ প্রণয়পদ রচনা করেছেন, যদিও এগুলোতেও রয়েছে অধ্যাত্ম চেতনার আভাস। আবার তাতেও সাম্প্রদায়িক চেতনার চিহ্ন অস্পষ্ট নয়।

দেখা যাচ্ছে এদেশের শাস্ত্র, সমাজ ও সরকারী ব্যাপারে নয় শুধু, বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্য ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমান তথা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো স্বস্ব স্বার্থে স্ব-সামাজিক, স্ব-রাষ্ট্রিক, ও স্ব-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। সাম্য ও সমাজবাদী আন্দোলন ব্যতীত জীবনের সব ক্ষেত্রেই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো যথার্থ অর্থে চিরকালই অবিযুক্ত রয়েছে। আস্তিক মানুষের পক্ষে মিলিত ও মিশ্রিত হয়ে অভিন্ন সংস্কৃতি ও সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্নতা ও বিযুক্তিতেই তাঁদের অস্তিত্বের স্থিতি ও নিরাপত্তা। তার প্রমাণ য়ুরোপে খ্রীস্টান ও ইহুদী ভাষায়, পোশাকে, নামে ও বাহ্যাচারে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কোথাও অভিন্ন জাতিসত্তা লাভ করেনি। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যেও এমনি দ্বান্দ্বিক স্বাতন্ত্র্য ছিল প্রকট ও প্রবল। তবু হাজার বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান মনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ক্রিয় অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা পোষণ করেও সহনশীলতার, সদ্ভাবের কিংবা ঔদাসীন্যের বাহ্যাবরণে প্রতিবেশী সুলভ আবশ্যিক সহযোগিতায় সহাবস্থান করেছে। কাজেই সমস্বার্থে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের ভিত্তি হচ্ছে সদ্বুদ্ধি ও সন্ধিজাত সহিষ্ণুতা। বিরুদ্ধ মতের লোকের মধ্যে প্রীতির পরিচর্যা অবাস্তব ও অসফল প্রয়াসমাত্র।

৭

বাঙলার রাজনীতিক ইতিকথা

॥ ১ ॥

প্রাচীন ও মধ্যযুগে জন-জীবনে শাস্ত্র ও শাসকের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। শাস্ত্র ও সরকার বলতে গেলে জন-জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করত, বিশেষ করে এদেশের বর্ণে বিভক্ত তথা জীবিকায় বিভক্ত জনসমাজে শাস্ত্র ও সামন্তের দাপট ছিল

প্রবল। তাই জন-জীবিকা ও সংস্কৃতি বলতে গেলে সরকার প্রভাবিত ও সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিল। তাছাড়া যখন শাসকগোষ্ঠী হত বিদেশী বিজাতি বিধর্মী ও বিভাষী, তখন দেশী ও বিদেশী সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিত, তার পরিণামে গ্রহণে-বর্জনে যে মিলনমুখী মিশ্র-সংস্কৃতির ও সামাজিক রীতি-নীতির উদ্ভব হত—তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ত সাহিত্য-সঙ্গীত শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিদেশী বিধর্মীর সংস্পর্শে আসার ফলে এ-ভাবে দেশী মানুষের চিন্তা-চেতনায় প্রথমে যে অভিঘাত সৃষ্টি হয় এবং তাতে দেশী মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসায় ও জগৎভাবনায় যে রূপান্তর ঘটে, তা সাহিত্যে-শিল্পে-সঙ্গীতে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে বিশেষভাবে অভিব্যক্তি পায়। এই জন্যেই সাহিত্যাদির ইতিহাসে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও তজ্জাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথাও আলোচনা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

বাঙলাদেশ প্রায় চিরকালই ছিল বিজাতি বিজিত দেশ। কাজেই বাঙলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ইতিকথা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ-কালেও আমরা বুঝি শাসক-প্রশাসকের শাসন নীতি, নৈতিক আদর্শ ও হিত-চেতনার ধরনের উপর নির্ভর করে জন মনের ও জন জীবনের বিকাশ বিবর্তন কিংবা অবক্ষয় ও বন্ধ্যাত্ব। কাজেই শাসকবর্গের আনুকূল্য ও বিরূপতা জন মন ও মনন তথা সামাজিক-নৈতিক-বৈষয়িক-আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবে জন জীবনের সব প্রচেষ্টার মধ্যেই শাস্ত্র ও রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকে। আজো পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোতে তা-ই হচ্ছে। কাজেই আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির পালাবদল তথা যুগান্তর রূপান্তর ঋতুর প্রভাবের মতো প্রশাসনিক প্রভাবেরই ছাপযুক্ত।

বাঙলা সাহিত্যকে আমরা এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি-ভাবে তিনভাগে নির্দেশ করি, এবং অবচেতনভাবেই এ-বিভাগের ভিত্তি করেছি রাজনৈতিক পরিবর্তন। মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন আমল যদিও প্রাচীনযুগ নামে চিহ্নিত কিন্তু এই চার বংশীয়দের রাজত্বকাল অভিন্ন নয়। গুপ্ত ও সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য-বাদী, পালেরা ছিলেন বৌদ্ধ। আবার সেনেরা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটের লোক, তাঁদের রাজত্বও ছিল বাঙলারি সীমায় নিবদ্ধ। পালরাজত্বের শুরু ও শেষ মগধে। বাঙলার অধিকাংশ অঞ্চল যেমন তাঁদের শাসনে ছিল তেমনি বিহার উড়িষ্যা মধ্য ও উত্তর প্রদেশের অধিকাংশও ছিল তাদের অধিকারে। আবার গুপ্তরা ছিলেন উত্তর বিহার সংলগ্ন উত্তর প্রদেশীয়। আর মৌর্যরা ছিলেন বৌদ্ধ ও মাগধী। কাজেই ধর্মীয় গোত্রীয় ভাষিক ও দৈশিক পরিচয়ে তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন এবং তাঁদের

শাসন তথা আমল অভিন্ন যুগ লক্ষণে চিহ্নিত করা চলে না। অতএব হাজার বছর কাল ধরে এই চার বংশীয়ের রাজত্বকাল চলেছে এবং লঘু-গুরু যাই হোক না কেন জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্তত চারটে যুগান্তর যে হয়েছিল তা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই বলা চলে। অবশ্য এই যুগের সবটা আমাদের আলোচনার অন্তর্গত নয়। তাই একে আমরা 'প্রাচীন যুগ' - এই সাধারণ নামে চিহ্নিত করে রাখছি। তেমনি তুর্কী বিজয়ে শুরু হয় মধ্যযুগ। পরে যখন মুঘল বিজয় ঘটে তখন মুঘল আমলকেও আমরা মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত করি। যদিও তুর্কো-আফগান-মুঘল শাসন কালে আরব-ইরানী ও মধ্যএশীয় বহু জাতি উপজাতির প্রভাবে সুদীর্ঘ সাতশো বছরের সময় পরিসরে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে প্রসার ও রূপান্তর ঘটেছে অনেক। জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এসেছে নানা পরিবর্তন। তবু আমরা এই সাতশো বছরের সময় পরিসরকে তুর্কীযুগ, মুঘল যুগ কিংবা আদি মধ্যযুগ ও মধ্যযুগ বলে আখ্যাত করি। অবশ্য মানতেই হবে এর বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই—তেমনি ব্রিটিশ বিজয়ে আধুনিক যুগের আরম্ভ মনে করি কিন্তু আঠারো শতকের আধুনিক যুগে আর বিশ শতকের আধুনিক যুগে পার্থক্য যে বিপুল ও বিচিত্র তা কে অস্বীকার করবে?

যা হোক শাস্ত্রিক সামাজিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন যে মুখ্যত রাজনৈতিক পরিবর্তনেরই প্রসূন এবং সেই তত্ত্ব বোধগত না হলে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কিংবা পাঠ করা অনেকটা অসার্থক হয়, তা আমরা জানি ও মানি। সে পরিবর্তন বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মীর বিজয়ে, আগমনে ও শাসনে শুরু হলে তা যুগান্তর ঘটায়। এ প্রভাব মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মে-আচারে-আচরণে-মনে মননে-পোষাকে-আসবাবে এমনকি জীবিকাপদ্ধতিতেও রূপান্তর ঘটায়। এমনি করে নতুন যুগে নতুন মানুষ নতুন কথা বলে। নতুন সম্পদ ও সমস্যার, আনন্দ ও যন্ত্রণার প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়, এমন কি একই বংশীয়ের শাসন আমলেও শাসকের মেজাজ-মর্জি এবং আদর্শ-উদ্দেশ্যের প্রকার ভেদে শাসিত জনের সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

বাঙলার যে অংশ নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ ও কণ্ব বংশের শাসনে ছিল, সেই অংশে নিশ্চিতই কথ্য মাগধী প্রাকৃত, লিখিত শৌরসেনী-প্রাকৃত এবং জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সংস্কৃতি এবং উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রিক শাসনপদ্ধতি চালু হয়েছিল। এ সময় সংস্কৃত নয় বরং প্রাকৃতই যে দরবারী ভাষা ছিল, তার প্রমাণ মৌর্য যুগের বলে অনুমিত মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি। লেখ্যভাষা বিরহী অনুন্নত অষ্ট্রিক গোত্রের প্রায় সব কিছুর বাহ্যত ইতি ঘটিয়ে মগধরাজ্যভুক্ত অংশের আর্যায়ণ বা আর্যীকরণ

এইভাবেই সম্ভব হয়ে উঠে। এই বৌদ্ধ-শাসকদের আমলে রাজ্যভুক্ত শাসিত জৈনদের উপর যে পীড়ন হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে অশোকেরই এক আদেশ সূত্রে। আবার ব্রাহ্মণ্যবাদী গুপ্ত আমলে নিশ্চয়ই এই দেশে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র সংস্কৃতি আচার-পার্বণ লক্ষণীয়রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই সাত শতকের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ্য-বাদী রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ পীড়ন প্রসঙ্গে হিউ এনৎসাঙ বৌদ্ধ বিলুপ্তির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তেমনি বৌদ্ধ পাল আমলে বৌদ্ধরা স্বধর্মীর শাসনের স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ করলেও বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে তারা তখন আত্মপ্রত্যয়হারা এবং শঙ্করাচার্যের নব জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদ নির্জিত বৌদ্ধমতের পক্ষে মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়ায়—যার ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্তি প্রায় সম্পন্ন হয়ে এল। এই-সময়েই নিম্নবিত্তের ও সমাজ বহির্ভূত বৌদ্ধরা পীড়ন ভয়ে হিন্দু সমাজে আত্মগোপন করে প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্ম রক্ষা করে। নাথযোগী ধর্মঠাকুরের পূজারী, সহজিয়া বৈষ্ণব-বাউল ও শৈব নাথপন্থীরা—সবাই ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত ঐ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বৌদ্ধ-শাস্ত্র সংস্কৃতি বিহার চৈত্য প্রভৃতি বৌদ্ধ নিদর্শন বাঙলায় যেন সুপরিকল্পিতভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়। আবার তুর্কী আমলে দেখতে পাই সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য সমাজ-পতির রোষের ভয়ে এতো কাল যারা তাদের বিশ্বাস-সংস্কারে গড়া লৌকিক দেবতার তথা জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও ঋদ্ধির প্রয়োজনে সৃষ্ট ইষ্ট ও অরি দেবতার পূজা কিংবা মাহাত্ম্য কথা নিভয়ে-নির্বিঘ্নে নির্দ্বিধায় প্রকাশ্যে প্রচার করতে পারেনি, তারা বিদেশী-বিধর্মী তুর্কী শাসকের প্রশ্রয়ে বা ঔদাসীন্যে কিংবা উৎসাহে ক্ষমতাবিচ্যুত সমাজপতির পীড়নের ভয়মুক্ত হয়ে স্ব স্ব ইষ্ট ও অরি দেবতার মঙ্গল-গানে মুখর করে তুলল বাঙলার পরিবেশ। আবার ব্রাহ্মণ্যমত ও ইসলামের দ্বন্দ্ব-মিলনের প্রসূন মেলে উত্তর ভারতীয় সন্তমতের আদলে সৃষ্ট চৈতন্যদেবের নব বৈষ্ণবমতে। শঙ্কর রামানুজ-মাধব নিম্বার্ক-ভাস্কর-বল্লভ, কবির-নানক-দাদূ-একলব্য-রামদাস-রামানন্দ কিংবা চৈতন্যদেবের নব প্রেম-ভক্তি ধর্ম বিজেতার ধর্ম ইসলামের সঙ্গে পরিচয়েরই প্রসূন। এগুলোই আবার ইসলামের প্রসারে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মুঘল বিজয়ের প্রভাবে বাঙালী মনের ও সাহিত্যের যুগান্তর লক্ষণীয়। পীর-নারায়ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণব সহজিয়া মতের উদ্ভব, বাউল মতের প্রসার, ফারসী ভাষা-সাহিত্যের প্রভাব-বাহুল্য, উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা-প্রবণতা প্রভৃতি তার সাক্ষ্য। ব্রিটিশ অধিকারেও প্রতীচী-পরিচয়ের আলো-আঁধারির যুগে—যুগসন্ধিক্ষণে নতুন বন্দরনগরী কলকাতায় পাই হিন্দুর কবিগান ও মুসলমানের দোভাষী সাহিত্য। কাজেই শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও বৈষয়িক

জীবনে সবক্ষেত্রেই রাজনীতিক-প্রশাসনিক প্রভাবের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। আজও তাই আছে।

অতএব আমাদের বাঙলা সাহিত্যের যুগান্তর বা রূপান্তর কিংবা বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য রাজনৈতিক প্রশাসনিক প্রভাব প্রসূত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই লৌকিক পৌরাণিক লোককাহিনীর জনপ্রিয়তা, বিধর্মী তুর্কীর প্রশ্রয়ে বা উৎসাহে শুরু হ'ল শাস্ত্র বিরুদ্ধ পাপজনক কর্ম—শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ। ব্রিটিশ আমলে যেমন ধন-যশ-মান-লোভী হিন্দুরা বেপরোয়া হয়ে কালাপানি পাড়ি দিয়ে ম্লেচ্ছ-স্পর্শ-দুষ্ট হতে গৌরব বোধ করেছে, তুর্কী আমলেও তেমনি রৌরব নরকভীতি কিংবা সামাজিক নিন্দা উপেক্ষা করে ব্রাহ্মণ কায়স্থই এগিয়ে এলেন রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত অনুবাদে। বর্ধিষ্ণু লোকায়ত ধর্মের অনাচার থেকে স্মৃতিশাসিত পৌরাণিক ধর্ম রক্ষার প্রেরণাই ছিল এর মূলে।

অতএব তুর্কী আমলের শুরুতে পাচ্ছি লৌকিক কৃষ্ণকথা, লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকথা, নাথ-গীতি, পালগীতি প্রভৃতি। পনেরো ষোল শতকের দিকে তুর্কী প্রতিপোষণে পাচ্ছি সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ। তুর্কীর ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ও সংঘাত মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সনাতন ধর্মের সংস্কার ও রক্ষণ প্রয়াস—রঘুনন্দন-রঘুনাথ-রামনাথ প্রভৃতির ন্যায়-স্মৃতি ইত্যাদির চর্চায়।

আর চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে পাই দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় আদলে নব মত প্রচারের মাধ্যমে কাল-উদ্ভূত শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান এবং এই প্রয়াসের প্রসূন হচ্ছে পদসাহিত্য, দার্শনিক তত্ত্বগ্রন্থ, রাগ-তাল ও বাদ্যযন্ত্র, চরিতগ্রন্থ প্রভৃতির উদ্ভব ও বিকাশ। ষোল-আঠারো শতকে মুসলিম কবির প্রণয়োপাখ্যান, শাস্ত্র গ্রন্থ ও চরিত গ্রন্থাদি, গাথা-গীতিকা, পীর-নারায়ণ সত্য ও তাঁর চেলা পীর-দেবতাদের মাহাত্ম্য কাহিনী, সতেরো-আঠারো শতকে পাই সহজিয়া বাউলের নানা উপশাখার সাধনশাস্ত্র হঠযোগগ্রন্থাদি, আঠারো শতকের শেষার্ধে কোম্পানী শাসনের গোড়ার দিকে মেলে কবিগান ও দোভাষী সাহিত্য।

এই সব সাহিত্যের উদ্ভবের ও বিকাশের মূলে সমকালীন প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। কাজেই কারণ-কার্য বুঝবার জন্যেই বাঙলার রাজনৈতিক বিবর্তনের রূপরেখাটি আমাদের জানা আবশ্যিক। এ-সূত্রে এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলাদেশ কিংবা ভাষিক বাঙলাদেশ ব্রিটিশ-পূর্ব কালে কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না। কাজেই বিভিন্ন আঞ্চলিক জীবন ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে বিকাশ-বিবর্তন পেয়েছে।

॥ ২ ॥

ইতিহাস বিরল এই দেশের অতীত বহু গবেষণায়ও এখনো কায়া ধারণ করেনি। এমন কি পূর্ণাঙ্গ কঙ্কালের অবয়ব পেয়েছে কি না সন্দেহ। কাজেই কায়ার প্রতিভাসে ছায়াই আমাদের সম্বল।

নেগ্রিটো মোঙ্গলীয় রক্ত-সঙ্কর অস্ট্রিক বাঙালী জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মত গ্রহণ-পূর্ব কালে সভ্যতার কোন্ স্তরে ছিল তা আমরা পষ্টভাবে জানিনে। তবে পশ্চিম বঙ্গে পাণ্ডু-রাজার ঢিবি উৎখননের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি দৃষ্টে মনে হয় একটা উন্নয়নশীল জাতি ও বিকাশমান সংস্কৃতি তাদের কোন কোন গোত্রের ছিল। মহাভারতিক পৌরাণিক (মৎস্য ও বায়ু) কাহিনীকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া চলে না। প্রাচীন বাঙালীর বর্ণমালা কিংবা লেখ্য ভাষা ছিল না, তাদের যোগ-সাংখ্য তন্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান থাকলেও আধুনিক অর্থে কোন Religion যে তখন গড়ে উঠেনি, তা জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহজ প্রসার থেকে অনুমান করা চলে। এও হয়তো সত্য যে গোত্র-প্রধানের নেতৃত্বে তখনো তারা সর্দারতন্ত্রের আওতায় যৌথ জীবন যাপন করত। জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে বর্ণিত মহাবীরের প্রতি রাঢ় অঞ্চলের লোকের আচরণ এই অনুমানের প্রবর্তনা দেয়। রাজা ও রাজ্য গড়ে উঠবার মতো সংস্কৃতি ও সভ্যতা তখনো তাদের অনায়ত্ত—তাই আর্যরা তাদের দস্যু ও পাখি বলে অবজ্ঞা করত, তাদের স্পর্শও আর্যদের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত হত। কাজেই উত্তর পশ্চিমের আর্যীকৃত অঞ্চলের তথা পাটলীপুত্রের নন্দ-মৌর্য-সুঙ্গ-কণ্বরাজারা জৈন-বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশ কালে রাঢ়ে-পুণ্ড্রে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলা যেমন কোন এক নামে পরিচিত ছিল না, বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল তেমনি গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও প্রাতিবেশিক রীতি-নীতির পার্থক্যও ছিল। যানবাহনের অভাব স্থূল জীবনযাত্রা, এবং স্থানিক ও গৌত্রিক জীবন দীর্ঘস্থায়ী করেছিল।

উত্তর ভারতের সঙ্গে শাস্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক যোগ স্থাপিত হওয়ার পরে আমরা প্রাচীন বাঙলাকে আদি-মধ্যযুগের সীমা অবধি গৌড়, সুহ্ম, রাঢ়, বঙ্গ, সমতট, পুণ্ড্র, হরিখেল, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভক্ত দেখি। তারপরে পাই গৌড় রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি নামের অঞ্চল। আবার প্রশাসনিক বিভাগ অনুসারে কিংবা প্রসিদ্ধি অনুসারে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি, দণ্ডভুক্তি, কঙ্কগ্রাম ভুক্তি. তাম্রলিপ্তি, দক্ষিণ রাঢ়, উত্তর রাঢ়, চন্দ্রদ্বীপ, বাঙ্গালা, সুবর্ণবীথি, উত্তর মণ্ডল, সমতট

মণ্ডল, হরিখেল, প্রাগজোতিষপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল বা এলাকার নাম পাই। ঐতিহাসিক কালে গ্রীক লেখক Pliny, Ptolemy এবং চীনা পর্যটক প্রভৃতির নানা উক্তিতেও বাঙলার কিছু পরিচয় মেলে। এ-সময় বাঙলা ও বাঙালীর আর্যায়ণ পূর্ণতা লাভ করে এবং পুণ্ড্র-বঙ্গবাসীরা তখন আর্যরূপে স্বীকৃত।

মোটামুটিভাবে আলেক্সান্দারের ভারত অভিযান কালে (৩২৬ খ্রী: পূ:) গঙ্গারিডই নামে গাঙ্গেয় বাঙলায় একটা রাজ্য ও প্রবল রাজশক্তি ছিল বলে গ্রীক সূত্রে সংবাদ মেলে। এই সময়কার বাঙলারাজের নৌশক্তি ও গজশক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। হয়তো পাটলীপুত্রের রাজারা তথা নন্দ-মৌর্য-সুঙ্গ-কণ্ব বংশীয়রা রাঢ়-সুহ্ম-পুণ্ড্র শাসন করেছেন ৩১৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি। ৩২০ থেকে ৬৫০ খ্রীস্টাব্দ অবধি গুপ্ত শাসনে ছিল বাঙলার বহু অঞ্চল। সমুদ্র গুপ্তের সময় থেকে বাঙলার শাসন দৃঢ় ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। কিন্তু আধুনিক ভৌগোলিক কিংবা ভাষিক সমগ্র বাঙলায় গুপ্ত শাসন এমন কি ইংরেজ পূর্ব যুগে মুগল শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শশাঙ্ক ও রাজা গণেশ বংশীয়রা ব্যতীত আর কোন সার্বভৌম শাসকই হয়তো বাঙালী ছিলেন না। গুপ্তরা তো নয়ই, পালেরাও বাঙালী ছিলেন কিনা নিশ্চিত প্রমাণ নেই। শশাঙ্ক ও রাজা গণেশ বংশীয়ের শাসন কাল সর্ব সাকুল্যে ত্রিশ বছরের বেশী হবে না। অতএব বাঙলাদেশ সাধারণভাবে চিরকালই বিদেশী শাসিত। ক্বচিৎ দেশী সামন্ত স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র ও খণ্ড রাজ্যের সাময়িক অধিকারী ছিল।

গুপ্তরা প্রধানত পুণ্ড্রে ও গৌড়ে এবং শেষের দিকে বঙ্গেরও কিছু এলাকায় অধিকার বিস্তার করে, কিন্তু রাঢ়-সুহ্মও তাদের শাসনে ছিল কিনা, থাকলেও কতকাল ছিল তা সঠিক বলা যাবে না। গুপ্ত অনুপ্রবেশের সময়ে রাঢ়ে সিংহবর্মা ও তৎপুত্র চন্দ্রবর্মা যে রাজত্ব করতেন তার সাক্ষ্য মেলে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া তাম্রলিপিতে। কিন্তু এঁরা রাজপুত (যৌধপুরী) কিংবা বাঙালী সেবিষয়ে সংশয় আছে। মেহেরাউলি লিপিতে প্রাপ্ত বঙ্গবিজেতা চন্দ্র এবং এই চন্দ্র বর্মা অভিন্ন বলে কেউ কেউ মনে করেন। গুপ্তদের পতনকালে ছয় শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গ সমতটে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব নামে তিনজন সামন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন বলে কিছু প্রমাণ মেলে। এঁরা ছাড়াও পৃথু রাজা সুধন্যাদিত্য প্রভৃতি স্বাধীন সামন্ত বা ক্ষুদ্র রাজার নাম মেলে। কাজেই সেকালের পক্ষে এই বিপুল-বিস্তৃত দেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্মৃতনাম রাজা ও রাজ্য ছিল।

সাত শতকের প্রথম দশকেই শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত নামে এক প্রবল প্রতাপ স্বাধীন গৌড়াধিপতির সাক্ষাৎ মেলে। তিনি উত্তর ও পশ্চিম বাঙলা এবং উড়িষ্যা বিহারের

কিয়দংশে আপন আধিপত্য বিস্তার করে বাঙালীর গৌরব-গর্বের অবলম্বন হয়ে রয়েছেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধপীড়ক। গুপ্তদের ও শশাঙ্কের শাসন কালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি প্রায় বিশ বছর প্রতিপত্তির সঙ্গে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে—বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গা-মাটিতে। পূর্ববঙ্গেরও কিছু অংশ হয়তো তাঁর শাসনে ছিল। তিনি ছিলেন উত্তর-ভারতিক রাজা রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্যের উৎকল মগধ অংশ হর্ষবর্ধন এবং গৌড়-পুণ্ড্র-রাঢ় কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মণ দখল করে নেন। ভাস্কর বর্মণের পরে রাঢ়াধিপতিরূপে পাই এক জয়নাগকে। এর পরে রাঢ়-গৌড়ের প্রায় শত বছরের ইতিহাস অজ্ঞাত—এর পরই পাল রাজত্বের শুরু ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে এবং ৭৫০-এর দিকে বঙ্গে দেখি শান্তিদেব বংশীয়দের রাজত্বের শুরু। ৭২৫-এর দিকে জয়বর্ধন নামে (নেপালী ?) শৈল বংশীয় এক রাজা কিছুকাল পুণ্ড্র শাসন করেন। মগধরাজ যশোবর্মণও আট শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙলার কিছু অংশ জয় করে কিছুকাল শাসনে রাখেন। কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য কিছুকাল গৌড় রাজ্যের আনুগত্য লাভ করেছিলেন। হিউএনৎ-সাঙ-এর বঙ্গ ভ্রমণকালে সমতটে ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করতেন। এই রাজপরিবারের সন্তান শীলভদ্র নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। সামন্তরাজ জ্যেষ্ঠভদ্রও সম্ভবত এই বংশীয় ছিলেন।

নেপালী-তিব্বতী-কামরূপী-মোঙ্গলীয় (?) খড়্গ বংশীয় বৌদ্ধ খড়্গোদ্যম, জাত খড়্গ, দেবখড়্গ ও রাজভট্ট সমতট শাসন করেন।

শশাঙ্কের পরে ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে প্রজারা আসলে সামন্তরা স্ব স্ব স্বার্থে মাৎস্য ন্যায়ের অবসান কল্পে এক সামন্ত গোপালকে সার্বভৌম রাজা করে আনুগত্যের স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করল। গোপাল বাঙালী ছিলেন কিনা তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের সাক্ষ্যে গোপালের পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্ধন। কিন্তু এই উত্তরকালীন সাক্ষ্য সংশয় ঘুচায় না—কেননা পাল রাজত্বের গোড়ার দিককার প্রায় দুশো বছর ধরে আমরা পালরাজাদের অনুশাসনগুলি পাচ্ছি বাঙলা-বহির্ভূত অঞ্চলে। উড়িষ্যা ও মগধই ছিল তাঁদের রাজ্যের কেন্দ্রাংশ। তা ছাড়া গোটা আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলা কখনো পালদের অধিকারে ছিল না। ধর্ম-পালের আমলে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব অবধি তাঁর রাজ্যের বিস্তার দেখি এবং বিক্রম-শীল, নালন্দা, উড্ডিয়ানা ওদন্তপুরী প্রভৃতি ছিল পাল রাজ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র। কেবল মহাস্থানগড় ও সোমপুরী বিহারই ছিল উত্তর বঙ্গের প্রান্তে—আজকের বাঙলার সীমায়। রাষ্ট্রকূট ও কালচুরীদের সঙ্গে তাঁদের ছল বৈবাহিক সম্পর্ক। এসব তাঁদের অবাঙালী চেতনার সাক্ষ্য দেয়। রামচরিতে পালদের ক্ষত্রিয়, আর্যমঞ্জুশ্রী

মূলকল্পে দাস বংশোদ্ভূত এবং আবুল ফজল তাঁদের কায়স্থ বলে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া পাল রাজত্বের শুরু ও শেষ মগধেই। অতএব পালেরা বহুকাল যাবৎ বাঙলা-দেশের অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করলেও তাঁরা একান্তভাবে বাঙলার ও বাঙালীর শাসক ছিলেন না। পাল শাসনকালের দৈর্ঘ্য ও পালদের বৌদ্ধত্বই বাঙলার ইতিহাসে ও বাঙালীর ঐতিহ্যে পালদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। উত্তর ভারতে ও বিহারে পাল অধিকার যতই সঙ্কুচিত হয়েছে পাল রাজারা ততই বাঙালী হয়ে উঠেছেন এবং তখন থেকেই তাঁদের তাম্র শাসন ও শিলালিপি বাঙলায় সুলভ হয়েছে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ ও রাজচক্রবর্তী সম্রাট হচেছন ধর্মপাল। খালিমপুর তাম্র শাসনসূত্রে মনে হয় গোটা উত্তর ভারত অন্তত কিছুকালের জন্যে তাঁর বশীভূত হয়েছিল। বাদাল স্তম্ভলিপির প্রমাণে বলা চলে দেবপাল (আনু: ৮১০-৫০ খ্রী:) অন্তত কিছুকালের জন্যে কম্বোজ থেকে বিন্ধ্য পর্বত এবং প্রাগজ্যোতিষপুর ও পশ্চিম সাগর অবধি তাঁর শাসন বা প্রভাব ব্যাপ্ত করেছিলেন। তাঁর পরের রাজারা—বিগ্রহ পাল ওর্ফে সুর পাল—নারায়ণ পাল—রাজ্যপাল—গোপাল (২য়)—বিগ্রহ পাল (২য়) অবধি (আনু: ৮৫০—৯৮৮ খ্রী:) পালদের দুর্ভাগ্য ও দুর্যোগের কাল। এই সময় পালরাজ্য সংকুচিত হতে থাকে। এমন কি দক্ষিণ এবং পূর্ববঙ্গও হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। হরিখেলে (পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম) কান্তিদেব এই সময়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রকূট রাজ অমোঘ বর্ষ (৮১৪-৮০ খ্রী:) উড়িষ্যার শুলকিরাজ রণস্তম্ভ, প্রতিহাররাজ ভোজ দেব, কালচুরীরাজ গুণাম্বুধি দেব যশো বর্মণ প্রভৃতি দক্ষিণে, উত্তরে, রাঢ়ে, গৌড়ে, পুণ্ড্রে ও সমতটে পাল রাজ্যাংশ দখল করে নেন। কেউ কেউ রাজ্যপাল ও নয়পালকে কম্বোজীয় বঙ্গ বিজেতা বলে মনে করেন। এই কম্বোজ কোচ কিংবা কম্বোজীয় বলে অনুমিত হয়। মনে হয় মগধ ও উত্তর বঙ্গের ক্ষুদ্র অংশে পাল রাজ্য এই সময় সীমিত হয়ে পড়ে। আবার মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮ খ্রী:) হৃতরাজ্য ও হৃত গৌরব কিছুটা উদ্ধার করেছিলেন। এর পরে আরো শতোর্ধ্ব বছর ধরে নয় পাল—বিগ্রহ পাল (৩য়)—মহীপাল (২য়)—সুর পাল (২য়)—রামপাল—কুমার পাল—গোপাল (৩য়)—মদন পাল ও গোবিন্দ রাজত্ব করেন। তাঁরা প্রায় সবাই হৃত সম্পদ ও হৃত গৌরব পাল বংশের ম্লান প্রতীক।

দেব পালের পরেই পাল সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙতে থাকে। তখন থেকে সাধারণভাবে রাঢ়ে-বরেন্দ্রে-বঙ্গে-সমতটে বিভিন্ন সামন্ত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চাভিলাষী রণবীরেরা ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে বরেন্দ্রের কৈবর্ত ভীম-রুদ্রক-দিব্য, রাঢ়ের সেনেরা, সমতটের চন্দ্ররা, পূর্ববঙ্গের বর্মণেরা এবং

সমতটের চন্দ্রদের পরে দেবরা প্রধান। বরেন্দ্রের কৈবর্ত রাজ ভীম রুদ্রক দিব্য ছাড়া অন্যেরা বাঙালী ছিলেন বলে প্রমাণ নেই।

প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস মূলত তাম্র শাসন ও শিলালিপি-নির্ভর—ক্বচিৎ কোন রাজা সম্পর্কে গ্রন্থাদিতে প্রাসঙ্গিক ও প্রশস্তিমূলক উক্তি মেলে। রামচরিত-বল্লাল চরিত ব্যতীত কোন চরিতগ্রন্থ মেলে না। তাছাড়া রাজার নাম ও সন্ধি-বিগ্রহের উল্লেখ মাত্র ইতিহাস নয়; এমনকি ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ কঙ্কালও নয়—ঝাড় বর্তিকার টুকরো কাঁচ মাত্র। এইখানে জনজীবন অনুপস্থিত, রাজকীয় জীবনের সাক্ষ্যও আত্মপক্ষের কিংবা সেসব অনুগ্রহজীবীর তোয়াজের ভাষায় বর্ণিত।

তাছাড়া রাজা গুণী-জ্ঞানী-বিবেচক বা বলবীর্যবান হলেই প্রজার সুখ হবেই তেমন কোন অমোঘ নিয়ম নেই। কিংবা রাজা দুর্জন-দুরাচারী-অজ্ঞ-অসমর্থ-উদাসীন হলেই প্রজা অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-পীড়নের শিকার হবে, তাও নয়। কেননা, জনগণ থাকে স্থানীয় শাসক প্রশাসকের অধীনে, তাদের চরিত্রের ও মানবিক দোষ-গুণের উপর মুখ্যত নির্ভর করে প্রজার জীবন-জীবিকার সুযোগ ও আপদ-সম্পদ। সেসব ইতিবৃত্ত আমাদের অনায়ত্ত। তবু কথায় বলে 'বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস মেলে, শিশিরেও সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়' কিংবা 'ঘটেও আকাশ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব'। আমরাও এ বিরল ও বিরান অতীতের কোন কোন বিষয় প্রমাণে-অনুমানে অনুধাবন করতে পারি।

সেনেরা ছিলেন কর্ণাট দেশীয় কাণাড়ী ক্ষত্রিয়। রাঢ়ে আগত সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন থেকেই এ বংশের শুরু। তাঁর পুত্র বিজয় সেন সম্ভবত প্রথম স্বাধীন রাজা (১০৯৭—১১৬০)। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনই (১১৬০—৭৮) সেন বংশের মধ্য-মণি। ইনি আধুনিক ভাষিক বাঙলাদেশ ছাড়াও বিহার উড়িষ্যার কতক অংশ স্বাধিকারে আনেন। লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮—১২০২ বা-০৬) সগৌরবে রাজত্ব করে বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য হারান। এর পরও পূর্ববঙ্গে সেন বংশীয় সামন্তরা কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। বিশ্বরূপ সেন (১২০৬—২০) এবং কেশব সেনের (১২২০—২৩ খ্রীঃ) নাম অনুশাসন সূত্রে মেলে।

সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী। তাঁরা বৌদ্ধ অধ্যুষিত এই বাঙলাদেশে নতুন করে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সমাজ-আচার-রীতি-নীতি, বর্ণানুগ শ্রেণীবিন্যাস, পার্বণ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি অত্যুৎসাহে রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ সমাজ ও নিম্নবিত্তের মানুষ তাঁদের হাতে পীড়িত হয়েছিল। এ কালের নাথ-যোগী (তাঁতী), ধর্ম ঠাকুরের পূজারী, সহজযানী, মীননাথ-গোরক্ষনাথ পন্থী বিভিন্ন শাখার বৌদ্ধরা প্রচ্ছন্নভাবে শূদ্ররূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রান্তে ঠাঁই করে নিয়ে আত্মরক্ষা

করে। বৌদ্ধদের নির্বাণ ও সাম্যের সমাজ এ ভাবে বর্ণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য সমাজে পরিণতি পায়। ফলে এ সমাজের এক বৃহৎ অংশ মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃস্বের ও লাঞ্ছিতের অভিশপ্ত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। শূদ্রাদি অস্পৃশ্যের এবং নিম্ন-বিত্তের পেশাদারী শ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার হরণ করা হয়। কৃত্রিম বর্ণ বিন্যাসের ফলে উচ্চ বিত্তের অধিকাংশ মানুষ যেমন আভিজাত্য গৌরব লাভ করে, তেমনি এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব কোন্দলও সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। তাই ঘটকের রচিত কৃত্রিম বংশাবলী এবং জাতি-মালা কাচারী সত্তেরো শতক অবধি সমাজ ক্ষেত্রে অনর্থ ঘটিয়েছে দেখতে পাই। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে (১৩ শতক) বাঙলায় ছিল ব্রাহ্মণ ও ছত্রিশবর্ণের শূদ্র এবং তাদের অধিকাংশ ছিল বর্ণশঙ্কর বা মিশ্ররক্তের।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও ঐ মতের সমর্থন মেলে। জৈন-বৌদ্ধ সমাজে যখন জীব নির্বিশেষের প্রাণের মর্যাদা ও জীবিকার স্বাধীনতা ছিল, তখন এই নব-বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজে মানুষের মৌলিক অধিকারই অপহৃত হল। নিম্নবর্ণের বৃত্তিধারী তন্তবায়, কর্মকার, চর্মকার, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার ও ঝাড়দার প্রভৃতি দরিদ্রদেরকে তথা এ দেশের মানুষকে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনেরা অপরিস্রুত অজ্ঞ বলে অবজ্ঞা করতেন। তাই উত্তর ভারত থেকে তথা আর্যাবর্ত থেকে আর্যব্রাহ্মণ এনে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। গুপ্ত আমলে শাসন কার্যে জনগণেরও প্রতিনিধিগ থাকত; তখন ভুক্তি (প্রদেশ), বিষয় (পরগনা), মণ্ডল (জিলা), বীথি (মহকুমা) ও গ্রামে বিভক্ত ছিল প্রশাসনিক কাঠামো। প্রশাসকরা ছিলেন যথাক্রমে উপরিক, বিষয়পতি, মাণ্ডলিক, বীথিপতি ও গ্রামপতি। মহত্তর নাগরিকদের প্রতিনিধি ছিলেন নগরশ্রেষ্ঠী (ব্যাঙ্কার), প্রথম সার্থবাহ (বণিক), প্রথম কুলিক (শিল্পী) ও প্রথম কায়স্থ। কার্যালয়ের নাম ছিল অধিকরণ, অন্যান্য অফিসারের নাম—চৌরোদ্ধরিক, শৌল্কিক দাশাপরাধিক, তরিট পুস্তপাল, মহাক্ষপটলিক, জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃ, মহাদণ্ডনায়ক, ধর্মাধিকার, মহাপ্রতিহার, দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক, দণ্ডশক্তি, কোষ্ঠপাল, প্রান্তপাল, অমাত্য, মহামাত্য, সেনাপতি, গূঢ় পুরুষ (গুপ্তচর), করম (সহকারী), অধ্যক্ষ, দূত, মন্ত্রপাল (মন্ত্রী), মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, যূথপতি প্রভৃতি। কিন্তু পাল-সেন আমলে শাসক-প্রশাসকরাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এ ভাবেও দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্বেকার গণ-অধিকার অপহৃত হয়।

মৌর্য যুগ থেকে সেন আমল অবধি জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ছিল। সে বিষয় আমরা অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ব্রাহ্মণ্য পীড়নে বাঙলাদেশ থেকে জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। গণমানব যে দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিল তাও আর্যাসপ্তশতী, সদুক্তি কর্ণামৃত, সুভাষিত রত্নকোষ, প্রাকৃতপৈঙ্গল, চর্যাগীতি,

শেক শুভোদয়া প্রভৃতি গ্রন্থসূত্রে পাই। পাল আমলের শেষ দিক থেকে সেন আমল অবধি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব প্রবল ছিল। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও আচারের বহুলপ্রচার সত্ত্বেও দেশের মানুষের চারিত্রিক দৌর্বল্য জাত সর্বপ্রকার অনাচার ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। দুর্গা পূজার সময়ে, হোলি প্রভৃতি পার্বণে নৃত্য-গীতে ও আচরণে অশ্লীলতার নিদর্শন ছিল। তারও সাক্ষ্য মেলে লক্ষ্মণ সেনের আমলের সাহিত্যে এবং অন্যান্য সূত্রে। দৈবনির্ভরতা ছাড়াও রাজশক্তির বীর্যহীনতা ও জনগণের আদিরসাসক্তি ছিল। জনগণের পার্বণ দুর্গাপূজার সময়ে অনুষ্ঠিত শাবরোৎসবে কিংবা কামোৎসবে অথবা বাসন্তী হোলিতে বিকৃত রুচি ও অশ্লীলতা ছিল প্রকট। গুপ্তরা ও সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী, জনগণ ছিল সাধারণভাবে প্রাচীন জড়বাদের সংস্কার-পুষ্ট জৈন-বৌদ্ধ। তার ফলেই মহাযান ও তজ্জাত মন্ত্র-তন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহজ যানী বিকৃতবৌদ্ধ মতই এখানে জনপ্রিয়তা লাভ করে লোকধর্মে পরিণত হয়। ফলে গৃহস্থের দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা পান বজ্রধর ও বজ্রতারা এবং অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ। করুণা ও মৈত্রীর সূত্র ধরে লোকনাথকে অবলম্বন করে বৌদ্ধ ভক্তিবাদ দৃঢ়মূল হয়। বজ্রনাথ আদিনাথ শিবরূপে পরবর্তীকালে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবতাহিসেবে অভিন্নরূপ লাভ করেন—নাথপন্থ ও নাথসাহিত্য তারই পরিণাম প্রসূন। আবার অন্যদিকে লোকনাথ ভক্তিবাদ নির্ভর বিষ্ণুতে বিলীন হয়েছেন। যে সংস্কার রক্তের মতো মন-মানসের পোষ্টা তা শাস্ত্র কিংবা শাসকের হুকুম-হুমকিতে বিলীন হয় না। ধর্ম ধমকে নিয়ন্ত্রিত হবার নয়। তাই জনগণের দেবতা চণ্ড-চণ্ডী শিব-শক্তিরূপে লৌকিকরূপ শেষাবধি রক্ষা করেছেন, বিষ্ণুও লৌকিক রাধার-কৃষ্ণ হয়ে গৃহস্থের আপন দেবতা হয়ে আছেন। বৌদ্ধ যুগের লৌকিক ধর্ম, বাসলী, ক্ষেত্রপাল, গণেশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য দেবতারূপে গৃহীত হয়েছিলেন। অভিজাতরা যখন সংখ্যাগুরুর লৌকিক দেবতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হল, তখন নিজেদের রুচি মতো এ সব দেবতার একটা তাৎ-পর্যময় মহত্তররূপ সমাজ মানসে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের আর্যাভিমান বজায় রাখতে প্রয়াসী হয়; পুরাণ এ উদ্দেশ্যেই রচিত। তাই সব দেবতারই দুইরূপ—লৌকিক ও পৌরাণিক। বৌদ্ধ দেবতা ও অপদেবতা—ধর্ম, তারা, মনসা, যক্ষ, লোকনাথ, আদিনাথ, বাসলী পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবতার আবরণে এ ভাবে টিকে থাকলেন। যদিও সুপরি-কল্পিতভাবেই যেন বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য-চৈত্য-আচার-অনুষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল বাঙলাদেশ থেকে সেন আমলে। তবু বৌদ্ধ যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র-দেহতত্ত্ব স্থানীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে রাখল। নামান্তরে এবং ক্বচিৎ রূপান্তরে লৌকিক বৌদ্ধ দেবতা ও সংস্কার চিরকালের জন্যে দৃঢ়মূল হয়ে রইল। তুর্কী বিজয়ে স্বস্থ গণমানব তখন পূর্ণ উদ্যমে লৌকিক দেবতার মহিমা-মাহাত্ম্য গানে-গাথায়-পাঁচালীতে

প্রচার শুরু করে। মধ্যযুগের বাঙলায় লৌকিক ও লিখিত সাহিত্যের এভাবে আরম্ভ। কাজেই আমাদের সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে প্রাচীন অস্ট্রিক-মোঙ্গলীয় সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র ভিত্তিক দেবতা ও তত্ত্ব, জীবন-চেতনা, জগৎ-ভাবনা ও আচার-পার্বণ বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য আবরণে স্থানিক ও কালিক রূপান্তরে আজো বিদ্যমান। তাই বাঙলা সাহিত্য আলোচনায় বৌদ্ধ প্রভাব ও তার গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সে-পথে পথিকৃৎ।

॥ ২ ॥

১২০২ বা ১২০৪ অথবা ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খালজী নদীয়া-লক্ষ্মণাবতী জয় করেন। পশ্চিম বঙ্গের কতকাংশ এবং পূর্ববঙ্গ অনেককাল তুর্কী শাসনের বাইরে থেকে যায়। এই তুর্কী বিজয় ও শাসন সম্পর্কে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের অনেক অভিযোগ। তেরো-চৌদ্দ শতকে এবং পনেরো শতকের মাঝামাঝি কাল অবধি অর্থাৎ মাহমুদশাহী রাজত্বের পূর্বাবধি তুর্কীর নির্যাতনে বাঙালীরা নাকি এমনি ত্রাস ও শঙ্কার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে যে, পয়ার-ত্রিপদী রচনার মতো মানস-স্বস্তি তাদের সুদীর্ঘ আড়াইশ' বছরের মধ্যে একবারও মেলে নি। অবশ্য দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ তথ্যের স্বীকৃতি নেই। সাহিত্যের ইতিহাসকার পরিবেশিত তত্ত্ব যে ইতিহাস-সমর্থিত নয় বরং তার বিপরীত, তা-ই দেখাবার জন্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal Vol. II থেকে বাঙলার তুর্কী শাসকদের শাসন-সম্পর্কিত ঐতিহাসিকের মন্তব্য তুলে ধরছি।

ক. খালজী আমীরদের শাসনে (১২০২—২৭ খ্রীঃ)

১. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী (১২০২—০৫) ১২০২ কিংবা ১২০৬ সনে 'নুদিয়া' জয় করেন। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই এদেশ জয় করেন। তাই শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই ইনি সামন্ততান্ত্রিক শাসন-সংস্থা গড়ে তোলেন। আর একদিকে মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে গঠনমূলক কাজে যেমন যত্নবান হন, তেমনি শক্তি সঞ্চয় করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। "Malik Ikhtyaruddin Muhammad devoted the next two years (1203-05) to the peaceful administration of his newly founded kingdom. He followed the usual practice of Muslim conquerors by pulling down idol temples and building mosques on their

ruins, endowing Madrasa or College of Muslim learning and evincing his zeal for religion by converting the infidels. But he was not bloodthirsty and took no delight in massacre or inflinching misery on his subjects (pp 8-9)···(He) was indeed the maker of the medieval history of Bengal—He was a born leader of men, brave to recklessness and generous to a fabulous extent.'' (p. 12).

২· মালিক ইজ্জুদ্দিন মুহম্মদ শিরান খালজী (১২০৭—৮)—এক বছরের মত রাজত্ব। Shiran was a man of extra-ordinary courage, sagacity and benevolence. (p. 15).

৩. মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ (১২০৮—১০ খ্রী:)—ইনি বিদ্রোহী আমীর আলি মর্দানের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেও দক্ষ শাসক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। (He) was the most level headed politician, steadfast in ambition, unfettered by any scruple or sentiment, possessed of the rare gift of making himself acceptable even to his prospective rivals and too clever to place all his cards on the table a minute too soon, (p. 18).

৪· মালিক আলি মর্দান (১২১০—১৩ খ্রী:)—এঁর ঘটনাবহুল জীবন। বিদ্রোহ, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দু:সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, উন্মত্ততা, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতির সমবায়ে ইনি বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর মানুষ।

হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর হাতে সমভাবে উৎপীড়িত হয়েছে। (He) was a man of undoubted ability as a soldier, but impolitical, bloodthirsty and of a murderous disposition......Partly out of policy but mainly actuated by a feeling of vengeance against his Khilji kinsmen who had cast him out, he made the Khilji nobles suffer terribly at his hands. (p. 19).

৫. মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ (পুন: ১২১৩-২৭)—অত্যন্ত জনপ্রিয় সুশাসক। তিনি নৌবহর সৃষ্টি করেন। সম্ভবত তাঁর নৌসৈন্যেরা হিন্দু ছিল।

(Iwaz) proved one of the most popular Sultans that ever sat on the throne of Gour (p. 21)······Iwaz built more than one Juma Mosque, other Mosques and Madrasas also arose on all sides (p. 25) ...... the kingdom of Lakhnawati and Bihar enjoyed

uninterrupted peace for about twelve years under the vigorous and beneficient rule of Sultan Ghyasuddin Khilji till the first expedition of Sultan Shamsuddin-Iltutmish against Bengal 1225 A. D. (p. 25) ——Sultan Ghyasuddin's reign of about fourteen years was a prosperity for his kingdom (p. 17)——Sultan Ghyasuddin in his exterior and interior graces was every inch a Padishah, just, benevolent and wise (p. 28), 'বৃহৎবঙ্গে'ও (পৃ: ৬১২) এঁর উচ্ছ্বসিত তারিফ আছে। এখানেই খালজী আমীরদের শাসনের অবসান ঘটে। তারপরে শুরু হয় দিল্লী সুলতানের মামলুক (ক্রীতদাস) শাসন।

খ. মামলুক (গোলাম) শাসনে (১২২৭—৮২)

৬. শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ (১২২৭—২৯)—সম্রাট ইলতুতমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীন গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজকে পরাজিত ও হত্যা করে গৌড়ের শাসক নিযুক্ত হন। তিনি দেড় বছর মাত্র "অতি দক্ষতার সহিত রাজদণ্ড চালনা করিয়াছেন।" (বৃহৎবঙ্গ পৃ: ৬১৩) ।

৭. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বল্‌খ খালজী (১২২৯—৩০) ওরফে দৌলতশাহ্‌ বিন মওদুদ—নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর ইনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট ইলতুতমিসের সেনানীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

৮. মালিক আলাউদ্দীন জানি (১২৩১—৩২)—সম্রাট ইলতুতমিস এঁকেই গৌড়ের শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে সম্রাট স্বয়ং গৌড়ে আসেন এবং অজ্ঞাত কারণে তাঁকে পদচ্যুত করে মালিক সাইফুদ্দীন আইবককে সুবাদারী দেন।

৯. মালিক সাইফুদ্দীন আইবক (১২৩২—৩৫)—"He possessed all the noble qualities of his race and rose to the front rank of the maliks of his age." (p. 45).

১০. মালিক ইজ্জুদ্দিন তুঘরল তুঘান খান (১২৩৬-৪৫)—ইনি রাঢ় অঞ্চলও দখলে এনেছিলেন। ফলে, বিহার, বরেন্দ্র ও রাঢ়ের অধীশ্বর হয়ে ইনি যোগ্যতার সঙ্গে শাসনদণ্ড চালনা করেন। "He was adorned with all sorts of humanity and sagacity and graced with virtues and qualities and in liberality, generosity and power of winning men's heart he had no equal. (p. 46).

১১. মালিক তৈমুর খান-ই-কিরান (১২৪৫—৪৭)—ইনি তুঘরল তুঘান খান থেকে গৌড় জবরদখল করেন। এঁর আমলে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজা নরসিংহদেব রাঢ় ও বরেন্দ্রের অনেকখানি দখল করে নেন। কিন্তু তিনি তা পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি।

১২. মালিক জালালউদ্দিন মাসুদ জানি (১২৪৭—৫১)—ইনি আলাউদ্দীন জানির পুত্র। এঁর উপাধি ছিল মালিক-উস্-শরক্। উল্লেখ্য কৃতিহীন রাজত্ব।

১৩. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুঘিসুদ্দীন উজবেক (১২৫২—৫৭)— ইনি তিনবার দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন। এই দিগ্বিজয়ী, সাহসী ও নিপুণ যোদ্ধা গৌড়, বিহার ও অযোধ্যা জয় করেন এবং কামরূপ অভিযানে পরাজয় ও মৃত্যুবরণ করেন।

'Rushness and imperiousness were implanted in his nature and constitution ; but he was a man of undoubted ability as soldier and proved a successful ruler too. (p. 51).

১৪. মালিক ইজ্জুদিন বলবন উজবেকী (১২৫৭—৫৯)—জবরদখলকার। তাঁর উল্লেখ্য কোন কৃতি নেই।

১৫. মালিক তাজুদ্দিন আরসালান খান (১২৫৯—৬৫)—যুদ্ধবাজ ও রক্তপিপাসু। ইজ্জুদিন যখন 'বঙ্গ' অভিযানে ব্যস্ত তখন তিনি লখনৌতীতে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড ঘটান।

'He was an impetuous and warlike man and had attained the acuse of capacity and intrepidity. (p. 55).

১৬. তাতার খান (১২৬৫—৬৮)—আরসালানের পুত্র।

'Tatarkhan was a very capable ruler, renowned for his bravery, liberality, heroism and honesty. (p. 57)

১৭. শেরখান (১২৬৮—৭২)—উল্লেখ্য কৃতিহীন।

১৮. আমীন খান—উল্লেখ্য কৃতিহীন।

সহকারী সুবাদার তুঘরল খান (১২৭২—৮১)

১৯. মুঘিসুদ্দিন তুঘরল তুঘান খান (১২৭২—৮১)—অল্পদিন সুবাদার আমীন খানের সহকারী রূপে থেকে গৌড়ের শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন। তুঘরলের হিন্দু পাইক (পদাতিক) সৈন্যবাহিনী ছিল (p. 61)। সম্রাট গিয়াসুদ্দীন

বলবন অসংখ্য পরিকর সহ তুঘরলকে হত্যা করেন। গৌড়ে সে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড।

"Tughral possessed all the characteristic virtues of Turk, indomitable will, reckless bravery, resourcefulness and boundless ambition." (p. 58)—His court at Lakhnawati rivalled that of Delhi in power and magnificence and he was more popular with his people and much better served by them than Sultan Balban who was more feared than loved by his subjects—He was profuse in liberality, so the people of the city (of Dehli) who had been there, and also the inhabitants of that place (Lakhnawati) became very friendly to him. The troops and citizens having shaken off all of the Balbani chastisement, joined Tughral heart and soul. (p. 60-61).

এবার ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মামলুক শাসনকালের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যাক:

"The History of this period is sickening record of internal dissensions, usurpations and murders.—Here in Bengal the political maxim gained ground that whosoever could kill or oust the reigning ruler should be acknowledged without demur as its legitimate master and Bengalees, whether Turks or Hindus remained generally indifferent to the fate of their rulers and enunciated a constitutional principle of their own that the loyality of a subject was due to the masnad (throne) and not to the person who happened to occupy it (p. 42)—Another notable feature of the history of this period was the beginning of a sort of rapprochement between the conquerors and their Hindu subjects. The exodus of upper class Hindus on a wide scale from the Muslim Territory gradually stopped and now for the first time we come across references to Hindus as a class of inhabitants in the Muslim Capital. The Muslim rulers had no internal trouble with regard to their Hindu subjects of Varendra even when the Hindus of Orissa threatened the capital with a siege. (p. 43).

গ. বলবন বংশের শাসনে (১২৮২—১৩০১)

২০. নাসিরুদ্দীন বঘরা খাঁন (১২৮২—৯১)—কর্মকুণ্ঠ, বিলাসপ্রিয় কিন্তু হৃদয়বান সজ্জন। "He was wise in counsel, weak in action and

unaggressive by temperament. Though there was nothing to admire him he was a lovable and genial personality strong in human virtues. He reigned rather than ruled the kingdom of Bengal, but he enjoyed throughout the esteem of his nobles and popularity with his subjects in the land of his adoption. (p. 47).

২১. রুকুনউদ্দীন কায়কোয়াস (১২৯১—১৩০১)—নাসিরুদ্দীনের পুত্র। উল্লেখ্য কৃতিহীন রাজত্ব।

এবার বলবনী শাসনের ফলশ্রুতি যাচাই করা যাক: "The Balbani regime in Bengal was not only a period of expansion but one of consolidation as well. It was during this time that the saints of Islam who excelled the Hindu priesthood and monks in active peity, energy and foresight began prosetylising on a wide scale not so much by force as by the fervour of their faith and their exemplary character. They lived and preached among the low class of Hindus then as ever in the grip of superstition and social repression. ১ – About of a century after the military and political conquest of Bengal, there began the process of the moral and spritual conquest of the land through the efforts of the muslim religious fraternities that now arose in every corner. By destroying temples and monasteries the muslim warriors of earlier times had only appropriated their gold and silver - the saints of Islam completed the process of conquest —moral and spiritual by establishing Dargahs and khankhas deliberately on the sites of these ruined places of Hindu and Buddhist worship. (p. 69).

ঘ. অজ্ঞাত মামলুক শাসনে (১৩০১—২২)

২২. শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১—২২)—'Shamsuddin Firoz was a ruler of exceptional ability. (p. 82). He died full of years of glory and a fame. (p. 82).

১. "হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ / আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন। হিন্দুরা কি করে তারে যার যেই কর্ম / আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।"—বৃন্দাবন দাস।

২৩. ক. গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ—Rebellious son of Firoz Shah.

খ. নাসিরুদ্দীন ইব্রাহীম শাহ

গ. বহরম খান ওর্ফে তাতার খান (১৩২২—২৮)।

এখন থেকে কয়েক বছরের জন্যে গৌড় রাজ্যকে তিন-অঞ্চলে ভাগ করে তিনজন শাসকের অধীনে দেয়া হয় এবং শাসকদের নিজেদের মধ্যে দখল-বেদখলের কোন্দলও চলতে থাকে।

২৪. ক. কদর খান—লখ্নৌতি—১৩২৮

খ. মালিক ইজুদ্দিন এহিয়া—সাতগাঁও—১৩২৮

গ. বহরম খান—সোনারগাঁও—১৩২৮—(মৃত্যু: ১৩৩৭)

২৫. ক. ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ—(১৩৩৮—৫০)—সোনারগাঁও।

"The lot of Hindu population in Fakhruddin's time was not very enviable for "they are muleted" says Ibn Batuta "of half of their crops and have to pay taxes over and above that". (p. 102).

খ. আলী শাহ (১৩২৮—৪২) লখ্নৌতি

গ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ—লখ্নৌতি—সাতগাঁও (১৩৪২—৫৭)—সোনারগাঁও (১৩৫৩—৫৭)

ঘ. ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ (১৩৫০—৫৩)—সোনারগাঁও। ইখতিয়ার উদ্দিন ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ্র পুত্র।

ঘ. ইলিয়াস শাহী আমলে (১৩৪২—১৪১৩)

২৬. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্-ই শেষ অবধি গোটা গৌড়রাজ্যের অধিপতি হয়ে উঠেন এবং তিনি ১৩৫৩ সন থেকেই গৌড়রাজ্যের স্বাধীন সুলতান।

২৭. সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭—৮৯) ইলিয়াস শাহ্র পুত্র। "During the long period of peace that followed Sultan Sikandar adorned his capital with many noble monuments of architecture." (p. 112).

২৮. গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ (১৩৮৯—১৪০৯)—এঁর ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি প্রাবাদিক ও প্রাবচনিক হয়ে আছে। ইনি সিকান্দার শাহ্‌র পুত্র। বিদ্যাপতি এঁরই গুণ কীর্তন করেছেন।

২৯. সাইফুদ্দীন হামজা শাহ (১৪০৯—১০) উল্লেখ্য কৃতিহীন।

৩০. শামসুদ্দীন-(১৪১০-১৩)—ইনি হামজা শাহ্‌র পুত্র। এঁর আমল রাজা গণেশের প্রভাবের যুগ। এ সময় সম্ভবত রাজপরিবারে গৃহযুদ্ধ ঘটে।

ঙ. গণেশ ও তাঁর বংশধরদের আমলে (১৪১৪—৩২)

৩১. রাজা গণেশ (১৪১৪—১৮)—জবরদখলকার। এঁর নিন্দা-প্রশংসা দু-ই আছে। তবে সুদক্ষ শাসক।

৩২. মহেন্দ্র দেব (১৪১৮) রাজত্বকাল কয়েক মাস মাত্র। ইনি হিন্দু দলের দ্বারা মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন।

৩৩. যদু বা জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ-(১৪১৮-৩১)—যে সব ব্রাহ্মণ তাঁর প্রায়শ্চিত্তে অংশ গ্রহণ করেও তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে নারাজ ছিল, তাদের তিনি লাঞ্ছিত করেন। মোটামুটিভাবে সুশাসক। "We can well believe that the province grew in wealth and population during his peaceful reign (p. 129).

৩৪. শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩২—৩৩) -ইনি জালালউদ্দীনের পুত্র। "His reign was darkened by his crimes and follies, till the nobles finding it intolerable, got him murdered through his slaves Shadi khan and Nasir khan in 1333 A. D." (p. 129)

চ. পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বা মাহমুদ শাহী আমলে (১৪৩৩—৮৬)

৩৫. নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৫৯)

"Chosen by the people the new sovereign, who styled himself Nasiruddin Abul Muzaffar Mahmud, was able to enjoy an undisturbed and prosperous reign. He is described as a just and liberal king by whose good administration" the people, both young and old were contended and the wounds of oppression inflicted by Ahmad Shah were healed ... his main interests

probably lay in the arts of palace. A large number of inscriptions found all over his kingdom recording the erection of Mosques, khankas, gates, bridges and tombs, testify not only to the prevailing prosperity but also to the enthusiasm for public works and interest in the building art, which he inspired. (p. 130).

৩৬. রুকনউদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯–৭৬)—Histories praise him as "a sagacious and law-abiding sovereign in whose kingdom the soldiers and citizens alike had contentment and security." কৃত্তিবাস এঁর প্রতিপোষকতা পেয়েছিলেন।

৩৭. শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪–৮১)— মালাধর বসু এঁরই প্রতিপোষকতায় "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" রচনা করেন।

Nizamuddin described him as vastly learned, virtuous and an able administrator. He evidenced a special interest in the administration of justice and interested on the strict and impartial application of the law—like Alauddin, he totally prohibited the drinking of wine and frequently assisted the judges in difficult cases." (p. 136).

৩৮. জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ (১৩৮১–৮৭)

Fath is stated to have been an intelligent and liberal ruler "who maintained the usages of the past and in whose time the people enjoyed happiness and comfort'. (p. 137).

এবার এখানে ইলিয়াস শাহী বাজত্বের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন উদ্ধৃত করছি:

The dynasty deserved well of Bengal, for with remarkable consistency it produced a succession of able rulers. They were tolerant, enlightened administrators and great builders. In shaping the economic and intellectual life of the Bengali people for nearly a century and a half ; the Ilyas Shahi kings played the leading part. Tolerance was their greatest asset. To have ruled over a people of an alien faith for eight generations was in itself a great achievement, to be instated on the throne after twenty five years' exclusion by a local dynasty was

an even greater one. It was a singular proof of their popularity —a popularity which rested on their past services. (p. 137).

ছ. হাবসী গোলাম আমলে (১৪৮৭—৯৩)

৩৯. সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭—৯২)—প্রভু হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে প্রভুপত্নীর অনুরোধে বিশ্বস্ত হাবসী-গোলাম—আমির আন্দিল 'সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ' নামে গৌড়ের সিংহাসনে বসলেন।

"He is credited with having ruled justly and efficiently. His reputation as a soldier inspired respect and awe and his attachment to the Ilyas Shahi house made the people forget his race. His kindness and benevolence evoked warm praise from the historians. (p. 139).

৪০. নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (২য়)—(১৪৯০—৯১)—এক বছর কাল রাজত্ব করার পর সিদিবদরের হাতে নিহত হন।

৪১. শামসুদ্দীন মুজাফফর ওর্ফে সিদিবদর ওর্ফে দিওয়ানা (১৪৯১—৯৩) —রক্ত পিপাসু নরদানব।

"His was a perfect reign of Terror ... ... Commenced a ruthless destruction of the noble and learned men of the capital. His sword fell equally heavily on the Hindu nobility and princes suspected on opposition to his sovereignty." (p. 140).

(জ) হোসেন শাহী আমলে (১৪৯৩—১৫৩৮)

সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)।

হোসেন শাহী শাসন সম্বন্ধে সাহিত্য ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ নেই, বরং তারিফ আছে প্রচুর। কাজেই আমরা ইতিহাস আর ঘাটতে চাইনে।

আমরা বাঙলার ৩১৫ বছরের ইতিহাসের খসড়া চিত্র দিলাম। এ ধরনের শাসনেই ডক্টর সুকুমার সেন অত্যাচার ও হত্যার 'তাণ্ডবলীলা' প্রত্যক্ষ করেছেন, গোপাল হালদার দেখেছেন, কেবল 'রক্ত' আর আগুন' আর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র মোহন বসু, ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমুখ বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সব ইতিহাস রচয়িতাই পড়েছেন দুঃশাসন, নিপীড়ন, বিধর্মী হত্যা কিংবা বলপ্রয়োগে ইসলামে দীক্ষার ত্রাসকর কাহিনী।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী (১২০৪) থেকে সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৫১৯) অবধি মোট বিয়াল্লিশ জন শাসক গড়ে সাত বছর করে গৌড়রাজ্য শাসন করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ স্বাধীন কেউ বা দিল্লীর সম্রাটের সুবাদার। সুবাদারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ শাসন-তান্ত্রিক কানুনের অনুপস্থিতি, সিংহাসনের উত্তরাধিকারে 'দাবী' ও যোগ্যতা বিষয়ে ধর্মীয় কিংবা শাসনতান্ত্রিক বিধানের অভাব এবং অঞ্চল হিসেবে গৌড়ের প্রান্তিকতা গৌড় শাসকদের উচ্চাভিলাষী ও উচ্ছৃঙ্খল হতে সহায়তা করেছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিপুলতার কারণও এ-ই। তাই সুবাদার বদল হয়েছে ঘন ঘন। এতেই শাসক সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা-যুগে সুলতানেরা সাধারণত আমৃত্যু রাজত্ব করেছেন।

এঁদের মধ্যে হিন্দু পীড়ক ও অত্যাচারী শাসক হচ্ছেন: ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী (১২০৪-০৭), আলী মর্দান (১২১০-১৩), মালিক তাজুদ্দিন আরসালান খান (১২৫৯-৬৫), সোনার গাঁয়ের ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৫৩ ৫৭), শামসুদ্দীন মুজাফফর ওর্ফে সিদিবদর (১৪৯১-৯৩)। এঁদের মোট রাজত্বকাল বিশ বছর। এই বিশ বছরই 'দুধে চনা' কিংবা দুধে গরলের মতো গোটা তুর্কী আমলকে 'রক্ত ঝরানো ও আগুন জালানো' শাসন রূপে পরিচিত করেছে। সে-যুগে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি না হওয়ার কারণ নাকি এ ই।

আমরা জানি, তুর্কী শাসকেরা কেবল নিজেদের মধ্যে মারামারিই জিইয়ে রাখেন নি, রাজ্য বিস্তারেও উদ্যোগী ছিলেন। রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দুকে শত্রু করে রেখে, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সৈন্যও নিয়ে (যেমন তুঘান খান ১২৭২-৮১) যুদ্ধাভিযান করা কিছুতেই সম্ভব হত না। কাজেই রাজ্যের স্থায়িত্বের গরজেই হিন্দু-নির্যাতন সম্ভব ছিল না।[১] আর সুবাদারেরা ঘন ঘন মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন বটে, তাতে রাজধানীতে ও যুদ্ধক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা ও প্রজার দুর্ভোগ হওয়া সম্ভব, অন্যত্র নয়। বিশেষ করে দুইজনের কাড়াকাড়ির অবসরে প্রজারা প্রশ্রয় পাওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন মুসলমান, তখন এরূপ ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুর উপরই

১. এ প্রসঙ্গে Early Muslim rules in Bengal and their non-Muslim subjects (Down to A. D. 1538) by Dr. Abdul Karim, Journal of Asiatic Society of Pakistan, Dacca. 1957 দ্রষ্টব্য।

পীড়ন হওয়ার কারণ নেই। সে যুগে রাজধানীর যুদ্ধ ও রাজা বদলের সংবাদ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছয় মাসে-নয় মাসেই পৌঁছত। সামন্তযুগে প্রজাসাধারণের তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধির তেমন কিছু ছিল না। এ সম্পর্কে মামলুক শাসন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য স্মরণীয়। যুগান্তকর পলাশী যুদ্ধের খবরই বা কাকে বিচলিত করেছিল? শহরে রাজনীতি, আন্দোলন কিংবা হাঙ্গামা এদেশে আজো গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ১৯৪২, '৪৬, ও '৫০-এর রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা স্মর্তব্য। আরো আগের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়। আকবরের সময়ে (১৫৭৫ খ্রীঃ) বাঙলা বিজিত হল বটে; কিন্তু আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে নিরঙ্কুশ মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কেননা মুঘলে-পাঠানে তথা রাজশক্তি ও সামন্তশক্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। জাহাঙ্গীর-শাহ্‌জাহানের বাঙলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল সত্য, কিন্তু হার্মাদদের উপদ্রবে মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ছিল না; আবার আওরঙজীবের আমলে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় বণিকদের দৌরাত্ম্য নতুন উপসর্গরূপে দেখা দিল। তা সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা বন্ধ ছিল না। আর ভারতে ইসলাম প্রচারে কোন কোন রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না তা' ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার কাহিনীও অমূলক।[১]

সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) উড়িষ্যা বিজয় কালে শত্রুর আশ্রয়রূপে 'দেউল-দেহারা' ভেঙে বাঙলার হিন্দু মনেও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্য-শাসনে তাঁর দক্ষতা ন্যায়নিষ্ঠা ও প্রজাহিতৈষণা এবং তাঁর বিদ্যোৎসাহিতা তাঁকে শীঘ্রই লোকপ্রিয় শাসক হিসেবে প্রখ্যাত করে। তাঁর পুত্র নাসির-উদ্দীন নুসরৎ শাহ কিংবা তাঁর পৌত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ এবং তাঁর অপর পুত্র আবদুল বদর ওর্ফে গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ — প্রজাপীড়ক বলে এঁদের কারুর নিন্দা ছিল না। হোসেন শাহ্‌র চট্টগ্রামস্থ লস্কর পরাগল খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ মহাভারতের আদি অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দীর প্রতিপোষক হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ্‌র (১৫৩৮-৩৯) হুমায়ুন ও শের শাহ্‌র হাতে রাজ্য হারানোর সঙ্গেই প্রকৃত পক্ষে বাঙলার স্বাধীন সুলতানী যুগের অবসান ঘটে। শের শাহ, তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ ও অক্ষম বংশধরগণ ১৫৫৮ অবধি প্রায় বিশ বছর

---

১ "হিন্দু কুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ / আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন / হিন্দুরা কি করে তারে যার যেই কর্ম / আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।"—বৃন্দাবন দাস

বাঙলাদেশ শাসন করেন। দিল্লী-কেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন এইভাবেই পুনরারম্ভ হয়। ১৫৫৮ থেকে ১৫৭৫ অবধি উড়িষ্যার সোলেমান কর্‌রানী ও তাঁর পুত্র দাউদ খান কর্‌রানী স্বাধীনভাবে বাঙলাদেশ শাসন করেন। শের শাহী কিংবা কর্‌রানী শাসন ছিল আফগানী বা পাঠান শাসন।

১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে মুঘল-সম্রাট আকবর বাঙলাদেশ জয় করেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এই জয় সম্ভব হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে বাঙলাদেশে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে বিয়াল্লিশ বছর লেগেছিল। ১৫৭৫ থেকে ১৬১৭ সন অবধি মুঘলদের সঙ্গে পাঠান শক্তি ও ভুঁইয়া নামের স্থানীয় সামন্তদের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যুদ্ধ করে করে ক্রমে ক্রমে ভুঁইয়াদের স্বতন্ত্রভাবে পরাজিত ও বশীভূত করে বাঙলাদেশে মুঘল-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতপক্ষে এই দ্বন্দ্ব-কোন্দলের বিয়াল্লিশ বছর ধরে বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক রকম অরাজকতাই চলেছিল। জনসাধারণ ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীদের তথাকথিত দ্বৈত শাসনে। বিদ্রোহী ভুঁইয়ারা এবং মুঘল-প্রশাসকরা উভয় পক্ষই রাজস্ব আদায় করত। অবস্থাটা ছিল এরূপ: দুই পক্ষই শাসন এবং শোষণের দাবীদার ছিল, কিন্তু পালন-পোষণের দায়িত্ব স্বীকার করত না। অবশেষে ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের আমলে বাঙলাদেশ মুঘলের করতলগত হয়। কিন্তু তখন বাঙলাদেশ লুণ্ঠনের আরো এক ভাগীদার জুটে গেছে—হার্মাদদের উপকূলাঞ্চল লুন্ঠন শুরু হয়ে গেছে। শাহ-জাহানের আমলে আরো এক পক্ষ প্রবল হয়ে উঠল। এ-ভাবেই মুঘল শাসক-মঘ-হার্মাদ লুটেরা এবং য়ুরোপীয় বেনেরা বাঙলাদেশে অবাধে শোষণ, লুন্ঠন ও ব্যবসা মাধ্যমে স্বাধীন-সুলতানী যুগের বাঙলার সঞ্চিত ঐশ্বর্য লুন্ঠন করে নিল। আওরঙজীবের আমলেও বাঙালীর জীবনের দুর্ভোগ-দুর্দশা ক্রমাবনতি লাভ করতে থাকে। এর মধ্যে শাহজাহানের বিদ্রোহ-কালে, মীর জুমলা-শায়েস্তা খাঁর আসাম ও চট্টগ্রাম অভিযান কালে বাঙলাদেশকে বহন করতে হয় যুদ্ধের ব্যয়। দিল্লী সাত সমুদ্রের না হলেও তেরো নদীর ওপারে ত বটেই। তাই স্বাধীন সুলতানী আমল অবসানের (১৫৩৮) পর থেকে বাঙলাদেশ আর কখনো দেশের ধন দেশে রাখতে পারে নি। বস্তুত ১৯৭২-এর আগে বিগত চারশো তিরিশ বছর ধরে বাঙলাদেশ ছিল বিদেশী শোষিত।

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আওরঙজীবের মৃত্যুর পর রাজপরিবারে দ্বন্দ্ব-কোন্দলের ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে—সেই দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের সুবাদার-গণ প্রবল হয়ে উঠে। অনেকেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এবং অন্যেরাও প্রকৃত-পক্ষে নামে মাত্র দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করে স্বাধীনভাবে নওয়াবী করতে থাকে। বাঙলায় মুর্শিদ কুলি খাঁ এক রকম স্বাধীনভাবেই ১৭১২ থেকে ১৭২৭ সন অবধি

প্রবল প্রতাপে 'সুবেহ বাঙ্গালা' শাসন করেন। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্যে তিনি দেশব্যাপী যে মধ্যস্বত্বভোগী এজেণ্ট নিয়োগ করেন, তারাই উত্তরকালে তালুকদার-তরফদার-জোতদার নামে প্রজাশোষক মধ্যস্বত্বভোগী নতুন শ্রেণী রূপে দেখা দেয়। এবং ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছিদ্র ধরে জমির প্রকৃত মালিক হয়ে দাঁড়ায়। কৃষক শ্রেণী ভূমিদাসে পরিণত হয়।

মুর্শিদ কুলি খাঁর পরে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন ও দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ এবং তারপরে আলিবর্দী খাঁ বাঙলার মসনদে বসেন। কিন্তু ১৭২৭ থেকে ১৭৫৭ অবধি এই কাল-পরিসর ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কাল। সুজাউদ্দীন ও সরফরাজ খাঁ ছিলেন দুর্বল শাসক। ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দীর গিরিয়ার যুদ্ধ এবং মীর জাফরের পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ফলগত। আলিবর্দী ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও বুদ্ধিমান শাসক। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহে জয়-পরাজয়ে টিকে ছিলেন। মীর জাফর ছিলেন নির্বোধ ও ভীরু, তাই তাঁর পক্ষে শেষরক্ষা করা সম্ভব হয় নি। আর মীর কাসিম স্বাধীনতাকামী সাহসী ও বুদ্ধিমান হলেও বিশ্বাসঘাতক এবং জমিদার ও মহাজন-পীড়ক হিসেবে সাধারণের সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। তাই তাঁরও পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

আমরা তুর্কী-মুঘল শাসকদের প্রায় নামসার কিন্তু ধারাবাহিক পরিচয় নেবার প্রয়াস পেলাম। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে এই ধারা-বর্ণনার গুরুত্ব অতি সামান্য। আমাদের প্রয়োজন তিনটি তত্ত্বে—আর্থিক, ধার্মিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লোক-জীবনে শাসক-প্রশাসকের নীতি-আদর্শের প্রভাব।

আর্থিক ক্ষেত্রে ১২০২/৬ থেকে ১৩৩৮ অবধি দিল্লী-কেন্দ্রিক তুর্কী শাসন-শোষণ কিভাবে চলতো তার স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। তবে প্রমাণে-অনুমানে বুঝা যায়, তখন ক্ষমতার লড়াই যত প্রবল ছিল শোষণের স্পৃহা তত তীব্র ছিল না। তাছাড়া তখনো দেশী সামন্তরাই প্রত্যক্ষভাবে প্রজা শাসন করতেন। কাজেই রাজস্ব দিল্লী পাঠানোর আগ্রহের চেয়ে সেই রাজস্বে যেন সৈন্যদল পোষণের প্রবণতাই ছিল তাঁদের বেশী। দুশো বছর ধরে বিদেশী সুলতানেরা (গণেশ ও হোসেন শাহ বংশীয়রা ছাড়া) একটানা স্বাধীনভাবে বাঙলাদেশ শাসন করে। শাসকদের স্বদেশী মধ্য এশিয়ার কিছু লোক বড় চাকুরে হিসেবে কিছু ধন-রত্ন তখনো বিদেশে নিয়ে গেলেও রাজস্ব হিসেবে একটা কানাকড়িও এ দুশো বছর ধরে বাইরে যায় নি। কাজেই সেই যুগে নগণ্য সংখ্যক ধনী-মানী ছাড়া দেশের জনসাধারণের মোটা ভাত-কাপড়ের অনাড়ম্বর জীবনে দারিদ্র্য-দুঃখ তেমন না থাকারই কথা। অবশ্য খরা-বন্যা-ঝড়-মহামারী

প্রসূত দারিদ্র্য-অনাহার-মৃত্যু প্রভৃতি বিপর্যয় এড়ানো সেকালে সম্ভব ছিল না। কিন্তু মুঘল আমলে মুঘলেরা সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসারে শাসন ও শোষণের অধিকার লাভ করেছিল, পালন-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। তাছাড়া বাঙলাদেশে আদায়-কৃত অতিরিক্ত রাজস্ব দিয়েই মুঘলেরা চট্টগ্রামে-আসামে ও অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালনা করেছে। আবার শায়েস্তা খাঁ প্রমুখ সুবাদারগণ দিল্লীতে বর্ধিত হারে রাজস্ব পাঠিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। তা ছাড়া শায়েস্তা খাঁ, আজিমুশ্শান, ফর্‌রুখশিয়ার প্রমুখ বাঙলার অনেক সুবাদারই ব্যক্তিগতভাবে লবণ-সুপারী প্রভৃতি নানা দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসা করেও বাঙলাদেশের সম্পদ চিরকালের জন্যে অপহরণ করেন। শাসকেরা তো এভাবে লুণ্ঠন করেইছেন—তার উপর মঘ-হার্মাদদের ধন-জন লুণ্ঠন নদীতীরাঞ্চলে ও উপকূলাঞ্চলে আওরঙজীবের আমল পর্যন্ত এক রকম অব্যাহত ছিল। আবার মুঘল আমলে য়ুরোপীয় বেনের বিশেষ করে ইংরেজ-ফরাসীরা ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। বলতে গেলে সতেরো শতকের শেষ এবং আঠারো শতকের গোড়ার দিকে গোটা ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য তাদের নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়। এই সব কারণে পনেরশো আটত্রিশে যে আর্থিক দুর্ভাগ্যের শুরু হয় সতেরশো সত্তর সনের মন্বন্তরে তা পূর্ণতা লাভ করে। আঠারো শতকের গোড়া থেকেই বাঙালীর জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সেই অবক্ষয়ের চিহ্ন সত্যপীর পাঁচালীতে ও ভারতচন্দ্রের রচনায় সুপ্রকট।

দিল্লী-কেন্দ্রিক তুর্কী শাসনের আমলে বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী শাসনে স্থানীয় শাসিত সমাজে নিশ্চয়ই বিচলন এসেছিল। পরবর্তীকালে রচিত শূন্য পুরাণের নিরঞ্জনের রুষ্মায় দেখতে পাই, নির্জিত বৌদ্ধেরা বিজয়ী তুর্কীদের মুক্তি-দূত রূপে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

সেন আমলে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিহার চৈত্য প্রভৃতি নিশ্চিহ্নে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। বাঙলাদেশে যে কোনকালে বৌদ্ধ শাস্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল তা অনুমান করবার মতো কোন নিদর্শনাদি ছিল না। কিন্তু গায়ের উপর জোর খাটে, মনের উপর খাটে না। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার জনগণের উপর ব্রাহ্মণ্য আচার ও রীতি-নীতি জোর করে চাপিয়েছিল। কিন্তু অন্তরে তারা পূর্বপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কারই লালন করত। তুর্কী বিজয়ের ফলে বিদেশী রাজশক্তির প্রশ্রয়ে সমাজপতির শাস্তির ভয়মুক্ত হয়ে তারা তাদের লালিত পূর্ব বিশ্বাস-সংস্কার নতুন করে সগৌরবে ও অত্যুৎসাহে প্রকাশ করতে লাগল। তার

ফলে প্রাচীন বৌদ্ধ দেব-দেবী স্বনামে ও বেনামে যথা তারা, বাসুলী, যক্ষ, বিষ্ণু, আদিনাথ, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি ঘট, পাথর ও মূর্তির মাধ্যমে পূজা পেতে থাকেন। আনুষঙ্গিকভাবে এঁদের মাহাত্ম্য-কথা আসরে অনুষ্ঠানে গান-গাথা-পাঁচালী-কথকতার মাধ্যমে চালু হতে থাকে। উচ্চবিত্তের সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জনগণের এই লোকায়ত ধর্মের কাছে হার মানল। লোকধর্মই বাঙালী হিন্দুর শাস্ত্রীয় ধর্মের ঠাঁই গ্রহণ করল। এবং স্বাধীন সুলতানী আমলের শেষের দিকে ঐ-সব দেব-কথা বিপুল কলেবরে পাঁচালী-কাব্যে পরিণতি পায়। এ-ভাবে ষোল-সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেশী লৌকিক দেবতা বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। আবার এ-সময়েই বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মীর প্রভাবে দেশী মানুষের চেতনায় যে ভাব-বিপ্লব দেখা দিল, তারই প্রমূর্ত রূপ মেলে চৈতন্যদেবের জীবনে ও বাণীতে। জৈন-বৌদ্ধ সাম্য-করুণা-মৈত্রীর ঐতিহ্য সমৃদ্ধ দেশে ইসলামী সাম্য ও প্রেমবাদের বীজ উপ্ত হয়েছে অনুকূল পরিবেশে। চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমবাদ হচ্ছে দেশী-বিদেশীর ভাব সমন্বয়ের প্রসূন। দেশী নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের দীক্ষিত মুসলমানেরাও পূর্বপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কারের সমন্বয়ে লৌকিক ইসলাম গড়ে তুলল। বিভাষায় রচিত বিদেশী ইসলামী শাস্ত্রে তাদের অনধিকার এবং পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ও লালিত অনপনেয় বিশ্বাস-সংস্কার এই লৌকিক ইসলাম সৃজনে স্বাভাবিক প্রবর্তনা দিয়েছে। এই ইসলাম ছিল মূলত পীর বা গুরুবাদী ইসলাম। তাই বাস্তব এবং কাল্পনিক পীর-তত্ত্বে, অলৌকিক কেরামতিতে, বৌদ্ধ-স্তূপের আদলে পরিকল্পিত দরগাহ পূজায় জল-দেবতা খাজা খিজিরের প্রতি অবিচল আস্থায় ও মানৎ সিন্নি-তাবিজ-কবচ ঝাড়-ফুঁকে এই ইসলাম ছিল সীমিত। আবার বাঙলাদেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী আফগান-মুঘলের করতলগত হল তখন আর্থিক জীবনের অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবীরূপেই শাস্ত্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রভাবিত করল। জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে আর্থিক বিপর্যয় বা অবক্ষয় প্রশাসনিক ঔদাসীন্য বা পীড়নেরই ফল। দেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী শোষকের হাতে পড়ে, তখন আর্থিক জীবনে যে অবক্ষয় দেখা দেয়, আত্মপ্রত্যয়-হীন নির্বোধ অসহায় মানুষ বাঁচবার তাগিদেই সে অবস্থায় অলৌকিক শক্তিরই আশ্রয় কামনা করে। বাঙলাদেশে এই আর্থিক বিপর্যয় কালে—ষোল শতকের শেষ পাদ থেকে পীর-নারায়ণ সত্য ও তাঁর চেলা পীর-উপদেবতাগণ নির্জিত বাঙালীর জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার অবলম্বন দেবতা হিসেবে উদ্ভাবিত হলেন। এ ক্ষেত্রে নির্জিত মানুষ হিসেবে জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সব বাঙালীর একই আদর্শে, উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যে মিলন ঘটেছিল। গীতা-স্মৃতি ও মন্দিরে আস্থা হারিয়ে হিন্দুরা এবং

মসজিদে আস্থা হারিয়ে মুসলমানেরা পীর-দেবতার অনুগ্রহে বাঁচবার প্রয়াসী হল। বাঙালীর সেই দুর্দিন-দুর্যোগ-দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে সত্যনারায়ণের পুঁথি, পীর-মাহাত্ম্য কথা ও উপদেবতা পাঁচালী। বাঙালীর শাস্ত্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকৃতি এই সব গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকে মুঘল আমল অবধি শাসকরূপে যাঁদের নাম ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে ছকে তাঁদের 'পীঠিকা' দেয়া হল :

[বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে সন তারিখের পার্থক্য লক্ষণীয়।]

মৌর্য বংশ

চন্দ্রগুপ্ত
বিন্দুসার
অশোক
বিম্বিসার
অজাতশত্রু

গুপ্তবংশ : আনু: ৩২০-৬০০ খ্রী:

শ্রীগুপ্ত
চন্দ্রগুপ্ত
সমুদ্রগুপ্ত
চন্দ্রগুপ্ত (২য়)
কুমারগুপ্ত

দামোদর গুপ্ত
কুমার গুপ্ত (২য়)
মহাসেন গুপ্ত

বাঙলার স্বাধীন সামন্ত (৬ষ্ঠ শতক)

১. গোপচন্দ্র : আনু: ৫০০-৩৩ খ্রী:
২. ধর্মাদিত্য : আনু: ৫৩৩-৩৬ খ্রী:

} কোটালীপাড়ায় প্রাপ্ত ৫ খানি, মল্লসারুলে প্রাপ্ত ১ খানি ও বিদ্যার জয়রামপুরে প্রাপ্ত ১ খানি তাম্র-শাসন সূত্রে লব্ধ তথ্যানুসারে।

৩. সমাচার দেব (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের রাজা আনু: ৫৩৬-৫০ খ্রী:)
৪. বন্য গুপ্ত (সমতট, রাজধানী—শ্রীপুর—৫০৭ খ্রী:)
৫. সুধন্যাদিত্য

৬. পৃথুবীর

বাঙালী রাজা : শশাঙ্ক (নরেন্দ্রগুপ্ত) আনু: ৬০৫-৩৫ খ্রী:)

[গৌড়-মগধ-দণ্ডভুক্তি-উৎকল অধিপতি]

গৌড়

ভাস্কর বর্ধন (৬ষ্ঠ শতক)

জয়নাগ (৫৫০-৬৫০)

যশোবর্ধন (৭২৫-৩৫)

সামন্ত (কুমিল্লার) সামন্ত রাজবংশ (৭ম শতক)

শ্রী জীব ধারণ রাজ

|

শ্রীধারণ রাজ

ত্রিপুরার সামন্ত লোকনাথ (৬৩৬-০৪ খ্রী: —তাম্রশাসন)

সমতট : আনু: ৭ম শতাব্দীর শেষার্ধ—আনু: ৬৫০-৭০০ খ্রী:

খড়্গোদ্যম

|

জাত খড়্গ

|

দেবখড়্গ

|

রাজরাজ ভট্ট (৭ম শতকের শেষের দিকের চীনা পরিব্রাজক সেঙ-চি কর্তৃক উল্লেখিত)

সমতটের দেববংশীয় রাজা : আনু: ৭৫০—৮০০ খ্রী:

১. শান্তি দেব

|

২. বীর দেব

|

৩. আনন্দ দেব

|

৪. ভব দেব

|

৫. কান্তি দেব

পালবংশ	সিংহাসনারোহণ	আনুমানিক রাজত্বকাল
১. গোপাল	৭৫৫ খ্রীস্টাব্দ	৭৮১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত
২. ধর্মপাল (বিরুদ বিক্রমশীল)	৭৮১ ,,	৮২১ ,, ,,
৩. দেবপাল	৮২১ ,,	৮৬১ ,, ,,

পালবংশ	সিংহাসনারোহণ	আনুমানিক রাজত্বকাল
৪. বিগ্রহ পাল ওর্ফে শূরপাল [ধর্মপালের ভ্রাতা বাক পালের পৌত্র, জয়পালের পুত্র]	৮৬১ খ্রীস্টাব্দ	৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত
৫. নারায়ণ পাল	৮৭৬ ,,	৯২০ ,,
৬. রাজ্যপাল [মগধ, বরেন্দ্র ত্রিপুরাধিপতি]	৯২০ ,,	৯৫২ ,,
৭. গোপাল (দ্বিতীয়) [মগধ, বরেন্দ্র ত্রিপুরাধিপতি]	৯৫২ ,,	৯৬৯ ,,
৮. বিগ্রহ পাল (২য়) [হৃতরাজ্য]	৯৬৯ ,,	৯৯৫ ,, ,,
৯. মহীপাল [পাল রাজত্বের নব প্রতিষ্ঠাতা]	৯৯৫ ,,	১০৪৩ ,, ,,
১০. নয় পাল	১০৪৩ ,,	১০৫৮ ,, ,,
১১. বিগ্রহ পাল (৩য়)	১০৫৮ ,,	১০৭৫ ,, ,,
১২. মহীপাল (২য়)	১০৭৫ ,,	১০৮০ ,, ,,
১৩. শূরপাল (২য়)	১০৮০ ,,	১০৮২ ,, ,,
১৪. রামপাল	১০৮২ ,,	১১২৪ ,, ,,
১৫. কুমার পাল	১১২৪ ,,	১১২৯ ,, ,,
১৬. গোপাল (৩য়)	১১২৯ ,,	১১৪৩ ,, ,,
১৭. মদনপাল	১১৪৩ ,,	১১৬১ ,, ,,
১৮. গোবিন্দপাল	১১৬২ ,,	?

বরেন্দ্র কৈবর্ত : আনু: ১১০০-২০ খ্রী: রাঢ়ে : ১১ শতকের শেষ ভাগ)
ঈশ্বর ঘোষ, রাজধানী—ঢেক্কারী

ক. দিব্য

খ. রুদ্রক

গ. ভীম

হরিকেল রাজা : আনু: ৮০১—৯০০ = পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম

১. ভদ্র দত্ত

২. ধন দত্ত

|

৩. কান্তি দেব (৯ম শতকের ১ম পাদ, সম্ভবত ভবদেবের দৌহিত্র)

সমতটের চন্দ্র বংশ :

আরাকানী সূত্রে দেখা যায় বৈশালী নগরে চন্দ্র রাজারা ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হন এবং উত্তর আরাকান তখনো সম্ভবত মহাবীর ও তাঁর পরবর্তী রাজাদের দখলে থাকে। সমতট অঞ্চলে হয় ঐ বিতাড়িত চন্দ্ররা কিংবা তাঁদের জ্ঞাতি সামন্তশাসক বংশীয়রা রাজত্ব করেন। বাঙলায় প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদির সাহায্যে তাঁদের রাজ-পরম্পরার 'পীঠিকা' দেয়া হল :

চন্দ্র বংশ : ৮০০—১০৭০ খ্রীস্টাব্দ

রাজা :	রাজত্বকাল	
১. পূর্ণ চন্দ্র	৮০০— ৮৪০	খ্রীস্টাব্দ সামন্ত (?) রাজ
২. সুবর্ণ চন্দ্র	৮৪০— ৯০০	,,
৩. ত্রৈলোক্য চন্দ্র	৯০০— ৩০	,,
৪. শ্রীচন্দ্র	৯৩০— ৯৭৫	,,
৫. কল্যাণ চন্দ্র	৯৭৫ - ১০০০	,,
৬. লড়হ চন্দ্র	১০০০—১০২০	,,
৭. গোবিন্দ চন্দ্র	১০২০—১০৪৫	,,
৮. ললিত চন্দ্র	১০৪৫—১০৭০	,,

ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্মণ রাজত্ব : ১০৮০—১১৫০ খ্রীস্টাব্দ (?)

১. বজ্র বর্মণ

|

২. জাত বর্মণ

|

৩. হরি বর্মণ

|

৪. শ্যামল বর্মণ (১০৭৯ খ্রী: ?)

|

৫. ভোজ বর্মণ

সেনবংশ : ১০৭০—১২০২ খ্রীস্টাব্দ

১. সামন্ত সেন
২. হেমন্ত সেন (১০৭০—৯৭)
৩. বিজয় সেন (১০৯৭—১১৬০)
৪. বল্লাল সেন (১১৬০—৭৮)
৫. লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮—১২০২/৬)

পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের শাসক

৬. বিশ্বরূপ সেন (১২০৬—১২২০) লক্ষ্মণ সেনের পুত্র
৭. কেশব সেন (১২২০—২৩)
৮. অন্যান্য রাজারা (১২২৩—৪৬)

পূর্ববঙ্গের দেববংশ : আনু: ১১৬০—১২৯০ খ্রী:

১. পুরুষোত্তম দেব
|
২. মধুমথন (সূদন) দেব (১১৬০—৮০)
|
৩. বাসুদেব (১১৮০—১২০৪)
|
৪. রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেব (১২০৪—৩০)
|
৫. দামোদর দেব (১২৩০—৫৪)
|
৬. অরিরাজ দনুজমাধব দশরথ দেব (১২৫৪—৯০ রাজধানী—বিক্রমপুর)

শ্রীহট্টে দেব বংশীয় রাজাগণ (১২৯০—১৩২০)

১. খরবাণ দেব
|
২. গোকুল দেব
|
৩. নারায়ণ দেব
|
৪. কেশব দেব
|
৫. ঈশান দেব

মধ্যযুগঃ তুর্কী বিজয়

তুর্কী বিজয়ের ফলে দেশে যুগান্তর ঘটে, যেমন ঘটেছিল ব্রিটিশ বিজয়ের সঙ্গে। এর নাম মধ্যযুগ।

ক. খালজী শাসন—১২০২—১২২৭ খ্রীস্টাব্দ

১.	ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী	১২০২-০৬ খ্রীস্টাব্দ
২.	মালিক ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খালজী	১২০৭-০৮ ,,
৩.	মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ (দুইবার)	১২০৮-১০।১২১৩-২৭
৪.	মালিক আলি মর্দান	১২১০-১৩

খ. মামলুক শাসন—১২২৭—৮২

১.	শাহজাদা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ	১২২৭-২৯ ,,
২.	মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বলখ খালজী	১২২৯-৩০ ,,
৩.	মালিক আলাউদ্দীন জানি	১২৩১-৩২ ,,
৪.	মালিক সাইফুদ্দীন আইবক	১২৩২-৩৫ ,,
৫.	মালিক ইজ্জুদ্দীন তুঘরল তুঘান খান	১২৩৬-৪৫ ,,
৬.	মালিক তৈমুর খান-ই-কিরান	১২৪৫-৪৭ ,,
৭.	মালিক জালাল উদ্দীন মাসুদ জানি	১২৪৭-৫১ ,,
৮.	মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুঘিসুদ্দীন উজবেকী	১২৫২-৫৭ ,,
৯.	মালিক ইজ্জুদ্দীন বলবন উজবেকী	১২৫৭-৫৯ ,,
১০.	মালিক তাজুদ্দীন আরসালান খান	১২৫৯-৬৫ ,,
১১.	তাতার খান (আরসালানের পুত্র)	১২৬৫-৬৮ ,,
১২.	শের খান	১২৬৮-৭২ ,,
১৩.	আমীর খান	১২৭২-৭৩ ,,
১৪.	মুঘিসউদ্দীন তুঘরল তুঘান খান	১২৭২-৮১ ,,

গ. বলবন বংশীয়ের শাসনে—১২৮২—১৩০১

১.	নাসিরউদ্দীন বঘরা খান	১২৮২-১২৯১ ,,
২.	রুকন উদ্দীন কায়কাউস	১২৯১-১৩০১ ,,

ঘ. অজ্ঞাত মামলুক শাসনে—১৩০১—১৩২৮ খ্রীস্টাব্দ

১. শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্ — ১৩০১-১৩২২ খ্রীস্টাব্দ

২. লাখনৌতি-সপ্তগ্রাম-সোনার গাঁও এই তিন ইক্তায় :

ক. গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ্

খ. নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ্

গ. বাহরাম খান ওর্ফে তাতার খান — ১৩২২-২৮ ,,

৩. ক. কদর খান—লাখনৌতি — ১৩২৮ ,,

খ. মালিক ইজুদ্দীন এহিয়া—সাতগাঁও — ১৩২৮ ,,

গ. বাহরাম খান—সোনার গাঁও — ১৩২৮ ,,

৪. স্বাধীন সুলতানী আমল

ক. ফকরউদ্দীন মুবারক শাহ—সোনার গাঁও — ১৩৩৮-৫০ ,,

খ. আলাউদ্দীন আলী শাহ—লাখনৌতি — ১৩২৮-৪২ ,,

গ. শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ—লাখনৌতি—সাতগাঁও — ১৩৪২-৫৭ ,,

—সোনার গাঁও — ১৩৫৩-৫৭ ,,

ঘ. ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ—সোনার গাঁও — ১৩৫০-৫৩ ,,
(ফকরউদ্দীনের পুত্র)

ঙ. ইলিয়াস শাহী বংশ—১৩৪২—১৪১২

১. লাখনৌতি-সাতগাঁওর ইজারাদার শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাঙলার ও বিহারের কতেকাংশের স্বাধীন সুলতান হন। ১৩৪২-৫৩/ ১৩৫৩-৫৭ খ্রীস্টাব্দ

২. সিকন্দার শাহ — ১৩৫৭-৮৯ ,,

৩. গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ — ১৩৮৯-১৪০৯ ,,

৪. সইফুদ্দীন হামজা শাহ — ১৪০৯-১০ ,,

৫. শামসুদ্দীন — ১৪১০-১২ ,,

চ. বায়াজিদ শাহীবংশ—১৪১২—১৪

১. শিহাবুদ্দীন. বায়াজিদ শাহ — ১৪১২-১৪ ,,

২. আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ — ১৪১৪ ,,

ছ. গণেশ বংশীয় সুলতানগণ—১৪১৫—১৪৩৩

১. রাজা গণেশ ওর্ফে দনুজমর্দনদেব — ১৪১৫, ১৪১৭-১৮ ,,

২. জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ বা যদু ১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩১ খ্রীস্টাব্দ
৩. মহেন্দ্র দেব (গণেশ পুত্র) ১৪১৮ ,,
৪. শামসুদ্দীন আহমদ শাহ ১৪৩২-৩৩ ,,

জ. মাহমুদশাহী বা পরবর্তী ইলিয়াস শাহীবংশ —১৪৩৩–৮৬ খ্রীস্টাব্দ

১. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১ম) ১৪৩৩-৫৮ খ্রীস্টাব্দ
২. রুকনউদ্দীন বারবক শাহ ১৪৫৯-৭৬ ,,
৩. শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ ১৪৭৬-৮০ ,,
৪. সিকান্দর শাহ ১৪৮০-৮১ ,,
৫. জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ (মাহমুদ শাহর অন্যপুত্র)-১৪৮১-৮৭

ঝ. সুলতান শাহজাদা ও হাবসী আমল — ১৪৮৭–৯৩

১. বারবক বা সুলতান শাহজাদা ১৪৮৭ খ্রীস্টাব্দ
২. সইফউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৪৮৮-৯০ ,,
৩. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (২য়) ১৪৯০-৯১ ,,
৪. শামসুদ্দীন মুজাফ্‌ফর ওর্ফে সিদি বদর ওর্ফে দিওয়ানা ১৪৯১—৯৩ খ্রীস্টাব্দ

ঞ. হোসেনশাহী বংশ — ১৪৯৩—১৫৩৮

১. সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ
২. নাসির উদ্দীন নুসরৎ শাহ ১৫১৯-৩২ ,,
৩. আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৫৩২-৩৩ ,,
৪ গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ ওর্ফে আবদুল বদর ১৫৩৩-৩৮ ,,

ট. সুর বংশ — ১৫৩৯—৫৯

১. শের শাহ
২. ইসলাম শাহ

ঠ. কররানী বংশ — ১৫৫৯—৭৫

১. সোলায়মান কররানী
২. দাউদ খান কররানী

ড. মুঘল আমল — ১৫৭৫—১৭৫৭

১. আকবর (১৫৭৫-১৬০৫)
সুবাদার

ক. মুনিম খান	১৫৭৪-৭৫	খ্রীস্টাব্দ
খ. হোসেন কুলি বেগ	১৫৭৫-৭৯	,,
গ. মুজাফফর খান তুরবতী	১৫৭৯-৮২	,,
ঘ. খানে আজম মির্জা আজিজ	১৫৮২-৮৩	,,
ঙ. শাহবাজ খান	১৫৮৩-৮৪	,,
চ. সাদিক খান	১৫৮৪-৮৬	,,
ছ. ওয়াজির খান	১৫৮৬-৮৭	,,
জ. সাঈদ খান	১৫৮৭-৯৪	,,
ঝ. রাজা মান সিংহ	১৫৯৪-১৬০৬	,,

২. জাহাঁগীর ১৬০৫—২৭

ক. কুতুবউদ্দীন খান কোকা	১৬০৬-০৭	খ্রীস্টাব্দ
খ. জাহাঁগীর কুলি খান	১৬০৭-০৮	,,
গ. ইসলাম খান	১৬০৮-১৩	,,
ঘ. কাসিম খান চিস্তি (স্বল্পকালের জন্যে শেখ হুসাম)	১৬১৩-১৭	,,
ঙ. ইব্রাহিম খান	১৬১৭-২৪	,,
চ. দারাব খান (শাহজাহান অধিকৃত ঢাকায়)	১৬২৪-২৫	,,
ছ. মহব্বত খান	১৬২৫-২৬	,,
জ. মুকরর্‌ম খান(স্বল্পকালের জন্য আজাদ খান)	১৬২৬-২৭	,,

৩. শাহজাহান ১৬২৮—৫৮

ক. ফিদাই খান	১৬২৭-২৮	খ্রীস্টাব্দ
খ. কাসিম খান জুঈনী	১৬২৮-৩২	,,
গ. খানে আজম মীর মুহম্মদ বকর	১৬৩৩ ৩৫	,,
ঘ. ইসলাম খান মাশহাদী	১৬৩৫-৩৯	,,
ঙ. (মুহম্মদ) শাহ শুজা (স্বল্পকালের জন্য সইফ খান)	১৬৩৯-৬০	,,

৪. আওরঙ্গজীব ১৬৫৮—১৭০৭

ক. মুয়াজ্জম খান ওর্ফে মীর জুমলা	১৬৬০-৬৩	খ্রীস্টাব্দ
খ. শায়েস্তা খান	১৬৬৪-৭৮	,,
গ. মুহম্মদ আজম (স্বল্পকালের জন্য ফিদাই খান)	১৬৭৮-৮৮	,,

ঘ. খান-ই জাহান	১৬৮৮-৮৯	খ্রীস্টাব্দ
ঙ. ইব্রাহিম খান	১৬৮৯-৯৭	
চ. আজিমউদ্দীন ওর্ফে আজিমুশশান	১৬৯৭-১৭০৭	,,

৫. **বাহাদুর শাহ (১ম) ১৭০৭—১২**

ক. আজিমুশশান	১৭০৭-১২	,,

৬. **জাহান্দর শাহ ১৭১২—১৩**

ক. খান-ই জাহান	১৭১২-১৩	,,
৭. **ফখরুখ শিয়ার**	১৭১৩-১৯	,,
৮. **রাফিদ্ দরাজ**	১৭১৯	,,
৯. **রফিউদদৌলা** ওর্ফে **শাহজাহান (২য়)**	১৭১৯	,,
ক. মীর জুমলা	১৭১৪-১৬	,,
খ. মুরশিদ কুলি খান	১৭১৭-১৯	,,

১০. **মুহম্মদ শাহ** ১৭১৯—৪৮

দিল্লীর সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে এ সময় থেকে বাঙলার সুবাদারী পুরুষানুক্রমিক নওয়াবীতে পরিণত হয়। মসনদ দখল করে নওয়াবেরা সম্রাট থেকে নিয়োগ পত্র বা সনদ আদায় করতেন।

ক. মুরশিদ কুলি খান	১৭১৯-২৭	খ্রীস্টাব্দ
খ. শুজাউদ্দীন মুহমমদ খান	১৭২৭-৩৯	,,
গ. সর্ফরাজ খান	১৭৩৯-৪০	,,
ঘ. আলিবর্দী খান	১৭৪০-৪৮	,,

১১. **আহমদ শাহ ১৭৪৮—৫৪**

ক. আলিবর্দী খান	১৭৪৮-৫৪	,,

১২. **শাহ আলম (২য়) ১৭৫৪—১৮০৬**

ক. আলিবর্দী খান	১৭৪৮-৫৬	,,
খ. সিরাজুদ্দৌলা	১৭৫৬-৫৭	,,
গ. মীর জাফর আলি খান	১৭৫৭-৬০	,,
ঘ. মীর কাসিম আলি খান	১৭৬০-৬৩	,,
ঙ. মীর জাফর আলি খান (পুন:)	১৭৬৩-৬৫	
চ. নাজিমুদ্দৌলা	১৭৬৫-৬৬	
ছ. সইফুদ্দৌলা	১৭৬৬-৭০	

৮

মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ

বাঁচার তাগিদই মানুষের সব কর্ম-প্রয়াসের ও আচরণের ভিত্তি এবং উৎস। এর থেকেই জন্মে প্রতিবেশ-পরিবেষ্টনীর সাথে ও জীব-উদ্ভিদের সঙ্গে সখ্য ও শত্রুতা। আগাছার জঙ্গল কাটতে হয়, আবার সযত্নে রাখতে হয় খাদ্য-ফলের গাছ। জীবনের নিরাপত্তার ও জীবিকার সহায় কুকুর পায় লালন আর প্রাণ-বিনাশী সাপ-সিংহ পায় তাড়ন। মানুষের স্বশ্রেণীর মধ্যেও সখ্য ও শত্রুতা ঐ একই কারণে গড়ে উঠে। সমস্বার্থে গড়ে উঠে ঐকমত্য ও সহযোগিতা এবং সহাবস্থানের সদিচ্ছা, আর অসমস্বার্থে জেগে উঠে বিদ্বেষ-বিষ, বাধে দ্বন্দ্ব ও ঘটে সংঘাত। একদিন ঐ সমস্বার্থেই প্রয়োজন হয়েছিল যৌথ-প্রয়াসের, গড়ে উঠেছিল গোত্রীয় সংহতি। আরো পরে জীবিকা-সামগ্রীর অপ্রতুলতা মানুষকে প্রবর্তনা দিয়েছিল বিভিন্ন গোত্রের সহাবস্থানে ও সহযোগিতায়। এ স্তরে মিলনের সেতু হয়েছিল স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের অঙ্গীকার এবং ভিত্তি হয়েছিল স্বীকৃত নীতি। এই অঙ্গীকারের ও নীতির রকম-ফের ক্রমে গড়ে তোলে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী মত ও পথ। গোড়ার দিকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সার্বিক সংহতি লক্ষ্যে যার উদ্ভাবন, তা-ই এভাবে খণ্ড ও ক্ষুদ্র সংহতির আধার রূপে দলীয় ও উপদলীয় নিত্য কোন্দলের কারণ হয়ে দেখা দিল।

বলেছি সম ও সহ স্বার্থেই গড়ে উঠে দল। 'প্রবলের উদ্বর্তন' নীতি ভিত্তিক সমাজে সম ও সহ স্বার্থবোধ স্থায়ী হতে পারে না। আত্মশক্তি সচেতন ও আত্ম-প্রত্যয়শীল মানুষ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। কাজেই তৈরী হয় নতুন নতুন দল। মনের, মতের ও স্বার্থের ঐক্যই দল গঠনের ভিত্তি। আবার স্বার্থবোধই মনের ও মতের ঐক্য-অনৈক্যের স্রষ্টা। অতএব, স্বার্থের প্রেরণাবশে মানুষে মানুষে সখ্য ও সংহতি কিংবা বৈর ও স্বাতন্ত্র্য জিইয়ে রাখার অঙ্গীকারেই দলীয় সংহতির স্থিতি। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বী বা ভিন্ন দলগুলোকে পর, সন্দেহভাজন ও শত্রু না ভাবলে স্বদলের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সুতরাং অন্যদলের প্রতি অবজ্ঞা, ঈর্ষা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পোষণ করেই স্বদলের প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠা অটল রাখতে হয়। সব দলই এক রকম। শাস্ত্রীয় দল তথা ধর্মসম্প্রদায় ঐহিক-পারত্রিক জীবন-সংপৃক্ত বলে ওতে আনুগত্য ও নিষ্ঠা বেশী ও চিরন্তন,

আর পার্থিব স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দল ত্যাগে কিংবা ভঙ্গে পাপ-ভীতি নেই বলে তা' ঘন ঘন প্রয়োজন মতো ভাঙা-গড়া ও ছাড়া চলে। তাই ধর্মীয় দলের পারস্পরিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব চিরন্তন ও মারাত্মক। 'দল' মাত্রেরই পূর্বশর্ত ও জন্মশর্ত অন্য দলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-কোন্দল। ফলে ধার্মিক মানুষের সেক্যুলার হওয়ার আগ্রহ সোনার পাথরবাটি বানানোর মতোই অবাস্তব ও অসম্ভব। কেন না, স্বধর্মে নিষ্ঠা ও আনুগত্যের মৌলশর্ত ও বাহ্য লক্ষণই হচ্ছে অনুভবে ও আচরণে পরধর্মে অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন। তাই একজন ধার্মিক বা আস্তিক বড়জোর পরমত সহিষ্ণু হতে পারে কিন্তু পরশাস্ত্রে কখনো শ্রদ্ধা রাখতে পারে না। পুরুষানুক্রমিক শাস্ত্র-শাসন ও ধর্মবোধ আশৈশবের সংস্কাররূপে মনুষ্যমনে অবিমোচ্য হয়ে স্থায়ী হয়। সাধারণ মানুষ পোষমানা প্রাণীর মতো শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের নিগড়ে যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত ও স্বস্থ থাকে। এই শাস্ত্র মেনেই ইহ-পরকালে প্রসারিত জীবনে সে থাকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত। এই শাস্ত্র তার ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এর বাইরে কিছু ভাবা বা করা সে পাপ বলেই জানে এবং মানে। তাই বিনা প্রশ্নে সে শাস্ত্র মানে। এমন মানুষ বিধর্মী বিদ্বেষী না হয়েই পারে না। তাই বিধর্মে অনাস্থা ও বিধর্মী-বিদ্বেষই স্বধর্ম নিষ্ঠার ও আদর্শ শাস্ত্রীয় জীবনের লক্ষণ। হিন্দুতে মিসকিন খাইয়ে, মোল্লা কে দক্ষিণা দিয়ে পুণ্যার্জনের যেমন আশা করতে পারে না, তেমনি পারে না মুসলমানও কাঙালভোজন করিয়ে ফিৎরা বা যাকাত কাফেরকে দিয়ে। এ জন্যেই ধার্মিকেরা সাধারণত গোঁড়া, অনুদার এবং বিবেচনাবোধ ও বিবেক-বুদ্ধিহীন। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, দেশ-জাত-বর্ণ ও শ্রেণীর ক্ষেত্রেও দলীয় দ্বন্দ্ব-কোন্দল কম হয় নি বা কম হয় না। এ কালে আমরা ভৌগোলিক ভারতবর্ষে বিধর্মী-বিদ্বেষ তো বটেই, সে সঙ্গে জাত-বর্ণ-শ্রেণী বিদ্বেষও প্রবল দেখছি, আফ্রিকায় দেখছি আদিম গোত্র দ্বেষণা ও বর্ণভেদ, আমেরিকায় রয়েছে বর্ণভেদ, অন্যান্য দেশেও ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র দ্বেষণা আঁজো অবিলুপ্ত। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, "মুসলমান রাজত্বের পূর্বে 'হিন্দু' এই জাতীয় নামই ছিল না। ছিল ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি প্রাচীন বর্ণমূলক জাতি, কিংবা স্বর্ণকার, কর্মকার, তন্তুবায় ইত্যাদি ব্যবসায়মূলক জাতি। কিন্তু 'হিন্দু' জাতি ছিল না।—হিন্দু ধর্মও ছিল না। ছিল শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সৌর-গাণপত্য সম্প্রদায়।" ('বাংলা সাহিত্যের কথা' মধ্যযুগ—পৃঃ ১৯)। এ স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ও দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম ও শ্রেণী-দ্বেষণার মূলে জীবিকা-সংপৃক্ত অসূয়া, বিরোধ ও প্রতিযোগিতাই কাজ করে। এ যুগের ব্যাখ্যায় এ-দ্বন্দ্ব-দ্বেষণার কারণ মূলত আর্থিক। কেননা, আমরা দেখতে পাই যেখানে ভিন্ন গোত্রের, বর্ণের, জাতের, শ্রেণীর বা ধর্মের লোক

নগণ্য সংখ্যক, সেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষ নিষ্ক্রিয় বিদ্বেষী অর্থাৎ কেবল অবজ্ঞাপরায়ণ ও উদাসীন। যেখানে বিভিন্ন গোত্রের ধর্মের ও বর্ণের মানুষের সংখ্যা তেমন নগণ্য নয় বরং সম্পদ সম্ভোগে ও অর্থোপার্জনে একে অপরের প্রতি-যোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, সেখানেই জাত-বর্ণ ধর্ম-গোত্র ও শ্রেণী-বিদ্বেষ সক্রিয় এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। এ বিদ্বেষ বারোমাস সক্রিয় থাকলে সহাবস্থান সম্ভব হত না। কিন্তু নিষ্ক্রিয়াবস্থায়ও ভিন্ন দলের, ধর্মের, গোত্রের, বর্ণের, জাতের ও দেশের মানুষের প্রতি অবচেতন মনে একটা অনাত্মীয়ভাব জেগে থাকে, একটা ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া থাকে—কিছুতেই সে-বাধা অতিক্রম করা যায় না, সে-ব্যবধান ঘুচানো সম্ভব হয় না। কাজেই আস্তিক মানুষের বিধর্মী-বিদ্বেষ, সাধারণ মানুষের দেশ-জাত-বর্ণ-গোত্র দ্বেষণা এতোই স্বাভাবিক ব্যাপার যে এ নিয়ে কোন দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র বা শাসককে দায়ী করে নিন্দা করা অবিবেচকের আচরণ মাত্র। বিদ্বানদের এ অবিবেচনাও মানুষের অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হয়েছে।

তবু ব্যক্তিসম্পর্কে মানুষ কখনো দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্রে ভেদ-বাধা মানে নি। চিরকাল ব্যক্তিগত জীবনে দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম অস্বীকার করে মানুষ মানুষকে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-সখ্য ও শ্রদ্ধা-স্বার্থের বাঁধনে বেঁধেছে, আত্মীয় বলে মেনেছে, জীবনের সহায়-সহচর বলে জেনেছে। আমরা রাজনীতি ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ককেই বড়ো করে দেখি ও দেখাই। গরজে পড়ে গোঁজামিল দিতে চাই, তাই ফাঁকির ফাঁক থেকেই যায়। এর ফলে ইতিহাস হয় বিকৃত, রাজনীতিও হয় না অভীষ্ট ফলপ্রসূ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় আমরা হিন্দু-বৌদ্ধে, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবে, বাঙালী-অবাঙালীতে এবং বিদেশী-বিজাতি বিভাষী-বিধর্মী তুর্কী-মুঘল শাসকের সঙ্গে শাসিত জনের দ্বন্দ্ব-কোন্দল ও সংঘর্ষ সংঘাতের (এমনকি আঞ্চলিক অবজ্ঞা-বিদ্বেষেরও) সংবাদ নানা সূত্রে পাই। তার মধ্যে সাহিত্যই প্রধান। এতে বিভিন্ন জাত-বর্ণ-ধর্মের লোকের মধ্যেকার ব্যক্তিগত প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-সখ্য, শ্রদ্ধা-স্বার্থের কথাও কিছু কিছু মেলে বটে, কিন্তু তা' কখনো শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি ও সরকারকে প্রভাবিত করে নি। ঐ দল, স্বার্থ ও মতগত অনাত্মীয় ভাবটাই সমাজ-সংস্কৃতি-সম্পদ ও সরকারের ক্ষেত্রে নিয়ামকের কাজ করেছে। যেখানে আর্থিক স্বার্থ নেই, সেখানে পর-দ্বেষণা নিন্দা-অবজ্ঞা-উপহাস-ঔদাসীন্য রূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন, •অচ্যুতদের প্রতি চর্যাকারের কিংবা মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ প্রভৃতির বাঙালীর (মাঝি-মাল্লার) প্রতি উপহাস। যথা—

আজ ভুসুকু বঙ্গালী ভইলি
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী। (চর্যাপদ)।
কান্দেরে বাঙালভাই বাফোই বাফোই—মুকুন্দরাম।
মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙাল—ক্ষেমানন্দ।
বাঙালীরে দেখে যেন ভেড়া—রামপ্রসাদ।

বৌদ্ধ ধর্মের আগে রাঢ়ে-বরেন্দ্রে জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়। যদিও জৈন-বৌদ্ধ মতে ও চর্যায় সাদৃশ্য অনেক, পার্থক্য সামান্য, তবু বৌদ্ধ-প্রসারে জৈন-মত বিলুপ্ত হয়। জৈন-বৌদ্ধে বিরোধ-সংঘর্ষ হয়েছিল নিশ্চয়ই, তার রূপ-স্বরূপও আজ আমাদের কাছে তেমন অস্পষ্ট নয়। দিব্যাবদান সূত্রে জানা যায়, অশোক পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের অবমাননায় রুষ্ট হয়ে আঠারো হাজার আজীবিক বা নির্গ্রন্থ জৈন হত্যা করিয়েছিলেন। বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুর বৌদ্ধ-বিদ্বেষ লোক-প্রসিদ্ধ। শশাঙ্কের একটি আদেশ ছিল এইরূপ—

"আ-সেতোর আতুষারাদ্রের বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান।
যো ন হন্তি স হন্তব্যোভৃত্যান্ ইত্যশিষন্ নৃপঃ।"

—সেতুবন্ধ থেকে হিমালয় অবধি যেখানে যত বৌদ্ধ রয়েছে, তাদের বৃদ্ধ ও বালক সহ যে ভৃত্য হত্যা করবে না, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে।—রাজভৃত্যদের প্রতি রাজার এই আদেশ।

'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজারা—

দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্
অসংখ্যাতান রাজমুখ্যান্ অনেকবিদ্যা
প্রসঙ্গে নির্জিত্য তেষাং শীর্ষানি পরশু-
ভিশ্ছিত্বা বহুষু উদুখলেষু নিক্ষিপ্য
কট ভ্রমণৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্টমত ধ্বংসমাচরণ নির্ভয়ো বর্ততে।"

—অসংখ্য দুষ্টমতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজমুখ্যদের অনেক বিদ্যা প্রসঙ্গে নির্জিত করে তাদের মাথা কুঠার দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে উদুখলে ফেলে মুষলাঘাতে চূর্ণ করে দুষ্ট মত ধ্বংস করে নির্ভয়ে থাকতেন।

সেনরাজাদের উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধ-বিদ্বেষের আভাস দেয়। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে ও সরহের দোহায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজের নিন্দা প্রকট। আর্যদেবের "চিত্তশোধন প্রকরণে"-ও ব্রাহ্মণ্যবাদীর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। সাধনমালা, বজ্রসূচি-তত্ত্বকোষ প্রভৃতিতেও এ বিদ্বেষ মেলে। এমন কি শূন্য পুরাণে বেদশাস্ত্রের ঠাই

শ্রীনিরঞ্জনের পদপ্রান্তে এবং ব্রাহ্মণ্য সব দেবতাই ধর্মনিরঞ্জনের আনুগত্য স্বীকার করে। লাউসেনের কাছে স্বয়ং দুর্গাও হার মেনেছেন। এখানে মনসামঙ্গলের হাসান হোসেন পালাও স্মর্তব্য। সাত শতকের প্রথমার্ধে শশাঙ্ক বৌদ্ধ-পীড়নের জন্যে নিন্দা পেয়েছেন হিউ-এনৎ-সাঙের ও হর্ষচরিত প্রণেতা বাণভট্টের। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামের বৌদ্ধগ্রন্থেও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৌদ্ধ-পীড়ন প্রবণতার কথা রয়েছে। বৌদ্ধ-পীড়নের শেষ উল্লেখ মেলে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা বা কলিমাজালাল' নামের পদবন্ধে। এতে নির্জিত নিপীড়িত সংখ্যালঘু বৌদ্ধেরা তুর্কীবিজয়কে সদ্ধর্মীর মুক্তির আশ্বাস ও ভগবানের আশীর্বাদ বলে জেনেছে। উচচবর্ণের ও উচচ বিত্তের কিছু বৌদ্ধ হয়তো দেশত্যাগ করে স্বধর্ম রক্ষা করেছিল। নিম্নবিত্তের ও বর্ণের নির্জিত বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্য হামলা থেকে স্বধর্ম রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসেবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে আত্ম-বিলয় ঘটিয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্বধর্ম ও আচার রক্ষা করেছে, এরা হচেছ নাথযোগী নামে পরিচিত তাঁতীরা, বৈষ্ণব-সহজিয়ারা, বাউলরা এবং শৈবনাথপন্থীরূপে মন্ত্র-বজ্র সহজযানী যোগী-তান্ত্রিকরা আর ধর্মঠাকুরের পূজারীরূপে রাঢ়ের ডোম-চাঁড়াল–বাগদীরা। মতে-আচারে তারা বিকৃত বৌদ্ধ হলেও আজ সামাজিক রাষ্ট্রিক পরিচয়ে তারা হিন্দু। এবং অনেক বাউল মুসলমানও। মধ্যযুগে রামচন্দ্র কবিভারতী বৌদ্ধমত প্রকাশ্যে গ্রহণ করায় তাঁকে দেশ-ছাড়া হতে হয়েছিল। বিদেশী-বিজাতি বিভাষী-বিধর্মী তুর্কী-মুঘল শাসনে এবং ইসলামের প্রসারে শাসিত হিন্দুর শাসক-বিদ্বেষ স্বাভাবিক কারণেই প্রবল হয়েছিল। তা ছাড়া যুদ্ধে মন্দিরাদি ভাঙার ফলে এবং পৌত্তলিকতার প্রতি মুসলিম তুর্কী-মুঘলের পরিব্যক্ত অবজ্ঞা-উপহাস হিন্দুমনে অপমানের জ্বালা ও বিদ্বেষ বিষ তীব্র করেছিল নিশ্চয়ই। তাই হিন্দু-অধ্যুষিত মিথিলার হিন্দুরাজ পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি ম্লেচ্ছ-স্পর্শদোষ থেকে বাহ্যত দূরে থেকেও মানসপীড়া বশে সক্ষোভে মুসলিমের হিন্দুপীড়নের একটা আদর্শায়িত কাল্পনিক আলেখ্য না এঁকে পারেন নি :

কতহু তুরুক বরকর
বাট জাইতেঁ বেকার ধর।
ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ
মথাঁ চড়াবএ গাইক চড়ুআ।
ফোট চাট জনউ তোড়।
উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়।
ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ
দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।

গোরি গোমঠ পূরলি মহী
পদরুহ দেবাক ধাম নহী।
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার
ছোটে তুরুকা ভড়কী মার। —(কীর্তিলতা)

কিন্তু এই বিদ্যাপতিই অন্যত্র বলেছেন :

হিন্দু তুরুকে মিলল বাস
একক ধম্মে অওকো উপহাস।
কতহুঁ মিলিমিশ কতহুঁ ছেদ। —(কীর্তিলতা)

এটিই যথার্থ ভাষণ। এসূত্রে পরবর্তীকালের ইংরেজদের নেটিব-অবজ্ঞা স্মর্তব্য। বিদ্যাপতির চিত্রে পীড়নপ্রবণতার চেয়ে তুর্কীদের মস্করা ও পরিহাস-প্রিয়তাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে।

বিপ্রদাস পিপিলাইও বলেন :—

(তুর্কীদের) কেহ বা জুলুম করে কেহ গুনা শিরে ধরে
রুজু করি করএ নছাব।

আর ধার্মিকরা ইসলামে দীক্ষাও দেয়—

জতেক সৈয়দ মোল্লা জপএ ত বিসমল্লা
সদামুখে কলিমা কেতাব
হিন্দুত কলিমা দিল মুসলমানি শিখাইল
তথা বৈসে জত মুসলমান।

—এ বর্ণনা যে সত্যসন্ধ হিন্দু কবির নিরপেক্ষ দৃষ্টিপ্রসূত, তাতে সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক বিজাতি-বিধর্মী বিদ্বেষ বশে কবি ভবানীদাসও ভবিষ্যদ্বাণীর আবরণে কল্পচিত্রই দিয়েছেন :

প্রচণ্ড যবনরাজা হবে ক্ষিতিপতি
ধর্মকর্ম লোকের হিংসিবে নিতিনিতি।
প্রয়াগ বারাণসী আদি যত পুণ্যস্থান
সকল স্থানের তারা করিবে অপমান।
বিড়ম্বনে হরিকার্য করিতে না দিব
বলে ধরি আনি তার জাতকুল নিব।

বিজয়গুপ্ত যদিও তাঁর স্বগ্রাম 'ফুল্লশ্রী'র পরিচয় প্রসঙ্গে গাঁয়ের শান্তি-সুখে গর্বিত ও সুলতান হোসেন শাহ্‌র (জালালউদ্দিন ফতেহ্ ওর্ফে হোসেন শাহ ১৪৮১-৮৫ খ্রীঃ) তারিফে মুখর, যেমন—

সুলতান হোসেন শাহা নৃপতিতিলক।
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি,
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত।

তবু সাধারণভাবে বিজাতি-দ্বেষণার ও বিধর্ম-অসহিষ্ণুতার একটি কল্প চিত্র দিয়েছেন: কাজীর শ্যালক মুল্লা হালদার ও পেয়াদা দাপটে প্রবল ও পীড়নে পটু।

১. তার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে।
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাত।
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তার স্কন্ধে
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে।
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে
কার পৈতা ছিঁড়ে ফেলে থুথু দেয় মখে।
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্রকিল
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল।
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা
চোপড়-চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা।

২. পৌত্তলিকতা-দ্বেষী মোল্লা 'খোদা খোদা বুলি যায় (মনসার) ঘট ভাঙ্গিবার।' হিন্দুরাও ছাড়বার পাত্র নয়, বেদম মার দিয়ে ছাড়ে। শুনে কাজীও ক্ষিপ্ত হয়ে বলে:

হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান।
গোটে গোটে ধরিবা গিয়া যথেক ছেমরা
এড়ারুটি খাওয়াইয়া করিব জাতিমারা।
ওস্তাদ মোল্লা মোর অপমান হয়
তাহারে এমন করে প্রাণে নাহি ভয়। (বিজয়গুপ্ত)

এ হচেছ বিধর্মী-দ্বেষী অসহিষ্ণু মুসলমানের কল্পচিত্র। আসলে বোধ হয় মনসা-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে দেবতা-দ্বেষী মুসলিমের প্রথমে অবিশ্বাস-অবজ্ঞার ও পরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত দান লক্ষ্যেই দ্বন্দ্ব-মিলনের এ কল্প-কাহিনী উদ্ভাবিত। হাসান-হোসেন পালা নির্মাণের মূলে এ উদ্দেশ্যই যে নিহিত, তাতে সন্দেহ নেই। এখানে মনসাপূজক মুসলিম বেদে গোষ্ঠীর কথা স্মরণীয়। তাই সম্বুদ্ধিজাত সহিষ্ণুতার কথাও পাই :

তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান
সে বলে উচিত নহে, রাখো হিন্দুয়ান।
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু-মুসলমানে
যার তার কর্ম সেই করে ধর্ম জ্ঞানে।
সকলের কুলাচার সৃজিল গোঁসাই
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য নাই। (দ্বিজ বংশীদাস)

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়ে' দেখি—হাসান হোসেন 'তুরুক' হলেও গ্রাম্য বিত্তবান চাষী। 'তাদের শতেক কৃষাণ সদা আছে নিয়োজিত।' গোরামিনা তাদের প্রধান কৃষাণ। ঐ কৃষাণদেরও রয়েছে গোলাম। সে যাচ্ছিল স্নান করতে, পথে গাছতলায় রাখালেরা করছিল মনসাপূজা। অকারণেই

—'ক্রোধযুক্ত হৈল সবে তুরুক দেখিয়া
ধর ধর ডাক ছাড়ি গেল খেদাড়িয়া।'

[বলা বাহুল্য মুসলিম মাত্রই তখন হয়তো তুরুক অভিধায় চিহ্নিত হত।]

উক্ত গোলামের নালিশক্রমেই রাখালদের মনসাঘট ভাঙতে যায় গোরামিনা। হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে এভাবেই! এ সূত্রে ব্রিটিশ আমলে পূজোর বাজনা ও গরু কুরবানীজাত দাঙ্গা স্মর্তব্য।

ক্রুদ্ধা মনসা আদেশ দিল 'বধহ তুরুক সব জনেক রাখিয়া।' বিষতিয়া সাপ মুসলিম পাড়ায় প্রবেশ করে হত্যা করল নিরানব্বই জনকে, বেঁচে রইল মাত্র একজন। তার নাম ভাঁড়ু। এরূপ দেশী নাম আরো মেলে—দিনু, কিনু, ফুল, ছুটি, ইছাই বাছাই, টগরি, জিরা, হারি, কালাফুলি, হুলহুলি, নাকুড়ি প্রভৃতি। লক্ষণীয় দেশী মুসলমানকেও বিপ্রদাস 'তুরুক'-এই সাধারণ নামে অভিহিত করেছেন। এই ভাঁড়ুই হাসানহাটি যেয়ে হাসানকে জানাল সব বৃত্তান্ত। এভাবেই হিন্দু-মুসলিম-মনসার লড়াইয়ের শুরু! বিপ্রদাস স্বধর্মত্যাগী জোলা-মুসলিমদেরও এ সূত্রে স্মরণ করেছেন :

দেখিয়া জোলার পাড়া ধায় বিঘতিয়া বোড়া
আছে জোলা আপনার কাজে
মাথাএ তইকা ভাঙ্গা তাহে কানি কালো রাঙ্গা
কামড় খাইল তার মাঝে।
ফলে—হাসান নগরে যত জোলা বৈসে শত শত
বধে বিঘতিয়া কালানলে।

২

গৌড়ে হিন্দু-মন্দির ভাঙার অপবাদ নেই সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র বা অন্য কোন সুলতানের। উড়িষ্যায় অভিযানকালে অর্থাৎ যুদ্ধকালে সেখানকার ধনাগার-স্বরূপ কিংবা শত্রুর শিবিরস্বরূপ মন্দির ভেঙেছিলেন হোসেন শাহ:

যে হুসেনশাহ সর্ব উড়িষ্যার দেশে
দেব মূর্তি ভাঙিলেক দেউল বিশেষে। (চৈতন্যভাগবত)

[অবশ্য মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়ার দৃষ্টান্ত ভারতে একটা দুটো নয়—বহু] লক্ষণীয় যে তুর্কী সুলতান-ফৌজদার-কাজী প্রভৃতি শাসক-প্রশাসকের হিন্দু-পীড়নের কথাই সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে। দেশজ মুসলিম প্রতিবেশীর হাতে হিন্দুর পীড়ন-প্রাপ্তির কথা নেই। তার কারণ দুটো। এক, তখনো গাঁয়ে-গঞ্জে দীক্ষিত বা উপনিবিষ্ট মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য, দুই, সার্বভৌম ক্ষমতা তুর্কী-মুঘলের হাতে থাকলেও হিন্দু সামন্তরাই শাসন করত দেশ। রাজস্বও আদায় করত হিন্দু কর্মচারীরাই। কাজেই জনগণ ছিল প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুর শাসন-পোষণে। তাই সাধারণ মুসলিমের পক্ষে হিন্দুপীড়ন সম্ভব ছিল না।

আবার সর্বত্র ব্রাহ্মণের লাঞ্ছনার কথাই রয়েছে বর্ণিত। এ নির্যাতন কেবল যেন ব্রাহ্মণের উপরই হত। জয়ানন্দের বর্ণনায় পাই:

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে
ধন প্রাণ লয় তার জাতিনাশ করে।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে
ঘরদ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী।

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিল প্রমাদ।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হৈব হেন আছে
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হৈব পাছে।

অতএব—'নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।'

কিন্তু এজন্যেই কি 'ব্রাহ্মণে-যবনে বাদ' এবং কেবল ব্রাহ্মণ নির্যাতন। আমাদের মনে হয়, অন্য বর্ণের ও বিত্তের লোক ইসলামে সহজে দীক্ষিত হত, তাদের সঙ্গে প্রচারকরাও মিশনারীসুলভ সদ্ভাব রক্ষা করে চলত। বিপ্রদাসের উক্তিতে 'হিন্দুত কলিমা দিল মুসলমানি শিখাইল' এবং দীক্ষিত 'জোলা' মুসলমানের প্রতি তাঁর সক্ষোভ পরিহাসে আমাদের অনুমানের সমর্থন রয়েছে। কাজেই সমাজপতি শাস্ত্রী ব্রাহ্মণই হিন্দুর ধর্ম, সমাজ ও আচার রক্ষার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছিলেন। এজন্যেই 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।' সুতরাং ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ বা ব্রাহ্মণ-নির্যাতনকে ঢালাওভাবে বিধর্মী-পীড়ন বলে চালিয়ে দেয়া যায় না। যেমন ইংরেজ-বিদ্বেষ ও পাদ্রী-দ্বেষণা সমার্থক নয়। হিন্দুদের পাদ্রী-বিদ্বেষ থাকলেও ব্রিটিশ-দ্বেষণা ছিল না উনিশ শতকে। এখানে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র উক্তি পুনঃ স্মর্তব্য-–'হিন্দু' জাতি ছিল না। হিন্দু ধর্মও ছিল না। কাজেই হিন্দুমাত্রেরই উপর বিদ্বেষপ্রসূত অত্যাচারও হতে পারত না। তাছাড়া তখন প্রত্যক্ষভাবে প্রজাকে শাসন-পোষণের ও শোষণ-পীড়নের নির্দ্বন্দ্ব অধিকার ছিল স্থানীয় হিন্দু সামন্তেরই।

আবার ঐ সংখ্যাগুরু হিন্দু বা ব্রাহ্মণরা যে শাসক তুর্কী বা যবনদের খুব ভয় করে চলত, তার প্রমাণও দুর্লভ। বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্ত যেমন হিন্দুর প্রতিশোধমূলক মুসলিম-দলন চিত্র সগর্বে বর্ণনা করেছেন, তেমনি বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ প্রমুখ কবিগণও সদম্ভে মুসলিম দলনের বর্ণনা দিয়েছেন—

১. গদাধর বোলে আরে কাজী বেটা কোথা
ঝাটে 'কৃষ্ণ' বোল নহে ছিণ্ডোঁ এই মাথা। (বৃন্দাবনদাস)

২. নবদ্বীপ সীমাএ যবন যদি দেখ
আপন ইচ্ছাএ মার, প্রাণে পাছে রাখ। (জয়ানন্দ)

৩. নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন। (বৃন্দাবনদাস)

৪. প্রভু আজ্ঞা দিল 'যাহ করহ কীর্তন
আমি সংহারিব আজি সকল যবন। (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

এগুলো যে মূলত জাত্যাভিমান ও তজ্জাত জাতিবৈর জ্ঞাপক অতিশয়োক্তি তার প্রমাণ তুর্কী-মুঘল আমলেই শাসিত প্রজা নির্ভয়ে গ্রন্থে শাসকের পীড়নের কথা লিখেছেন, শাসকের ধর্মের চাইতে শাসিতের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন, শাসক-গোষ্ঠী থেকে শাসিতের দেবতার অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন—অন্নদামঙ্গল অবধি অনেক কাব্যেই এসব চিত্র মেলে—যা কোন নির্যাতনকারী শাসকই সহ্য করে না; এমনকি এই গণতন্ত্রের যুগেও নয়। তা' ছাড়া আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ প্রমুখ বহু সুলতানের তারিফে সমকালীন বহু কবি মুখর। এ যেন এ-যুগের বিভিন্ন মতাবলম্বী সংবাদপত্রসুলভ দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক। তাতে যেন পরিহাস রসিকতার ভাবও রয়েছে। তাই সম্রাট জাহাঙ্গীরকেও ভূতের উপদ্রব সহ্য করতে হয়। আবার সতেরো-আঠারো-উনিশ শতকে কাল্পনিক পীর-পাঁচালীর মাধ্যমে মুসলিমদেরও তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সমান উৎসাহী দেখতে পাই। পীরনারায়ণ 'সত্য', তাঁর চেলা দক্ষিণরায়, বড় খাঁ গাজী, গাজী-কালু এবং ইসমাইল গাজী, জাফর গাজী, মোবারক গাজী–সফী গাজী, মানিকপীর, মছলন্দর পীর প্রভৃতির কাহিনীতে হিন্দু-মুসলিমের ধর্মমত ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব ও পরিণামে আপোশ-মিলনের চিত্রই বিধৃত।

অর্ধেক মাথায় কালা একভাগে চুড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধ নীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে। (কৃষ্ণরামদাস)

বিজয়গুপ্ত-বিপ্রদাস পিপিলাই থেকে এ-ধারার শুরু এবং কৃষ্ণরাম-ভারতচন্দ্র-গরীবুল্লাহ প্রমুখ হয়ে মুন্‌শী আবদুর রহিমে তার অবসান।

সৈয়দ সুলতান, জায়েনউদ্দীন, শাহ বারিদ খান, গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রমুখ কবিগণ রসুল, হামজা, আলী, হানিফা প্রভৃতি ইসলামের উন্মেষ যুগের বীরদের দিগ্বিজয় বর্ণনা সূত্রে পরাজিত ব্রাহ্মণ রাজা ও রাজ-কন্যাদের সপ্রজা ইসলাম বরণের জন্যে আহবান জানিয়েছেন,* অন্যথায় হত্যার হুমকি দিয়েছেন। সর্বত্র কেবল ব্রাহ্মণই তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য। এবং কাফের নয়, কুফরীই (পৌত্তলিকতাই) তাঁদের তীব্র ঘৃণার বিষয়; ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও পৌত্তলিকতার অপকর্ষ দেখানোই ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুর্কী-মুঘল শাসনকালে মুসলিমরা ইংরেজ আমলের মতো

জীবিকাক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে নি, তাই তাঁদের রচনায় হিন্দু-বিদ্বেষ মেলে না। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোই তার প্রমাণ :

১. তোর হিত বলি আমি হও মুসলমান
নবীর সাক্ষাতে যাই আনহ ইমান।
কলিমা না কহ যবে করিমু সংহার।

২. এক আল্লাক মান যবে না কাটিব শির
আল্লার রসুল হেন যদি মান মোক
যথ অপরাধ কৈলা ক্ষেমিব তোহোক।

৩. আল্লার পরম মিত্র নবী মুহম্মদ
তাহান কলিমা পড়ি ভুঞ্জ রাজপদ।

৪. নৃপতির করে ধরি তবে পয়গাম্বর
কলিমা পড়াইলা সুখে হরিষ অন্তর। (রসুল বিজয়—শাহ বারিদ খান)

৫. মূর্তি ভাঙ্গিয়া কর মসজিদ নির্মাণ
সৈন্য সমুদিত তুমি হও মুসলমান।
বুতখানা দূর করি মসজিদ উঠাও।
হামেসা কোরান পড়ি কলিমা বুলিবা।

৬. কাফের জুনুদ শাহ বলেন :
না কাটিও শির তুমি রাখ মোর প্রাণ
আজ্ঞা কর মহাশয় হৈমু মুসলমান।

৭. হানিফা—'রাজ্যে রাজ্যে কাফিরকে করে মুসলমান।'
হানিফা বলেন—ধনে রত্নে কার্য নাহি করি মুসলমান
সমুদিত রাজ্য জিনি মুসলমান করি
তবে সে মদিনা যাইব এই সত্য ধরি।
(হানিফার দিগ্বিজয়—শাহ বারিদ খান)

৮. অন্দরেতে যাই আলি জব করিব গরু
সেই শেব থোন (কাছে) দিমু তোমার রাজার জরু।
কলিমা পড়াইয়া সব ভজাইমু জিগির
অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ। (রসুল বিজয় - জায়েনউদ্দীন)

শাসক-শাসিতের সম্পর্ক যেখানে বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী-বিজাতির, সেখানে সহাবস্থানের গরজে ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতাভিত্তিক একটা আপোশ রফা আবশ্যিক

হয়ে উঠে। নইলে শাসিতজনদের কিংবা সংখ্যালঘুর জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র নিরাপদ হয় না। মধ্যযুগে সেই আপোশ-প্রয়াস উপরোক্ত ধারায় আবর্তিত হয়েছে। মা যখন মারে, তখন তা' বিনা অনুযোগে সহ্য করাই নিয়ম। কিন্তু সঙ্গত কারণে মেরেও সৎমা নিন্দা থেকে রেহাই পায় না। প্রবল মাত্রই যে কমবেশী পর-পীড়ক, শাসকমাত্রই যে সাধারণভাবে শোষক ও পীড়ক, দুরাত্মা-প্রবলের ও শাসক-প্রশাসকের যে কোন দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নেই ওরা যে আলাদা শ্রেণী—শাসক-প্রশাসক বিজাতি-বিধর্মী হলে শাসিত-শোষিত-পীড়িত মানুষ এ তত্ত্ব মনে রাখে না। মনে ভাবে বুঝি বিজাতি-বিধর্মী-বিদেশী-বিভাষী বলেই শাসকরা প্রজাপীড়ন করছে। গোঁয়ার, লোভী, পরস্বাপহারী, মূর্খধার্মিক প্রভৃতি যে সুযোগ সুবিধে মতো ব্যক্তিগত ভাবে হিন্দু-পীড়নে উৎসুক ছিল, তার সত্যতা আজকের দিনের উচ্চ-শিক্ষিত মানুষের প্রবণতা থেকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তবু শাসকের স্বধর্মীর সংখ্যাল্পতার দরুন তা সেকালে কখনো ত্রাসকর হয়ে উঠতে পারে নি। আধুনিক বিদ্বানেরাও স্বীকার করেন:

"মুসলমানদের বাঙলা আক্রমণকালে হিন্দুধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল। নিম্ন-বর্ণের লোকদের দাসে পরিণত করা হয়েছিল। তাদের ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ পীড়নের প্রয়োজন হয়নি।" (১৮৯১ সনের আদমশুমারীর রিপোর্ট)

মুসলিম শাসনকালে "শাসনভার, সামরিক দায়িত্ব, সংস্কৃতিচর্চা, কোন বিষয়েই হিন্দুর উন্নতি ব্যাহত হয় নি, বরং মুসলমান শাসনকর্তাদের প্রচুর পোষকতা ছিল।" (প্রবোধচন্দ্র ঘোষ: বাঙালী, পৃঃ ৭৯ ৮০)

"পাঠানযুগে দেশ শাসনে যে বাঙালী হিন্দুর অধিকতর অধিকার ছিল, তাহার প্রমাণ হুসেনশাহী বংশ ও কররানী বংশের অধীনে বহু বাঙালী হিন্দু কর্মচারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পাঠান আমলে রাজ্যশাসনে, বিশেষত রাজস্বব্যাপারে একটা হিন্দু আমলাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।" (অসিত বন্দ্যো: বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫)

"স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় শুধু মুসলমানেরা নয়, হিন্দুরাও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁরা অনেক সময় মুসলমান কর্মচারীদের উপরে ওয়ালি অর্থাৎ প্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হতেন। বাংলার সুলতানদের মন্ত্রী, সেক্রেটারী এমনকি সেনাপতির পদেও অনেক হিন্দু নিযুক্ত হয়েছেন।" (সুখময় মুখো: বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর পৃঃ ৪৬৩)

"পাঠান শাসনকালে বাঙালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। (১৫-১৬ শতকে) এই দুই শতাব্দীতে বাঙালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই। (বাঙ্গালার ইতিহাস : বঙ্কিমচন্দ্র)।

"তাহাদিগের (পাঠানদের) আমলে বাঙ্গালীরাই বাঙালা শাসন করিত। ইঁহারা (হিন্দু রাজাগণ ও সামন্তরা) রাজস্ব আদায় করিতেন, শান্তি রক্ষা করিতেন, দণ্ডবিধান করিতেন এবং সর্বপ্রকার রাজ্য-শাসন করিতেন। (বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা : বঙ্কিমচন্দ্র)

"মুসলমান রাজশক্তি তখন স্বাধীন এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনে ও রক্ষণে বাঙালী হিন্দু সবিশেষ সহায়তা করিতেছে (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃঃ ৮৮)।

অতএব, মুসলমানেরা তুর্কী-মুঘলযুগে বিধর্মী নির্যাতনের সুযোগ কৃচিত কখনো পেয়েছে মাত্র। উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত রামচন্দ্রখান হিন্দু হিসেবে নয়, বাকী রাজস্বের জন্যেই নির্যাতিত হয়েছিলেন। আবার রূপ-সনাতনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রদ্বীপের প্রশাসক ছিলেন প্রজাপীড়ক। অর্থ আত্মসাৎ করে তিনি বিদ্রোহীর মতো আচরণ করেছিলেন বলে 'চৈতন্য চরিতামৃতে' হোসেন শাহার জবানীতে পরিব্যক্ত :

'তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারিয়া বাক্‌লা কৈল খাস'।
(চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ-১৯)

আবার ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-মুসলিমের পরিচিত-প্রতিবেশী সুলভ প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-সখ্য ও শ্রদ্ধা-স্বার্থের সম্পর্কও গভীর এবং অবিচ্ছেদ্য ভাবে গড়ে উঠত। আগেই বলেছি ব্যক্তি সম্পর্কে প্রায় কোন মানুষই দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-বৈর দ্বারা চালিত হয় না। আর এক ক্ষেত্রেও মানুষ কোন স্বাতন্ত্র্য অসূয়া অহঙ্কার অবজ্ঞা মনে ঠাঁই দেয় না—সে হচ্ছে দৈব ভয়ের এবং ব্যাধি, স্বার্থ ও লিপ্সার ক্ষেত্র।

এখানে আপাতনিরাপত্তা, নিরাময় ও প্রাপ্তিলোভ মানুষকে সর্ব সংস্কারের বাধা অতিক্রমণে প্রবর্তনা দেয়। এসব ক্ষেত্রে মিলনমুখী চিত্র অনেক মেলে। যেমন :

১. গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা।

নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা। (চৈতন্যচরিতামৃত)

২. শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন। (চৈতন্যভাগবত)

৩. তর্কে পরাজিত চৈতন্যের মাহাত্ম্যমুগ্ধ কাজীও চৈতন্যের পায়ে ধরে বলে-
'এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি।
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ। (চৈ: ভাগবত)

৪. হিন্দু কুলে কেহ যদি হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম। (চৈতন্যভাগবত)

৫. যবন হরিদাসকে মুলুকের পতি বলছেন :
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।
আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ জাত। (চৈতন্যভাগবত)

৬. জাজপুরের দেহারা বন্দিব একমন
যেইখানে অবতার হৈল যবন। (ধর্মমঙ্গল)

৭. বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ—(চৌধুরীর লড়াই)

৮. বন্দোঁ পীর ইসমালি গড় মান্দারনে।
দারাবেগ ফকির বন্দিব নিগাছে
জোড় হাতে বন্দিব পাঁড়ুয়ার সুফী খাঁএ। (ধর্মমঙ্গল - সীতারামদাস)

৯. যবনেহ যার (রামের) কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে
ভজ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে। (চৈতন্যভাগবত)

১০. বিজয় গুপ্তের নায়ক চাঁদ সদাগর লখীন্দরের বাসরে কোরআন পাঠেরও ব্যবস্থা রাখেন। শেখ শুভোদয়ায় জলালের এবং পাঁচালীতে সত্যমানিক পীরাদির মাহাত্ম্যকীর্তন রয়েছে, জাফর খানেরও গঙ্গাস্তোত্র আছে।

১১. ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারশ্য পড়িবে
মোজা পাএ নড়ি হাতে কামান ধরিবে। (চৈতন্যমঙ্গল)

আবার গুণরাজ খান মালাধর বসু, বিদ্যাপতি, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবিচন্দ্র মিশ্র (গৌরীমঙ্গল : ১৪৯৭-৯৮ খ্রীঃ-পুথি পরিচয় পঞ্চানন মণ্ডল, ৩য় খণ্ড) কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, রূপরাম, মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার [ভুঁইয়া মুসা খাঁর আমলের] কৃত্তিবাস, দ্বিজশ্রীধর কবিরাজ, রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র, যশোরাজ খান, মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম, গদাধরদাস, কৃষ্ণরামদাস, মহাদেব আচার্যসিংহ (মালতীমাধব নাটকের টীকাকার, বাঃ ইঃ দুশো বছর পৃঃ ২৮৪) প্রমুখ কবিগণ প্রতিপোষণ পেয়ে বা না পেয়েও, রুকনউদ্দিন বারবকশাহ, শামসুদ্দীন ইউসুফশাহ, জালালউদ্দীন হোসেন শাহ, সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেনশাহ, নাসির উদ্দিন নুসরৎশাহ, আলা উদ্দিন ফিরোজশাহ, পরাগলখান, ছুটিখান, আকবর, শাহজাহান, সুজা, মুসা খাঁ, আওরঙজীব প্রমুখ শাসক-প্রশাসকের অকারণ-সকারণ স্তুতি গেয়েছেন।

সন্ত সন্ন্যাসী ফকিরের ক্ষেত্রেও বিষয়ী মানুষ কখনো পার্থক্য স্বীকার করে নি। এসব হচ্ছে পূর্বোক্ত ব্যক্তিগত জীবনের কথা। কিন্তু কারণে অকারণে সুপ্ত জাতি-বর্ণ-গোত্র-ধর্ম-বৈর আস্তিক ও দলভুক্ত মানুষের মনে যে-কোন প্রাসঙ্গিক কারণে জেগে উঠেই এবং প্রয়োজন স্থলে প্রকাশও পায়। এবং এ দিয়ে ইতিহাসের ধারাও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বকালেও আমরা তা দেখতে পাই।

এর পরে গৌড়ীয় নববৈষ্ণব মতের উদ্ভবকালেও আমরা বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈবের দ্বন্দ্ব-কোন্দল দেখেছি, যেমন উনিশ শতকে দেখেছি খ্রীস্টান-ব্রাহ্ম-সনাতনীদের এবং মজহাবী-ওয়াহাবী-ফরায়েজীদের দ্বন্দ্ব-কোন্দল।

সনাতন লোকধর্মের প্রতি নবদীক্ষিত বৈষ্ণবদের ছিল সীমাহীন অবজ্ঞা। তারা বলে :

১. ধর্ম-কর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন।
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।

যোগিপাল ভোগিপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিবারে সব লোক আনন্দিত। (চৈ: ভাগবত)

উত্তর বঙ্গে তখন :

২. উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার
শৈব শাক্ত কর্মী যোগী বিভিন্ন আচার।
মদ্য মাংস মৎস্য যাগ মলেতে সাধন
কামিক্ষার ব্রত মহীপালের জাগরণ।
যোগিপাল ভোগিপালের যাত্রা মহোচ্ছব
ভোট কম্বল চর্ম পরিধান সব।
(নিত্যানন্দের বংশ বিস্তার : সুকুমার সেন পৃ: ৩৩০)

৩. ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ
ডাকা চুরি পর গৃহ দাহে সর্বক্ষণ।
দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় কোটাল
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল। (চৈ: ভা:)

৪. মহাপাপী ব্রাহ্মণ যে আছে দুই ভাই
নবদ্বীপের যে ঠাকুর জগাই মাধাই। (লোচনদাস)

৫. ধিক জাঁউ আমার নদীয়ার ঠাকুরাল
গুপ্ত হত্যা ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার। (ঐ)

কীর্তন শুনে সনাতনীরা বলে :

৬. শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে 'হইল প্রমাদ
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ'। (চৈ: ভাগবত)
...এ বামন গুলা রাজ্য করিবেক নাশ—
কেহো বোলে যদি ধানে কিছু মূল্য চড়ে
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে। (চৈ: ভা:)

৭. এগুলা সকলে মধুমতী সিদ্ধিজানে
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।—
কেহো বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।

ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ। (চৈ: ভা:)

চৈতন্য ও তাঁর চেলাদের বিরুদ্ধে কাজীর কাছে নালিশ করে হিন্দুরাই :

৮. আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই
যে কীর্তন প্রবর্তিল কভু শুনি নাই।
'নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি
হিন্দু ধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজার। (চৈ: চ:)

তর্কে পরাজিত বৌদ্ধরা চৈতন্য-লাঞ্ছনার ষড়যন্ত্র করেছিল বলেও উল্লেখ রয়েছে চৈতন্য চরিতামৃতে :

৯. বৌদ্ধাচার্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল
দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল।
সর্ব বৌদ্ধে মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈল,
অবশেষে 'সবে আসি প্রভু পদে লৈল শরণ।'

বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণবীয় উত্তেজনা ও ক্রোধবশে তাই এ পাষণ্ডদের সম্বন্ধে বারবার বলেছেন —

এতো পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে
তবে লাথি মারোঁ তার মাথার উপরে। (চৈ: ভা:)

কবিগণ রাজবন্দনা করেও আবার সেই রাজার অত্যাচার পীড়নের কথা বলেছেন। যেমন ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী প্রতিমা-বিনাশক হোসেন শাহ কেবল যে প্রশংসিত হয়েছেন, তা নয়, চৈতন্য দেবের ঐশ্বর্যেরও স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'এসব মানুষি নহে গোসাঞি চরিত্র।' (চূড়ামণিদাস-গৌরাঙ্গ বিজয়) 'সেই ত গোসাঞি উহা জানিহ নিশ্চয়।' (চৈতন্য চরিতামৃত)

আবার, বৈষ্ণব অবৈষ্ণবের পারস্পরিক নিন্দাবাদও ঐ একই সাধারণ দল-চেতনার বা ভিন্ন দল-দ্বেষণার প্রকাশ মাত্র।

তাই বলেছি, এসব দেশ জাত বর্ণ গোত্র দ্বেষণা একটা সাধারণ মানবিক বৃত্তিরই প্রকাশ,— এর মধ্যে বাস্তব তথ্য বা ঘটনা খোঁজা নিরর্থক। এসব অভিব্যক্তি কেবল এ যুগে বিরোধীদলের ভূমিকা ও বক্তব্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আবার গাঁয়ের নিরক্ষর নিঃস্ব নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের লোকেরা এ স্বাতন্ত্র্য ও সচেতনতা রক্ষা করার বা এর অনুশীলন করার গরজ কখনো তেমন অনুভব করেনি। জীবিকাগত আর্থিক জীবনে চির দুস্থ এসব মানুষ নিয়ম ও নিয়তির শিকাররূপে আশ্বাস ও প্রবোধের অবলম্বন খুঁজেছে প্রায় অবচেতন মনেই। তাই দুর্বোধ জটিল শাস্ত্রে আশ্বস্ত হতে না পেরে তারা সহজ ও সরল পথের সন্ধান করেছে ঐহিক-পারত্রিক জীবনের স্বস্তি-বাঞ্ছায়। এভাবে লোক-প্রয়োজনে লোক-মনীষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে লোকধর্ম। পীর-নারায়ণ সত্যের স্বীকৃতিতে কিংবা বিভিন্ন গুরুনামী বাউল সাধনায় নিরক্ষর গ্রামীণ হিন্দু-মুসলিম অভিন্ন-মিলন ময়দান রচনা করে সহিষ্ণুতায় ও সহযোগিতায় সহাবস্থান করেছে। কেবল উচচ বিত্তের, বর্ণের ও শিক্ষার সুখী ও সম্পদশালী স্বস্থ মানুষই শাস্ত্র-সংস্কৃতি-সমাজের নামে বিভেদ-বিদ্বেষ জিইয়ে রাখার মধ্যেই স্বাতন্ত্র্য গৌরব ও স্বাধর্ম্যগর্ব অনুভব করে আনন্দিত কিংবা জিগীষু হতে চেয়েছে। এ হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-জাত-সম্পদ চেতনার অবশ্যম্ভাবী প্রসূন। এর থেকে আস্তিক ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানুষের নিষ্কৃতি নেই। অথচ এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে ব্যবহারিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে মুসলিমের ঘরোয়া জীবনে, অন্তত নাপিত, ধোপা, বারুই, বৈদ্য, কামার, কুমার, গো-চিকিৎসক, বাদ্যকর, চাষী, মাঝি, তাঁতী, মুচি প্রভৃতি নানা পেশার লোকের সঙ্গে সেযুগে বার্ষিক চুক্তি ভিত্তিক ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক রাখতেই হত।

তা'হলে সাহিত্যে-ইতিহাসে বিধৃত বিরোধের স্বরূপটা কি।

আসলে মন ও মত বাঁচিয়ে গাঁয়ে-গঞ্জে আজকের মতোই সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন মতের মানুষ মাঠে-ঘাটে-হাটে ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনে সহযোগিতা ও সদ্ভাব রেখে সহাবস্থান করত। দুই বিরুদ্ধ-মতবাদীর মধ্যে যা কাম্য ও কেজো তা হচ্ছে সহাবস্থানের অঙ্গীকারে সহিষ্ণুতা। ভিন্নমতের আস্তিক ও দলীয় মানুষের মধ্যে প্রীতির চর্চা অবাস্তব বলেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই এ প্রয়াস বিড়ম্বিত হয়।

স্মর্তব্য যে, মধ্যযুগে জনগণের জীবনযাত্রা ছিল নিম্নমানের। অন্ন-বস্ত্র-গৃহ ছিল স্বল্পব্যয়ের; অদৃষ্টবাদী অজ্ঞ মানুষ আর্থিক দুর্গতির জন্যে কাউকে দায়ী করত না। গাঁয়ে পণ্য ও শ্রম বিনিময়ই ছিল বৃত্তিজীবী মানুষের আর্থিক জীবনের ভিত্তি। কিন্তু উচচবিত্তের মধ্যে শ্রেণীগত সচেতন জীবন ও রাজনীতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ছিল। লক্ষণীয় যে প্রাচীন ভারতে জনবহুল বৌদ্ধ সমাজ রাজশক্তিরও অধিকারী ছিল। তাই শঙ্করাচার্যের প্রচারণায় ও প্ররোচনায় ভারতে বৌদ্ধ বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু জৈনরা

ছিল সংখ্যায় অল্প, রাজশক্তি ছিল না তাদের। তাই তাদের প্রতি তেমন বিদ্বেষ ছিল না সংখ্যাগুরু সমাজের। ফলে ভারতে জৈনরা আজো টিকে রয়েছে।

ব্রিটিশ আমলে মুদ্রার বহুল ব্যবহার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সার্বিক প্রসার ও শিল্পবিপ্লব, কলকারখানার দৈশিক প্রসার, শিক্ষার বিস্তার, রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ ও গণতান্ত্রিক অধিকারে অনুরাগজাত দল-চেতনা প্রভৃতিই প্রথমে স্বধর্মী ও স্বসম্প্রদায় চেতনা এবং পরে শ্রেণী-চেতনা তীব্র, গভীর ও ব্যাপক করে। বিদ্বেষবিষ, দ্বন্দ্ববোধ, সংগ্রামবুদ্ধি ও সংঘাত অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যিক হয়ে উঠে প্রবুদ্ধ আত্মোন্নয়নকামী মানুষের মধ্যে এ কারণেই।

৯

বাঙালীর সংস্কৃত চর্চা ও সংস্কৃত রচনা

॥ ১ ॥

যদিও জৈন-বৌদ্ধরাই সম্ভবত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মগধ অঞ্চল থেকে আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলাদেশে প্রবেশ করে, তবু অনুমান করা চলে শাস্ত্রীয় ভাষা পালি-প্রাকৃতের অপরিমেয় গুরুত্ব সত্ত্বেও জৈন-বৌদ্ধরাও সংস্কৃত একেবারে পরিহার করে চলতে পারে নি। কারণ সংস্কৃত ছিল সর্বভারতীয় ভাষা। আন্তঃ-আঞ্চলিক মানুষের কথা বিনিময়ের প্রয়োজন ছাড়াও প্রাচীন শাস্ত্র ও ঐতিহ্য প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের জন্যেও তাদের সংস্কৃত চর্চা করতে হত। শাস্ত্র, শিক্ষা ও প্রশাসনের বাহনও সাধারণভাবে ছিল সংস্কৃত। অবশ্য পুণ্ড্রবর্ধনে তথা বগুড়ার মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের তাম্রলিপির ভাষা প্রাকৃত এবং তা জনগণের উদ্দেশ্যেই উৎকীর্ণ। যদিও এই ভাষা প্রশাসনের ভাষা ছিল বলে সঙ্গত কারণেই অনুমান করা চলে, তবু মনে হয় বাঙলাদেশে মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন আমলে সংস্কৃত তার প্রাধান্য কখনো হারায় নি, তা বিভিন্ন লেখমালার সাক্ষ্যে প্রমাণিত। কাজেই মৌর্য শাসনে প্রাকৃত চালু করার সুপরিকল্পিত রাজকীয় প্রয়াস [অশোক-অনুশাসনের ভাষাই তার প্রমাণ] থাকা সত্ত্বেও জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ভাষা, শাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে অস্ট্রিক-মোঙ্গল অধ্যুষিত বাঙলার আর্যায়ণ যে পূর্ণতা পেয়েছিল দু'হাজার বৎসর আগেই, তা আমরা বিনা তর্কে মেনে নিতে পারি। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র কখনো সংস্কৃতের প্রভাব এড়াতে পারে নি। জৈন-বৌদ্ধেরা তাদের শাস্ত্রের বহুল প্রচার মানসে সংস্কৃতেও গ্রন্থ রচনা করেছে। অন্তত দেড় হাজার বৎসর ধরে

সর্বভারতীয় শিক্ষা মাত্রই সংস্কৃত বাহনেই সম্ভব ছিল। তাই শাস্ত্র, সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চা সংস্কৃতের মাধ্যমেই হয়েছে। অতএব, বাধ্য হয়েই শিক্ষক ও বিদ্বান বাঙালীর সংস্কৃতের চর্চা করতে হয়েছে। শাস্ত্রীয় আচার পার্বণ ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে এবং পঠন-পাঠনের গরজে তাঁরা গোড়া থেকেই পাঠ্য শাস্ত্রের বা গ্রন্থের টীকাভাষ্য সংস্কৃতেই রচনা করেছেন পরবর্তীকালের সাক্ষ্যে তাও আমরা অনুমান করতে পারি। যে কোন বক্তব্য সর্বভারতে প্রচার-প্রয়োজনেও তাঁদের সংস্কৃতের চর্চা করতে হয়েছে। এই জন্যেই টীকা-ভাষ্য-ব্যাকরণের আকারে বাঙালীর বহু সংস্কৃত রচনার উল্লেখ কিংবা সন্ধান মেলে। এগুলো অবশ্যই বিদ্যার বহুল চর্চার স্বাক্ষর। কিন্তু সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন নয়। কাজেই এগুলো সে-কারণেই সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ্য নয়। তবে বিদ্যাবত্তা ও মননশীলতার অভিব্যক্তি হিসেবে এই ধরনের রচনাও নিশ্চয়ই বাঙালীর গৌরবের ও গর্বের।

সংস্কৃত চর্চায় বাঙালীর উৎকর্ষের, স্বাতন্ত্র্যের, গৌরবের ও গর্বের বিষয় হচ্ছে বাঙালী সৃষ্ট ভাষাশৈলী—যা 'গৌড়ী'রীতি রূপে সুনামে-দুর্নামে ভারত বিখ্যাত—এ বাঙালী চিন্তা-চেতনার ও রুচি-স্বাতন্ত্র্যের অবিমোচ্য স্বাক্ষর। সাহিত্য ক্ষেত্রে কালিদাস না হোন, নৈষধচরিত ও খণ্ডন খণ্ডখাদ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীহর্ষ যে বাঙালী ছিলেন, তা তাঁর গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ও নিদর্শনযোগে নীলকমল ভট্টাচার্য[১] ও ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী[২] প্রমাণিত করেছেন। তা ছাড়া প্রকীর্ণ কবিতায়, গীতি কবিতায় ও সুভাষিত সদুক্তিমূলক শ্লোকে-বচনে বাঙালী তার মনীষার ও সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বল ও গৌরবজনক সাক্ষ্য রেখেছে এবং কেবল সংস্কৃতে নয়, প্রাকৃতে-অবহট্‌ঠেও। আর্যাসপ্তশতী, গীতগোবিন্দ, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতরত্নকোষ বা কবীন্দ্র বচনসমুচ্চয় ও প্রাকৃতপৈঙ্গল সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কাব্যে-নাটকেও তার দান নিন্দনীয় নয়; ন্যায়ে-স্মৃতিতে-দর্শনে নতুনতর শাস্ত্রীয় মতবাদ সৃষ্টিতে তার দান বিপ্লবাত্মক ও যুগান্তকর।

ভাষার বহুল চর্চার প্রসূন ও সাক্ষ্য গৌড়ীরীতি যে অবশ্য আলোচনার বিষয় হয়েছিল তা বোঝা যায় বাণভট্ট, ভামহ, দণ্ডী, বামন, বিশ্বনাথ, রাজশেখর প্রমুখ আলঙ্কারিকের গৌড়ীশৈলীর গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ থেকেই। গৌড়ীরীতি শব্দাড়ম্বর,

১. Saraswati Bhavan Studies, Vol. III.
২. চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ৭২-৭৫।

সমাসবাহুল্য, অনুপ্রাসাধিক্য, অতিভাষণ, ধ্বনি-কার্কশ্য ও প্রচলিত শব্দ প্রযুক্তির জন্যে নিন্দিত, কিন্তু ওজঃগুণ, কান্তি ও কবিত্বের জন্যে প্রশংসিতও।

মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় দেড় হাজার বছর ধরে বাঙলায় নানা প্রয়োজনে সংস্কৃত ভাষার বহুল চর্চা হলেও সুকুমার সাহিত্য রচনায় বাঙালীর অবদান বেশী নয়—অর্থাৎ কাব্য ও নাটক সৃষ্টিতে তাদের কৃতিত্ব তেমন স্বীকৃত নয়, যদিও আর্যা, গাথা, গীত ও প্রকীর্ণ কবিতার শ্লোক ও বচন রচনায় তারা সর্বভারতীয় স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমনকি বাঙলাদেশে প্রাপ্ত শিলালিপি, তাম্রশাসন, পট্টোলী, প্রশস্তিগুলোর মধ্যেও (এ গুলোর সংখ্যা প্রায় ১৫০ টি) কবিত্ব-পাণ্ডিত্যের দ্যুতি, উচ্ছ্বসিত অতিভাষণ-পটুতা, বাগবৈভব ও অলঙ্কারাড়ম্বর সুপ্রকট। পাল পূর্ব-যুগের বাঙালীর রচিত বলে কথিত গ্রন্থের মধ্যে পালকাপ্য রচিত হস্ত্যায়ুর্বেদ (হাতীর চিকিৎসাশাস্ত্র) ও চন্দ্রগোমী রচিত চান্দ্র ব্যাকরণ ও অন্য বহু তন্ত্র, নাটক, কাব্য ও দর্শনগ্রন্থ ছাড়াও গৌড়পাদ বা গৌড়াচার্য রচিত আগম শাস্ত্র 'গৌড়পাদটীকা' ও সাংখ্যকারিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পাল আমলের শাসন ও পট্টোলীতে অনেক শাস্ত্রবিদ ও সাহিত্যকলাবিদ জ্ঞানী-গুণীর নাম ও প্রশস্তি মেলে, কিন্তু তাঁদের রচিত গ্রন্থের সন্ধান মেলে নি। দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র, গুরবমিশ্র পুরুষানুক্রমে রাজমন্ত্রী ও পণ্ডিত ছিলেন। ভবদেবভট্ট, চতুর্ভুজ, গৌড় অভিনন্দ, শ্রীধর ভট্ট, সন্ধ্যাকর নন্দী, বৌদ্ধ বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধি, মৈত্রেয় রক্ষিত, বিমলমতি, চিকিৎসাশাস্ত্রী মাধব, চক্রপাণিদত্ত, নিশ্চল কর, সুরেশ্বর, অরুণদত্ত, বিজয়রক্ষিত বৃন্দকুণ্ড, শ্রীকণ্ঠদত্ত, বঙ্গসেন, গয়াদাস প্রমুখ অনেক প্রসিদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ পাল যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। অতএব পালযুগে আয়ুর্বেদের বহুল চর্চা ও চিকিৎসাবিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বৈদিকশাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে ভবদেবভট্ট, অনি-রুদ্ধভট্ট, নারায়ণ প্রমুখের গ্রন্থ মেলে।

পাল আমলের বৌদ্ধশাস্ত্র, দর্শন ও তন্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে শীলভদ্র, শান্তিরক্ষিত জেতারি, দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রীমিশ্র, অভয়াকর গুপ্ত, দিবাকরচন্দ্র, কুমারবজ্র, দান-শীল, পুতলি, নাগবোধি, প্রজ্ঞাবর্মণ, বৌধিভদ্র, মোক্ষাকরগুপ্ত, বিভূতিচন্দ্র, শুভাকর এবং চর্যাগীতিকারগণ রয়েছেন (বাংলাদেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৩৪-৪৩)।

সম্প্রতি মুদ্রারাক্ষস প্রণেতা বিশাখদত্ত, বেণীসংহার রচক নারায়ণভট্ট, 'অনর্ঘরাঘব প্রণেতা মুরারি, চণ্ডকৌশিক রচয়িতা ক্ষেমীশ্বর বাঙালী নাট্যকার বলে বাঙালীরা দাবী করেন। কিন্তু তাঁদের দাবীর ভিত্তি দৃঢ় নয়, তাঁদের যুক্তিগুলো ক্ষীণ ও তুচ্ছ। মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার ও অনর্ঘরাঘব প্রসিদ্ধ নাটক। বাঙালীরা যে নাটক রচনা

করেন নি, তা নয়, তবে সেগুলো গৌরব করার মতো শিল্পগুণসম্পন্ন নয় বলেই বিদ্বানদের ধারণা। তবু কৃষ্ণমিত্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক (১১ শতক) স্মরণীয়। এটি সর্বভারতীয় সমাদর পেয়েছিল এবং ফারসীতেও অনূদিত হয়েছিল। বাঙালী রচিত এমনি অনেক নাটকের নাম মেলে পনেরো শতকের প্রথমার্ধে (১৪৩১ খ্রীঃ) সাগরনন্দী রচিত 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষ' নামক নাট্যকলা গ্রন্থে। যেমন মারীচ-বঞ্চিতক, কেকয়ীভরত, কৃত্যারাবণ, বালিবধ, কীচকভীম, শর্মিষ্ঠা পরিণয়, উৎ-কন্ঠিতমাধব, রেবতীপরিণয়, কেলি রৈবতক, উষাহরণ, রাধা, সত্যভামা, উন্মত্ত-চন্দ্রগুপ্ত, মায়াকাপালিক, ক্ষপণক কাপালিক, মদনিকাকামুক, মায়াশকুন্ত ইত্যাদি (ডক্টর সুকুমার সেন উদ্ধৃত: পৃ: ৩৩, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ)। রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী নাটক, কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেনের চৈতন্যচন্দ্রোদয় বৈষ্ণব সমাজে চির আদৃত।

কাব্যের মধ্যে অভিনন্দের রামচরিত প্রথম উল্লেখ্য কাব্য। কিন্তু তিনি বাঙালী ছিলেন কি গুজরাটি ছিলেন, তা নিয়ে তর্ক আছে। তবে একজন গৌড়বাসী গৌড়াভিনন্দ যে প্রকীর্ণ কবিতার রচক ছিলেন তার নিঃসংশয় প্রমাণ মেলে কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয় ও সদুক্তি কর্ণামৃত নামের সংকলন গ্রন্থ দুটোতে। 'নৈষধচরিত' নামের মহাকাব্য প্রণেতা শ্রীহর্ষকে এখন প্রায় নিঃসংশয়ে বাঙালী কবি বলে দাবী করা চলে। কীচকবধ কাব্য রচয়িতা নীতিবর্মার উপরও বাঙলা ও উড়িষ্যার (কলিঙ্গের) দাবী আজো অমীমাংসিত রয়েছে, যেমন রয়েছে জয়দেবের উপর। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত তো বাঙালীর বটেই, তারপর আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিত, ধোয়ীর পবনদূত জয়দেবের গীতগোবিন্দ, গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতী বাঙালীর গৌরব-গর্বের অবলম্বন। তেরো শতকের রামচন্দ্র কবিভারতী ও চতুর্ভুজ প্রসিদ্ধ। এবং ষোল-সতেরো শতকে রচিত মুরারিগুপ্ত, কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও স্বরূপ দামোদরের চৈতন্যচরিত রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী ও নাটক প্রভৃতি বহির্বঙ্গে প্রচলিত বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্য। এ-ছাড়াও পদ্মনাভ মিশ্র, চন্দ্রশেখর, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণনাথ, রাম দয়াল, রাম গোপাল, লম্বোদর বৈদ্য গোপেন্দ্রনাথ, অম্বিকা চরণ, মহিলা কবি প্রিয়ংবদা, রামচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই সতেরো-আঠারো শতকে দূতকাব্যাদি রচনা করেছেন।

আগেই বলেছি, বাঙালীর সংস্কৃত চর্চার এবং কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও মনীষা প্রকাশের প্রধান অবলম্বন ছিল তাম্রপট্ট, শিলালিপি, মন্দির লিপি, প্রশস্তি ও আর্যা বা প্রকীর্ণ কবিতা আর শ্লোক, বচন প্রভৃতি। প্রায় দেড়শ' খানার মতো শাসন, শিলালিপি ও প্রশস্তি আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌর্যযুগে (খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে) উৎকীর্ণ মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রথম লিপিটিতে মাগধী-প্রাকৃত ও ব্রাহ্মী

হরফ ব্যবহৃত। আর সব সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ। এগুলোর কোন কোনটা কবিত্ব-গুণে ও তোয়াজ-স্তুতি জ্ঞাপক উপমাদি অলংকার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে উজ্জ্বল। কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার নিধনপুর শাসন, ধর্মপালের খালিমপুর লিপি, বল্লাল সেনের সীতাহাটি অনুশাসন, বিজয় সেনের বরাকপুর শাসন, দেওপড়ায় প্রাপ্ত ভোজ বর্মের তাম্রশাসন, ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর মন্দিরস্থ প্রশস্তি ও বিজয় সেন প্রশস্তি, লক্ষ্মণ সেনের শাসন, নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশ্র প্রশস্তি প্রভৃতি কবিত্ব ও স্তুতি-কাব্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। তা-ছাড়া এসব অনুশাসন ও প্রশস্তিই আমাদের বিলুপ্ত প্রাচীন ইতিহাসের দিগদর্শন—সেই কারণে এগুলোর গুরুত্ব অশেষ।

শিক্ষিত বাঙালী দু'হাজার বছর ধরে শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় দর্শনচর্চা করছেন। পঠন-পাঠন ও যজন-যাজনের তাগিদে তাঁদেরকে শাস্ত্র ও দর্শনের টীকা-ভাষ্যও রচনা করতে হয়েছে। শিক্ষার বাহন যেহেতু সংস্কৃত এবং তা-ই সর্বভারতে শিক্ষিতজন-বোধ্য একমাত্র ভাষা, সেহেতু টীকা-ভাষ্যও রচিত হয়েছে সংস্কৃতে। ফলে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য অধ্যাপক আচার্য পুরোহিতের সংস্কৃতে টীকাভাষ্য লিখতে, পড়তে ও বুঝাতে হয়েছে।

বাঙলার মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধ পণ্ডিতরা যে সংস্কৃতে এমনি অসংখ্য টীকা-ভাষ্য, তন্ত্রগ্রন্থ এবং মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান, নাথপন্থ, কৌলপন্থ প্রভৃতি উপমত সম্পর্কিত বহু তত্ত্ব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার অনুবাদমূলক নিদর্শন মেলে তিব্বতী ও চীনা ভাষায় অনূদিত ও রক্ষিত বিভিন্ন গ্রন্থে। এক সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রচারে বৌদ্ধ বিলুপ্তি ঘটে। তাই রক্ষকের অভাবে ও ব্রাহ্মণ্যবাদীর বিরূপতায় বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্য এদেশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একটা জনবহুল প্রবল ধর্মসম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার ঐতিহ্য-নিদর্শন এমন নিঃশেষে বিলুপ্ত বিস্মৃত হওয়ার নজির বোধ করি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি আর নেই। আজ জ্ঞানবলে মানুষ জগৎ ও জীবনের জন্ম-রহস্য, তার বিগত জীবনের বিলুপ্ত-বৃত্তান্ত, সৌরজগৎ ও নভোলোকের সব তত্ত্ব ও তথ্য দার্পণিক স্বচ্ছতায় জ্ঞানচক্ষুর গোচরে আছে। এ-যুগে কিছুই আর আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। তাই জ্ঞানী মানুষেরা আজ ভারতের বৌদ্ধ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপরেখা নানাভাবে আবিষ্কার করে চলেছেন।

সাংখ্য যোগ ও তন্ত্র যে বাঙালী চিন্তা-চেতনার প্রসূন এবং বাঙালীর মননে-আচরণেই যে সেগুলো পুষ্ট ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সে তথ্য আজ আর গুহায়িত নয়। অস্ট্রিক-মোঙ্গল তত্ত্বচিন্তার, অধ্যাত্ম সাধনার ও সাংস্কৃতিক চেতনার এ প্রসূন ও নিদর্শন বাঙালীর স্বকীয়তার, স্বাতন্ত্র্যের ও মনন-বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য। বাঙালী সত্তার ও মননের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার স্পৃহা থেকেই এর উদ্ভব। মহাযান প্রভাবিত বজ্রযান-সহজ-

যান-নাথপন্থ-কৌলপন্থ এবং মন্ত্রযান-কালচক্রযান প্রভৃতি নামসার বিকৃত বৌদ্ধমত-গুলোর উদ্ভব ও বিকাশ বাঙলাদেশেই এবং এগুলোর বিস্তার ও প্রসার ঘটে কম-বেশী গোটা বৌদ্ধ জগতেই। এপথেই একদিন বাঙালীর অধ্যাত্ম বিকাশ ও আত্ম-বিস্তার ঘটেছিল, সম্ভব হয়েছিল তার বিশ্বব্যাপী তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়। পরিবেশও ছিল অনুকূল। মৌর্য, পাল ও চন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধেরা এখানে রাজত্ব করে-ছেন দীর্ঘকাল। তাছাড়া পর্বত বেষ্টিত বাঙলার পার্বত্য-মোঙ্গলেরাই ছিল সাংখ্য যোগ ও তন্ত্রের হয়তো আদি উদ্ভাবক। অস্ট্রিক-মোঙ্গল রক্তসঙ্কর বাঙালী উত্তরাধি-কার সূত্রেই পেয়েছে সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রে, কায়াসাধনে ও দেহতত্ত্বে দীক্ষা। যে-সব জ্ঞানী-মনীষী-তাত্ত্বিক ও সাধকের ঐকান্তিক চর্চা ও চর্যার ফল এই শাস্ত্র ও দর্শন, নাম জানি আমরা তাঁদের কয়েকজনেরই মাত্র—কপিল, পতঞ্জলি ও মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা, কানুফা, শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, শান্তিদেব, শান্ত রক্ষিত, কমলশীল, মহাজেতারি, জেতারি, জ্ঞানশ্রীমিত্র, সরহ, কক্কুরীফা, লুইফা, শবর ফা প্রমুখ। চর্যাগীতি ও দোহাকোষ ছাড়া মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌলজ্ঞান নির্ণয়, লুইফার অভিসময় বিভঙ্গ, শীলভদ্রের আর্যবুদ্ধভূমি ব্যাখ্যান, শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার ও শিক্ষা-সমুচ্চয় প্রভৃতিই একালে প্রখ্যাত। বৌদ্ধযুগের বৌদ্ধ-সংকলিত সুভাষিত রত্নকোষ এবং সদুক্তিকর্ণামৃতে আমরা বহু বৌদ্ধ আর্যাকার ও শ্লোক-বচন রচয়িতার সন্ধান পাই। শেষ বৌদ্ধ রচক তেরো শতকের রামচন্দ্র কবিভারতী।

বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র বৌদ্ধ বংশজ ব্রাহ্মণ্যবাদীর অনুশীলনে ও পরিচর্যায় আরো বিকাশ লাভ করে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ যোগী (তাঁতী), বৈষ্ণব-সহজিয়া, হিন্দু-মুসলিম সমাজভুক্ত বাউল ও নাথপন্থীর মধ্যে এবং অন্যান্য অধ্যাত্ম-সাধক সম্প্রদায়ে নানা নামের আবরণে আজো চালু রয়েছে। দেহতত্ত্ব, দেহাত্মবাদ ও কায়াসাধন তাই বাঙালীর আদি ও অকৃত্রিম ধর্ম ও চর্যা। মধ্যযুগে গৌড়পাদ, পরিব্রাজকাচার্য, কৃষ্ণানন্দ আগামবাগীশ ও পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখ অনেকেই তন্ত্রশাস্ত্র গ্রন্থের সংকলক ও ভাষ্যকার।

আগেই বলেছি, শাস্ত্রীয় গ্রন্থের টীকা-ভাষ্য রচনায় বাঙালী পণ্ডিতদের উৎসাহের অভাব ছিল না। সেন আমল থেকেই বাঙলার বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্য সমাজে বেদ-বেদান্তের বহুল চর্চা শুরু হয়। উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরাজারা দীক্ষিত হিন্দুদের বর্ণে বিন্যস্ত করে উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মণ এনে শাস্ত্র ও সংহিতাদির অনুসরণে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় ছিলেন নিরত। তাই এগারো বারো শতকে ব্রাহ্মণ্য পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে সাড়ম্বরে পালিত হতে থাকে। তবু বিকৃত বৌদ্ধ সংস্কার জাত লৌকিক দেবতা এবং লোকায়ত আচার-সংস্কারও রয়ে গেল—বহু

চেষ্টায়ও বিদূরণ-বিনাশন সম্ভব হল না—প্রকাশ্যে যেখানে বাধা, সেখানে গুপ্তভাবে চলতে লাগল। তুর্কী বিজয়ের ফলে তা আবার শত গুণে বৃদ্ধি পেয়ে ও প্রবল হয়ে প্রকাশ পেল। কিন্তু যুগপৎ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রেরও অনুশীলন প্রবলভাবেই চলতে থাকে। ফলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের আলোচনা ও টীকা-ভাষ্য রচনা বৃদ্ধি পায়।

বৈদিক শাস্ত্র-সাহিত্যের টীকা-ভাষ্যকারদের মধ্যে শালিকনাথ (সপ্তম শতক) মদন (নবম শতক) ভট্ট ভবদেব (অষ্টম-নবম) জীমূত বাহন (বারশ') অনিরুদ্ধ (বারশ') বল্লাল সেন (বারশ') হলায়ুদ মিশ্র (বারশ') শূলপাণি (পনেরো শতক) বৃহস্পতি রায় মুকুট (পনেরো শতকের প্রথমার্ধ) শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, রঘুনন্দন (পনেরো শতক) এঁরা ছাড়াও চিৎসুখমণি, পুরুষোত্তম, গৌড়পূর্ণানন্দ কবি চক্রবর্তী, দর্ভপাণি, রাম নাথ সিদ্ধান্তবাচস্পতি, শ্রীকর আচার্য, কালি শিরোমণি, গদাধর ভট্টাচার্য, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতিও উল্লেখ্য।

ন্যায় দর্শনে শ্রীধর ভট্ট (৯৯১ খ্রী: ন্যায় কন্দলী) ও ভট্ট ভবদেব হলায়ুধ মিশ্র, কুল্লক ভট্ট, বৃহস্পতি রায়মুকুট, রঘুনাথ শিরোমণি, বাসুদেব সার্বভৌম, মধুসূদন সরস্বতী, নরহরি বিশারদ, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য, বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি, জানকি নাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণি, এবং বৈষ্ণব তত্ত্বালোচনায় সনাতন-রূপ জীব-গোপাল ভট্ট, পরমানন্দ সেন প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

ব্যাকরণ-অভিধান সংকলকদের মধ্যে ব্যাকরণে চন্দ্রগোমী, টীকায় সুভূতি চন্দ্র ও সুখনাত্ত বন্দ্যঘটীয় সবানন্দ উল্লেখ্য। ধ্রুবানন্দ, দৈবকী ঘটক, নুলু পঞ্চানন প্রভৃতির কুলজি সাহিত্য বা 'কুলপঞ্জী' রচয়িতা হিসেবে বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে অবশ্য স্মরণীয় নাম। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত এবং হলায়ুধ মিশ্রের শেখ শুভোদয়া কেবল কাব্য কিংবা জীবন চরিত নয়—সমকালের ইতিহাসও।

অলঙ্কার শাস্ত্রে রূপ গোস্বামী রচিত উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, কবি কর্ণপুরের অলঙ্কার-কৌস্তুভ বিশেষ অবদান। ছন্দ শাস্ত্রে আঠারো শতকের শেষার্ধের নরহরি চক্রবর্তীর ছন্দসমুদ্র স্মরণীয়। বৈদ্যক শাস্ত্রে তথা আয়ুর্বেদে শূলপাণি, মাধবকর (৭ শতক) চক্রপাণি দত্ত (১০৬০ খ্রী:) নারায়ণ (১১ শতক), গঙ্গাধর (১২ শতক) বিজয়রক্ষিত (১২৪০ খ্রী:) সুরেশ্বর (১৪ শতক), বঙ্গসেন (১৪ শতক) পরমেশ্বর রক্ষিত প্রভৃতি প্রধান। গণিত শাস্ত্রে শ্রীনিবাস বৃহস্পতি ও তাঁর পুত্রদ্বয় বিশ্রাম ও রাম স্মরণীয়। সঙ্গীত তরঙ্গ ও সঙ্গীত রত্ন রচয়িতা রাধা মোহন সেনের নামও উল্লেখ্য। কবিপণ্ডিত, চূড়ামণি আচার্য, কবিচক্রবর্তী, রায়মুকুট উপাধিধারী বৃহস্পতি বাঙলার সুলতানদের প্রিয় ছিলেন।

॥ ২ ॥

তিনটে আর্যা বা শ্লোক সংগ্রহ গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে। এর একটি বারো শতকের কবি গোবর্ধন আচার্য রচিত। ইনিও রাজা লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক ও সভাপণ্ডিত। জয়দেব ও সমকালের শক্তিমান কবি হিসেবে এঁর তারিফ করেছেন। গোবর্ধনের গ্রন্থের নাম 'আর্যাসপ্তশতী' কিন্তু আর্যা বা শ্লোক সংখ্যা হচেছ ৭৫৬। 'আর্যা' ছন্দের নাম, প্রাকৃতে যেমন একটি ছন্দের নাম গাথা। আর্যা ছন্দে রচিত বলেই গ্রন্থ নামে 'আর্যা'যুক্ত এবং প্রতিটি শ্লোকও আর্যা নামে পরিচিত। গাথা ছন্দে রচিত বলেই হালের কবিতা সংকলনের নাম 'গাহা সত্তসঈ।' শ্লোকগুলো বর্ণনানুক্রমিক 'ব্রজ্যা'য় তথা গুচেছ বিন্যস্ত।

গোবর্ধনের আর্যায় প্রেম, প্রকৃতি, লোকচরিত্র, লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাস, ঘরোয়া জীবন, আপ্তবাক্য প্রভৃতি সব কিছুই রয়েছে। তাই এটি সর্বভারতীয় প্রচার ও সমাদর লাভ করেছিল। দারিদ্র্য ও পীড়নের চিত্র রয়েছে ২৭, ৩০৪, ৩১৫, ৩৭১ ৪৯২ সংখ্যক আর্যায়।

বিদ্যাকর সংকলিত বহু কবির প্রকীর্ণ কবিতার সঞ্চয়নের নাম 'সুভাষিত রত্নকোষ'। এই সংকলন গ্রন্থের নামহীন খণ্ডাংশ আগেই উদ্ধার হয়েছিল, সে অংশ প্রকাশকালে F. W. Thomas নাম দিয়েছিলেন 'কবীন্দ্রবচন সমুচচয়'। অবশ্য পাণ্ডুলিপির এক স্থানে এ নামটি পাওয়া গিয়েছিল। সম্প্রতি সবটাই আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এটির সংকলক বিদ্যাকর প্রদত্ত নাম 'সুভাষিত রত্নকোষ'।

কবিগণের সবাই বারো শতকের পূর্বেকার বলে মনে হয়। কালিদাস–ভবভূতির শ্লোকও রয়েছে। ১১১ জন কবির অধিকাংশই অশ্রুতপূর্ব নাম,—এঁরা সম্ভবত গুপ্ত ও পাল আমলের এবং বৌদ্ধ সমাজে বহুল প্রচলিত কিছু নামও রয়েছে কবিদের। তাছাড়া বুদ্ধ প্রশস্তি দেখে বিদ্বানেরা অনুমান করেন, সংকলক বিদ্যাকর এবং কিছু কবি বৌদ্ধ ছিলেন। শৃঙ্গার ও ঋতু বিষয়ক পদের সংখ্যাই বেশী। উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা রূপে জন-জীবন ও জীবিকার, ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনের আচার ও সংস্কারের চিত্রও সুলভ। বাঙলার ও বাঙালীর প্রতিবেশ ও জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে বলেই অধিকাংশ পদ বাঙলার ও বাঙালীর বলে ধরে নিয়ে 'কবীন্দ্রবচন সমুচচয়'কে বা 'সুভাষিত রত্নকোষ'কে বাঙলার সম্পদ বলে দাবী করা হয়। বিশেষত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলো দৃষ্টে মনে হয় অধিকাংশ কবি আট-নয়-দশ-এগারো শতকের এবং তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী।

দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থটি সুবিখ্যাত 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের ২১ তম বছরে ১১২৭ শকে বা ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে এটি সংকলিত। সংকলক শ্রীধর দাস ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যে একজন শাসনকর্তা[১] বা মহামাণ্ডলিক। তাঁর পিতা বটুদাসও ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের বন্ধু ও প্রতিরাজ বা রাজপ্রতিনিধি। সদুক্তিকর্ণামৃতে সমকালীন বাঙালী কবিদেরও পদ সংকলিত রয়েছে—লক্ষ্মণ সেন কেশব সেন, দিবাক, জয়দেব, বাসুদেব সেন, ধোয়ী, শরণ উমাপতি ধর, গোবর্ধন, গঙ্গোক প্রভৃতির। এই গ্রন্থের প্রকীর্ণ বা চুটকী কবিতায় জীবন-জীবিকা, সমাজ-ধর্ম, রুচি সংস্কৃতি প্রেম-প্রকৃতি, আর্থিক-অবস্থা, নৈতিক-চেতনা প্রভৃতি উপমাদির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিকভাবে চিত্রিত হয়েছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে পদ সংখ্যা ২৩৭০ টি। কবির সংখ্যা ৪৮০। প্রায় পাঁচশত পদ অজ্ঞাতনাম কবিদের। পদগুলো বিষয়ানুযায়ী প্রবাহে বিভক্ত।

যাযাবর জীবনের অবসানে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যভিত্তিক নগর সভ্যতার শুরু থেকেই গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশা শাসন-শোষণে পীড়ন-পেষণে কেবল বেড়েইছে, অধিকাংশ মানুষ দাস হিসেবে তো গৃহপালিত পশুর প্রাপ্য আদর যত্নও পেত না। অন্যান্য মানুষও কেবল কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণটা কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখত— তাও সব সময় সম্ভব হত না। খরা-বন্যা-ঝঞ্চা-দুর্ভিক্ষ কিংবা মহামারীতে গাঁ উজাড় হয়ে যেত। সেকালে শাহ সামন্ত প্রভুর সহচর-অনুচর-নায়েব-গোমস্তা, মুৎসুদ্দি-মোল্লা-পুরুতরা ছিল সেকালের প্রবল প্রতাপ মধ্যবিত্ত এবং শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কারের নিয়ন্তা। তাদের হাতেই মার খেত গণমানব। সে মার ছিল শাস্ত্রিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক সর্ব প্রকার। এ জন্যেই দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ-অনাহার-মৃত্যু-পীড়ন-পেষণ ছিল সমাজে নিত্যকার দৃশ্য। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র কয়েকটি শ্লোকে সেই চিরন্তন চিত্রের স্বাক্ষর রয়েছে।

ক. ক্ষুৎ ক্ষামা শিশবঃ শবা ইব তনুর্মন্দাদরো বান্ধবো •
লিপ্তা জর্জর কর্করী জললবৈর্নো মাং তথা বাধতে
গেহিন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটায়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
কুপ্যন্তী প্রতিবেশিনী প্রতিমুহুঃ সূচীং যথা যাচিতা।

• শিশুসন্তানরা ক্ষুধায় পীড়িত, শবের মত শীর্ণ দেহ, আত্মীয়রা আদর করে না, পুরোনো জীর্ণ পাত্রে স্বল্প জল ধরে, এ সবও আমাকে তেমন দুঃখ দেয় নি,

১. ইখতিয়ারউদ্দীন ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে সম্ভবত নবদ্বীপ তথা গৌড় জয় করেন। 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' এর আগেই সংকলিত লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের ২৭তম বর্ষে। তা হলে লক্ষ্মণ সেন অন্তত ১১৭৬ সনের দিকে সিংহাসন পান। অতএব এগুলো ১২০৩ সনের পরের হতেই পারে না। অবশ্য অনুগত স্তাবক লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় স্বীকার না-ও করতে পারেন।

যেমন কষ্ট পেয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম আমার গৃহিণী করুণ হাসি হেসে ছিন্ন কাপড় সেলাই করবার জন্যে বিরক্ত প্রতিবেশীর কাছে সুঁচ ধার চাচ্ছেন।

খ. বৈরাগ্যেক ভনুতনুঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী
ক্ষুৎক্ষামেক্ষণ কুক্ষিভিশ্চ শিশুভির্ভোক্তুং সমভ্যর্থিতা
দীন দুস্থ কুটুম্বিয়া পরিগলদবাষ্পাম্বুধৌতানাপ্যেকং
তুণ্ডলমানকং দিনশতঃ নেতুং সমাকাঙ্ক্ষতি।

—বৈরাগ্যে তার সমুন্নত দেহ শীর্ণ, পরনে ছেঁড়া কাপড়, ক্ষুধায় শিশুদের চোখ কোটরাগত, পেট বসে গিয়েছে, তারা ব্যাকুল হয়ে খাদ্য চাইছে। দীনা দুস্থা গৃহিণী চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে—এক মণ চালে যেন তাদের একশ' দিন চলে।

গ. চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গণ্ডু পদার্থি মণ্ডুকাকীর্নং জীর্নং গৃহং মম।।

—ঘরের কাঠ খসে পড়ছে, দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় জড়ো হয়ে গেছে, আমার জীর্ণ ঘর কেঁচো খেকো ব্যাঙে আকীর্ণ।

এ চিত্র সেকালের নয়, আজকেরও। এচিত্র চিরকালের—চিরন্তন।

উক্ত দুই সংকলন গ্রন্থের যেসব কবিকে বাঙালী বলে অনুমান করা হয় তাঁরা হলেন মধুশীল, শ্রীধর নন্দী রতিপাল, ভ্রমর দেব, শ্রীহর্ষ দেব, বীর্যমিত্র, শ্রীধর্ম কর, বৈদ্যধন্য, বন্দ্য তথাগত, বিনয় দেব, শ্রীরাজ্য পাল, ধরণী ধর, লক্ষ্মীধর, সুবর্ণ রেখ, জয়ীক, বিত্তোক, বৈদ্যোক, ললিতোক, সিদ্ধোক, সোহ্নোক, হিঙ্গোক, জিতারি নন্দী, কবিরাজ ব্যাস, উদয়াদিত্য, বার, নীলাঙ্গ, বেতাল, বিরিঞ্চি, বাচস্পতি, ধর্মযোগেশ্বর। আর নিশ্চিত প্রমাণের বাঙালী কবি হচ্ছেন গৌড়াভিনন্দ, রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁর সভাসদ ও আত্মীয়রা এবং কমলগুপ্ত, রবিগুপ্ত, যজ্ঞঘোষ, চন্দ্রচন্দ্র, তিলচন্দ্র, লড়হ চন্দ্র, দিবাকর দত্ত, প্রভাকর দত্ত, কালিদাস নন্দী, ত্রিপুরারি পাল, গাঙ্গোক, নাথোক, বাথোক, ধনঞ্জয়, শবর ও বাঙ্গাল।

[সুকুমার সেন, ১ম পূ. পৃঃ ৩৪-৩৫]

প্রখ্যাত বাঙালী বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ 'অমর কোষের' প্রাচীনতম টীকাকার বলে কারো কারো বিশ্বাস। তাঁর রচিত টীকার নাম, 'টীকাসর্বস্ব'। এতেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহু আর্যা বা শ্লোক উদ্ধৃত। সেই সব শ্লোককারদের অনেকেই হয়তো বাঙালী। সর্বানন্দ বারো শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

তাঁর 'টীকাসর্বস্ব' ১১৫৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত। তাঁর 'টীকাসর্বস্ব' থেকে সে যুগের ব্যবহারিক জীবনের কিছু আভাস মেলে। যেমন—"বেদেকে 'বাদীয়ারা' বলা হতো। তারা সাপ ধরতো। লোকে জুয়া খেলতো। জুয়ার সাথীদের বলা হতো 'সহিঅর' এবং জুয়ার পণকে বলা হতো 'আঢ়'। তেলীরা চামড়ার মশকে তেল রাখতো এবং সেই মশকের নাম ছিল 'কুড়ুআ'। মেয়েরা খোপা (খোপা) বাঁধতো। ব'হুখণ্ড (বাউটি), তাড়ঙ্গ (তাড়), প্রভৃতি অলঙ্কার পরতো।। পুরুষেরা ঘোটাচূড় (বাবরি) রাখতো এবং টোপর পরতো। ঘোড় ও 'করকচ' নামে দুই রকমের লবণের ব্যবহার ছিল। পূর্ব বঙ্গের লোকে 'সিধম্যলা' (সুটকি মাছ) খেতো।"

[মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—বাংলা সাহিত্যের কথা– ১ম খণ্ড]

'বৃত্ত রত্নাকর' নামের গ্রন্থ রচয়িতা বাঙালী কেদার ভট্টেরই হয়তো পিতা ছিলেন 'বাসনামঞ্জরী' প্রণেতা পোব্যোক। পিতা-পুত্রের দুই গ্রন্থেই রয়েছে জন-জীবনের চিত্রসম্বলিত বহু শ্লোক। পনেরো শতকে সংকলিত 'সুভাষিতাবলী' নামের শ্লোক সংগ্রহ গ্রন্থটি এ সূত্রে স্মরণীয় এবং ষোল শতকের রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলীধৃত' কিছু শ্লোক এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

বারো শতকে ভারত বিখ্যাত কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। বন্দনাংশে গৌতমবুদ্ধও প্রণাম পেয়েছেন এবং বন্দনাংশে কবি স্বয়ং একে মঙ্গলগান বলেছেন—'মঙ্গলম উজ্জ্বল গীতি'। গীতগোবিন্দ একটি নৃত্য সম্বলিত গীতিনাট্য। তা সত্ত্বেও এটি একটি উৎকৃষ্ট কাব্যও—এমন কি, মহাকাব্যের আঙ্গিক আদল যুক্ত। 'গীতগোবিন্দ' বারোটি সর্গে বিভক্ত। এতে চব্বিশটি গান রয়েছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে শ্লোক। বসন্তকালে রাধা ও কৃষ্ণের মান জাত বিচ্ছেদ ও পরিণামে সখীর মধ্যস্থতায় মিলনই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। ছন্দলালিত্যে ভাষাসারল্যে রসমাধুর্যে এবং মৌলিকতায় 'গীতগোবিন্দ' অনন্য।

জয়দেব 'কেন্দুবিল্বসম্ভব রোহিণীরমণ' বলে ভণিতায় আত্ম পরিচয় দিয়েছেন। এতে বোঝা যায় তাঁর জন্ম 'কেন্দুবিল্ব' গ্রামে এবং স্ত্রীর নাম রোহিণী। বীরভূমে এখন কোন কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলী গাঁ নেই। কিন্তু অজয় নদীর তীরে 'জয়দেব কেঁদুলী' মেলা আছে। ঐখানেই কেন্দুবিল্লি কেঁদুলী গাঁ আছে। তবে জয়দেব 'কেঁদুলী মেলা' বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠিতও হতে পারে, অথবা তিনি ভিন্ন জয়দেবও হতে পারেন। এই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে উড়িষ্যাবাসীরা এখন জয়দেবকে উড়িয়া বলে দাবী করেন। সেখানে নাকি পুরীর অদূরে 'কেন্দুবিল্ব' গাঁ আজো বর্তমান। মিথিলাবাসীরাও বলেন তীরহুত জেলার কেন্দুলীতে ছিল জয়দেবের নিবাস।

দ্বিজ মোহনদাসের 'ভক্তমাল'[১] সূত্রে জানা যায় 'কেন্দুবিল্লি গ্রাম আছে অজয় কিনারে।' এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের গন্ধর্বমতে মালা বদলের মাধ্যমে 'পুষ্পের বিভা দোঁহার হইলা।'—এ তথ্য যদি বানানো না হয়, তা হলে বলতে হবে পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের সম্পর্কের সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না।

গীতগোবিন্দের কোন কোন পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি শ্লোকে জয়দেবের আত্ম-পরিচয় রয়েছে। শ্লোকটি :—

শ্রীভোজ দেব প্রভবস্য বামা (রামা) দেবীসূতঃ শ্রীজয়দেবকস্য
পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকন্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু।

অতএব কবির পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামা বা রামা দেবী। ডক্টর সুকুমার সেন "বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় অর্থে 'বন্ধু'" ব্যবহৃত ধরে পরাশরকে শ্যালক ও প্রধান গায়ক বলে অনুমান করেছেন। নাচে পদ্মাবতী এবং গানে পরাশরাদি দোহার ছিল, আর জয়দেব স্বয়ং ছিলেন নৃত্য শিক্ষক [পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তী] ও দলের অধিকারী। তা হলে জয়দেব পেশায় ছিলেন কবি-গায়েন। গীতগোবিন্দের গানগুলো সখী রাধা ও কৃষ্ণের গেয়। বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা—যেখানেই জয়দেবের জন্ম হোক না কেন তিনি যে গৌড়ে ছিলেন এবং লক্ষ্মণ সেনের সভায় ও সভাকবিদের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। অতএব তিনিও বিদ্যাপতির মতোই বাঙলার ও বাঙালীর কবি। 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' ধৃত এ শ্লোকটি আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে :

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ জঙ্গমহরে সংকল্পকল্পদ্রুম
শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজক সভালঙ্কার কারাপিত
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোঽসি তুষ্টাবয়ম্।

তাছাড়া ষোল শতকে রচিত দ্বিজ মোহন দাসের 'ভক্তমাল' গ্রন্থে এবং আঠার শতকে রচিত বনমালী দাসের 'জয়দেবচরিত' গ্রন্থে জয়দেবের জন্মভূমি বীরভূমে 'কেন্দুবিল্লি' গাঁয়ে বলে উল্লেখ রয়েছে (সুখময় মুখোপাধ্যায় : 'প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়' জয়দেব, পৃঃ ১৩—১৪।) এবং ষোল শতকে সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থে ও কোচবিহাররাজ নরনারায়ণের (১৫৫৫—৮৭) সভাকবি

১. 'ভক্তমাল' পথির পরম্পরায় 'জয়দেব-পদ্মাবতী কথা' ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল 'সুবর্ণ লেখ' ক. বি : পঃ ৫৯৬—৬০৪।

শুক্লংবজরচিত গীতগোবিন্দের টীকায় যথাক্রমে জয়দেবকে কবিমন্ত্রী উমাপতিধরের সহচর ও লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

জয়দেব একটি শ্লোকে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন:

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈবাচার্য গোবর্ধনস্পর্ধ
কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিলক্ষ্মাপতি।

—উমাপতিধর বাক্য পল্লবিত করেন, জয়দেব শুদ্ধসন্দর্ভরচনায় সমর্থ, দ্রুত দুরূহপদরচনায় শরণ শ্লাঘ্য, শৃঙ্গার রসের সৎ ও প্রমেয় (পরিমিত) পরিবেশনায় গোবর্ধনাচার্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিশ্রুত আর কবিলক্ষ্ম-পতি (কবিরাজ) ধোয়ী শ্রুতিধর। এতে হলায়ুধ মিশ্রের নাম নেই। বলা বাহুল্য জয়দেব, উমাপতিধর ও শরণের প্রকীর্ণ কবিতা, গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতী, ধোয়ীর 'পবনদূত', নট গঙ্গোকের-শ্লোক, হলায়ুধ মিশ্রের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' নামক মীমাংসাগ্রন্থ ও 'শেখশুভোদয়া' রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভা অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। পবন দূতের নায়ক লক্ষ্মণ সেন, এটি বিরহকাব্য 'মেঘদূতের' আদলে রচিত; শ্লোক সংখ্যা ১০৪। বিচ্ছিন্ন শ্লোকও তিনি রচনা করেন। পনেরো শতকে সংকলিত শ্লোকগ্রন্থ সুভাষিতাবলীতেও লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের উল্লেখ রয়েছে:

গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতো [বা পঞ্চৈতে] লক্ষ্মণ সেনস্য চ।

দীর্ঘজীবী উমাপতিধর বল্লাল সেনও লক্ষ্মণ সেনের সভায় ছিলেন, দেওপাড়ার বিজয়সেন প্রশস্তি ও মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন তাঁরই রচিত বলে মনে করা হয়। সদুক্তিকর্ণামৃতে তাঁর নব্বইটি শ্লোক ধৃত রয়েছে। তুর্কী শাসক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজীরও তিনি আনুগত্য স্বীকার করে স্বপদে হয়তো বহাল থেকেছেন, সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত একটি শ্লোকই তার প্রমাণ:

সাধুম্লেচ্ছ নরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূর্নীচে না পি
ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ততে।

—সাধু হে ম্লেচ্ছরাজ, সাধু, আপনার বীর প্রসবিণী মাতা, নীচ (কুলোদ্ভবা) হলেও আপনার মতো লোক দিয়েই পৃথিবী এখনো সুক্ষত্রিয় পূর্ণ রয়েছে।

কবি ধোয়ীর একটি শ্লোকে বাঙালীসুলভ কামনা প্রকাশ পেয়েছে—ঐশ্বর্য নয় ঈশ্বরী পাটনীর মতো 'দুধ-ভাত', কবিযশ, গঙ্গাতীরে বাস, সজ্জনের প্রীতি ও অচলা বিষ্ণুভক্তি ইত্যাদি। তেরো শতকের কবি রামচন্দ্র কবিভারতীর 'ভক্তি শতক' ও 'বৃত্তমালা' উল্লেখ্য রচনা।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় সংস্কৃত রচনার একটি নামসার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হল। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা বাঙলার ও বাঙালীর শাস্ত্র সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবহমান রেখেছিলেন, যাঁরা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁদের নাম অন্তত আমাদের স্মরণে রাখা আবশ্যিক। তেমন নাম হচ্ছে শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, অতীশ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, কপিল, গোরক্ষ নাথ, হাড়িফা, কানুফা, শান্তিদেব, শান্তরক্ষিত, ভবদেব ভট্ট শ্রীহর্ষ, অনিরুদ্ধ, রঘুনন্দন, ন্যায়কন্দলী প্রণেতা শ্রীধর ভট্ট, উমাপতি, জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, হলায়ুধ মিশ্র, গোবর্ধন, বল্লাল সেন, জীমূত বাহন, সন্ধ্যাকর নন্দী, বিদাকর, সর্বানন্দ, গৌড়াভিনন্দ, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, গোবিন্দ দাস, শ্রীধর দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, ধ্রুবানন্দ, দৈবকী, নুলু পঞ্চানন, স্বরূপ দামোদর, বিল্বমঙ্গল (কর্ণামৃত রচয়িতা) প্রভৃতি।

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ রচনা

বাঙলাদেশে বাঙালী সংকলিত বা রচিত কোন প্রাকৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। মৌর্য বংশীয় রাজার একটি প্রাকৃতে রচিত অনুশাসন লিপি পাওয়া গেছে পুণ্ড্র বর্ধন এলাকায় মহাস্থান গড়ে। তাও বাঙালীর রচনা না হওয়ারই কথা। কারণ তখনো বাঙালী আর্যভাষায় পটু হয়ে ওঠেনি।

দাক্ষিণাত্যে মারাঠী প্রাকৃতে সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' হচ্ছে প্রাপ্ত প্রাচীনতম পদ সংগ্রহ গ্রন্থ। এর সংকলক হাল। হাল স্বয়ং রাজা বলে উল্লিখিত। কিন্তু কোন সময়ের কোথাকার ও কোন বংশের রাজা তিনি তা অনির্ণীত। কেউ বলছেন তিনি সাতবাহন বংশীয় রাজা। তাহলে তিনি খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের কোন এক সময় বর্তমান ছিলেন বলে মানতে হয়। কিন্তু তাঁর সংকলিত কবিতাগুলির অধিকাংশ ভাবে, ভাষায় ও বিষয়বস্তুতে অন্তত আরো ছয়-সাতশ' বছর পরের। কাজেই তিনি ঐ সময়কার সাতবাহন বংশীয় ন'ন। আবার কেউ কেউ বলেন হাল পাঁচ শতকের শালবাহন বংশীয়ই ছিলেন হয়তো। কিন্তু সে বংশীয় হলেই সে কালেরও হতে হবে এমন কোন কারণ নেই। আমাদের অনুমান তিনি সাত-আট শতকে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের কোন এলাকার সামন্ত রাজা ছিলেন। তাঁর সংকলিত

গ্রন্থে ভারতের নানা অঞ্চলের পদ সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর সংগৃহীত একটি পদে রাধার (রাহিআর) নাম রয়েছে। আট শতকের আগে রাধা নাম ছিল অজ্ঞাত। দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণ প্রিয়ার নাম ছিল 'নাপ্পিনাই'—রাধা নয়। পরবর্তীকালে ব্রহ্ম বৈবর্ত, মৎস্য, স্কন্দ, পদ্ম ও দেবী ভাগবত পুরাণে, তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে, পঞ্চতন্ত্রে ও বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রে 'রাধা' প্রসঙ্গ সংযোজিত হয়ে ঐ-গুলো প্রাচীনত্বের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য লাভ করেছে। অথচ ষোল শতকেও সনাতন গোস্বামী শাস্ত্র গ্রন্থে রাধা নাম খোঁজ করে ব্যর্থ হয়ে ভাগবতের 'অনয়ারাধিতং'-এর মধ্যে রাধা নাম আবিষ্কার করে তুষ্ট ছিলেন [বৈষ্ণবতোষিণী]। আট শতকে রচিত ভট্ট নারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকেই প্রথম নিশ্চিতভাবে রাধা নাম মেলে।

—[গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্—। নান্দীশ্লোক]

তাছাড়া 'গাহাসত্তসঈ'-র সব পদের ভাষা সমান প্রাচীন নয়। কাম-প্রেম-বিরহ-বিচ্ছেদ সম্পৃক্ত পদসম্বলিত বহুল প্রচলিত এই পদসংকলন গ্রন্থের সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা ছিল, বাঙালাদেশেও এর বহুল প্রচার ছিল, বাঙালীর আর্যা, গাথা বা প্রকীর্ণ কবিতা রচনার মূলে হাল-এর 'গাহাসত্তসঈ' বা গাথাসপ্তশতীর ও চৌদ্দ শতকের বলে কথিত পিঙ্গল [ফণীন্দ্র ?] সংকলিত প্রাকৃতপৈঙ্গলের প্রভাব, গভীর ও ব্যাপক ছিল বলে বিদ্বানদের ধারণা। তাই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের উপক্রমে এদুটো গ্রন্থের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত। উক্ত দুই গ্রন্থে ধৃত কাম-প্রেম-বিরহের পদগুলো যেন পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস।

প্রাকৃতপৈঙ্গলের পদগুলো প্রাকৃতে ও শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত। এটি ছন্দ গ্রন্থ। ছন্দের দৃষ্টান্ত স্বরূপই পদগুলি সংকলিত। অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ অংশের কোন কোন শ্লোক হয়তো বাঙলা অঞ্চলের বা বাঙালীর রচনা। কেন না কয়েকটি পদের ভাষা প্রায় প্রাচীন বাঙলার কাছাকাছি। এই পদগুলোতেও প্রেম-প্রকৃতি-বিরহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি ছাড়াও সাধারণ গৃহস্থের ঘরোয়া জীবনের বাস্তব আলেখ্যও মেলে। হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য বর্ণনার রূপকে এ যেন দরিদ্র বাঙালীর চিত্র। যেমন:

ক. বালো কুমারো ছঅ মুণ্ডধারী
উবাঅ হীনা মুই এক নারী।
অহং নিসং খাই বিসং ভিখারী
গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী

—পুত্র এখনো বালক, ছয়জন পোষ্য অথবা আমার ছয়মুণ্ড ধারী পুত্র এখনো

৭—আ. শ.

বালক, আমি একা উপায়হীনা নারী। ভিখারী-(স্বামী শিব) অহর্নিশ বিষ (নেশা) খায়, আমার কি গতি হবে।

তুলনীয় টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী
বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাঅ
দুহিল দুধ কি বেন্টে সামায়।—ঢেন্টনপাদ।

খ. পুত্ত-পবিত্ত বহু তধণা ভত্তি কুটুম্বিনী সুদ্ধমণা
হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা কো কর বব্বর সগ্‌গমণা।

—নিষ্পাপ পুত্র, বহুধন, শুদ্ধ স্বভাবা ও ভক্তিমতী গৃহিণী, হাঁকে ত্রস্ত ভৃত্য (যার ঘরে থাকে), সে বর্বর (না হলে) কি স্বর্গ কামনা করে?

গ. সো মানিঅ পুন্নবংত জাসু ভত্ত পং ডিঅ তণঅ
জাসু ঘরিণি গুণবংতি হোবি পুহবী সগ্‌গ নিলঅ।

—সেই পুণ্যবান যার (পিতৃ) ভক্ত পণ্ডিত পুত্র আছে, যার গৃহিণী গুণবতী হবে, তার পৃথিবীই স্বর্গ নিলয়।

ঘ. রাআ লুদ্ধ সমাজ খল
বহু কলহারিণ সেবক ধুত্তউ।
জীবন চাহসি সুকখ জই
পরিহর ঘর জই বহু গুণ জুত্তউ।

(যেখানে) রাজা লোভী, সমাজ খল, স্ত্রী ঝগড়াটে, সেবক ধূর্ত, (সেখানে সুখ নেই), যদি জীবনে সুখ চাও, তাহলে বহুগুণযুক্ত (অর্থাৎ সুখ-সম্পদের অন্য উপকরণ থাকা সত্ত্বেও) গৃহ ত্যাগ কর।

ঙ. ক্ষীণ প্রাণ দরিদ্র মানুষের ভীরু বুকের চরম-আকাঙ্ক্ষার ও স্বপ্নের সুখচিত্র:

ওগ্‌গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা
মোইণি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা খাই পুণ্যবন্তা।

—কলাপাতার উপর দুধ-ঘি-মাখা ওগরাভাত মোরলা (ময়না ?) মাছ আর নালতে শাক দিয়ে খাচ্ছেন পুণ্যবান—দিচ্ছেন কান্তা (স্ত্রী)।

প্রাকৃতপৈঙ্গলধৃত কবি বিদ্যাধর রচিত কিছু পদে কাশীশ্বর বা কাশী-রাজের বল-বিক্রম-বিজয়ের সগর্ব বর্ণনা রয়েছে। এই রাজার ভয়ে বঙ্গ, কলিঙ্গ, তেলঙ্গা, মারাঠা-সৌরাষ্ট্র-মালব কর্ণাট-গুর্জর সব পদানত বা পলাতক। এতেই মনে হয় সংকলক পিঙ্গলও কাশীশ্বরের অনুগত ও প্রসাদজীবী ছিলেন। অবশ্য এখানে রাজপুত বীর হাম্বীর ও সহযোগী সেনাপতি জজ্জলেরও শৌর্য ও রণনৈপুণ্য জ্ঞাপক পদও রয়েছে।

আগেই বলেছি ভারতের শিক্ষা-সাহিত্য-শাসন ও সংস্কৃতির ভাষা ছিল সংস্কৃত। তাই সর্বভারতীয় প্রচার ও প্রসার উদ্দেশ্যে জৈন-বৌদ্ধরাও শাস্ত্রীয় পালি-প্রাকৃতের টীকা-ভাষ্য সংস্কৃতেই রচনা করতেন। বৌদ্ধের প্রাকৃত-মিশ্রিত ও ব্যাকরণ বিরুদ্ধ সংস্কৃত কালে 'বৌদ্ধ-সংস্কৃত' নামে ধিকৃতও হয়। আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাবল্যের কারণে কালে বাঙলার জৈন-বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সাগ্রহে সংস্কৃত চর্চা করেছে হয়তো কতকটা জৈন-বৌদ্ধ বিদ্বেষ কিংবা ঐ ঐতিহ্য-বিস্মৃতির আগ্রহবশেই। তাই বাঙালী ব্রাহ্মণ্যবাদীর প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহঠট রচনা দুর্লক্ষ্য। অন্যদিকে বাঙলার বিকৃত জৈন-বৌদ্ধমতবাদীরা প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহঠটেই তাঁদের শাস্ত্র চর্চার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বস্তুত বাঙলাদেশে সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙলার যোগসূত্র রক্ষা পেয়েছে বজ্র সহজযানী ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ রচনার মাধ্যমেই। অবহঠট বিশেষ করে শৌরসেনী অবহঠট চৌদ্দ-পনেরো শতক অবধি সাহিত্যের জনপ্রিয় বাহন ছিল। তাই শাস্ত্রে ও সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত বিদ্যাপতিকেও রাজা শিবসিংহের প্রশস্তি গ্রন্থ 'কীর্তিলতা' অবহঠটে রচনা করতে দেখি। আট শতক থেকেই সম্ভবত বাঙলাদেশেও লেখ্য অপভ্রংশ অর্থাৎ শৌরসেনী গণভাষারূপে জন প্রিয়তা লাভ করে। তাই যোগতান্ত্রিক গুহ্যসাধনার কতকগুলো গ্রন্থ উক্ত ভাষায় রচিত ও লিপিবদ্ধ দেখতে পাই।

বজ্রসত্ত্ব বা বজ্রধরের (হে বজ্র, হেরুক) সাধকরাই বজ্রী ও বজ্রকুল। সেই বজ্র-কুলই আধুনিক বাউল, [বজ্রকুল> বজ্জউল> বাজুল> বাউল অথবা বজ্রী> বজ্জির> বজ্জিল> বাজিল]

বৈষ্ণব সহজিয়া ও শৈব নাথপন্থীরা হচ্ছে সেই বজ্র-সহজযানী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, অন্য কথায় যোগ-তান্ত্রিক-সহজ সাধক। অনাদি নাথ, আদিনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ নাথই বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে ব্রাহ্মণ্য শৈবতন্ত্রের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে আত্ম-

রক্ষা করেছেন। সহজিয়া ও বাউল গানে ও চর্যায় আজো সেই সাধনার আবর্তিত ও বিবর্তিত রূপ চালু রয়েছে। সহজযানী যোগী সিদ্ধাদের রচিত সাধনতত্ত্ব, দোহা ও চর্যাগীতি আমাদের হাতে এসেছে। এগুলোর অধিকাংশ বাঙালীর রচনা ও বাঙলার নিজস্ব ধর্মতত্ত্বের ধারক। কাজেই শৌরসেনী অপভ্রংশে—অবহট্‌ঠটে রচিত হলেও এগুলো বাঙলার ভাষা-সাহিত্য-শাস্ত্র ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ ও উৎস। অতএব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত ডাকার্ণব, সুভাষিত সংগ্রহ, দোহাকোষ পঞ্জিকা, সরোরুহবজ্রের দোহাকোষ, কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ, ডক্টর প্রবোধ বাগচি সংগৃহীত তিলপাদ ও সরহপাদের দোহাকোষ আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেও উল্লেখ্য। এগুলো সাত থেকে বারশতকের মধ্যেকার রচনা। উক্ত সব গ্রন্থই সটীক। টীকার ভাষা সংস্কৃত। সরোরুহ, সরহ, সরোজ ও পদ্ম অভিন্নার্থক।

একই ব্যক্তির নাম সংস্কৃত ও প্রাকৃত রূপে ভিন্নতর হতে পারে। তবু এঁরা অভিন্ন কি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তা নিরূপণ করা কঠিন। সরহ হে বজ্রতন্ত্র প্রভৃতি পঁয়ত্রিশ খানা তন্ত্রগ্রন্থ, অন্যূন ছয়খানি বিভিন্ন বিষয়ক দোহাকোষ এবং চারটি চর্যাগীতির রচয়িতা। সবকয়টি বজ্রসত্ত্ব ও বজ্রসহজযান তত্ত্ব সম্পর্কিত রচনা। কাজেই এই সব অভিন্ন ব্যক্তির রচনাও হতে পারে। তবে বিদ্বানেরাও অনুমান করেন, পদকার দোহাকার ও তন্ত্রকার তিনজন ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এই অনুমানের ভিত্তি তেমন প্রবল নয়। কৃষ্ণাচার্যও তিনজন বলে অনুমিত। একজন তন্ত্রকার, একজন যোগীসিদ্ধা এবং অন্যজন দোহাকার পদকার।

রাজপুত রাজাদের প্রশাসনিক কার্যে ব্যবহৃত হয়ে এবং নাটকের সংলাপে স্থান পেয়ে শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ লেখ্য বা শিষ্ট ভাষার মর্যাদা পায় প্রায় পাঁচ শতক থেকে। পরে তা অনুকৃত হয়ে সর্বভারতীয় ব্যবহারের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই বাঙালী কানুফা প্রমুখ সবাই ঐ প্রাকৃত ও অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠকে তাঁদের রচনার বাহন করেন। প্রাপ্ত দোহা ও ডাকার্ণব তা-ই শৌরসেনী অবহট্‌ঠে রচিত। চর্যাপদগুলোও গণবোধ্য করে অর্বাচীন অবহট্‌ঠে রচিত এবং এই লোকপ্রিয় গীতিগুলো বহু কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে হয়ে বিশেষভাবে স্থানীয় বুলির প্রভাবে পড়েছে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

তবে এ-ক্ষেত্রে একটি গুরুতত্ত্ব ও তথ্য স্মরণীয়। তেরো ও চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধ অবধি অর্বাচীন অবহট্‌ঠে ব্যতীত কোন স্থানীয় বুলিতে কোথাও কোন শিষ্ট বা লেখ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি। অর্থাৎ তখনো নব্য ভারতীয় আর্যবুলি লিখবার ভাষায় গৃহীত বা উন্নীত হয় নি। সেই রেওয়াজ চালু হয় চৌদ্দ শতকের

মাঝামাঝি থেকে। আবদুর রহমানের সন্দেশরাসক, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ চন্দ্রবর্দায়ের পৃথ্বিরাজ রাজসূয় প্রভৃতি দিয়ে নব্যভারতীয় আর্যবুলির লেখ্যভাষার মর্যাদা প্রাপ্তির শুরু বলা চলে।

তিল্লোপা, তৈলপা, তিলোপা, তিলিপা প্রভৃতি নানা উচ্চারণে তিলপার নাম বিকৃত ও বিচিত্র। অনেক বিদ্বান মনে করেন তিলপা দুইজন · একজন উড়িষ্যাবাসী, অপরজন চট্টগ্রামবাসী। এঁরা হয় তেলীসন্তান, নয়তো ব্রাহ্মণ। এঁদের যিনি চট্টগ্রামবাসী—তাঁর সিদ্ধনাম প্রজ্ঞাভদ্র এবং তিনি দোহাকার ও চারখানা বজ্রতত্ত্ব রচয়িতা। তাঁরই শিষ্য ছিলেন নাড়োপা।

আমাদের যোগপন্থ, নাথপন্থ, সহজপন্থ তার আধুনিক রূপ সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল পন্থ ছাড়াও তান্ত্রিক ও দেশী সূফী তত্ত্ব ও চর্যা জানবার বুঝবার জন্যেও উৎস হিসেবে এই বজ্রযোগী সহজপন্থীদের চর্যা ও চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি আবশ্যিক। এঁরা ব্রাহ্মণ্য দেব-দ্বিজ-বেদদ্বেষী, ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি বিরোধী, এঁরা দেহবাদী, দেহাত্মবাদী, কখনো নাস্তিক, কখনো আস্তিক, কখনো বামা বর্জিত কায়সাধক, কখনো বা বামাচারী দেহসাধক। এ বিষয়ে সহজিয়া ও বাউল প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। যোগতান্ত্রিক সাধনা সবারই অবলম্বন। এবং সবাই গুরুবাদী। কাহ্নপা বলেন:

"আগম বেঅ পুরাণে পণ্ডিত্ত মান বহংতি
পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভমর্যান্তি।"

—আগম-বেদ-পুরাণ পড়ে পণ্ডিত মান বহন করে, পাকা বেলের চারদিকে যেমন অলি বৃথা ঘুরে বেড়ায়।

তিলপা বলেন: দেব ন পূজহ তিত্থ ন জাবা
"দেব পূজাহি ন মোকখ পাবা।"

—দেবপূজা করো না, তীর্থে যেয়ো না, (কারণ) দেব পূজায় মোক্ষ পাবে না।

সরহ বলেন:

জই নগ্গা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ শিআলহ।

—নগ্ন হলেই যদি মুক্তি হয়, তা হলে সুন (কুকুর) শিয়ালেরও মুক্তি হবে।

আবার,

কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ নিবেজ্জেঁ
কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সেববঁ।
কিন্তহ তিত্থ তপোবণে জাই
মোক্‌খ কি লবভই পানী কাই।

—কি হবে তোর দীপে, কি হবে নৈবেদ্যে, মন্ত্রের সেবাতেই বা তোর কি কাজ হবে? কী হবে তোর তীর্থ-তপোবনে যেয়ে, স্নান করলেই কি মোক্ষ লাভ হয়?

দেহ-ই সব তত্ত্ব ও তথ্যের আধার, কায়াসাধনই সার:

এথু সে সুরসরি জুমণা এথু সে গাঙ্গা সাঅরু
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু।

—এখানেই (দেহের মধ্যেই) মন্দাকিণী যমুনা-গঙ্গা। এখানেই প্রয়াগ বারাণসী, এখানেই আছে চন্দ্র-সূর্য।

অন্যত্র—

ঘরে অচ্ছ, ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই।

—ঘরে (দেহে) আছে; ঘরেই আছে, বাইরে কোথায় জিজ্ঞাসা করছ?

কাহ্নপা বলেন—

বুঝি অবিরল সহজ সুণ কাহি বেঅপুরাণ

—সহজ শূন্য বোঝার পর বেদ-পুরাণে কি দরকার?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'য় রয়েছে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব। সবগুলোই সটীক গ্রন্থ—অর্থাৎ টীকা ভাষ্য গ্রন্থ।

টীকাকার মুনিদত্ত রচিত চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে টীকার শুরু 'নমঃ শ্রীবজ্রযোগিন্যৈ' টীকাকার অদ্বয়বজ্র রচিত সরোজবজ্রের দোহাকোষের টীকা সহজাম্নায় পঞ্জিকার' আরম্ভ 'নমশ্রীবজ্রসত্ত্বায়।' কৃষ্ণাচার্য পাদের দোহাকোষের টীকা মেখলার শুরু 'ওঁ নমো বজ্রধরায়'। ডাকার্ণবের শুরু 'ওঁ নমঃ সর্ব্বীর বীরেশ্বরীভ্যঃ' ডাকার্ণব জৈনমতের প্রবর্তক মহাবীর বন্দনায় ও মহাবীরেশ্বর বুদ্ধ উবাচ দিয়ে শুরু হলেও বজ্রধর, মহাসুখ, সহজসুন্দরী, বুদ্ধ, যোগিনীচক্র প্রভৃতি সবটাই বজ্র-সহজ তত্ত্ববিষয়ক। কাজেই ডাকার্ণবও আমাদের তত্ত্ব শাস্ত্রের উৎস।

সেক শুভোদয়া

কয়েকটি বাঙলা পদ সম্বলিত গদ্যে পদ্যে রচিত একটি সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল মালদহের বাইশ হাজারী মসজিদে। হলায়ুধ মিশ্রের ভণিতাযুক্ত এ গ্রন্থের নাম 'সেক শুভোদয়া'। মসজিদটি জালালউদ্দিন তাবরেজী নামের দরবেশ নির্মিত ও বাঙলার প্রথম মসজিদ বলে পরিচিত। উনিশ শতকের শেষ দশকের গোড়ার দিকে মালদহের তখনকার জিলা প্রশাসক উমেশচন্দ্র বটব্যাল হরিদাস পালিত নামের স্থানীয় হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের সাহায্যে সেক শুভোদয়ার পুথিটি হস্তগত করেন এবং স্থানীয় জিলা স্কুলের শিক্ষক রজনীকান্ত চক্রবর্তীর সাহায্যে উক্ত গ্রন্থের পাঠোদ্ধার সূত্রে একটি খসড়া ও একটি চূড়ান্ত পাঠ সম্বলিত পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন। বটব্যাল বদলী হওয়ার সময় মূল পুথিটি ও চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। ১৮৯৮ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে খোঁজ করে এই দুটো পাণ্ডুলিপির একটিও পাওয়া যায়নি। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর খসড়া-নির্ভর একটি সংস্করণ ১৯২৭ সনে বের হয়েছিল। ১৯৬৩ সনে ডক্টর সুকুমার সেন ইংরেজী অনুবাদসহ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল থেকে একটি অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ সংস্করণ বের করেন।

মূল পুথিটি কতকালের পুরানো তা' আর জানবার উপায় নেই। ১৯২৭ সনের সংস্করণের ভূমিকায় পুথিটি প্রাচীন বাঙলা হরফে (Early Bengali Script) লিপীকৃত বলে উল্লেখ করা হয়। ডক্টর সুকুমার সেন পুথি না দেখেও অনুমান করেন লিপিকাল সতেরো শতকের শেষ বা আঠারো শতকের গোড়ার দিক বলে।

আজ অবধি যাঁরাই 'সেক শুভোদয়া' সম্পর্কে কথা বলেছেন, তাঁরা এর 'অকৃত্রিমতা' সম্বন্ধে সন্দেহ কিংবা অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। তার কারণ কয়েকটি বিষয়ে তাঁরা সুনিশ্চিত নন :

ক. জালালউদ্দিন তাবরেজীর অস্তিত্ব ও পরিচয়—তাঁর বঙ্গে আগমনের দলিলাভাব।

খ. গ্রন্থোক্ত বিষয় সুগ্রথিত নয়। বাস্তবে, কল্পনায় ও গল্পে সামঞ্জস্য নেই।

গ. সম্পত্তির লোভে বাইশ হাজারী মসজিদের মুতোয়াল্লী কর্তৃক এই (জাল) গ্রন্থ রচনা করানো অসম্ভব নয়। কয়েকটি গ্রামকে পীরোত্তর সম্পত্তি

হিসাবে দাবী করার জন্যই টোডরমলের জরীপ কালে এটি রচিত—এমন জনশ্রুতি দরগাহ এলাকায় নাকি চালুও আছে।

ঘ. ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত।

ঙ. তুর্কী বিজয়ের পূর্বে মুসলিম বিহীন বা বিরল গৌড়ে হিন্দুরাজার মসজিদ নির্মাণে অনুমতি দানের কারণ নেই। বিশেষত রাজা লক্ষ্মণ সেন তুর্কী বা বিদেশী বিদ্বেষী ছিলেন।

সম্পাদক ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর ভূমিকায় নানা স্থানে তাঁর মানস দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্বাক্ষর রেখেছেন :

ক. এ গ্রন্থ ষোল শতকের শেষার্ধে রচিত বলে তিনি বিশ্বাস করেন, তবু স্বীকার করেন যে এ গ্রন্থে ইতিহাসের ছিটে ফোঁটা রয়েছে, বিশেষ করে লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, হলায়ুধ মিশ্র, ধোয়ী, গঙ্গো বা গঙ্গোক এবং বিজয় সেন ও রামপাল ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাছাড়া উমাপতি ধর ও লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে অসদ্ভাবের এবং লক্ষ্মণ সেনের পত্নী বল্লভা ও শ্যালক কুমার দত্তের কাহিনীর ইঙ্গিত তিনি মেরুতুঙ্গাচার্যের প্রবন্ধ চিন্তামণি' গ্রন্থেও পেয়েছেন।

খ. লক্ষ্মণ সেন যে বিদেশী তুর্কী বা মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন তা'ও তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ সূত্রে স্বীকার করেছেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-ধৃত কবি শরণের একটি রাজস্তুতিমূলক পদে এ কথাটিও রয়েছে 'ম্লেচ্ছান স্বেচ্ছা বিনাশম নয়তি'। (তিনি) স্বেচ্ছায় ম্লেচ্ছ (তুর্কী)-দের হত্যা করান। এবং অন্য একটি পদেও এমনি কথা আছে। সেক শুভোদয়ায়ও পাই 'তত্র যো যবন যাতি তম ঘাতয়তি'। —সেখানে (গৌড়ে) যে যবন (তুর্কী বা মুসলিম বা বিদেশী) যায় তাকেই হত্যা করেন। উমাপতি ধর যে লক্ষ্মণ সেনের বিরোধী ছিলেন বা সুবিধাবাদী ছিলেন তা নতুন প্রভু বখতিয়ার খলজীর স্তুতি রচনাতেই স্পষ্ট। তাঁর তোয়াজের ভাষায়—

> 'সাধু ম্লেচ্ছ-নরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈাব বীরপ্রসূ:
> নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ততে।
> দেবে কুট্যতি যস্য বৈরিপরিষন্নারাংকমলে পুর:
> শস্ত্রম্ শস্ত্রমিতি স্ফুরন্তি রসনাপত্রান্তরালে গিরঃ।

—হে ম্লেচ্ছ নরেন্দ্র (তুমি) ধন্য, তোমার বীরপ্রসবিনী মাতাও ধন্য—যদিও নীচ বংশজ। পৃথিবী (তোমার মতো) সুক্ষত্রিয় শাসিত বলে মানতে হবে। রিপুবিনাশী বলে পরিচিত দেব (রাজা) তখন 'শস্ত্র শস্ত্র' বলে হেঁকে রসনা পত্রান্তরে পলালেন।

গ. সংস্কৃত কোথাও কোথাও বিশুদ্ধ ও উচ্চমানের এবং প্রাচীন মূল কাব্য-ভিত্তিক গদ্যায়ন বলেও তিনি স্বীকার করেন। সংস্কৃত যে মিশ্র বা অশুদ্ধ নয় বরং সংস্কৃত না-জানা লিপিকরের বাঙলা রীতিতে সংস্কৃত লেখার ফলে অর্থাৎ সমাসবদ্ধ পদ সম্বন্ধে অজ্ঞ লিপিকরের লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতির প্রমাদের ফলে যে 'হরে কর কম্বা' শ্রেণীর অশুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়, তাও ডক্টর সেন স্বীকার করেন এবং বাঙলা রচনাংশকে আদি-মধ্য যুগের বলে স্বীকার করেন। কোন কোন ঘটনা ও গল্প যে তুর্কী-পূর্বকালের তাও তিনি বিশ্বাস করেন।

ঘ. কবি জয়দেব উড়িয়া-মৈথিলী-বাঙালী যেই হোন—লক্ষ্মণ সেনের সভায় যে এসেছিলেন, সে-প্রমাণও রয়েছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' বিধৃত জয়দেবের উক্তি এরূপ : গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজারাজকরভালঙ্কর...দৃষ্টতো 'সি তুষ্টা বয়ম'। রাজা ও রাজ-প্রতিনিধি পরিবেষ্টিত সভার অলঙ্কার স্বরূপ হে গৌড়পতি, (আপনাকে) দেখে তুষ্ট হলাম।

ঙ. ডক্টর সুকুমার সেন কেবল জালালউদ্দিন তাবরেজীর পরিচিতি নিয়েই ধাঁধায় পড়েছেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকার উপর নির্ভর করে তিনি সিলেটের জালালউদ্দিন কুনঈয়াইর মধ্যেই জালালউদ্দিন তাবরেজীকে খুঁজেছেন এবং সে তথ্যের উৎস খুরশীদ জাহাননুমা (ইলাহি বখশ হোসাইনী আঙরেজাবাদীর রচিত, ১৬১৭-৭৮ সন) এবং গোলাম হোসেনের 'রিয়াজুস সালাতিন' প্রভৃতি। কিন্তু সেক শুভোদয়ার প্রথম সংস্করণে স্বীকার করা হয়েছে যে তুর্কী বিজয়ের পূর্বে কোন মুসলিম দরবেশের অনুরোধে পরধর্মমত সহিষ্ণু কোন হিন্দু রাজা এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েও থাকতে পারেন। এবং পরে প্রখ্যাত দরবেশের নাম এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে (মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্যে)।

চ. ডক্টর সেনের মতে সেক শুভোদয়ার (কাব্যের) মূল লেখক বা গদ্যে পদ্যে বর্তমান সংকলক ও পুনর্লেখক গ্রন্থটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার ও গ্রন্থের মর্যাদা বাড়াবার জন্যে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ও মন্ত্রী 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' নামের স্মৃতিগ্রন্থ সংকলক হলায়ুধ মিশ্রকে প্রণেতা হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি এও বলেন যে, মূলকাব্যটি জনপ্রিয় গল্পের সংকলন ছিল এবং তা চৌদ্দ বা পনেরো শতকের। পরে তা পীরকাহিনী সূত্রে শিথিলভাবে গ্রথিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

ছ. দরগাহ এলাকায় 'লক্ষ্মণসেনী দালান' নামে একটি দালানও রয়েছে, এই লক্ষ্মণ সেনকে পরবর্তী কোন নায়েব লক্ষ্মণ সেন বলে তিনি অনুমান করেন।

জ. পুষ্পিকায় লিপিকরের উক্তি নিম্নরূপ :

সমাপ্তশ্চায়ং পুস্তকমিতি।
যথাদৃষ্ট তথাদ্ধি ।

শ্রীমৎসাহ জলালস্য কথাং জনমনোরমাম
শ্রীজগন্নাথ রায়স্য পাঠার্থং যত্নতং।
ভাদ্রমাসাসিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং ভৃগুবাসরে
যত্নেন লিখিতং গ্রন্থ শ্রীরাম ভদ্র শর্মণা।
—এ গৃহং বাণ...শ্রীমতাং...তথা।
দশ সপ্তাং শকে ভাদ্রে লিখিতেয়ং শুভোদয়া।
শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী কৃষ্ণায় নমঃ।
শ্রীরাম চন্দ্রায় নমঃ।

যাবনিক সন ৬০৮ শাকে বিক্রমাদিত্য ১১৩৪ কার্তিক শ্রীমৎসাহ জলালস্য আশ্রমে আগমনম। শ্রীহরি। যাবনিক সন ৬১০ শাকে বিক্রমাদিত্য ১১৩৬ চৈত্র কৃষ্ণাতৃতীয়ায়াং অত্র দেশাৎ গমনং রজ্জব চন্দ্রে শ্রীমৎ সাহ জলালস্য

শুভমস্তু।

এর থেকে নিম্নের তথ্যগুলো মেলে :

১. লিপিকর রামভদ্র শর্মা জনৈক জগন্নাথ রায়ের পাঠের জন্য এ গ্রন্থ নকল করেছিলেন। বইটি হিন্দুর জন্য হিন্দু কর্তৃক অনুলিখিত। লিপিকরের সময়েও শাহজালালের কাহিনী জনগণের কাছে মনোরম।

২. কৃষ্ণ পক্ষের ভাদ্র মাসের ৫ তারিখ শুক্রবারে লেখা শুরু এবং ১৭ই ভাদ্রে লিপিকাজ শেষ। সনটি অপাঠ্য। '—৯৫' আছে। প্রথম সংস্করণের সম্পাদক আদি বাঙলা হরফে লিপীকৃত বলেছেন, তাহলে ১২৯৫ বা ১৩৯৫ হয়। শকাব্দ ধরলে ১৩৭৩ বা ১৪৭৩ খ্রীস্টাব্দ হয়।

৩. ৬০৮ হিজরী সনে (১২১১-১২ খ্রীস্টাব্দে) শাহজালাল ঐ আশ্রমে (বাইশ হাজারী মসজিদে) এসে ৬১০ হিঃ (১২১৩-১৪ খ্রীঃ নবেম্বর মাসে) সনে তিনি দেশত্যাগ করেন। বিক্রম সংবতেরও উল্লেখ রয়েছে ১১৩৪-৩৬, এটিকে শকাব্দ ধরলে ১২১২-১৪ খ্রীস্টাব্দই মেলে।

এবার আমাদের বক্তব্য পেশ করছি :

ক. ডক্টর সুকুমার সেন স্বীকার করেন যে পদ্যে রচিত একটি প্রাচীন গল্প-সংকলন ভিত্তি করেই গল্পগুলো শেখ জালালউদ্দিনের মহিমা-সূত্র দিয়ে গদ্যে-

পদ্যে পুনর্গ্রথিত হয়েছে। সেকালে ছাপাখানা ছিল না, অধিকাংশ গ্রন্থই গ্রন্থকারের এলাকায় চালু থাকত। কাজেই কারো লেখা চুরি করে গৌড়ে বসেই নতুন বই রূপে চালিয়ে দেয়ার মতো জালিয়াতি কি সম্ভব ছিল?

খ. প্রাচীন কাব্যটি কেউ না কেউ সংকলন করেছিলেন। 'ব্রাহ্মণ সবস্ব' সংকলক হলায়ুধ মিশ্র এই সংকলনকর্তা হতে বাধা কি, বিশেষত যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কাহিনীগুলো শেখ ও লক্ষ্মণ সেন নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে? লক্ষ্মণ সেনের সভায় নামকরা জনপ্রিয় সব কবি ছিলেন। পরবর্তীকালে যদি সেন-সভার প্রখ্যাত কারো নাম গ্রন্থের সাথে যুক্ত করতে হয়, তাহলে শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ধর প্রভৃতির একজনের নাম যুক্ত হল না কেন? বিশেষত এঁদের নামও যখন গ্রন্থে অন্য সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে?

গ. এই গ্রন্থ নিশ্চয়ই ভাল সংস্কৃত জানা সৃজনশীল হিন্দু পণ্ডিত রচিত, যাঁর লক্ষ্মণ সেনের সভা, সভাসদ, কবি এবং প্রাসাদ-জীবন, জনজীবন, জনজীবিকা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক ও ব্যাপক ধারণা ছিল, আর শিল্পীসুলভ সৃজনশীলতা, নৈপুণ্য এবং রসবোধও ছিল। ইতিহাস বিরল সেযুগে চারশ' বছর আগেকার বাস্তব ঘটনা ও পরিবেশ বানিয়ে বানিয়ে রচনা করা কি তার পক্ষে সম্ভব ছিল? যদি জাল বলে স্বীকার করা হয় তা হলে বলতে হবে এই পণ্ডিত নিশ্চয়ই দুশ্চরিত্র ও দুরাত্মা। নইলে অর্থলোভে যবন পীরের দেবকল্প মহিমা প্রচার তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। তাছাড়া সাহিত্য শিল্পী একজন মিশ্র বাচীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ষোল শতকে এ গ্রন্থ লিখে সমাজে ঠাঁই পাবার কথা নয়,—বিশেষ করে যেখানে হিন্দুরাজার নিন্দা রয়েছে। অবশ্য ছদ্মনামে লেখা সম্ভব। কিন্তু সম্পত্তি রক্ষার জন্যে একটা তাম্র শাসন কিংবা কাগুজে পাট্টোলী না বানিয়ে এতোবড় গ্রন্থ রচনা করানোর ঝুঁকি কেন নিল মুতোয়াল্লী, তার সদুত্তর মেলে না। আর জালালউদ্দিন তাবরেজী যদি বাঙলাদেশে না-ই আসবেন, তাহলে এ দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে তাঁর নাম ও সিদ্ধি এতো জনপ্রিয় হল কি করে? এ দেশে না আসলে জীবন্ত পীর হিসেবে তাঁর নামে গল্পই বা হিন্দু সমাজে চালু হল কি করে?

ঘ. বলা হচ্ছে টোডরমলের জরীপের সময় জমি দখলে রাখবার জন্যই মুতোয়াল্লীর উদ্যোগে এই জাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এতেই স্বীকার করা হচ্ছে যে তারও আগে এখানে এক পীর ছিলেন, তাঁর নামে বাইশ হাজার টাকার মুনাফার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি পীরোত্তর সম্পত্তিও ছিল। সে পীর কে?

কে দিলেন এই পীরোত্তর সম্পত্তি? এই পীর যদি জালালউদ্দিন না হন এবং দাতা যদি লক্ষ্মণ সেনও না হন, তাহলেও একজন পীর ও একজন সম্পত্তিদাতা সামন্ত কিংবা রাজা নিশ্চয়ই ছিলেন। তাঁদের নাম গোপন করে মুতোয়াল্লী নতুন নামের পীর ও নতুন নামের রাজা আবিষ্কার করার চেষ্টা করবেন কেন? পীর বা দরগাহ ব্যক্তি বিশেষের মতো অখ্যাত, অপরিচিত এবং বিস্মৃত-নাম হয় না। সমকালে জনবহুল শহরে তথা জন-সমাজে বাস করে মুতোয়াল্লীর পক্ষে যে কোন কারণেই হোক প্রকাশ্যে পীরের ও রাজার নাম বদলানো সম্ভব ছিল কি? তাছাড়া স্বীকারই করা হচ্ছে প্রতি বছর রজব মাসের ২২ তারিখে এখানে উরস হয়, মেলা বসে এবং তাতে হিন্দু মুসলিম যোগ দেয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে এ দরগাহ লক্ষ্মণ সেনের আমল থেকেই লোক বিশ্রুত। তাই সম্পত্তি রক্ষার জন্য লক্ষ্মণ সেনের আমলের দলিলও প্রয়োজন ছিল। দলিলের অভাবে এ বই দেখানো হয় এবং এটি এমনই বই যা পার্বণিকভাবে পড়া হত এবং যা পড়ে বা শুনে বিপন্মুক্ত হওয়া যেত যা হিন্দুরাও অন্তত সতেরো শতক অবধি বিশ্বাস করত। দরগাতে রক্ষিত পুথিটি হিন্দুর জন্যে হিন্দু দিয়ে অনুলিখিত। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে হয়তো দরগায় রক্ষিত আগের পুথিটি কালে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ মুতোয়াল্লী হিন্দুর থেকেই এ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এও সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে দরগায় পুথির পার্বণিক পাঠ কেবল হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব ছিল। অবশ্য মৌখিক অনুবাদে হিন্দু-মুসলিম ভক্তরা তা শ্রবণ করে পুণ্যলাভ করত। অতএব এ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয় যে, 'সেক শুভোদয়া' নামের পীরমাহাত্ম্য জ্ঞাপক গ্রন্থটি হিন্দুদের জন্যেই হিন্দুভক্ত হলায়ুধ মিশ্র রচনা করেছিলেন।

মুসলিম মুতোয়াল্লী সম্পত্তিলোভেই যদি টোডরমলের আমলে এই গ্রন্থটি লিখিয়ে থাকেন, তাহলে ডক্টর সুকুমার সেনের ধারণা মতে ১৭-১৮ শতক (লিপিকাল) অবধি গৌড়ের হিন্দুরা কেন ঐ পীরমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক জাল পুথি আগ্রহের সঙ্গে পড়ছেন, বিশেষ করে বিশ শতকেও যখন ঐ পুথি জাল বলে মালদহ অঞ্চলেই লোকশ্রুতি রয়েছে?

ঙ. দরগায় 'লক্ষ্মণ সেনী দালান' রাজা লক্ষ্মণ সেনেরই যে স্মৃতি বহন করছে, তা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

চ. জালালউদ্দিন তাবরেজী বলে সত্যই এক দরবেশ ছিলেন। তিনি দেও-তলায় অবস্থানও করেছিলেন কিছুকাল। আলাউদ্দিন আলী শাহ (১৩৪১-৪২ খ্রীঃ) তাবরেজী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঐস্থানে (পাণ্ডুয়া শহরে) একটি দরগাহ নির্মাণ

করেন বলে রিয়াজুস সালাতিন সূত্রে জানা যায়। ভিন্নভাবে তা' অর্থাৎ সাক্ষাৎ দর্শনের কথা বুকাননের বিবরণীতে মেলে। এই স্বপ্নদর্শন তাবরেজীর মৃত্যুর শতাধিক বছর পরের ঘটনা। এই জালালউদ্দিন তাবরেজী বাঙালাদেশ ত্যাগ করে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিসের (১২১০-৩৬ খ্রীঃ) সময়ে দিল্লীতে যান।[১] এবং খজিনাতুল আফাসিয়া মতে ৬৪২ হিঃ বা ১২৪৪ খ্রীস্টাব্দে এবং তাজকেরাতুল আউলিয়া-ই-হিন্দ অনুসারে ৬২২ হিঃ বা ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।[২] নাসিরুদ্দিন নুসরৎ শাহর রাজত্বকালে (১৫১৯-৩১ খ্রীঃ) ৯৩৪ হিঃ বা ১৫২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে উৎকীর্ণ দেওতলার শিলালিপিতে দেওতলাকে "শেখ জালাল মুহম্মদ তাবরেজী শহর" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] গৌড়ের দরবেশ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন সর্কীরাজের দরবেশ জাহাঙ্গীর সিমনানী। সর্কীরাজ ইব্রাহিম সর্কীর কাছে লিখিত সিমনানীর পত্রে প্রকাশ—দেওতলায় জালালিয়া (জলালপন্থী) দরবেশদের সমাধি রয়েছে। জালালউদ্দিন তাবরেজী বাঙলাদেশে ছিলেন ; সেবা ও সরাইর দ্বারা তিনি জনগণকে মুগ্ধ ও ভক্ত করেছিলেন।[৪] ইনিই খানকা ও লঙ্গরখানা খুলেছিলেন এবং ভোজবর্মন রচিত 'অমৃত কুণ্ড' সম্ভবত তাঁরই আগ্রহে আরবীতে অনূদিত হয়। আবদুর রহমান চিশতির মতে[৫] জালালউদ্দিন তাবরেজীর পুরো নাম ছিল আবুল কাসেম মখদুম শেখ জালাল তাবরেজী।[৬] তিনি শেখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর (১১৪৭-১২৩৪) শিষ্য ছিলেন।[৭] তাবরেজী কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী, (১১৪২-১২৩৬) বাহাউদ্দিন যাকারিয়া, (১১৬৯-১২৬৬) নিযামুদ্দিন সুগরা (মৃ: ১২০০) ও দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিসের (১২১০-৩৬) সমসাময়িক।[৭] এঁদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। দিল্লী এলে তিনি সুলতান ইলতুৎমিসের অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন।

---

১ Social History of Muslims in Bengal down to 1538 A. D : Dr. Abdul Karim : Journal of Pakistan Historical Society ; Pp. 97-98, Vol. VIII, Pt. 1, 1960, Pp. 290-96.

২ বাঙলাদেশে মুসলিম আগমনের প্রাথমিক যুগ : ডক্টর আবদুল করিম : সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা ১৩৭০ সন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; পৃঃ ৯২-১০২।

৩ ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে মুসলমান সমাজ বিস্তার : ডক্টর আবদুল করিম : বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ; শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭১ সন।

৪ Bengal Past & Present, Vol. LXVII, Sl. No. 130, 1948, Pp. 35-36.

৫ Mirat-al-Ansar : Dacca University, M. S. No. 16/AR/143/Folio 19.

৬ Akhbar-al-Akhyar : Descriptive Catalouge of Arabic and Persian Manuscripts : Dr. A B. M. Habibullah : Pp. 44-45.

৭ ক Ain-i-Akbari, Vol. III, Jarret, p. 366. খ History of Sufism in Bengal : Dr. Md. Enamul Huq, Pp. 160-67.

আমাদের ধারণা 'সেক শুভোদয়া' রাজমন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্রেরই রচনা। তুর্কী বিজয়ের পর উমাপতি ধরের মতো তিনিও তুর্কী প্রভুর প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এই পীর প্রীতিমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কাজেই সেক শুভোদয়া গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করা অমূলক। আমাদের ধারণায় জালালউদ্দীন তাবরেজী ১২০০-১২ খ্রীস্টাব্দ অবধি গৌড়ে ছিলেন। এবং তাজকিরাতুল আউলিয়া মতে ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

'সেক শুভোদয়ায়' ২৭টি পরিচেছদ ছিল। ২৬-২৭ পরিচেছদ হয় ২৫ এর অন্তর্গত অথবা লিপিকর ঐ দুটো পান নি তাঁর নকলের আদর্শ পুথিতে। রাজা লক্ষ্মণ সেন ও শেখ জালালউদ্দিনের প্রথম সাক্ষাৎ দিয়েই গ্রন্থের শুরু। বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচেছ শেখের প্রতি রাজা, মন্ত্রী, নটী ও অবিশ্বাসীদের ক্রমশ: আকৃষ্ট হবার চমকপ্রদ কাহিনী, রাজশ্যালক কুমার দত্ত-মধবী-মধুকর-রানী বল্লভা সম্পৃক্ত ঘটনা, শেখের প্রথম জীবনের নানা অলৌকিক কাহিনী, বিজয় সেনের কাহিনী, কুশল তীরন্দাজ লক্ষ্মণ সেন-মদন-উমাপতি ধর সম্বন্ধীয় ঘটনা, বৃদ্ধণ মিশ্র, পদ্মাবতী-জয়দেবের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, রাজা ও ধোপা সম্বাদ, ধোয়ী ও চার ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী-বিদ্যুৎপ্রভা সম্বাদ, শেখের মসজিদ নির্মাণ ও সম্পত্তি লাভ: নট গাঙ্গোর কাহিনী, বিদ্যুৎপ্রভা ও তাঁতী প্রভৃতির আখ্যায়িকা।

এর মধ্যে যেসব বাঙলা ছড়া ও পদ রয়েছে সেগুলো এই :

ক. মকদম শেক সাহ জালাল তবরেজ
তব পাদে করোঁ পরণাম
চৌদিশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম
বারেক রক্ষা কর মোর পর্ণ (পণ্য) প্রাণ
দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্ধেক দান।

খ. শ্রীমল্লক্ষ্ম সেন মহাবীর
কর্ণরন্ধ্রে ভেজে তীর।

গ. রামরাজা বর্ত ইন্দ্র বর্ষে জল
যে বৃক্ষ রোয়ে সে অবশ্য ধরে ফল।

ঘ. শ্রী লক্ষ্মণ কি রাজা বড় বীর
অভ্যাসের কারণে ভেজে তীর।

ঙ. যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিয়ে আশ
যদি না শীঘ্র ফলে তবে তু হয় ছয় মাস।

সেকের মহিমা কেরামতি :

চ. বনের শাখ খায় সে বনের গোনা
ঝিকরিরা পোটলি বান্ধিয়া দেয় সেক
হাটে বিকাইলে হয় সোনা।

ছ. মধ্যে আছে পীরের মোকাম
তদ্যোপরি বিদ্যতে প্রধান পুরুষের স্থান।
তিয়াঞ্জলি তাহার নামে দান
পূর্ব উদয়াচল পর্বতের নাম।
উদয় সূর্য প্রত্যুষ বিহান
কিরাত জানিয়া আমার মোকামের করিব সম্মান
চতুর্থ অঞ্জলি তাহার নামে দান
উত্তরে হিমাচল দেবের অবস্থান।
তথা আমি করিব প্রয়াণ
আমি গেলে তারা করিবে সম্মান।
পঞ্চম অঞ্জলি তাহার নামে দান
আমার বাপ মাও দরিদ্রের পুত্র।
আত্মাজনিতে তাহারা পাইল বড় দুখ
আমার জলে তার হোক আপ্যান।
ষষ্ঠ অঞ্জলি তাহার নামে দান
পৃথিবীর লোকে আমার জানে নাম।
কহো বলে ভালো কহো করে অপমান
সপ্তম অঞ্জলি তাহার নামে দান
রাজা হৈঞা আমার করিব সম্মান।
প্রথমে আইলে দিবেক আমার নামে অনুপান
অষ্টম অঞ্জলি তাহার নামে দান
আমার গ্রামে যে করিব অবস্থান
সহিঞা দুঃখ যদিনা করে আন
পুনঃ পাছে দেয় সম্মান।

আমার মোকামে সাধিয়া অনেক লোক করিব প্রণাম
কেহ বাঞ্ছে ধন-পুত্র কেহ আরোগ্য দান।
আমি তাহার করি ত্রাণ।

বন্দিনী ডাকিনীর সেকের কাছে মুক্তি প্রার্থনা – এটি যথার্থই প্রাচীন বুলি প্রভাবিত বাঙলা রচনা :

হউঁ যুবতী পতিয়ে হীন
গঙ্গা সিনায়ি কাক গাইয়ে দিন।
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ
বায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ
ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি যাউঁ ঘর
সাগর মধ্যে লোহার গড়।
হাত জোড় করিয়া মাঙ্গো দান
বারেক মহাত্মা রাখো সম্মান।
বড় সে বিপাক আছে উপায়
সাজিয়া গেইলে বাঘে না খায়।
পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়িয়া মাঙ্গো দান
মধ্যে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ।
শ্রীখণ্ড চন্দন হৃদয়ে শীতল
রাত্রি হৈলে বহে অনল।
পীন পয়োধর বাঢ়ে আর
প্রাণ যায় বহিঞাঁ ভার।
নয় বহিঞাঁ পড়ে নীর
জীয়েন প্রাণী পলায়েন বীর।

সেক কর্তৃক মুক্তিদান :

আশেপাশে শ্বাস করে উপহাস
বিনা বায়ুতে ভাঙ্গে তালের গাছ
ভাঙ্গিল তাল লম্বিল রেখা
চল যাহ সখি পলাইল শঙ্কা।

সেক শুভোদয়াধৃত দুটো আপ্তবাক্য চির সত্যের মর্যাদায় ভাস্বর :

১. অভ্রছায়া খলপ্রীতির্নবশস্যানি যোষিতঃ / কিঞ্চিৎ কালোপভোগ্যানি যৌবনানি ধনানি চ — মেঘের ছায়া, খলের প্রীতি, তাজা ফসল, নারী, যৌবন ও ধন স্বল্পকালের উপভোগ্যমাত্র।

২ যস্মিন দেশোঃ ন সম্মানং ন মিত্রং ন চ বান্ধবঃ /ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ ন কুর্যাত্তত্র সংস্থিতিম—যে দেশে সম্মান, মিত্র, আত্মীয় এবং শিক্ষা নেই, সে দেশে কখনো বাস করতে নেই।

ভবিষ্যদ্বাণীরূপে গ্রন্থে ধৃত তুর্কী বিজয়ের উল্লেখ থেকেই 'সেক শুভোদয়া' গৌড় বিজয়ের অব্যবহিত পরেই (১২০৪ খ্রীস্টাব্দে) রচিত বলে অনুমান করি। কারণ বিদেশী বিজাতি-বিধর্মী প্রভুর ক্ষমা ও অনুগ্রহলাভের জন্যে বিজিত রাজার মন্ত্রীর এমন একটা কিছু করার প্রয়োজন ছিল। উমাপতি ধরের প্রশস্তি কবিতা এ অনুমান সমর্থন করে। এটি বাঙলায় প্রথম পীরমাহাত্ম্য বা পীরমঙ্গল গ্রন্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

বাঙালীর মৌল ধর্ম

সাংখ্য ও যোগ—এই দুই শাস্ত্র ও পদ্ধতি যে আদিম অনার্য দর্শন ও ধর্ম তা আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না। এ শাস্ত্র অস্ট্রিক কিংবা বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিরাত জাতির মনন-উদ্ভূত, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। তবে উভয় গোত্রীয় লোকের মিশ্র-মননে যে এর বিকাশ এবং আর্যোত্তর যুগে যে এর সর্বভারতীয় তথা এশীয় বিস্তার, তা এক রকম সুনিশ্চিত।

বাঙালীর শিব ও ধর্ম ঠাকুর অনার্য মানস প্রসূত। তেমনি অনাদি এবং আদিনাথও কিরাত জাতির দান। ভোট-চীনার নত, নথ, নাত, নাথ থেকেই যে 'নাথ' গৃহীত, তা আজ আর গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। অতএব নিষাদ-কিরাত অধ্যুষিত বাঙলায় বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি এবং উদ্ভব-রহস্য সন্ধান করতে হবে এই দুই গোত্রীয় মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে ও ভাষায়। মনে হয়, আর্য-পূর্ব যুগেই সাংখ্যদর্শন ও যোগপদ্ধতি সর্বভারতীয় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ কারণেই সম্ভবত ময়েনজোদাড়োতেও যোগী-শিবমূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি।

কোন সংখ্যাল্প গোত্রের পক্ষেই বিদেশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসেই রয়েছে তার বহু নজির। আমাদের দেশেই শক-হূন-ইউচি-তুর্কী-মুঘলেরা শাসক হিসেবেই এসেছিল, কিন্তু সংখ্যাল্পতার দরুনই হযতো তারা তাদের ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি বেশী দিন রক্ষা করতে পারে নি। আর্যেরাও নিশ্চয়ই দেশবাসীর তুলনায় কম ছিল। তাই ঋগ্বেদেও মেলে দেশী ধর্ম সংস্কৃতির পরিচয়।

বৈদিক ভাষায় দেশী শব্দ যেমন গহীত হয়েছে, তেমনি যোগপদ্ধতিও হয়েছে প্রবিষ্ট। বস্তুত এই দ্বিবিধ প্রভাব ঋগ্বেদেও সুপ্রকট। তাছাড়া, দেশী জন্মান্তরবাদ, প্রতিমা পূজা, নারী, পশু ও বৃক্ষ-দেবতার স্বীকৃতি, মন্দিরোপাসনা, ধ্যান, কর্মবাদ, মায়াবাদ এবং প্রেততত্ত্বও দেশী মানস প্রসূত। কাজেই যোগ

ও তন্ত্র সর্বভারতীয় হলেও অস্ট্রিক নিষাদ ও ভোট-চীনা কিরাত অধ্যুষিত বাঙলা-আসাম-নেপাল অঞ্চলেই হয়েছিল এ-সবের বিশেষ বিকাশ। যোগীর দেহশুদ্ধি ও তান্ত্রিকের ভূতশুদ্ধি মূলত অভিন্ন ও একই লক্ষ্যে নিয়োজিত। বহু ও বিভিন্ন মননের ফলে, কালে ক্রমবিকাশের ধারায় সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র—তিনটে স্বতন্ত্র দর্শন ও তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এবং প্রাচীন ভারতের আর আর ঐতিহ্যের মতো এগুলোও আর্যশাস্ত্র ও দর্শনেব মর্যাদা লাভ করে।

অতি প্রাচীন শিব—কিরাতীয় ধানুকী, কৃষিজীবীর কৃষক এবং ব্রাহ্মণ্য যোগী তপস্বীরূপে নানা বিবর্তনে পৌরাণিক রূপ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আদিরূপও—তথা বৃষ্টি, শস্য ও সন্তান উৎপাদনের [সূর্য] দেবতার স্মারকগুলিও বিলুপ্ত হয় নি। বস্তুত দেবাধিদেব মহাদেবরূপে শিবকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় আর্য-অনার্য তত্ত্ব ও ধর্ম বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। তাই যোগ পন্থের নায়কও শিব। তিনিই নাথ-পন্থের প্রভাবে হয়েছেন অনাদি, আদি ও চন্দ্রনাথ। এবং অন্যান্য নাথ সিদ্ধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জনক।

এই যোগই শিব-সম্পৃক্ত হয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক, নাথ পন্থ, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া [এ স্তরে শিব-উমার পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণ প্রতীক গৃহীত] মতরূপে যেমন বিকাশ পেয়েছে, তেমনি সূফীমত সংশ্লিষ্ট হয়ে বাঙলার সূফীমত গড়ে তুলেছে। শৈবমতে ও নাথপন্থে পার্থক্য সামান্য ও অর্বাচীন। শিবত্ব, অমরত্ব ও ঈশ্বরত্ব তত্ত্বের দিক দিয়ে অভিন্ন। আজীবিক, জিন, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, সন্ত এবং ফকিরও যৌগিক সাধনাকে অবলম্বন করে বৈরাগ্যবাদকে আজো চালু রেখেছে। আলেকজাণ্ডার, মেগাস্থিনিস, বার্দেসানেস, হিউএনৎ সাঙ, জালালুদ্দীন, আলবেরুনী, মার্কোপলো, ইবনে-বতুতা প্রভৃতি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যোগীরা। এদিকে বেদে (সাম), ব্রাহ্মণে (শতপথ) ও উপনিষদে (ছান্দোগ্য), মহাভারতে, গীতায় ও পুরাণে যোগ, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রভৃতির উদ্ভব ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক উপোসথ সম্ভবত যোগ তত্ত্বের প্রভাবজ। শাসক ও সমাজপতি আর্যদের প্রাবল্যে 'হুঙ্কার' তথা ওঙ্কার মন্ত্র দিয়ে যৌগিক সাধনার শুরু হলেও, কুলবৃক্ষ 'বকুল', আভরণ 'রুদ্রাক্ষ' ও কর্ণে কড়ি, আহার্য 'কচুশাক', শব সমাহিতি প্রভৃতি দেশী ঐতিহ্যেরই স্মারক।

"মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা।
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলি ছালা।
পুনরপি যোগী হৈব কর্ণে কড়ি দিয়া।" (গোরক্ষ বিজয়)

এই কড়িও অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ের। মিশরেও ছিল এই কড়ির বিশেষ কদর। এখনো বাঙলার ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগীর কাছে কড়ি বিশেষ তত্ত্বের প্রতীক। শিবের এই রূপ নিশ্চিতই দেশী কিরাতের। দেহাধারস্থিত চৈতন্যকেই তারা প্রাণশক্তি বা আত্মা বলে মানে। দেহনিরপেক্ষ চৈতন্য যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু দেহ সম্বন্ধে তারা সহজেই কৌতূহলী হয়েছে। দেহ-যন্ত্রের অন্ধি-সন্ধি বোঝা ও দেহকে ইচ্ছার আয়ত্তে রাখা ও পরিচালিত করাই হয়েছে তাদের সাধনার মুখ্য লক্ষ্য। তাই প্রাণ অপানবায়ু তথা শ্বাস-প্রশ্বাস বা রেচক-পূরক তত্ত্ব, দেহদ্বার, নাড়ী, দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রভৃতির অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তাদের পক্ষে আবশ্যিক হয়েছে। সেজন্যে পরিভাষাও হয়েছে প্রয়োজন। এভাবে দশমী দুয়ার, চন্দ্র-সূর্য, ঈড়লা-পিঙ্গলা-সুষুম্না, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, চতুষ্চক্র বা ষটচক্র বিভিন্ন দল-সমন্বিত পদ্ম, বাঁকানল, কুলকুণ্ডলিনী, উল্টা সাধনা প্রভৃতির নানা পরিভাষা ক্রমে চালু হয়েছে।

এ সাধনায় হঠ (রবি-শশী) যোগই মুখ্য অবলম্বন। হ—সূর্য বা অগ্নি, ঠ—চন্দ্র বা সোম। হঠ—শুক্র ও রজঃ-র প্রতীক। এই যোগের বহুল চর্চা হয়েছে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে, নেপালে, তিব্বতে ও বাঙলায়। বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, মন্ত্রযান ও তন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরেরই কামরূপ-কামাখ্যা। এখানেই সংকলিত হয়েছিল প্রখ্যাত যোগ গ্রন্থ 'অমৃতকুণ্ড'। নেপাল ও তিব্বত আজো গুহ্যসাধকদের শিক্ষা ও প্রেরণার কেন্দ্র। ['সিধ যোগী উতরাধী বা উত্যর দিসি সিধ কা যোগ'- গোরখবাণী: ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, পৃঃ ১৬]।

অতএব এই কায়া-সাধন অতি প্রাচীন দেশী শাস্ত্র, তত্ত্ব ও পদ্ধতি। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম বাঙালী তথা ভারতবাসী এর প্রভাব কখনো অস্বীকার করে নি। তবু নেপাল-তিব্বত ছাড়া সমভূমির মধ্যে বৌদ্ধযুগে কেবল বাঙলা দেশে এর বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করি। কেন না এখানেই সহজিয়া ও নাথপন্থের উদ্ভব। এই বাঙলাদেশ থেকেই:

হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই।

হাড়িসিদ্ধা ময়নামতীতে (চট্টগ্রামে—জ্বালন ধারায়—সমন্দরে?), কানুপা উড়িষ্যায়, মীননাথ কামরূপ-কামাখ্যায় এবং গোরক্ষনাথ উত্তর-পশ্চিম ভারতে গিয়ে স্বমত প্রচার করেন। এঁদের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাবই সর্বভারতীয় হয়েছিল।

পূরবদেশ পছাঁহী ঘাটি
[জনম] লিখ্যা হমারা জোঁগ
গুরু হমারা নাঁবগর কহীএ
মেইট ভরম বিরোগঁ—

[গোরখ বাণী, ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ]

—'পূর্বদেশে [আমার] জন্ম, পশ্চিম দেশে বিচরণ, জন্মসূত্রে [আমি] যোগী গুরু [আমার] ভব-সাগরের নাবিক, আমি ভ্রমরূপ রোগ থেকে মুক্ত হই।'

শেষ বয়সে সম্ভবত তিনি নেপালে অবস্থিত হন। নেপালীদের গোর্খা নাম হয়তো গোরক্ষনাথের প্রভাবের স্মারক। তাছাড়া গোরখপুর ও গোরখপন্থ আজো বিদ্যমান। মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ তথা মোচংদরেব প্রভাবও বিস্তৃতি পেয়েছিল। এঁদের প্রভাব, রচনা ও কাহিনী কেবল বাঙলা ভাষায় ও বাঙলাদেশেই বিশেষ করে রক্ষিত রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া পদ, বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বাউল-গীতি, যোগীর গান ও যুগী কাচ আজো বাঙলাদেশেরই সম্পদ। ভারতের অন্যত্র এসব গান ভক্তিবাদের মিশ্রণে বিকৃত। এসব সিদ্ধার কেউ উচ্চ বর্ণের লোক ছিলেন না। তাঁতী, তেলী, কৈবর্ত, ডোম, হাড়ী ও চাঁড়ালই ছিলেন।

ভণত গোরখনাথ মছিংদ্রনা পুতা [শিষ্য] জাতি হমারী তেলী
পীড়ি কোটা কাঢ়ি লীয়া পবন খলি দীয়াঁ ঠেলী।
বদত গোরখনাথ জাতি মেরী তেলী
তেল গোটা পীড়ি লীয়াঁ খুলি দীবী মেলী।

—[গোরখবাণী, পিতাম্বর সম্পাদিত, পৃঃ ১১৭]

এতেও এঁদের বাঙালীত্ব তথা অনার্যত্ব প্রমাণিত হয়।

এসব কায়াসাধকরা মানুষের জন্ম-রহস্য থেকে মৃত্যু-লক্ষণ অবধি সব কিছুর সন্ধান করেছেন, এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হবার উপায় আবিষ্কারে ব্রতী ছিলেন। দেহস্থ চারিচন্দ্র—শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচালিত করে অমৃত রসে পরিণত করতে চেয়েছেন। গুরুবাদী এ সাধনায় নাদ, বিন্দু, রজঃ ও শুক্র সৃষ্টি-শক্তির উৎস। বিন্দু ধারণ করে সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করলে, জীবনী-শক্তি অক্ষত থেকে আয়ুবৃদ্ধি করে। কেননা সৃষ্টিতেই শক্তির শেষ, সৃষ্টির পথ বন্ধ হলে ধ্বংসেরও পথ হয় রুদ্ধ। এভাবে তার ইন্দ্রিয় বা দেহের—

দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারাম খানা।

বিন্দুর ঊর্ধ্বায়নের ফলে ললাট দেশে তা সঞ্চিত হয়। এর নাম সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম। এতে চির রমণানন্দ লাভ হয়—এর নাম সহজানন্দ বা সামরস্য। এই সহজানন্দের সাধকরাই সচ্চিদানন্দ, সহজিয়া বা আধুনিক বাউল।

চৈতন্যরূপ আত্মার রজঃ ও শুক্রতেই স্থিতি। নতুন চৈতন্য সৃষ্টির জন্যে সে আত্মা রজঃ ও শুক্র রূপে তরলতা প্রাপ্ত হয়। সাধক ও সাধিকা যথাক্রমে রজঃ-রক্ত ও শুক্র বিন্দু পান করে সেই চৈতন্যকে দেহাধারে আবদ্ধ রাখে।

সর্বভারতীয় সাধনায় এবং ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়েও সাংখ্য যোগ ও তন্ত্র বাঙলার ধর্ম বাঙালীর ধর্ম। কেননা, এই ধর্মের উদ্ভব ও বিশেষ বিকাশ ভূমি বাঙলা। তাই অমৃতকুণ্ড, বৌদ্ধ সহজিয়ার দোঁহা ও চর্যাপদ, কৌলজ্ঞান নির্ণয়, বৈষ্ণব সহজিয়ার সহজিয়াপদ, বাউল গীতি, ধর্মমঙ্গল, শূন্য পুরাণ, ময়নামতী-মাণিকচন্দ্র-গোপীচাঁদ গাথা, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীতি, গোরক্ষ বিজয়, অনিল-পুরাণ, হর-গৌরী-সম্বাদ, নূরনামা, শিনামা, তালিবনামা, আগম-জ্ঞানসাগর, আদ্য পরিচয়, নূরজামাল, গোর্খসংহিতা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি রচনা যেমন এদেশেই মেলে, তেমনি এদেশী লোকের ধর্ম-সাধনায় যোগতন্ত্র আজো অবিলুপ্ত। আজো হিন্দু-মুসলিম সমাজে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের সংখ্যা নগণ্য নয়। ডাকিনী-যোগিনী, তুক-তাক, দারু-টোনা, মন্ত্র-কবচের জনপ্রিয়তাও বৌদ্ধ প্রভাবের স্মারক; গুরু, প্রেত আর যক্ষ বৌদ্ধদের দান। আজো বৌদ্ধ যোগ ও তন্ত্র বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের অধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যে এদেশেই বৌদ্ধ শাসন ও বৌদ্ধ-প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী—উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে পাল রাজত্ব ও পূর্বাঞ্চলে সমতটে চন্দ্র শাসন। এখানেই অভিন্ন-সত্তায় মিলেছে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ও ভোট-চীনার রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি। প্রাচীন কালেই নয় কেবল, মধ্যযুগে এবং আধুনিক কালেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও কলকাতার ব্রাহ্মমত বাঙালী ভারতবর্ষকে দান করেছে।

চৌরাশীসিদ্ধার অনেকেই বাঙালী। অবশ্য এই চৌরাশীসিদ্ধা সংখ্যাবাচক নয়, সিদ্ধিজ্ঞাপক। 'চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহতত্ত্বে সিদ্ধ'—অর্থে মূলত চৌরাশীসিদ্ধা ব্যবহৃত—[জ্ঞানপ্রদীপ সৈয়দ সুলতান]। পরবর্তীকালে অজ্ঞতাবশে সিদ্ধার সংখ্যা-জ্ঞাপক মনে হওয়ায় চৌরাশীজন সিদ্ধার তালিকা নির্মাণের ব্যর্থ প্রয়াস শুরু হয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেনও মনে করেন, চৌরাশীসিদ্ধা রূপকাত্মক। তিনি বলেন "চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টির মত চৌরাশীসিদ্ধের চৌরাশীও সাঙ্কেতিক সংখ্যা মাত্র।" [ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খাবিজয়'-এর ভূমিকা স্বরূপ নাথপন্থের 'সাহিত্যিক ঐতিহ্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১—২। (৬)।] ডক্টর শশিভূষণ-দাশগুপ্তের মনেও ছিল এ প্রশ্ন। [Obscure Religious cult etc.]

মানুষের ধর্মমত কেবল আচার-আচরণই নিয়ন্ত্রণ করে না, তার ভাব-চিন্তাও পরিচালিত করে। এই জন্যে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতিতে ও ভাব-চিন্তায় ধর্ম মতের প্রভাবই মুখ্য। বাঙালীর এই যোগতান্ত্রিক জীবনতত্ত্বও বাঙালীর জীবনে ও মননে প্রগাঢ় ও ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। এর ফলে বহিরাগত বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম এখানে কখনো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এদেশীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারই বহিরাগত ধর্মমতের প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে এবং কালিক অনুশীলনে ও বহু মননের পরিচর্যায় সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে এনেছে ঔজ্জ্বল্য। এভাবে বৌদ্ধ বিকৃতির ফলে পেলাম বজ্রযান, কালচক্র-যান, মন্ত্রযান, সহজযান ও নাথপন্থ। ব্রাহ্মণ্য-বিকৃতির পরিণামে পেলাম লৌকিক দেবতা ও তান্ত্রিক সাধনা, ইসলামী বিকৃতিতে এল সত্যপীর কেন্দ্রী বহু দেবকল্প ও দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী লৌকিক পীর—যাদের দু'চারজন সেনানী শাসক হলেও অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব কাল্পনিক। আজো আমাদের সামাজিক, পার্বণিক ও আচরিক রীতি-নীতিতে আদিম Animism, Magic belief প্রবল ও মুখ্য। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কেবল বহিরাঙ্গিক প্রসাধনের মতোই আমাদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য ও রিকথের সঙ্গে প্রলিপ্ত হয়ে আছে মাত্র। তাই ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা আক্ষরিক-ভাবেই সত্য। তিনি বলেন,

It is now becoming more and more clear that the Non-Aryan contributed by far the greater portion in the fabric of Indian civilisation, and a great deal of Indian religious and cultural traditions, of ancient legend and history, is just non-Ayan translated in terms of the Aryan speech...the ideas of 'karma' and transmigration, the practice of yoga, the religious and philosoph'cal ideas centring round the conception of the divinity as Siva and Devi and as Krishna, the Hindu ritual of puja as opposed to the vedic ritual of Homa—all these and much more in Hindu religion and thought would appear to be non-Aryan in origin, a great deal of Puranic and epic myth, legend and semi-history is pre-Aryan, much of our material culture and social and other usageseg. the cultivation of some of our most important plants like rice and some vegetables and fruits like tamarind and the cocoanut etc. the use of betel leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion, most of our folk crafts, our nautical crafts, our distinctive

Hindu dress (the dhoti and sari), our marriage ritual in some parts of India with the use of vermilion and turmeric and many other things would appear to be legacy from our pre-Aryan ancestors.'' [Indo-Aryan and Hindi, pp. 31-32]

যোগ ও তান্ত্রিক সাধনা দ্বিবিধ : বামাচারী ও কামাচার বর্জিত। গোরক্ষনাথ কামাচার বর্জিত বা ব্রহ্মচর্য সাধনার প্রবর্তক। এ গোরক্ষনাথবাদীরাই নাথপন্থী। আর হাড়িফা বা জালন্ধরী পাদের অনুসারীরা বামাচারী। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় অবধূত যোগী, শেষোক্ত সম্প্রদায় কাপালিকযোগী। নাথপন্থীরা পরিণামে ব্রাহ্মণ্য শৈবদের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠে। আর পা-পন্থীরাও শৈব-শাক্ত তান্ত্রিকরূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ভুক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এদের সাধনা আজো প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধমত ভিত্তিক, তথা আদি সাংখ্য যোগ-তন্ত্র ধারার ধারক। পরিণামে সবাই আত্মজ্ঞান, শিবত্ব, অমরত্ব ও মোক্ষ-কামী। এদেশের প্রাচীন অনার্য শিব ভোট-চীনার প্রভাবে 'নাথ' হয়ে আবার ব্রাহ্মণ্য প্রাবল্যে শিব-হর-মহাদেব-রুদ্র রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। তাই আদিম, প্রাচীন ও অর্বাচীন তথা দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মোঙ্গল ও আর্য মনন-প্রসূত সব দ্বান্দ্বিক গুণ নিয়ে শিব আজো জীবন্ত উপাস্য দেবতা।

দেহস্থিত চৈতন্যই আত্মা। এ আত্মা জগৎ-কারণ পরমাত্মারই অংশ। খণ্ডকে স্বরূপে জানলে অখণ্ডকেও জানা হয়ে যায়। এ জন্যে দেহের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণাধিকার চাই। এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব দম বা শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ পবন যখন আয়ত্তে আসে। আর এজন্যে বিন্দুধারণ, দেহ বা ভূতশুদ্ধি, ত্রিকাল দৃষ্টি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবে ব্রহ্মদর্শন, আত্মজ্ঞান, ইচ্ছাসুখ, ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতির সামর্থ্য অর্জন প্রয়োজন।

দেহ হচ্ছে মন-পবনের নৌকা। প্রাণ ও আপন বায়ু আর মনরূপে অভিব্যক্ত চৈতন্যই হচ্ছে দেহযন্ত্রের ধারক ও চালক। তাই মন-পবনকে যৌগিক সাধনা-বলে ইচ্ছা শক্তির আয়ত্তে আনতে হয় :

"মন থির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির
বিন্দু থির তো কন্ধ থির
বলৈ গোরখদেব সকল থির।"

[অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতবাসীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ: ১১৮]

বাঙালী মুসলমানেরা এই সাধনাই বরণ করেছিল। কেবল দু'চারটা আরবী

ফারসী পরিভাষা এবং আল্লাহ্-রসুল, আদম-হাওয়া, মোহাম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা এবং রাকিনী প্রভৃতির বদলে ফিরিস্তা বসিয়ে এই প্রাচীন কায়া সাধনাকে ইসলামী রূপ দানে প্রয়াসী ছিল। সমন্বয়ের চেষ্টাও আছে। যেমন নয়ানচাদ ফকীরের 'বালকানামায়' পাই :

দিলসে বৈঠে রাম-রহিম দিলসে মালিক-সাঁই
দিলসে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই।
ধড়ে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুজিআ আলম তারা
চাঁদযুক্ত মেঘজুতি ইন্দ্রে বইছে ধারা।

[প্রাচীন পুথির বিবরণ : আবদুল করিম, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১৩৮]

অতএব, বাঙলার বা বাঙালীর আদিধর্ম বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী আবরণে আজকের দিনেও অবিলুপ্ত। ধর্ম, আদ্য, পুরুষপুরাণ, নাথ ও নিরঞ্জন পাক-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাঙলা দেশেও আল্লাহ্-খোদার পরিভাষারূপে গোটা মধ্যযুগে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

যোগ ও তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটে বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধ সমাজের ক্রম-বিলুপ্তিতে গড়ে উঠে বাঙলার ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম সমাজ। তাই পূর্ব ঐতিহ্যের ও বিশ্বাসের রেশ রয়েছে তাদের মননে ও আচারে।

এরও আগে পাই মৃগয়াজীবী ও মাতৃপ্রধান সমাজের কৃষিজীবী ও পিতৃপ্রধান সমাজে রূপান্তরের ইঙ্গিত। বাঙলায় নারীদেবতার আধিক্য মাতৃপ্রাধান্যের সাক্ষ্য, এবং ক্ষেত্রপ্রাধান্যও— তারা, শাকম্ভরী (দুর্গা), বসুমতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাসুলী প্রভৃতির জনপ্রিয়তায় সপ্রমাণ। তা ছাড়া মৃগয়াজীবীর হাতিয়ার 'হরধনু' ভঙ্গ করে তথা

---

১. শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা'য় ও দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু'তে 'ধর্ম' বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। নাথ ও নিরঞ্জন, আদ্য ও পুরুষপুরাণ সব রচনায় সুলভ।

ক. মনে মনে ধর্ম আরাধন।
খ. বিনয় ভক্তি করৌ ধর্ম আরাধন।
গ. ধর্ম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ।
ঘ. ধর্ম পথে ইউসুফ মাগন্ত যেহি বর।
ঙ. জলিখাএ বোলে স্মরি ধর্ম নিরঞ্জন।
চ. ধর্মপদ স্মরি সত্বরে গমন।
ছ. ধর্মের প্রসাদে আজি পুরিলেক আশ।
জ. ধর্ম আজ্ঞা তোমার পুরিব মনস্কাম। ইত্যাদি অনেক।

পরিহার করে রাম কর্তৃক সীতাকে (লাঙ্গলের ফাল) গ্রহণ কিংবা অহল্যাকে (যাতে হল পড়েনি) প্রাণ দান প্রভৃতির রূপকের মধ্যেও রয়েছে কিরাতীয়-নিষাদীয় যাযাবর জীবন থেকে স্থির নিবিষ্ট কৃষিজীবনে উত্তরণের ইতিহাস।

জীবিকার ক্ষেত্রে এই মৃগয়া ও কৃষিজীবনের অসহায়তার অভিজ্ঞতা থেকেই আসে যাদুতত্ত্বে ও জন্মান্তরবাদে আস্থা। কেননা, তারা অনুভব করেছে বাঞ্ছা-সিদ্ধির পথে কোথা থেকে যেন কি বাধা আসে। কার্য-কারণ জ্ঞানের অভাবেও প্রাতিকূল্যের কিংবা আনুকূল্যের অদৃশ্য অরি কিংবা মিত্রশক্তি সে কল্পনা না করে পারে নি। তাই প্রতিকার-প্রতিরোধ কিংবা আবাহন মানসে সে আস্থা রেখেছে যাদুতে, মন্ত্রশক্তিতে, পূজায় এবং প্রতীকী ও আনুষ্ঠানিক আবহে।

অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে বীজে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফল এবং ফলে বীজ আবর্তিত হয়—ধ্বংস হয় না। সে-বীজও বিচিত্র—কখনো দানা, কখনো শিকড়, কখনো কাণ্ড, আবার কখনো বা পাতা। কাজেই প্রাণ ও প্রাণীর আবর্তন আছে, বিবর্তনও সম্ভব—কিন্তু ধ্বংস যেন অসম্ভব। এর থেকেই হয়তো উদ্ভূত হয়েছে আত্মা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্ত্ব। স্বপ্নও হয়েছে এ বিশ্বাসের সহায়ক।

আবার, অদৃশ্য অরি কিংবা মিত্রশক্তির সঙ্গে সংলাপের ভাষা নেই বলে সে প্রতীকের মাধ্যমে জানাতে চেয়েছে তার প্রয়োজনের কথা এবং তার ভয়, বাঞ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। তার এই অনুযোগ ও প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে নাচে, মুদ্রায়, গানে ও চিত্রে এবং প্রতীকী বস্তুর উপস্থাপনায়। এভাবে তার প্রাণের ও আয়ুর প্রতীক হয়েছে দূর্বা, খাদ্য কামনার প্রতীক হয়েছে ধান, সন্তানবাঞ্ছা অভিব্যক্তি পেয়েছে মাছের প্রতীকে, কলাগাছের রূপকে প্রকাশ পায় বৃদ্ধির কামনা, আম্রকিশলয় তার জরা ও জরমুক্ত স্বাস্থ্যের ও যৌবনের প্রতীক, আর পূর্ণকুম্ভ হচ্ছে সিদ্ধির ও সাফল্যের প্রতীকী কামনা।

মূলত সব বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও শিল্প-সংস্কৃতির জন্ম হয় আঞ্চলিক প্রতিবেশপ্রসূত জীবন-চেতনা ও জীবিকাপদ্ধতি থেকেই। তাই বৈষয়িক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবিকা-পদ্ধতি এবং পরিবেষ্টনী-জাত ভূয়োদর্শন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রবাদ-প্রবচনাদি আপ্তবাক্যের এবং উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষার।

কালে এগুলোই হয়ে উঠল জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার উৎস ও আধার এবং পরিণামে এগুলোই হল ধার্মিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও সামাজিক সংস্কার, নৈতিক চেতনা ও জাগতিক প্রজ্ঞা। মননের বৃদ্ধি ও ঋদ্ধির ফলে এর

কোন কোনটি দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদায় উন্নীত। যেমন যাদুতত্ত্বের উত্তরণ ঘটেছে অধ্যাত্মতত্ত্বে। জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রাপ্তির প্রেরণাবশে যে-ভাব, চিন্তা ও কর্মের উদ্ভাবন, পরিবর্তিত পরিবেশে ক্রমবিকাশের ধারায় কালে তা-ই ধর্ম, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতা রূপে পরিকীর্তিত। যে-কোন সংস্কার অকৃত্রিম বিশ্বাসে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে ধর্মীয় প্রত্যয়ে পায় পরিণতি ও স্থিতি। অতএব, বাঙলার এই ধর্ম প্রবর্তিত ধর্ম নয়—লোকায়ত লোকধর্ম। ভৌগোলিক প্রভাবে ও ঐতিহাসিক কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারায় এর কালিক সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্ভব হয়েছে। এ ধর্ম গোষ্ঠীর তথা সামাজিক মানুষের যৌথজীবনের দান—জনমানবের জীবন-চেতনা ও জীবিকা-পদ্ধতির প্রসূন, গণ মন-মননের রসে সঞ্জীবিত গণ-সংস্কৃতির প্রমূর্ত প্রকাশ। এই ধর্ম ও সংস্কারের এবং আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাচীন বাঙালীর পরিচয় ও আধুনিক বাঙালীর ঐতিহ্য। ইতিহাসের আলোকে স্বরূপে আত্মদর্শন করতে হলে এ সবের সন্ধান আবশ্যিক।

বাঙালীর ধর্মতত্ত্বে পাপ-পুণ্যের কথা বেশী নেই। অনেক করে রয়েছে জীবন-রহস্য জানবার বুঝবার প্রয়াস। লোক-জীবনে সে-প্রয়াস আজো অবিরল। মনে হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোক-জীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ আত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রসাদ কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যে আসমানী-চিন্তার মাহাত্ম্য প্রলেপে বাস্তব জীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে এই নির্মিত ভুবনে বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও দুঃখী মানুষ। আজো গরীব-ঘরের প্রতারিত-প্রবঞ্চিত সেই মানুষ উদারকণ্ঠে সেই উদাস গান গায়।

তার জৈব প্রয়োজনের সামগ্রীও হয়েছে তার সেই ভাবের জীবনের রূপক। এ-ও হয়তো দুঃখ-দীর্ণ, দ্বন্দ্ব-ভীরু পলাতক মনের অভয় আশ্রয়, হয়তো বা পিছিয়ে-পড়া মানুষের প্রতিহত কাম্য-জীবনের স্বাপ্নিক প্রকাশ অথবা আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষের অবচেতন কামনার বিদেহী গুঞ্জন।

২

বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে

বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা যেমন-তেমন কাঠামো হয়তো খাড়া করা আজকাল আর শক্ত নয়। সে ইতিহাসও অবশ্যই কোথাও ছায়া, কোথাও কঙ্কাল, কোথাও বা বিবর্ণ কায়ার অতিরিক্ত কিছু নয়। এবং তা কখনো একালীন সর্ববঙ্গীয়ও নয়। বস্তুত ব্রিটিশ-পূর্বকালে আজকের বাঙলা ভাষী অঞ্চল কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল বলে প্রমাণ নেই। কাজেই বাঙলার সার্বিক ইতিহাসের ধারণা কল্পনা-সম্ভব—বাস্তব নয়। আমরা যখন বাঙলার আদি ইতিহাসের কথা বলি, তখন আমরা আবেগ বশে সত্যকে অতিক্রম করে যাই, কেননা, জানা তথ্য আমাদের সে অধিকার দেয় না। পূর্বে যেমন রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি নামে বিভিন্ন অঞ্চল পরিচিত ছিল, কোন একক নামে বা একক শাসনে গোটা আধুনিক বাঙলা কখনো অভিহিত বা প্রশাসিত ছিল না, তেমনি তুর্কী আমল থেকে ১৯০৫ সন অবধি 'সুবাহ বাঙলা'র প্রায়ই অপরিহার্য অঙ্গরূপে থাকত বিহার-উড়িষ্যাও। জৈন-বৌদ্ধ মত প্রচার সূত্রেই উত্তর ভারতের সঙ্গে এই দক্ষিণ পূর্বদেশের যে যোগ ও পরিচয় তা আজকাল অস্বীকৃত নয়, এবং বৌদ্ধ মতের সঙ্গে আসে বৌদ্ধ মৌর্য শাসন। কিন্তু তা যে বিহার-সংলগ্ন অঞ্চলেই সীমিত ছিল, তাও বিতর্কের আশঙ্কা না করেই বলা চলে। এভাবে মৌর্য-কন্ব-সুঙ্গ-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল শাসন-শোষণের খবর আমরা পাই বটে; কিন্তু তুর্কী-মুঘল পূর্বকালের শাসকরা রাঢ় সুহ্ম-গৌড়-পুণ্ড্রের কোথায় কতটুকু শাসনে রেখেছিল, তা আজো অনির্ণীত। আর বঙ্গ-সমতট হরিকেলে দেব-বর্মণ-চন্দ্র-খড়্গ রাজাদের কথা শোনা যায় বটে; কিন্তু কারো রাজ্য-সীমা জানা নেই।

অতএব, তুর্কী বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বাবধি বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসও কখনো নাম সার কখনো বা কঙ্কাল সার। এই রাজারা কি দেশী? মৌর্য-কন্ব-সুঙ্গ-গুপ্ত-পাল-সেনেরা ছিলেন বিদেশী। গঙ্গারিডই রাজ কি স্থানীয়? উত্তর মেলে না। পাল রাজত্বের উদ্ভব ও বিনাশ মগধেই, বাঙলার সবটুকু তাদের অধিকারে আসেনি কখনো। শশাঙ্ক নাকি বাঙালী—তিনি কি গৌড়ী না রাঢ়ী?—ইতিহাস নীরব। কেবল দিব্য-রুদ্রক-ভীমেরই সঠিক ঠিকানা মেলে। বর্মণরা যদি

আসামী হন, চন্দ্ররা আরাকানী, খড়গরা নেপালী আর দেবরা যদি কোচ হন, তা হলে?

অতএব, বাঙলা দেশের রাজার এবং বাঙালীর ইতিহাস অভিন্ন নয়। বাঙালীর দুর্ভাগ্য বাঙালী ঐতিহাসিক যুগে বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি শাসিত। ফলে বাঙলা-দেশের বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন বিবর্ণ খবর ইতিহাস বহন করলেও তাতে বাঙালী তার স্বরূপে অনুপস্থিত। কাজেই বাঙালীর ইতিহাস নেই। বাঙালীর ইতিহাস আজো বলতে গেলে অনাবিষ্কৃত ও অলিখিত। আমরা জানি কোন জনগোষ্ঠী বা গোষ্ঠী-সমষ্টি একচ্ছত্র শাসনে না থাকলে তাদের মধ্যে অভিন্ন ভাষিক, শাস্ত্রিক, আচারিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা-ভিত্তিক জাতিসত্তাবোধ জাগে না। আজকের বাঙলা ভাষী অঞ্চল ব্রিটিশ পূর্বকালে কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না, অঞ্চলটিও ছিল না একক নামে পরিচিত। তাই ভাষিক ঐক্যও হয়েছিল ব্যাহত। একচ্ছত্র থাকলে এবং অঞ্চল-সম্ভূত শাসক বংশ থাকলে আঞ্চলিক প্রাকৃতশাসনে কিংবা অবহট্‌ঠই হত দরবারী তথা প্রশাসনিক ভাষা। তাহলে আজ আমরা আসাম-বাঙলা-উড়িষ্যা-বিহারে এক অভিন্ন ভাষী মানুষ পেতাম। বুলিগত তুচ্ছ পার্থক্য নিয়ে তিন-চারটে তথাকথিত স্বতন্ত্র ভাষা এমন কৃত্রিম ব্যবধানের দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারত না। রাজশক্তির লালন পেয়ে মধ্য দেশীয় প্রাকৃত (শৌরসেনী) ও অবহট্‌ঠ এক সময় সর্ব-ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ঐক্যের ও সংহতির বাহন হয়েছিল। তেমন ভাগ্য এ অঞ্চলের কোন বুলিরও হতে পারত সীমিত পরিসরে।

অতএব, বহু বহু কাল এই দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের মানুষ অভিন্ন জাতি সত্তায় সংহত হতে পারে নি। বরং বিভিন্ন বিদেশীর আঞ্চলিক শাসনে ক্লিষ্ট, আত্ম-প্রত্যয়হীন মানুষ আত্ম-মর্যাদালাভের বিকৃত বাসনায় মিথ্যা পরিচয়ে আত্মতুষ্টির যে পথ অবলম্বন করেছিল তা পরিণামে আত্ম-হননের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেন না, এতে জাতি-সত্তার স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রায় চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে। ঐ বৈনাশিক সংস্কারের প্রভাব আজো অম্লান। বাঙালী মাত্রই তাই সত্য পরিচয় স্বেচ্ছায় পরিহার করে অঙ্গীকৃত সরকার ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিকে স্বদেশ এবং শাস্ত্রকার ও শাসকের স্বজাতি বলে জেনে আত্ম প্রবোধ পেতে থাকে। তাই এদেশের বৌদ্ধ মাত্রই ছিল মগধী, ব্রাহ্মণ্যবাদী মাত্রই আর্যাবর্ত- ব্রহ্মাবর্তের আর্য। মুসলিম মাত্রই আরব-ইরানী কিংবা মধ্য এশীয়। ফলে আজো শিক্ষিত অভিজাত বাঙালী মাত্রই চেতনায় প্রবাসী ও বিদেশীর জ্ঞাতিত্বগর্বী. তাই ভিন্নমতের'প্রতিবেশী মাত্রই পর।

দু'হাজার বছর ধরে এ-সংস্কার লালন পেয়ে পেয়ে এমন গভীর বিশ্বাসে ও প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে যে, আজকের বিদ্বানেরাও নিজেদের অস্ট্রিক-মঙ্গোলাদির রক্ত

শঙ্কর সন্তান বলে মুখে স্বীকার করেও মনে মানেন না। তথ্য প্রসূত জ্ঞান এভাবেই সংস্কারজাত অনুভবের মোকাবেলায় ব্যর্থ হচ্ছে। গোড়ার দিকের উত্তর ভারতীয় ভাষা-ধর্ম-শাসন-সংস্কৃতির ঋণ বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি চিরতরে বিলোপ করেছে। এর ফলে সে আর কখনো স্বমেরুতে স্থির হয়ে, আত্মপ্রত্যয়ে প্রবল হয়ে, রাজনৈতিক কিংবা বৈষয়িক জীবনে স্বতন্ত্র, স্বনির্ভর কিংবা স্বাধীন হবার সাহস পায় নি। তার জীবন-চেতনা ও জগৎ ভাবনা আজো তাই পরাশ্রিত ও পরপ্রভাবিত। আজো হিন্দুমন ঘুরে বেড়ায় আর্যাবর্তে ব্রহ্মাবর্তে রাজস্থানে ও হিমালয়ের কন্দরে। মুসলিম বিচরণ করে যোলশতক-পূর্ব উত্তর আফ্রিকায় আরবে ইরানে ও মধ্য এশিয়ায়। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদীর, শাক্ত শৈব বৈষ্ণব গণপত্যের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ছিল উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের মানস-উদ্ভূত। কিংবা হিন্দু-মুসলিম বিবাদ-বিদ্বেষও ছিল দেশাগত বিদেশীর মধ্যে সীমিত। এরা প্রলুব্ধ করে সরল দেশী লোককেও হয়তো দলে ভেড়াত। আশার কথা, এ-হচ্ছে আত্ম-বিস্মৃত বিকৃত রুচি নীলরক্ত লোভী সংস্কৃতি লিপ্সু শিক্ষিত মানুষের চিন্তা-চেতনা। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক সামান্য। সমাজের নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব এদের হাতে বলেই আজো বিভ্রান্ত বাঙালী বিপথে চালিত। এদের এখনো স্বস্থ ও সুস্থ করা সম্ভব। তার জন্যে বাঙালীর সত্যকার ইতিহাস জানা ও জানানো দরকার। পর-শাসিত বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাস নেই মেনে নিলে বাঙালীর ইতিহাস রচনা কষ্টসাধ্য নয়। বাঙালীর চিন্তার চেতনার ও কৃতির ইতিহাসের উপকরণ আজো বিলুপ্ত হয় নি। আমরা জানি, ঘটনার সুবিন্যাস ইতিহাস নয়, চেতনার অনুসরণ ও চিত্রণই ইতিহাস। কারণ মন ও মননই মানুষের কর্মে ও আচরণে অভিব্যক্তি পায়। ইতিহাসের লক্ষ্য সামষ্টিক মনের ও মননের সামান্যীকৃত অভিব্যক্তি স্থানিক ও কালিক আবর্তন-বিবর্তন কিংবা অনুবর্তনের ধারায় অনুধাবন ও বিশ্লেষণ।

অস্ট্রিক-মঙ্গোল রক্ত শঙ্কর বাঙালী উত্তর ভারতীয় ধর্ম ভাষা সংস্কৃতি ও শাসন গ্রহণ করে বাহ্যত আর্যীকৃত হলেও, সে তার মানস স্বাতন্ত্র্য কখনো হারায় নি। তার সাংখ্য-যোগ-মন্ত্র-তন্ত্র সে প্রায় সর্বভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মও সে নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছিল। মহাযান বজ্রযান মন্ত্রযান কালচক্রযান তন্ত্রযান ও সহজযান তারই প্রসূন, বৌদ্ধ চৈত্য যেমন দেবতা উপদেবতায় আকীর্ণ হয়েছিল, তেমনি বৌদ্ধ শাস্ত্রও বজ্রতারা তত্ত্বে, প্রজ্ঞা উপায় তত্ত্বে, অবলোকিতেশ্বর তত্ত্বে ও দেহতত্ত্বে পরিণত হয়েছিল। বেদ উপনিষদ গীতা স্মৃতি-শাসিত ব্রাহ্মণ্য মত এখানে জীবন-জীবিকার অরি ও মিত্র দেবতার লীলানুধ্যানে অবসিত হয়েছিল, ইসলামও পেয়েছিল যোগে দেহাত্মতত্ত্বে ও অদ্বৈতবাদে নবরূপ।

বাঙালীর মানস রূপের—চিত্তবৃত্তির তথা জীবনদৃষ্টির ও জগৎ-চেতনার প্রবহমান স্বরূপ জানা যাবে তার জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত দেবতা সৃষ্টিতে ও স্বকীয় স্বতন্ত্র জীবনচর্যায় ও জীবনাচরণে। বৌদ্ধ যুগে যেমন সে-স্বাতন্ত্র্যের অবাধ প্রকাশ ঘটেছিল, তেমনি মধ্যযুগে স্বাধীন সুলতানী আমলে রাস্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগে উত্তর ভারতীয় শাস্ত্র সমাজ ও সরকারের রক্তচক্ষুর ভীতিমুক্ত বাঙালী জীবনে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুগত্যের মৌখিক অঙ্গীকারের আবরণে সে তার সৃষ্ট আদি দেবতাদের মাহাত্ম্য-মহিমা দ্বিধাহীন চিত্তে উচ্চকন্ঠে ঘোষণা করেছে। বাঙালীর স্বশাস্ত্রে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, কারু-দারু-চারু শিল্পে, পটে ভাস্কর্যে তত্ত্বচিন্তায় বাঙালী স্বরূপে আত্ম প্রকাশ করেছে। তার স্বতন্ত্র জীবন-ভাবনার ও জীবনযাত্রার পরিচয় তাই কোন কালেই গুহায়িত ছিল না। আবার বৈষ্ণবে বাউলে ব্রাহ্মে ও সুফীবাদে পীর-বাদে তার প্রকাশ ঘটেছে কালান্তরে। যেমন তুর্কী বিজয়ের পরে তেরো-চৌদ্দ-পনেরো শতকে গোটা ভারতেই নিম্নবিত্তের বা নিম্নবর্ণের মধ্যে মুক্তিতৃষ্ণা জেগেছিল, সন্তধর্মে যার প্রকাশ ও সাফল্য। বাঙালীর ইতিহাস এই সব তত্ত্বের ও কৃতির ধারাবাহিক সুবিন্যাসেই হবে রচিত। শাসকদের স্বার্থে তাদের ভাষা শাস্ত্র ও সংস্কৃতি বাঙালীর উপর চাপানোর অভিসন্ধি প্রসূত প্রয়াসের যে-সব ইতিকথা ও তথ্য বাঙলার প্রচলিত ইতিহাসে আর্যত্বগর্বী বিদ্বানেরা সগৌরবে বর্ণনা করেন, তা' বাঙালীর জীবন ও মনন-সম্পৃক্ত নয়।

লোকশ্রুতির কোন আদিশূর কিংবা বল্লালসেন কাদের স্বার্থে আর্য কৌলীন্য সৃষ্টির অজুহাতে আর্য উপনিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসী হলেন, কিংবা লোকায়ত ধর্মাচারে ব্রাহ্মণ্য পার্বণিক শাস্ত্রাচার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে কোন অভিসন্ধি ক্রিয়াশীল ছিল—তা' আজ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে যাচাই করতে হবে। বঙ্গেস্থিত উত্তর ভারতীয় আর্যদের ও তাদের জ্ঞাতিদের চোখে অস্পৃশ্য হাড়ি ডোম বাগদী জেলে জোলা কিংবা ম্লেচ্ছ নেড়ে ছিল কারা, বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে নব্যব্রাহ্মণ্য সমাজে কৃত্রিম বর্ণবিন্যাস কাদের স্বার্থে কারা, করল, উচ্চবর্ণে ও বিত্তে অধিকারই বা পেল কারা, তার হিসেব নিতে হবে, নইলে বাঙালীর ইতিহাস অস্পষ্টই থেকে যাবে। বস্তুত বাঙালীর ইতিহাস বাঙলার লোকধর্মের, লোকায়ত দর্শনের, লোক সাহিত্যের, লোক শিল্পের, লোক সঙ্গীতের ও লোক বিশ্বাস-সংস্কারের ইতিকথারই অন্য নাম।

বাঙালীর ইতিহাস, বাঙলার জাতীয় ইতিহাস, বাঙলার সংস্কৃতি-কুলজী-কুলপঞ্জী প্রভৃতি নামে যেসব গ্রন্থ রয়েছে, তাতে বিদেশী শাসক এবং বিদেশীর শাস্ত্র ও সমাজ যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, অস্পৃশ্য বলে অবহেলিত খাঁটি বাঙালীর জীবন-যাত্রার রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা তার শতাংশের একাংশও নেই। ইসলাম ও বৈষ্ণব মত-

বাদ বাঙলায় মধ্যযুগেও একবার বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা ও আভিজাত্যবোধ বিলোপ করে নির্বিশেষ বাঙালী সমাজ গড়ার সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু তা' দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বিহারে আজো কুলবাচিবিহীন হিন্দু নাম সুলভ।

বাঙলার ইতিহাসের যে অংশে প্রশাসনিক, স্থাপত্য শিল্প কিংবা সংস্কৃতি শাস্ত্র-সাহিত্য অথবা শিলালেখ বিষয়ের আলোচনা রয়েছে, সে অংশ বাঙলা বা বাঙালীর ইতিহাস নয়, তা' শাসক-শোষকের দর্প দাপটের নিদর্শন মাত্র। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মিলবে বাঙালী স্থষ্ট দেবতার মূর্তিশিল্পের বাহার ও ব্যঞ্জনা, দেব-মহিমা-মাহাত্ম্য চেতনার বৈচিত্র্য, কামার-কুমোর-তাঁতীর-ঘরামির-পটুয়ার কৃৎকৌশলের সঙ্গে রূপচেতনার সাক্ষ্য। বৌদ্ধ কিংবা ব্রাহ্মণ্য শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভয়মুক্ত বাঙালী স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায় বিধর্মী তুর্কী শাসন কালে। তাই চৌদ্দ-পনেরো শতকে বাঙালীর চিন্তা-চেতনায়, কর্মে ও আচরণে রেনেসাঁসের আভাস মেলে, তার মর্মের কথা, প্রত্যাশার প্রত্যয়ের কথা প্রকটিত হয় তার নাথসাহিত্যে, তার ধর্মমঙ্গলে, শিবায়নে, মনসার ভাসানে, চণ্ডীর অনুধ্যানে, তার অধ্যাত্ম সঙ্গীতে, তার প্রণয়গাথায়, রূপকথায়, উপকথায়, ব্রতকথায় ও জৈব-বাসনার বিচিত্র আচারিক প্রকাশে।

আরো আগে জানতে হবে, শশাঙ্কের শক্তির উৎস কারা, মহাযান কাদের মানস প্রসূন, মহাযানী দেব প্রতীক, নির্বাণ চেতনা ও জীবনচর্যা কাদের জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত। বাঙালী জনগোষ্ঠী কাদের কাছে অস্পৃশ্য, কারা করে-ছিল এদের অন্ত্যজ, তথাকথিত অস্পৃশ্য কৈবর্ত দিব্যের দ্রোহের কারণ। ঐ নির্ধন দিব্যকে সার্বভৌম শক্তির আধার পাল সম্রাটের প্রতাপ ও প্রভাব ভেদ করে শির উঁচু করে নির্ভয়ে দাঁড়াবার প্রেরণা-উত্তেজনা যুগিয়েছিল কোন পীড়ন-শোষণ এবং নির্যাতন; এবং কারা হয়েছিল স্বেচ্ছায় তার সহায় ও সহযোগী!

নদী-হাউর-বর্ষা বহুল প্রত্যন্ত এই দেশ অনভ্যস্ত বিদেশীর পক্ষে কিছুটা দুর্জয় বলে তখনকার শাসকরা কেন্দ্রীয় শক্তিকে উপেক্ষা করেছে বার বার। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে প্রশাসক মনে। কিন্তু সে বাঞ্ছা কি ছিল দেশী লোকেরও! এসূত্রে এও জানতে হবে তুর্কী আমল থেকে কোম্পানী আমল অবধি বাঙালী সৈনিকরা যে বাঙলায় শাহ-সামন্তের পক্ষ হয়ে লড়াই করেছে, তার প্রেরণা দেশপ্রেম না পয়সা।

প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে যেসব বণিক-পর্যটক-প্রচারক বাঙলা দেশে এসেছে, তা'রা বাঙালীকে ভীরু, মিথ্যাভাষী, প্রতারক, কলহপ্রিয়, দরিদ্র ও চোর

বলে জেনেছে। আমরা জানি, বিগত দু'হাজার বছর ধরে বাঙালী ছিল বিদেশী শাসিত ও শোষিত। চিত্ত বিকাশের ও আত্মোন্নয়নের কোন সুযোগই মেলে নি তাদের। কেন না, উচ্চপদে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, স্বাধীন জীবিকা সংস্থানে পরাধীন মানুষের কোন অধিকার বা সুযোগ সাধারণত থাকে না। কথায় বলে—'অভাবে স্বভাব নষ্ট।' দারিদ্র্য মানুষের সব গুণই নষ্ট করে, অঙ্কুরে বিনাশ করে সব সম্ভাবনা। আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সড়ক হয় সংকীর্ণ, জীবন-ভাবনার দিগন্ত ঘরে-গাঁয়ে থাকে সীমিত। অন্নের কাঙাল মানুষে শাস্ত্র-সমাজ সম্পৃক্ত মানবিক চেতনা কিংবা নীতি নিষ্ঠা ও আদর্শবোধ সুদুর্লভ। অন্ন-সন্ধানী মানুষ তাই ছল-চাতুরী-প্রতারণা আশ্রয়ী না হয়েই পারে না। ভীরুতা, স্বার্থপরতা, আত্মরতি, হরণ স্পৃহা, নিঃসঙ্গ প্রয়াস, ঈর্ষা, অসূয়া ও কলহপ্রবণতা তার নিত্য-সঙ্গী। চিত্ত-বিকৃতির মৌল কারণ জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে স্বাধিকার লাভের ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুযোগের অনুপস্থিতি।

এমনি পরিবেশে কারণ-ক্রিয়াবোধের অভাবে কিছু সংখ্যক ন্যায়নিষ্ঠ ও মানবহিত-কামী মানুষের মনে তত্ত্বচিন্তা ও মানবহিতৈষণা জাগে, তাঁরাই হন বিষয়বিরাগী, সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-ফকির-দরবেশ এবং শাস্ত্র ও সমাজ সংস্কারক। নীতি কথা ও আপ্তবাক্য শুনিয়ে ন্যায়বোধ ও আদর্শবাদ জাগিয়ে তাঁরা ব্যক্তিকে অনীহ ও সমাজকে কলুষমুক্ত রাখতে চান। প্রাণের ভিত্তি অন্ন, মনের খাদ্য আনন্দ তাদের চেতনায় গুরুত্বহীন। অথচ মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার ও বিকাশের জন্যে ন্যূনতম আর্থিক সাচ্ছল্য আবশ্যিক। অধিকাংশ বাঙালীর তা' কখনো ছিল না।

তাই বোধহয় বিগত দুই হাজার বছর ধরে বাঙালী জীবনে ও মননে ভোগ ও বৈরাগ্য —এই দুটোরই দ্বান্দ্বিক অবস্থান দেখতে পাই। অক্ষমের ভোগলিপ্সা তাদের যেমন দুষ্ট করেছে, তেমনি বৈরাগ্য নষ্ট করেছে তাদের আকাঙ্ক্ষা। অসহায় ভোগ-লিপ্সুরা হয়েছে বিভিন্ন শক্তি ও নিরাপত্তা প্রতীক দেবতা-স্রষ্টা ও দৈবনির্ভর, আর আত্মপ্রত্যয়হীন দরিদ্র মানুষ পার্থিব বঞ্চনা-মুক্তির প্রয়াসে আত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তি, প্রবোধ ও প্রশান্তি সন্ধান করেছে, তাদের অবলম্বন হয়েছে যোগ, তন্ত্র, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও বৈরাগ্য। তাদের কাছে দারিদ্র্য ভোগবিমুখতা, বর্মভীতি ঔদাসীন্য অক্ষমতা অনাসক্তি আত্মবঞ্চনা সংযম এবং ভীরুতা অনীহা রূপে প্রতিভাত। প্রাকৃত পৈঙ্গলে তাই বাঙালীকে রণ-বিমুখ রূপে দেখতে পাই: ভঅ ভজ্জিঅ বঙ্গা (ভয়ে বাঙালী ভাগল) বঙ্গলা ভঙ্গলা [বাঙালী (রণে) ভঙ্গ দিল।]

আজ লজ্জা ও গৌরবের মধ্যে, সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির মধ্যে, দৌর্বল্য ও সাফল্যের মধ্যে, বিকাশ ও বিকৃতির মধ্যে, আনন্দ ও যন্ত্রণার মধ্যে, সম্পদ ও সংকটের মধ্যে, ভয় ও সাহসের মধ্যে, সামর্থ্য ও অক্ষমতার মধ্যে নিজেদের স্বরূপ

জানতে হবে, তবেই আত্মোপলব্ধি হবে সম্ভব। আত্মশক্তি ও সামর্থ্য এবং আত্ম-ত্রুটি ও দুর্বলতা সমভাবে জানা না থাকলে বিপদ ও ব্যর্থতা বাড়ে, পর-প্রতারণায় আপাতলাভ থাকলেও আত্মপ্রতারণা মরণফাঁদ বই নয়। কোন জ্ঞানই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে না, তাই জ্ঞানই শক্তি। আত্মজ্ঞান ফিরে পেলে জাতীয় জীবনে অনেক বিপদ-সঙ্কট উত্তরণ সম্ভব হবে।

২

ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালী

ভারতবর্ষ বর্ণ সঙ্কর জাতি অধ্যুষিত দেশ। গ্রীক, শক, হূন, কুষাণ, তুর্কী, মুঘল ও ইংরেজ জাতির আগমন ও বসবাস তো ঐতিহাসিক ব্যাপার। তারও আগে যারা এদেশে এসেছিল, তাদের মধ্যে দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয়দের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়াও আরো কত জাতি এদেশে বিজয়ীর বেশে এসেছে -সে খবর কারুর জানা নেই সত্য, কিন্তু অনুমান করা যায়, এই জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষ চিরকাল বিদেশী বিজিত দেশই ছিল।

ইতিহাস বলছে, এদেশে যারাই যখন এসেছে কিছুকাল পরে তারা বীর্যহীন হয়ে পড়েছে। ফলে বিদেশ থেকে নতুন নতুন জাতি এসে তাদের উপর আধিপত্য করেছে। এটি হয়তো এদেশের আবহাওয়ারই প্রতিক্রিয়া।

আসল কথা, কোন জাতির চারিত্রিক বিকৃতি না ঘটলে তার পতন হয় না। এ বিকৃতির দরুন যখন সমাজে ধর্মে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় ঘটে, অর্থাৎ দেশের বেশীর ভাগ লোক নীতিবোধ হারিয়ে ফেলে; ন্যায়নিষ্ঠা ও সততা প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে; মহৎ ও বৃহতের সাধনায় পরাঙ্মুখ হয়, তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে উঠে।

পুরাকালের কোন খবর ইতিহাস দিতে পারে না। কিন্তু মধ্যযুগের কোন কোন ব্যাপারে আমরা এ বিপর্যয়ের আভাস পাচ্ছি। মধ্যযুগে বিদেশী বহু দরবেশ ও প্রচারক এদেশে ধর্মপ্রচার করতে আসেন। তাঁদের অনুচর রূপে আসে নানা মত ও মতের বহুলোক। এদেশের সমাজ ও শাসন সম্বন্ধে কৌতূহলী লোকেরও অভাব ছিল না এদের মধ্যে। রাজনীতি-সচেতন স্বদেশপ্রাণ ও স্বজাতি-বৎসল কেউ কেউ হয়তো এদেশের দণ্ডশক্তির দৌর্বল্যের খবর দিয়ে স্বজাতি-স্বদেশীকে এদেশ জয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। অন্তত আজকাল ঐতিহাসিকেরা তা-ই অনুমান করেন।

এ-অনুমানের সপক্ষে অন্তত কিছু তথ্যের আকস্মিক যোগাযোগও রয়েছে। হযরত খাজা মঈন-উদ্দীন চিশতির আগমনের পর মুসলমানদের দিল্লী রাজ্য দখল, গৌড়ে জালালউদ্দীন তাবরেজীর আগমনের পরে বঙ্গ বিজয়, বাবা আদমের আগমনে সোনারগাঁ জয়, শাহ্ জালাল ও বদর আল্লামাহর 'খানকা' করার পরে যথাক্রমে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম বিজয় প্রভৃতি ঐতিহাসিকের অনুমানের পরিপোষক। এ ভাবেই ইংরেজ-ফরাসী-পর্তুগীজের রাজ্যলাভ তো একরকম চোখে-দেখা সত্য। অবশ্য দরবেশ-প্রচারকদের উপর এসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কেউ আরোপ করে না।

ইতিহাস-আশ্রয়ী ঘটনার কথাই বলি, য়ুরোপীয় বেনেরা এল বাণিজ্য করতে। এদেশের আদর্শচ্যুত নির্বোধ দণ্ডধরদের দুর্বলতা টের পেয়ে শুরু করল লুটপাট আর জনগণের উপর উৎপীড়ন। বাধা না পেয়ে বেড়ে গেল তাদের সাহস ও লোভ। আর বেনেবৃত্তি হল একসময়ে রাজ-শক্তিতে রূপান্তরিত। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পলাশী আর অর্ধভারতের ভাগ্যবিধাতা দুর্ধর্ষ মারাঠাগণ। কিন্তু তাদের সঙ্ঘ-শক্তি ছিল না। তাই ছিদ্রপথ নদী হয়ে দেখা দিল, সাত সাগরের ওপারের কুমীর এসে জুড়ে বসল। এমনি-ই হয়। আত্মপ্রত্যয়ী উদ্যমশীল জিগীষু মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এদেশে ক্ষাত্র ধর্মের অনুকূল পরিবেশ নেই। তাই 'শক হূন দল পাঠান মুঘল' শক্তি একই পথে লোপ পেল।

॥ ২ ॥

এ জন্যেই ভারতবর্ষ সঙ্কর জাতির দেশ। বাঙলা দেশের পক্ষে এ কথা আরো খাঁটি। আদি কাল থেকে এ দেশে নানা বর্ণের ও গোত্রের লোকের বাস। পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, গৌড়া, রাঢ়া প্রভৃতি যে গোত্রবাচক শব্দ, তা বিশ্বাস করবার কারণ রয়েছে। এগারো বারো শতকের সংস্কৃত পুরাণগুলোতে এদের বহুবচনের রূপ পাওয়া যাচ্ছে: গৌড়াঃ, বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ প্রভৃতি। এতে বোঝা যায়, এক এক গোষ্ঠী বা গোত্রের বসতি-অঞ্চল বাশিন্দাদেরই গোত্রীয় নামে পরিচিত হত।[১]

মহাভারতেও আমাদের অনুমানের সমর্থন রয়েছে। মহাভারতোক্ত কাহিনী এরূপ: বলি রাজার মহিষী সুদেষ্ণা নিঃসন্তান ছিলেন। স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত জন্মান্ধ মহর্ষি দীর্ঘতমাকে রাজা স্বীয় মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে ধর্মার্থকুশল পুত্র উৎপাদন করতে অনুরোধ করলেন। তদনুসারে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে বলিরাজ মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। দীর্ঘতমা সুদেষ্ণাকে বর দিয়েছিলেন, "তোমার পুত্রগণের অধিকৃত রাজ্যসমূহ তাহাদের নামে খ্যাত হইবে।"

অষ্ট্রিক, আলপাইন, পামিরীয়, দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির সমবায়ে আধুনিক বাঙালী জাতির উদ্ভব। সাত শতকের গোড়ার দিকে বোধ হয় শশাঙ্কের নেতৃত্বে প্রথম বঙ্গ-গৌড় রাজ্য গড়ে উঠে। চর্যাপদে 'বঙ্গ'-এর সঙ্গে 'আল' ও 'আলী' প্রত্যয় যোগে বঙ্গাল ও বঙ্গালী শব্দ চালু হয় দেশ ও জাতি অর্থে। ঐতরেয় আরণ্যকেও (আঃ ৫ম শতক) 'বঙ্গ' শব্দ দেশ বা জাতি অর্থে পাওয়া যায়। চর্যাপদে 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী' বা 'আজ বঙ্গাল দেশ লোড়িউ' আর সর্বানন্দের 'অমর কোষে' (১১৫৯ খৃঃ) 'বঙ্গাল প্রচার' শব্দ পাচ্ছি। নিতাইছিরকতিলকে (লিপিকাল ১২৯৫ খৃঃ) 'বঙ্গিদেশ' ব্যবহৃত হয়েছে। মুঘল আমলে কেবল গৌড়-বঙ্গাদি অঞ্চল 'সুবা-ই-বঙ্গাল' নামে আখ্যাত হয়। ফলে কয়েক শ' বছরের অব্যবহারে অন্য নামগুলো অপরিচিত হয়ে উঠল আর 'বঙ্গ' নামটি গোটা সুবার জন্য ব্যবহৃত হতে থাকল। কাজেই 'বঙ্গ' নামের প্রাচীনতা চর্যাপদ ও ঐতরেয় আরণ্যকের প্রাচীনতার ও প্রামাণিকতার উপর নির্ভর করে।

কোল, ভীল, ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, দ্রাবিড়, চকমা, নাগা, কশী, আর্য, শক, হূন, তুর্কী, মুঘল, আরব, ইরানী, পারসী প্রভৃতি দুনিয়ার নানা গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতির সমবায়ে উদ্ভূত আধুনিক বাঙালী জাতির মধ্যে তাই বিচিত্র আচার-সংস্কার, মননধারা, চারিত্রিক বৃত্তি-প্রবৃত্তি ও মানসিক সংস্কৃতির আভাস আজো দুর্লভ নয়। দেহাকৃতিগত বৈচিত্র্যও কি কম।

॥ ৩ ॥

আমাদের দেশে 'আর্য' ছাড়া আর সব গোত্রীয় মানুষই 'অনার্য'—এই সাধারণ নামে পরিচিত। সংস্কারবশত আমরা 'অনার্য' বলতে অসভ্যই বুঝে থাকি, যেন অনার্য 'অসভ্য'-এর প্রতিশব্দ। দেশের পুরোনো ইতিহাসের যে সব উপাদান পাওয়া যাচ্ছে, তাদের সবগুলোই আর্য ভাষায় ও আর্য প্রভাবে লিখিত বা উক্ত। তাই ঋগ্বেদের আমল থেকে আজ পর্যন্ত অনার্যদের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে, তা নিন্দা ও অবজ্ঞাসূচক। অনার্যেরা বিজেতার গৌরব-গর্বী আর্যদের কাছে মানুষ নামের যোগ্যও ছিল না। এ জন্যই বিভিন্ন গোত্রের অনার্যেরা আর্য সমাজে দস্যু, রাক্ষস, যক্ষ, নাগ, পক্ষী, কুকুর, দৈত্য প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য আদিতে এগুলো ছিল 'টোটেম' নাম। কিন্তু আর্যেরা ব্যবহার করেছে অবজ্ঞার্থে। দৈত্যকুলে প্রহলাদ, রাক্ষস কুলে রাবণ, নাগকুলে বাসুকী-জরৎকারু, যক্ষকুলে কুবের প্রভৃতির কাহিনী আমরা পাচ্ছি। মহাভারত ও

পুরাণাদিতে অনার্যদের সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। অথচ এই যুগে আমরা জানতে পারছি কোন কোন অনার্য গোত্র বিশেষত দ্রাবিড়েরা আর্যদের চেয়েও সভ্য ও উন্নত ছিল। তার প্রমাণ—কেবল ময়েঞ্জোদারো, হরপ্পা, পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও কোটদিজির আবিষ্ক্রিয়ায় নয়—আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষভাবে পাচ্ছি। ঋগ্বেদের আলোকে উত্তর কালের আর্য শাস্ত্র-গ্রন্থগুলো যাচাই করলে আমরা দেখতে পাব, সেখানে শুধু যে অনার্য দেব-দেবীরাই ভীড় জমিয়েছে তা নয়—জ্ঞান ও ভক্তিবাদ, যোগ আর সাংখ্যদর্শনও গড়ে উঠেছে, যা একান্তভাবে অনার্য-প্রভাব প্রসূত।

মহাভারতে বর্ণিত "ময়" দানবের কৌরবের সভা সাজানোর কাহিনীটি অনার্যশিল্প ও সভ্যতার উৎকর্ষের আভাস দিচ্ছে। ভক্তিবাদের উদ্‌গাতা শুক, নারদ, প্রহলাদ ও ব্যাসদেব অনার্য রক্তসম্ভূত। নবঘনশ্যাম' কৃষ্ণ আর 'নব দূর্বাদল শ্যাম' রামও হয়তো অনার্যের রক্তে ঋণী। নারী দেবতা এবং শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা একান্তভাবেই অনার্য। দেবকী, বাসুদেব, শিব, উমা প্রভৃতি অনার্য নাম। আর্য দেবতা প্রকৃতির প্রতীক। কিন্তু অনার্য দেবতা গুণ ও ভাব-কল্পের প্রতিমূর্তি। এ ভাবে আমরা নানা সূত্রে আর্যদের উপর অনার্যদের সাংস্কৃতিক বিজয়ের আভাস ও পরোক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি। প্রতিমাপূজা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী ও নারী দেবতার পূজা, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ, মন্দিরোপাসনা, যোগ, তন্ত্র ও সাংখ্যদর্শন, ধ্যান, সন্ন্যাস এবং ভূত, যক্ষ প্রভৃতি অপদেবতার পূজা প্রভৃতি অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসূন। উপনিষদ যদি বিদেহ (বিহার) অঞ্চলের হয়, তাহলে তাও অনার্য অবদান। আর বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম তো অনার্য-মনন প্রসূত বটেই।

আর্যরা বিজয়ী হয়েছেই বিদেশ থেকে এসেছে। কাজেই তাদের সংখ্যা বেশী হবার কথা নয়। আমরা অনুমান করতে পারি আর্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের উচ্চ বিত্তের ও আভিজাত্যের লোকগুলো আর্য সমাজে মিশে গিয়েছিল। নইলে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়েরা উচ্চ বর্ণের আর্যশ্রেণীভুক্ত হল কি করে? আর্যদের বসবাসের সাথে সাথেই উত্তর ভারত 'আর্যাবর্তে' পরিণত হল। ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ ভারতে সামীয় দ্রাবিড় আজো রয়ে গেছে। এ দিকে মগধ পেরিয়ে বহুকাল অবধি আর্যেরা আধুনিক বাঙলা দেশের খবর নেয় নি। এই 'পাণ্ডববর্জিত' দেশ সম্বন্ধে আর্যদের যেমন অবজ্ঞার ভাব ছিল, তেমনি এর সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ধারণাও তারা পোষণ করত। এ ভাবে কতকাল কেটেছে জানা যায় না, তবে গৌড়-বঙ্গাদি

অঞ্চলে যে বর্বর-প্রায় গোত্রগুলোর বসতি ছিল, তার আভাসও জৈন আর ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাচ্ছে।

॥ ৪ ॥

অনেককাল অবধি আর্য-অনার্যের রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই চলেছিল, বৈদিক-পৌরাণিক ইন্দ্র-কথা থেকে এও অনুমান করা কষ্টকর নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের অনার্য রাক্ষস, নাগ, দৈত্য প্রভৃতি গোত্রশক্তিকে রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক রণে পরাজিত ও পর্যদস্ত করে চিরদাসে পরিণত করতে বা এদের উচ্চবিত্তের লোকগুলোকে আর্যসমাজ ভুক্ত করে নিতে আর্যদের সময় লেগেছিল অনেক। যারা বশ্যতা স্বীকার করে নি. তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরে গিয়ে কিংবা বনে জঙ্গলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। যে সব বিত্তহীন অজ্ঞ মানুষ আর্য সমাজে দাসরূপে ঠাঁই পেল. তারা কিরূপ উৎপীড়িত হত ও অবজ্ঞা পেত. তার চিত্র মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ব্রাহ্মণ্য সংহিতার পাঁতিগুলো থেকে পাওয়া যায়। আর্যেরা সম্ভবত বহুকাল ধরে প্রবল প্রতাপে শাসন চালিয়ে যায়। এমনি করে এক সময় যখন বিজেতা-বিজিতের স্মৃতি গণমন থেকে মুছে গেল. অথচ বেশীর ভাগ অনার্য সমাজে হীনবর্ণরূপে লাঞ্ছিত. অবজ্ঞাত ও উৎপীড়িত হচ্ছিল, তখন জৈব নিয়মেই সেকালের প্রথামত ধর্মবিপ্লবের আবরণে সমাজ বিপ্লব দেখা দিল। এ বিপ্লবের সার্থক নেতা বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ। গৌতম-পূব বহু বোধিসত্ত্বের এবং জৈনদের মহাবীর-পূর্ব তেইশ জন তীর্থঙ্করের উল্লেখ থেকেই বোঝা যাচ্ছে. অসন্তোষ ও বিদ্রোহ অনেক আগে থেকেই দানা বেঁধে উঠছিল. সাফল্য আসে তথা পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হয় মহাবীর ও গৌতমের নেতৃত্বে। এই দেব-দ্বিজ-বেদদ্বেষী বিপ্লবীদ্বয়ের অনুশাসন থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্য সমাজদেহ কিরূপ বিষাক্ত করে তুলেছিল। তাঁরা দুজনেই প্রচলিত ধর্ম দর্শন তথা সমাজ ব্যবস্থা অস্বীকার করলেন। যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কাণ্ড. বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য—এক কথায় তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সমাজ. সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুরই বিলোপ সাধনে ব্রতী হলেন। মানুষের দুঃখ ঘুচাতে গিয়ে, মানুষের প্রাণ ও আত্মার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়ে তাঁরা সর্বজীবের জীবনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রচারে এগিয়ে এলেন। এতবড় কথা এর আগে আর কোঁথাও কেউ বলেন নি। সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বাণীবাহক মানবতার এই মহাসাধকগণ সেদিন কোটি কোটি নিপীড়িত নর নারীকে [দেবী পূজার যুগেও আর্যসমাজে নারীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল

না, শূদ্রের চেয়ে নারীর মর্যাদা বেশী ছিল না। [সংপ্রদায় বিশেষের খামখেয়ালী অত্যাচার থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। আর্য-অনার্যের বিভেদ উঠে গেল, ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ঘুচে গেল। সাধারণের 'বুলি' অভিজাত ভাষার আসনও কেড়ে নিল। নিম্নবর্ণের নর-নারী নতুন ধর্মচ্ছায়ায় ও সমাজাশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। [উচ্চবর্ণের খুব কম লোকই জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম বরণ করেছিল।]

এই বিদ্রোহ বিপ্লবের লক্ষণটা আরো স্পষ্ট করে বলা দরকার: দেবতার নাম করে বামুনেরা শোষণ ও পেষণ করত। গৌতম দেবপূজা অস্বীকার করলেন—আত্মা-নরক-পিণ্ড প্রভৃতির ব্যাপারে নিরীহ লোকদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে পীড়ন করা হয়। তাই বুদ্ধ বললেন—সব মিথ্যে। বর্ণাশ্রম-দুষ্ট সমাজে ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখা দিল। তাই প্রচারিত হল সাম্যবাদ। দেব ও দ্বিজের দৌরাত্ম্য অসহ্য হয়ে উঠল—তাই দেব-দ্বিজ পূজা অস্বীকৃত হল। সংস্কৃতে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর অধিকার ছিল না– তাই গণভাষা পালি ও প্রাকৃত মর্যাদা পেল। বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদকে অনার্য অভ্যুত্থান বলেও আখ্যাত করা যেতে পারে। গৌতম জন্মেছিলেন অনার্য-অধ্যুষিত নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলবাস্তুতে। তিব্বতী ভোটচীনা লিচ্ছবীরা ছিল তাঁর মাতৃকুল। মহাবীরও ছিলেন অনার্য-অধ্যুষিত তথা আর্যাবর্ত বহির্ভূত অঞ্চল দক্ষিণ বিহার সম্ভূত।

যে-দেবতাকে নিজের সুখ-দুঃখের কথা নিজ মুখে নিবেদন করা চলে না, যে-ধর্মের ক্রিয়া-কাণ্ড নিজের আচরণসাধ্য নয়, যে-ধর্মের বাণী নিজ মুখে উচ্চারণ ও নিজ কানে শ্রবণ সম্ভব নয়, তার সঙ্গে কারো আত্মিক যোগ থাকার কথা নয়। এ-কারণে লোকেরও কোন অন্ধসংস্কারের বন্ধন ছিল না। তাই ভারতময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সহজেই প্রচারিত হতে পেরেছিল।

আর্য-অনার্যের বিভেদ যখন ঘুচে গেল, তখন দেশ বা মানুষ অবিশেষের কাছে বুদ্ধ-মহাবীরের বাণী পৌঁছিয়ে দেবার পক্ষে কোন বাধা রইল না। এ সময়েই প্রথম জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মগধের সীমা অতিক্রম করে রাঢ়ে পুণ্ড্রে তথা আধুনিক বাঙলাদেশে নবধর্ম প্রচারের জন্যে উপস্থিত হলেন। এ দেশের বর্বর-প্রায় জনগণের মধ্যে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির আবরণে এই দ্রোহী-ধর্ম অর্থাৎ জৈন-বৌদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হল। এদের লিপি ছিল না, সাহিত্যের শালীন-ভাষা ছিল না, উঁচু মানের সংস্কৃতি ছিল না, তাই আর্য ধর্মের (নামত অবশ্য) সঙ্গে আর্য ভাষা আর সংস্কৃতিও তাদের বরণ করে নিতে হল। এ ভাবে বাঙলাদেশে অল্পকালের মধ্যে আর্যধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করল এবং এ সঙ্গে কিছু

সংখ্যক তথাকথিত আর্যও এ দেশে প্রচার উপলক্ষে বসবাস করতে শুরু করেছিল বলে অনুমান করতে বাধা নেই।

॥ ৫ ॥

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মান্দোলনকে আমরা অনার্য অভ্যুত্থানও যে বলতে পারি, তার পক্ষে কিছু তথ্য আছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণে দস্যু সর্দারের রাজ্যলাভ এবং নাপিতপুত্ররূপে ঘৃণিত নৃপতির কথা আছে।[১] রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"শূদ্রগণ অনার্য বংশসম্ভূত।.. ...শিশুনাগ বংশীয় মহানন্দের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়া একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন—মগধে শূদ্রবংশের অভ্যুত্থান ও আর্যাবর্ত পুনর্বার নিঃক্ষত্রিয় করণের প্রকৃত অর্থ বোধ হয় যে, এই সময়ে বিজিত অনার্যগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন এবং মহাপদ্মনন্দের সাহায্যে ক্ষত্রিয় রাজকুল নির্মূল করিয়াছিলেন। মহাপদ্মনন্দের পূর্বে ভারতবর্ষে কোন রাজা সমগ্র আর্যাবর্ত অধিকার করিয়া 'একরাট' পদবী লাভ করিতে পারেন নাই।"[২]

রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তে যদি ত্রুটিও থাকে, তবু আমরা বলতে পারি, মহানন্দ, চন্দ্রগুপ্ত কিংবা অশোক—এ তিন জনের যে কোন একজনের নেতৃত্বে অনার্য অভ্যুত্থান সফল হয়েছিল। রাজবংশী প্রভৃতি কৈবর্ত শূদ্রগণও এক সময় আর্য শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের দেব-দ্বিজ ও বেদদ্রোহিতা এতই তীব্র ছিল যে, নির্বাণ কালে তিনি নাকি সংস্কৃত-চর্চা করতে নিষেধ করে যান। বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্রের দস্যুবৃত্তির ও যুদ্ধের এবং মহাভারতে আর্য-অনার্যের যুদ্ধ-বিগ্রহের বহু কাহিনী আছে। বাসুকীর বিদ্রোহ, বৃত্রের দেবতা তাড়ন, রাবণের সীতাহরণ, প্রহলাদের আর্যধর্ম গ্রহণ, রামের হরধনু ভঙ্গকরণ, রামের পাদস্পর্শে অহল্যার প্রাণলাভ, অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্য যাত্রা প্রভৃতি আর্য-অনার্যের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও মিলনের কাহিনী। ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকাম, শুকদেব প্রভৃতির জন্ম অনার্যার গর্ভে। আর্যেরা যে অনার্যা সুন্দরীদের ধর্ষণ করত, এগুলো তারও নজির।

১ সমসাময়িক ভারত ১ম খণ্ড, ভূমিকা—যোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার।

২ বাঙলার ইতিহাস ১ম খণ্ড।

॥ ৬ ॥

মনে করা যাক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে বাঙলাদেশে আর্য-প্রভাব পড়ে নি। কিন্তু দেশে মানুষ ছিল, অথচ তাদের ভাষা ছিল না, সুখ-দুঃখের গান বা গাথা ছিল না, ছড়া ছিল না, 'বচন' ছিল না কিংবা ধর্ম সঞ্জাত সংস্কার ছিল না—এমন হতেই পারে না। কাজেই মেনে নিতে হয় যে, আর্য-পূর্ব যুগে এ দেশে কোন একটি সর্বজনীন ভাষা কিংবা গোত্রীয় ভাষাগুলো চালু ছিল। জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম বরণ করে নিয়ে তারা নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে উন্নত আর্য ভাষা গ্রহণ করে। এর সঙ্গে তাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতির ও বস্তুর নির্দেশক কিছু কিছু শব্দ ও বাগ্বিধি আর্য ভাষার (সম্ভবত মাগধী প্রাকৃত) সঙ্গে মিশে গেল। কোন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি অপরিণত থাকলে সেগুলোকে উন্নত-তর ভাষা ও সংস্কৃতির চাপে পড়ে অপমৃত্যু বরণ করতে হয়। সর্বক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন অবস্থায় এ বিপদ এড়ানো যায় না। বাঙলা সেদিন এই শেষোক্ত অবস্থায় পড়েছিল। কোন ভাষা সেকালে কোন ধর্মবিপ্লবের বাহন হলে তার বিকাশ দ্রুততর হত—এ কালে যেমন হয় রাষ্ট্রভাষা কিংবা কোন মতবাদের বাহন হলে। এর প্রসারও হত, কারণ কোন ভাষা কোন ধর্মবিপ্লবের বাহন হলে তার প্রভাব এড়ানো সে-ধর্মে দীক্ষিত জাতির পক্ষে অসম্ভব। এবং যে-কোন ভাষার প্রসার নতুন ভাব, চিন্তা ও নতুন বস্তু ভিত্তিক। জৈন ধর্ম নয়—বৌদ্ধ মতবাদই বাঙলাদেশে বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল। যারা এ মতবাদ গ্রহণ করতে পারে নি, তারা আত্মরক্ষা কিংবা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথা বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এ জন্যেই আজো কোল, ভীল, মুণ্ডা, কুকী, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি নিজেদের ভাষা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে, দেখতে পাই। এ সব ভাষাকেই সম্ভবত 'আর্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' (৮ম শতক খ্রীঃ) 'অসুরভাষা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে: 'অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়-পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা।' কিংবা ঐতরেয় আরণ্যকে 'বায়াংসি'র বুলি বলে নিন্দিত হয়েছে।

॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণ্য উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতির উপায় রূপে জনগণ বৌদ্ধ ও জৈন মত উৎসাহের সাথে গ্রহণ করলেও প্রথম উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয়

ধর্মে নানা বিকৃতি দেখা দিল। কারণ, এ দুটো ধর্মের শিক্ষা ও অনুশাসন জৈব ধর্মের এতই প্রতিকূল যে তা প্রাত্যহিক জীবনে আচরণসাধ্য নয়। সাধারণ-ভাবে, মানুষের জীবনে সাধনা হচ্ছে ধন-জন-মানের সাধনা। অন্তরের অভাব ও অতৃপ্তিবোধই আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মপ্রেরণারূপে প্রকাশিত হয়, ভোগেচ্ছাবিহীন জীবন সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। অথচ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মূল কথা—বৈরাগ্য—তৃষ্ণাবিহীন জীবনসাধনা—অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনকে পঙ্গু ও অথর্ব করে তোলা। তাই বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি ও বৌদ্ধদের নৈতিক চারিত্রিক দৌর্বল্যের সুযোগে শঙ্করাচার্য প্রমুখের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্য শক্তি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংঘর্ষে দেদার হত্যাকাণ্ড, বহু অত্যাচার ও নানা উৎপীড়ন যে হয়েছিল, তার প্রমাণ সে যুগের পুঁথিপত্রে নানা সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন 'শঙ্কর বিজয়ে' আছে: দুষ্টমতাবলম্বিনঃ জৈনান অসংখ্যাতান অনেক বিদ্যাপ্রসঙ্গে নির্জিত্যাতেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছিত্ত্বা বহুষু উদূখলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমণেচূর্ণীকৃত চৈবং দুষ্টমত ধ্বংসম আচরণ নির্ভয়ো বততে। [অর্থাৎ: অসংখ্য দুষ্টমতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজ্যমুখ্যদিগকে অনেক বিদ্যাপ্রসঙ্গে নির্জিত করিয়া তাহাদের মাথা কুঠার দ্বারা ছিন্ন করে, অনেক উদুখলে নিক্ষেপ করে, মুষল দ্বারা চূর্ণ করে, এইরূপ দুষ্টমত ধ্বংস আচরণ করে তিনি নির্ভয় থাকতেন।] এই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে বৌদ্ধগণ নির্মূল হয়ে গেল। তাদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতিও বৌদ্ধদ্বেষী নবজাগ্রত ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় কর্তৃক হয়তো বহুলাংশে বিনষ্ট হয়েছিল।

বাঙলাদেশের কথায় আসা যাক। বাঙালীরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করল সত্য, কিন্তু ধর্মের অনুশাসনের সাথে জনগণের আন্তর যোগ ছিল না, তাই নিরীশ্বর নৈরাত্ম্য বৌদ্ধ চৈত্যগুলো ক্রমে বহু দেবতা ও উপদেবতার মন্দিরে পরিণত হল। হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি নানা মতাদর্শ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। কারণ সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে স্বস্তি ও প্রবোধ পাবার জন্যে একটি মহা-শক্তিকে অবলম্বন স্বরূপ পাওয়া চাই। নইলে ভরসা কি? বাঙলার পাল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাই তাঁদের সময়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম নামত টিকে ছিল। সেন রাজাগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের প্রতিকূলতায় বাঙলাদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তৎসঙ্গে বৌদ্ধযুগের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিও বিলুপ্ত হল। বাঙলাদেশে কোনকালে যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব ছিল, তা অনুমান করবার সামান্য উপাদান পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল না। এতেই বোঝা যায়, কি অসামান্য উগ্রতা নিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মধ্বজি-

গণ বৌদ্ধদের ধর্ম, সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধ জাতিকে ধ্বংস করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গেও জনসাধারণের বিশ্বাস সংস্কারের যোগ নিবিড় ছিল না। রাজধর্ম বলে সেন বংশীয় শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুসৃত হলেও, আসলে ধর্মগ্রন্থ, মন্দির, দেবতা প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ও সম্পর্ক ব্রাহ্মণের মারফত হত বলে, তা' কখনও অকৃত্রিম হয়ে উঠে নি। তাই বাঙলাদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (সেন রাজবংশের পতনযুগেই এর সূচনা) রাজ-রোষের ভয়মুক্ত জনসাধারণ স্ব স্ব বিশ্বাস-সংস্কার দিয়ে নিজেদের ইষ্ট দেবতা পুনঃ সৃষ্টি করল। এটাই বাঙলাদেশে ও সাহিত্যে লৌকিক ধর্মান্দোলন। মনসা, চণ্ডী, ওলা শীতলা, ধর্মঠাকুর, নাথপন্থ প্রভৃতি দেবতার ও মতের সৃষ্টি হল এবং পূজার প্রসার ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে থাকল। এইগুলো মূলত বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত অনার্য ধর্ম। অবশ্য এতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব প্রচুর। এ প্রভাব পড়ে প্রধানত রামায়ণ অথবা মহাভারত ও পুরাণের মাধ্যমে। গভীর তাৎপর্যে, লোকায়ত ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রাহ্মণ্যবাদ লৌকিক দেবতা ও লোকায়ত মত স্বীকার করে স্মৃতি-পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয়ের মাধ্যমে আপোসে সহাবস্থানের সুযোগ করে নিয়েছিল।

এ সব লৌকিক দেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এক কালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোন উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পূজা চাই। অর্থাৎ যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী? গায়ের জোর। কি উপায়ে দখল করবে? যে উপায়ে হোক। তারপর যে সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়েরই জয় হোলো। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে।" রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য একটু কঠোর। আসলে সমাজে যে স্তরের লোক দ্বারা এ সব লৌকিক দেবতা পরিকল্পিত, প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত, তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও রুচিসংস্কৃতি কোন কালেই উঁচু ছিল না। যে পরিবেশ ও শিক্ষা পেলে মানুষের মন ও মননের বিকাশ ও প্রসার হয়, তা চিরকাল এদের কাছে রুদ্ধ ছিল, তাই এদের অপরিণত মন-বুদ্ধি-বোধিরই নগ্নরূপ ধরা দিয়েছে দেবতার কায়িক শক্তি ও ঐশ্বর্য পরিকল্পনায়।

খ্রীস্টীয় এগারো-বারো শতকে অর্থাৎ পাল রাজত্বের শেষের দিকে রচিত সংস্কৃত পুরাণগুলোতে এ সব লৌকিক দেবতার উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। 'বাংলা

মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে' আশুতোষ ভট্টাচার্য (১ম সংস্করণ) যা বলেছেন তা' অনেকটা সমীচীন বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন—"সেন রাজাদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল সত্য কিন্তু এত কালের একটা দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতিও—যাহা জাতির একেবারে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল—মুখ্যত: না হউক গৌণত: হইলেও এই সমাজদেহেই রহিয়া গেল। সেকালের বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনের এই সন্ধিযুগে, দেশীয় প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নূতন আদর্শ এই উভয়ের সংঘাতমুহূর্তে বাংলা পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যগুলি সর্ব প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।...তাহারা (বাঙালী হিন্দুগণ) নূতনকে (ব্রাহ্মণ্যধর্মকে), যেভাবে গ্রহণ করিল তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল; এই দেশীয় প্রচলিত ধর্ম-সংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। মঙ্গল কাব্যগুলি এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কি ভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গল কাব্যগুলি পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা যায়।...তাহারই ফলে বর্তমান বাঙলার হিন্দুসমাজে পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।"

॥ ৮ ॥

"বৈদিক মতাবলম্বী ও স্মার্তনীতিতে বিশ্বাসী সেনবংশ বাংলাদেশে যে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত নিম্ন-স্তরের জনসাধারণের কিছু মাত্র যোগ ছিল না—তাহারা তখনও কালচক্রযান, বজ্র-যান, সহজযান, নাথধর্ম প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের সুড়ঙ্গপথে গতায়াত করিতে-ছিল।" (অসিত বন্দ্যো: বা: সা: ইতিবৃত্ত ১ম খণ্ড পৃ: ২৭) অতএব সেন আমলে ধর্মের ক্ষেত্রে শাসক-শাসিত গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লঘু-গুরুভাবে চলছিল। তাছাড়া লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাঙালীর নৈতিক দৌর্বল্য, চারিত্রিক বিকৃতি ও সামাজিক শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। এর বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। হলায়ুধ মিশ্রের 'শেখ শুভোদয়া', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', শূন্য পুরাণ বা ধর্ম পূজাবিধানের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' প্রভৃতিতে এর আভাস আছে। গীতগোবিন্দে আধ্যাত্মিকতা সন্ধান করা বাতুলতা মাত্র—কারণ এতে তা নেই। বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণ্য উৎপীড়নের রেশ তখনো ছিল। রাজধর্মে ও ক্ষাত্রশক্তিতেও শিথিলতা এসেছিল।

মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি আধি-দৈবিক শক্তির উপর একান্ত নির্ভরতা এ যুগের প্রাসাদ ও কুটীরবাসীর চিত্তদৌর্বল্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সেন আমলের রণনীতির একটু নমুনা :

"তুকতাকের উপর বিশ্বাস সেকালে রাজশক্তিরও যে কতটা দৃঢ় ছিল তার একটু নিদর্শন দিচ্ছি সেকালের একটি তথাকথিত রণনীতির বই থেকে। শত্রুসৈন্য যদি চারিদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে বইটিতে অনেক রকম বিধান আছে। তার মধ্যে একটি বলছি। শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তূর্যের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে,

ওং অং হং হালিয়া হে মহেলি বিহঙ্গহি সাহিনেহি
মশানেহি খাহি লুঞ্চহি কিলি কিলি কালি হুংকট স্বাহা।

আর শ্বেত অপরাজিতার মূল ধুতুরাপাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক এঁকে সর্বগ্নোদয় মন্ত্রজপ করতে হবে। তা হলে সেই তূর্যের শব্দ শুনে "ভবতি পরচক্রভঙ্গ: স্বসৈন্য বিজয়:।" (ডক্টর সুকুমার সেন - মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী)

দেশের দণ্ডশক্তির যখন এমনি অবস্থা, তখন মুসলিমশক্তি দেশ শাসন ব্যাপারে বিশেষ বাধা পেয়েছিল বলে মনে হয় না। কাজেই 'ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা' চালাবার কারণ ঘটে নি। বরং ডক্টর সুকুমার সেনের অপর একটি উক্তি যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন—"আমাদের দেশের চিন্তাধারার একটা সাধারণ সূত্র হচ্ছে সুখের মত দু:খকেও ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধান বলে মেনে নেওয়া।...তাই কিছুকাল পরে জনসাধারণ সহজেই মুসলমান বিজয়কে ঈশ্বরের মার বলে মেনে নিয়ে মনে সান্ত্বনা আনতে চেষ্টা করলে।" (মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী)। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ও তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাসে' সেন আমলের বাঙালীর চরিত্র শৈথিল্যের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

॥ ৯ ॥

তুর্কী অভিযানের সময় বিজেতা-বিজিতের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান ছিল। বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে দেউলদেহারা ও দেশীয় সামন্তশক্তির উপর হামলা করতে যে বাধ্য হয়েছে তা' অস্বীকার করারও কারণ দেখি না।

দেশী শাসক-প্রশাসক-ব্যবসায়ীর স্থানে গায়ের জোরে বসল বিদেশী। কাজেই অনেকেরই সর্বনাশ হল ধনে-জনে মানে-মনে। প্রাণ হারাল অনেকেই। বিজেতাগণের উত্তম্মন্যতা ও বিজিতদের হীনমন্যতার দরুন পারস্পরিক সম্পর্ক যে কিছুকাল অবজ্ঞা ও বিদ্বেষদুষ্ট ছিল তাও সত্য। তুর্কী অভিযান তথা ভারতে মুসলমান বিজয় যে ধর্ম সম্পৃক্ত নয়, তা' সবাই স্বীকার করেছে। সুতরাং শাসক বিশেষের অত্যাচার উৎপীড়ন জাতীয় কলঙ্করূপে চিত্রিত হওয়াও উচিত নয়। যেমন, গণেশের পুত্র জালাল উদ্দীন যে কয়জন ব্রাহ্মণকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন, তা' একান্ত ভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল। ইসলাম বা মুসলমানের এর সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। ভারতে ইসলাম প্রচারে কোন কোন রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজধানীতেও হিন্দু আধিক্য তার প্রমাণ। তুর্কী মুসলমানেরা রাজত্ব করতে এসেছিল, ধর্ম প্রচার করতে নয়। অবশ্য মুসলমান বিজয়ের আনুষঙ্গিক ফল পরোক্ষভাবে ইসলাম প্রচারের সহায়ক হয়েছিল। বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য় এবং বৈষ্ণব গ্রন্থগুলোতে হিন্দুর উপর বিশেষ করে ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচারের যে সব কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদের সত্যতা স্বীকার করেও বলা যায়, এ সব অত্যাচার উৎপীড়ন অহেতুক ছিল বলে বিশ্বাস করা উচিত নয় [পূর্ব অধ্যায়ে জাতিবৈর দ্রষ্টব্য]। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগেও স্বদেশী সরকার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বজাতির উপর দলীয় স্বার্থে ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে রূঢ় ও কঠোর হতে বাধ্য হয়। বিরোধী দল একে অকারণ অত্যাচার-উৎপীড়ন বলে রটিয়ে থাকে। কে না জানে সকারণ শাস্তি চিরকালই শাস্তিভোগীর দ্বারা অকারণ উৎপীড়ন বলে বর্ণিত হয়? আত্মপক্ষ সমর্থন মানুষের সহজাত বৃত্তি। আবার কোন কোন মুসলমানের কাফেরদের প্রতি অবজ্ঞা, কাফের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্বহীন উক্তি ও কার্য পুঁথিপত্রে বিধৃত থেকে গোটা মুসলমান জাতিরও কলঙ্ক ঘোষণা করছে। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে ভাবে ধর্মীয় সংঘর্ষ হয়েছিল এবং হবার কারণ ছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সে কারণ থাকার কথা নয়। ওটাতে প্রতিবেশীসুলভ বহুকাল পোষিত আক্রোশের রেশ ছিল, এটাতে ছিল না। কেন না, দীক্ষিত মুসলমানের বিরলতার দরুন মুসলমান তখনো হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী হয়ে উঠে নি। তখন কেবল বিদেশী প্রশাসক মুসলমান ও দেশী হিন্দুই ছিল—অনেকটা ইংরেজ শাসক ও ভারতীয় প্রজার মতো।

মুসলিম রচিত রসুল বিজয়, হানিফার দিগ্বিজয়, সোনাভান, জৈগুন প্রভৃতির মধ্যেও দেখি মুসলমানদের কাফেরের প্রতি নয় কুফরীর প্রতিই অশেষ অবজ্ঞা

ও বিদ্বেষ, তাই তাদের কাহিনীতে রাজা ও ব্রাহ্মণই ইসলামে দীক্ষাদানের লক্ষ্য— দ্বন্দ্বও সর্বত্র রাজা ও ব্রাহ্মণের সঙ্গেই।

হিন্দু ও শাসক মুসলমানের বিরোধই সত্য ছিল, সম্প্রীতি মিলন কাহিনীই কি মিথ্যা ? "এদেশে আসিয়া মুসলমান রাজারা সংস্কৃত হরফে মুদ্রা ও লিপি ছাপাইয়াছেন, বহু বাদশা হিন্দু মঠ মন্দিরের জন্য বহু দানপত্র দিয়াছেন। সেসব ঐতিহাসিক নজীর দিন দিনই নূতন করিয়া বাহির হইতেছে।" (ক্ষিতি মোহন সেন)

তুর্কী রাজত্বের প্রথম যুগে রাষ্ট্রশক্তির স্থিরতা ছিল না। রাজা ও রাজপুরুষগণ নিজেদের মধ্যেই স্বার্থ ও অধিকার নিয়ে ষড়যন্ত্র, হানাহানি ও কাটাকাটিতে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং এ সময় দেশে হিন্দু-পীড়নে আগ্রহ না থাকারই কথা। কিন্তু ইলিয়াস শাহী শাসনে দেশে যে স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এ সময় থেকেই মুসলমান শাসকগণ দেশের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে তৎপর হন। এ সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দীক্ষার মাধ্যমে রক্তসম্পর্কও ব্যাপক হতে থাকে। কোন কোন মুসলমানের ব্যক্তিগত লাম্পট্যে হিন্দু রমণী ধর্ষণ যে চলে নি তা নয় তবে এগুলো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজাত নয়—কামজ। সুন্দরীর প্রতি পুরুষসম্ভব আকর্ষণজাত। যেমন রাজা গণেশের দরবেশ-পীড়ন একান্তই রাজনৈতিক কারণ প্রসূত।

শাসকগোষ্ঠী চিরকাল আলাদা একটা জাতি। তাঁদের স্বার্থ ও সুখের প্রেরণাতেই তাঁদের কর্ম প্রচেষ্টা চালিত। তা' জনসাধারণের পক্ষে কখনো কখনো বিপদের কারণ হয়ে উঠে মাত্র। শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ নরশ্রেষ্ঠ, আবার কেউ বা নরদানব। এসবই হচ্ছে ব্যক্তিগত চরিত্রনির্ভর ব্যাপার। কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের সঙ্গে সুশাসন কুশাসনের কার্যকারণ সম্পর্ক সন্ধান নিতান্ত নিরর্থক। বাঙলার তথা ভারতের মুসলমান নৃপতিদের অনেকেই সুশাসক ছিলেন, নরদানবও ছিলেন কেউ কেউ। তাঁদের অনুগ্রহ-নিগ্রহ স্বজাতি-বিজাতি সমভাবে ভোগ করেছে। আস্তিক মানুষেরা কেবল স্বধর্মকেই সত্য বলে জানে। পর ধর্মে আস্থার অভাবহেতু ধার্মিক মাত্রই পর ধর্মের প্রতি অবজ্ঞাপ্রবণ। কাজেই ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা কখনো ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু তাই বলে বৈষয়িক ও রাজনীতিক ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান ভেদবুদ্ধি যে প্রবল ছিল, তার প্রমাণ দুর্লভ। প্রতাপ-শিবাজীর মুসলমান অনুচর ছিল বহু। আওরঙজীবের হিন্দু সেনা ও সেনাপতির সংখ্যাও কি কম। তারপর যে সব সূত্রে আমরা বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার, হিন্দুর উপর মুসলমান উৎপীড়নের সংবাদ পাচ্ছি, তাতে লেখকের ব্যক্তিগত মতাদর্শ নিশ্চয়ই রয়েছে। যেমন, ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ যেমন

আছে, তেমনি সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছাও কম নয়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে বিরোধের কথা ফলাও করে বলে বেড়ায়, আবার কেউ সম্প্রীতির কথা তুলে ধরে। অথচ সত্য থাকে এ' দুয়ের মাঝখানে। '১২০১ থেকে ১৪৫০ পর্যন্ত আড়াই শ' বছর যাবত মুসলমানগণ বাঙলা দেশে অত্যাচার ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা' চালাবার ফলেই এ সময়ে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি বলে সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করবার জন্যেই আমাদের এত কথার অবতারণা করতে হল।

॥ ১০ ॥

আমাদের ধারণা, তুর্কী বিজয় ও তারপরের বাঙলার অবস্থা নিম্নরূপই ছিল :

তুর্কীদের বাঙলা অভিযানকালে তারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, ধনরত্ন প্রাপ্তির আশায় এবং পলাতক শত্রুর সন্ধানে দেউলদেহারা আক্রমণ করেছে ও ভেঙেছে। বিজয়ী হয়ে এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পরে দেউলদেহারা ভাঙবার কোন কারণ ছিল না। অবশ্য ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় অপরাধ বা আক্রোশ-বশে সামন্তশ্রেণীর কোন কোন হিন্দুর উপর পীড়ন যে করতে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তেমন অত্যাচার থেকে মুসলমানও নিষ্কৃতি পায় নি। সাধারণ মুসলমানের উত্তমন্যতা ও সাধারণ হিন্দুর হীনমন্যতাজাত পারস্পরিক অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ তাদেরকে কিছুকাল অনাত্মীয় করে রেখেছিল বলেও অনুমান করা যায়। কিন্তু হিন্দুদের উপর মুসলমানরা অত্যাচার করতে পারে নি। কারণ :

১. 'রাজ্যশাসনে ও রাজস্ব ব্যবস্থায় এমন কি সৈনাপত্যেও হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।' (ডঃ সুকুমার সেন)। "অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীর-গুলি ধনবান হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন।…এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইঁহারাই ব্যবসায় বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।" (ষ্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস)

২. সাধারণ মুসলমানরা বিশেষ করে প্রচারক দরবেশরা চাইতেন এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার হোক। কাজেই ইসলামের মাহাত্ম্য ও মুসলিম জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্যও সাধারণ মুসলমানকে সংযত হয়ে চলতে হয়েছে। বিশেষত গৌড়েই হযরত জালালউদ্দীন তাবরেজী ও আলাউল হক তাঁর পুত্র হযরত নূর কুতবে-আলম প্রভৃতি অবস্থান করতেন।

৩. গৌড়ের প্রথম দিককার সুলতান ও রাজপুরুষগণ নিজেদের মধ্যেই স্বার্থ ও ক্ষমতা নিয়ে ষড়যন্ত্র, হানাহানি ও মারামারিতে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময়ে হিন্দু

প্রজাদের [যারা ছিল শতকরা প্রায় আটানব্বই জন] তাঁরা উৎপীড়ন দ্বারা উত্তেজিত হবার সুযোগ দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। ধর্মান্তর ও বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অতি অল্পকালের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এরূপে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ সম্প্রীতি স্থাপিত হওয়া সম্ভব। তাছাড়া তখনো গাঁয়ে গঞ্জে মুসলমান ছিল দুর্লভ বা নগণ্য। ইলিয়াসশাহী শাসনকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। গৌড়ের সুলতানের অধীনে হিন্দুরাও অন্তত মন্দের ভালো রূপে মুসলমানদের ন্যায় নিজেদের স্বাধীন জাতি বলে মনে করত। অন্তত অনুগত ও তুষ্ট প্রজা ছিল। এ-জন্যেই মুঘলের বিরুদ্ধে বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে তারা কখনো উদাসীন ছিল না। ধর্ম ব্যাপারেও পারস্পরিক সহনশীলতার ভাব বিরাজ করত। বৃন্দাবন দাস বলেন—

"হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম॥"

এবং বৈষ্ণবদের হাতে অনেক মুসলমান স্বধর্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

এই ইলিয়াসশাহী আমল থেকেই বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। কবিচক্রবর্তী, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিতসার্বভৌম, কবিপতি ও কবি চূড়ামণি, মহাচার্য রায়মণি বৃহস্পতি মিশ্র এ সময়কার পরপর কয়েকজন সুলতানের দরবার অলংকৃত করেছিলেন। হোসেনশাহী আমল বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের সুবর্ণযুগ। এ-সময়ে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন অধ্যায় সূচিত হল। ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে বাঙালীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠল। বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়ে মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। দীনেশ চন্দ্র সেন (বৃহৎ বঙ্গ) বলেন—"বাঙ্গালা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল, এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল।... এই পাঠান যুগে সর্ব প্রথম হিন্দু সমাজে নূতন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে, তাহারা গরুড়পক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট করজোড়ে থাকিতে দ্বিধাবোধ করিল। ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রচার করিলেন। তাঁহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহা করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের অনুবাদ ও শ্রোতা-

দিগের বাপান্ত করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন, 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।' একদিকে মুসলমান ধর্মের প্রভাব, অপর দিকে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্মপ্রচার—এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নবভাবে জাগ্রত হইল। শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তাজগতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরাও রাজ্য শাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগিলেন। এই পাঠান-প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল, এই স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গলার প্রতিভার যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনও সময়ে তদ্রূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই।" [এ সূত্রে জাতিবৈর পরিচ্ছেদে (পৃ ৭৬-৭৭) বঙ্কিমচন্দ্র, সুকুমার সেন, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতও দ্রষ্টব্য।]

মিথিলার পণ্ডিত চক্রায়ুধের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রালোচনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে উঠে। এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এতই প্রবল হয়ে উঠে যে, নবদ্বীপ সম্ভব কোন ব্রাহ্মণ বীর মুসলমানদের বিতাড়িত করে হিন্দু রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে বলে গুজব রটে, ফলে হোসেন শাহ চঞ্চল ও সতর্ক হয়ে উঠেন এবং নবদ্বীপ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান হওয়ায়, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বপ্নসাধ ধসে গেল। রঘুনন্দন, রামনাথ ও রঘুনাথ শিরোমণি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য সংহতির প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই হয়তো রাজনৈতিক স্বার্থে হোসেন শাহ গোড়ার দিকে চৈতন্যের মত প্রচারে পরোক্ষ সহায়তা দান করেন।

॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্যের বাহন দেবভাষা সাধারণ বাঙালীকে বহুকাল মূক করে রেখে-ছিল। বাঙালী তার বুকের আশা মুখের ভাষায় বহুকাল প্রকাশ করতে পারে নি। সেন রাজাদের আমলে 'শূদ্রমাত্রেরই উচ্চ শ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল।...এই জনসাধারণ অজ্ঞ ও মূর্খ হইয়া রহিল।' (দীনেশ সেন—বৃহৎ বঙ্গ)। ব্রাহ্মণ্য শাসনের অক্টোপাস থেকে ছাড়া পেয়ে বাঙালীর যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত রুদ্ধ আবেগ নানা ধারায় প্রকাশিত হয়ে বাঙালীকে আর্যপ্রভাব মুক্ত পৃথক জাতিরূপে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। এমন শুভযুগ বাঙালীর জাতীয় জীবনে এর আগে বা পরে কোনদিন আসে নি।

শেখ শুভোদয়া বা গীতগোবিন্দের ভাষা তো প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় রীতির তুলনায় নিকৃষ্ট। শেখ শুভোদয়ার ভাষা তো অবিমিশ্রও নয়, তবু এঁরা দেশীভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে সাহস পান নি দেব-দ্বিজের ভয়ে। সহজ ও নাথপন্থীদের প্রচেষ্টা এখানে উল্লেখ-যোগ্য নয়—কারণ হিন্দু বাঙালীর সমাজে তাঁদের কোন প্রভাব ছিল না। সুতরাং একান্তভাবে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার ফলেই বাঙলা ভাষার পুষ্টি ও বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। শুধু কি তাই, মুসলমানেরা কেবল সাহিত্যের উৎসাহদাতা বা পাঠক ছিলেন না, সাহিত্য সৃষ্টিতেও হাত দিয়েছিলেন হিন্দুদের সাথেই। আর এ-ব্যাপারে তাঁদের কোন বাধাও ছিল না। বেশীর ভাগ বাঙালী মুসলমান তো হিন্দু থেকেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। কাজেই অনুকূল পরিবেশে তারা যে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহবোধ করবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না।

॥ ১২ ॥

তবু পণ্ডিত ও প্রতিভাবানদের কাছে এ-ভাষা মধ্যযুগে কোনদিন কদর পায় নি। তাঁরা সংস্কৃত ও ফারসীকেই স্ব স্ব অবদানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যাঁরা সেবা করেছেন তাঁদের প্রতিভা খুব উঁচু দরের ছিল না। তাই কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি যতই পাণ্ডিত্যাভিমান দেখান না কেন, আলাউল, দৌলতকাজী, ভারতচন্দ্র, ঘনরাম যত বড় প্রতিভার পরিচয় দিন না কেন, কেউই সমসাময়িক সংস্কৃত বা ফারসী সাহিত্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা রেখে যেতে পারেন নি। বাঙলা সাহিত্যের পাঠকদের মতো অধিকাংশ লেখকও যে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, তা অনুমান করা চলে। এ-জন্যেই চার শ' বছর ধরে অনুশীলিত হয়েও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য আশানুরূপ ঋদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। যদিও এসব রচনা রূপকল্পে না হোক, রসকল্পে তথা মনন-ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে বাঙলার সংস্কৃতির কিছু রূপান্তর ঘটিয়েছিল।

কোন জাতির মুখের বুলিও যে সাহিত্য সৃষ্টির বাহন হতে পারে, তা' অসামান্য প্রতিভা ছাড়া কারুর মনে জাগেও না, তাই বাঙলায় হিন্দুদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না, জনগণের মধ্যে লৌকিক দেবতার পূজা প্রচারের আগ্রহ ও গরজই তাঁদেরকে বাঙলা লেখায় প্রবর্তনা দিয়েছে। এ-জন্যেই হিন্দুর হাতে আমরা নিছক সাহিত্য-শিল্প পাই নি। গোড়া থেকেই কিন্তু মুসলমানরা এ-কাজে হাত দেন। বাঙলার মাধ্যমে ধর্ম-কথা শোনানোর সাথে সাথে উত্তর ভারতীয় ও ইরানী রস-কথাও শোনানোর ব্যাপারে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। আধুনিক ভারতীয়

ভাষার মধ্যে সম্ভবত বাঙলা ভাষাতেই প্রথম রোমান্স রচিত হয়। এ-কৃতির 'ইউসুফ জোলেখা' রচয়িতা শাহ্ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯—১৪০৯ খ্রী:)। কিন্তু এ প্রয়াস দেখা দেয় সেকালের মুষ্টিমেয় কয়জনের মধ্যে মাত্র। জনসাধারণ তাদের দিকে চেয়ে বসে ছিল না। তাদের সাহিত্যের ভাষা না থাক, মুখের বুলি ছিল। আরো ছিল জৈব-রস পিপাসা ও হৃদয়-নিঃসৃত বক্তব্য। তাই শিল্প সৃষ্টির মহৎ আদর্শে নয়, বক্তব্য প্রকাশেরই জৈব-প্রয়োজনে তাদের নিজ নিজ আঞ্চলিক বুলিতে অঞ্চলবাসীর উদ্দেশ্যে গান, গাথা, ছড়া, বচন, রূপকথা ও রসবার্তা তৈরী করে তারা মুখে মুখে প্রচার করতে থাকে। এগুলোই আমাদের আধুনিক সংজ্ঞায় 'লোক-সাহিত্য' বা 'পল্লী সাহিত্য'। বহু মুখের স্পর্শে এগুলো রূপ ও রস বদলেছে, তাই এ-সব ব্যক্তিক রচনা আর নেই। এ কারণেই এগুলোকে 'গণ রচনা' বলে নির্দেশ করা হচ্ছে আজকাল। দেশের লেখ্যভাষায় রচিত নয় বলে, এ সব রচনা কোন কালেই অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে দেশময় ব্যাপ্ত হতে পারে নি। আগেই বলেছি 'পল্লী সাহিত্য' সাহিত্য সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস প্রসূত নয়। অনুভূতির আন্তরিকতা ও গভীরতাই এগুলোকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করেছে। আর আজকাল মর্যাদা পাচ্ছে সাহিত্য হিসেবে। আমাদের মঙ্গল কাব্যও বলেছি দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার প্রয়াসেরই ফল। তবু আনুষঙ্গিক ভাবে তাতে সাহিত্যরস ও সাহিত্যশিল্প গড়ে উঠেছে। তাই এগুলোও সাহিত্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আর দেব-লীলার অনুধ্যান ও সাধন ভজন কীর্তনের বাহনরূপে রচিত হয়েছে গীতি কবিতা।

অতএব, অন্যান্য দেশের বুলি যেমন ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের মাধ্যমরূপে বা গেঁয়ো লোকের ভাব-ভাবনা ও অনুভূতি-উপলব্ধি প্রকাশের বাহনরূপে ক্রমে সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত হয়েছে, আমাদের বাঙলা বুলির সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরের ইতিহাসও সেরূপ। এর জন্ম তারিখ জানা নেই, তবে এর জন্ম পদ্ধতি ও জন্মের ইতিকথা আঁচ করা যায় সহজেই।

॥ ১৩ ॥

এবার যে-বাঙালী এ সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, তাদের মন-মননের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা যাক। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বুঝবার জন্যে বাঙালীকে তথা বাঙালীর চরিত্র জানা আবশ্যিক। কেন না, জীবের বিশেষত মানুষের কর্ম ও আচরণে তার আন্তর সত্তার (Innerself) নিবিড়তম প্রকাশ ঘটে। মানুষের কর্ম ও আচরণ তার অভিপ্রায়েরই বহিঃপ্রকাশ। আর অভিপ্রায়

হচ্ছে মন-মনন প্রসূত। এবং ব্যক্তির বা জাতির মন-মনন গড়ে ওঠে তার Heredity (জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তি) ও environment-কে (পরিবেশ) ভিত্তি করে। যেহেতু মানুষের কর্ম ও আচরণ তার ভাব-চিন্তা ও অনুভূতি-উপলব্ধিরই প্রতিমূর্তি, এবং যেহেতু ভাষা-সাহিত্যও জাতির কর্ম ও আচরণের অন্তর্গত, সেহেতু ভাষা ও সাহিত্য ব্যক্তির বা জাতির মানস-সন্তান—মানস ফসল। আবার আমরা এ-ও জানি, প্রত্যেক ক্রিয়ারই কারণ রয়েছে, তেমনি সব কারণেরই ক্রিয়া আছে। কিন্তু ক্রিয়ার কারণ একাধিক হতে পারে। কাজেই ঘটনার বিশ্লেষণে ও বিচারে পূর্ব-ইতিহাস জানা আবশ্যিক। কারণ আমরা জানি, ব্যক্তিকে না জানলে তার কর্ম ও আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তার ফলে ব্যক্তির কর্ম ও আচরণের গুরুত্ব-লঘুত্ব ও যাথার্থ্য বিচারেও ভুল হয়। কাজেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি তথা স্বরূপ জানতে হলে বাঙালীর চরিত্রও জানা দরকার। আর চরিত্র জানতে হলে অতীতে ঘটা পৌনপুনিক ক্রিয়া ও আচরণের সাধারণ লক্ষণ বিচারেই তা সম্ভব।

আগেই বলেছি, বাঙালী সঙ্কর জাতি। নানা গোত্রের রক্তের মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন চারিত্রিক উপাদানের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে তাদের জীবনে।

এর ফলে বাঙালী চরিত্রে নানা বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রবণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ভোগলিপ্সা ও বৈরাগ্য, কর্মকুণ্ঠা ও উচ্চাভিলাষ, ভীরুতা ও অদম্যতা, স্বার্থপরতা ও আদর্শবাদ, বন্ধনভীরুতা ও কাঙালপনা প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক গুণই বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বাঙালী ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয়। উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনাতেই এর প্রকাশ। তাই বাঙালী যখন কাঁদে, তখন কেঁদে ভাসায়। আর যখন হাসে, তখন সে দাঁত বের করেই হাসে। যখন উত্তেজিত হয়, তখন আগুন জ্বালায়। তার সবকিছুই মাত্রাতিরিক্ত। তার অনুভূতি—ফলে অভিভূতি—গভীর। কেঁদে ভাসানো, হেসে লুটানো আর আগুন জ্বালানো আছে বটে, কিন্তু কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী নয়—যেহেতু উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা মাত্রেই তাৎক্ষণিক ও ক্ষণজীবী। বাঙালীর গীতি-প্রবণতার উৎস এখানেই।

দুই হাজার বছর ধরে নির্জিত-শোষিত বাঙালী কালো পিঁপড়ের মতো অতি চালাক ও নিঃসঙ্গ স্ব-নির্ভর। তাই সে ধূর্ততা যত জানে বুদ্ধির সুপ্রয়োগ তত জানে না, ফলে আত্মরক্ষার ও স্বার্থপরতার হীন প্রয়োগে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি কলুষিত হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার মহৎ প্রয়াসে প্রযুক্ত হয় না। তাই তার সঙ্ঘশক্তি নেই, অভাব পীড়িত বাঙালী ব্যবহারিক জীবনের উন্নয়নে বুদ্ধির ও অধ্যবসায়ের অবদান গ্রহণে অক্ষম।

ভাবপ্রবণ বলেই বাঙালী মুখে আদর্শবাদী ও বৈরাগ্য ধর্মী। কিন্তু প্রবৃত্তিতে সে একান্তভাবে অধ্যাত্মবাদীর ভাষায় 'বস্তুবাদী', গণভাষায় 'জীবনবাদী' এবং নীতিবিদের ভাষায় 'ভোগবাদী'। এ-জন্যে বাঙলাদেশে জীবনবাদ বা ভোগবাদ অধ্যাত্মচিন্তার উপর বার বার জয়ী হয়েছে। নৈরাত্ম্য ও নিরীশ্বরবাদী এবং নির্বাণকামী বৌদ্ধধর্ম বাঙালী মুখে স্বীকার করে নিয়েছিল মাত্র, সেজন্যেই তার অন্তরের জীবন সাধনা ধর্মের উপর জয়ী হল, তাই বৌদ্ধচৈত্য হল দেব-দেবীর আখড়া। নির্বাণের নয়—জীবনের ও জীবিকার আরাম ও বিলাসের দেবতা রূপে পূজিত হলেন তাঁরা। পারত্রিক নির্বাণ নয়, ঐহিক ভোগই হল কাম্য। যেহেতু বাঙালী কর্মকুণ্ঠ, তাই পৌরুষের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জীবনোপভোগের প্রয়াস তাদের ছিল না। মহাজ্ঞান, তুক্-তাক্, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতির দ্বারা 'সিসম ফাঁক' আয়ত্ত করে খিড়কীদ্বার দিয়ে জীবনের ভোগ্য সম্পদ আহরণের অপপ্রয়াসই তাদের কর্মাদর্শ বা জীবনের লক্ষ্য হ'ল। পালদের আমল এমনি করেই কাটল। আবার সেন আমলে যখন শঙ্করাচার্যের শিষ্য-উপশিষ্যেরা সেন রাজশক্তির সহায়তায় এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবর্তন করেন, তখন বাঙালী বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য মতবাদ গ্রহণ করে নিল, কিন্তু হৃদয়ে জিইয়ে রাখল তার জীবন-বিলাসের আকাঙক্ষা। তাই 'মায়াবাদ', পরব্রহ্মপ্রীতি, জীবাত্মা-পরমাত্মার রহস্য প্রভৃতিতে তার কোন উৎসাহ ছিল না। শুধু তা-ই নয়, এতে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই নিজের জীবনের নিরাপত্তা ও ভোগের দেবতা সৃষ্টি করে সে আশ্বস্ত হয়। এভাবে চণ্ডী (অন্নদা, দুর্গা), মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার পূজা দিয়ে সে জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়। এ সব দেবতা তার পারলৌকিক মুক্তির কিংবা আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবন উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না। একই কারণে ইসলামোত্তর যুগে, বিশেষত মুঘল আমলে বাঙলা দেশে হিন্দুর পুরোনো দেবতাকে ও ইসলামের নির্দেশকে ছাপিয়ে উঠেন সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, বনবিবি-বনদেবী, কালুগাজী-কালুরায়, বড়খাঁ গাজী-দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি-শীতলা প্রভৃতি জীবন ও জীবিকার ইষ্ট ও অরি দেবতা। অতএব কোন বৃহৎ ও মহতের সাধনা সাধারণ বাঙালীর কোন কালেই ছিল না। সে একান্তভাবে জীবন-সেবী ও ভোগবাদী। এ ব্যাপারে সে আত্মা-পরমাত্মাকে তুচ্ছ জেনেছে, স্বর্গ-নরককে করেছে অবহেলা। বৈষ্ণব সমাজের বিকৃতিও এই একই মানসের ফল। বঞ্চিত দরিদ্র বাঙালী যেখানেই ভোগের সামগ্রী দেখেছে, সেখানে তার লুব্ধচিত্ত কাঙাল হয়েছে। পৌরুষ তার ছিল না। দু'হাজার বছরের বঞ্চনার ফলে ভীরুতা ও কর্মকুণ্ঠা হয়েছে তার মজ্জাগত। তাই জীবন ধারণের প্রয়োজনে দেব-নির্ভর

হওয়া তথা অপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তি ও উপায় খোঁজাই ছিল তার আদর্শ। তবে লোভের তীব্রতায় এবং ত্রস্ত জীবনের মমতায় কখনো কখনো সে ক্ষণকালের জন্যে মরীয়া হয়ে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছে, সে সাহস দেখিয়েছে। কিন্তু জৈব ধর্ম বিরোধী নির্জলা অধ্যাত্ম-চিন্তা তাকে প্রলুব্ধ করে নি। সে আদর্শবাদের বন্ধনভীরু এবং জীবন-সাধনায় ও ভোগে অদম্য।

বাঙলার ও বাঙালীর যা গৌরব-গর্বের অবদান, তা সব সময়েই ছিল ব্যক্তিক অবদান, সামগ্রিক জীবনে তা কৃচিৎ ফলপ্রসূ হয়েছে। তাই বাঙালীর মহৎ পুরুষদের মহা অবদানের ফলভোগে ধন্য হতে পারে নি তারা। এই বাঙলা দেশেই চিরকাল নতুন চিন্তা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু লালন পেয়েছে সামান্য। তবু যখন আমরা স্মরণ করি এই মাটির বুকেই—এই মানুষের মনোভূমেই উপ্ত হয়েছিল বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান, কায়াবাদ, নবন্যায়, নবস্মৃতি, নবপ্রেমবাদ, ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদ কিংবা ব্রাহ্মদর্শন, তখন গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠে। আবার যখন স্মরণ করি, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, দীপঙ্কর, শীলভদ্র, জীমূতবাহন, রামনাথ, রঘুনাথ, চৈতন্যদেব, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, তীতুমীর, শরীয়তুল্লাহ্, দুদু মিয়া, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এদেশেরই সন্তান, তখনো নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই।

আমাদের মধ্যযুগীয় পাঁচালী সাহিত্যে বাঙালীর এই চারিত্র—এই মানসই ফুটে উঠেছে। আমাদের সাহিত্যে তাই ইষ্ট দেবতাই প্রধান হয়ে উঠেছেন। কারণ তিনি জীবন-জীবিকার অবলম্বন। তবু তার প্রাণ-প্রাচুর্যের লক্ষণ ফুটে উঠেছে তার স্ব-ধর্মে সুস্থিরতায়। বহিরাগত কোন ধর্মই সে মনে-প্রাণে বরণ করে নেয় নি। এ স্বাতন্ত্র্য ও অনমনীয়তা এ কালে ক্ষেত্র বিশেষে তার মর্যাদা বাড়িয়েছে।

৪

বাঙলায় ইসলামের প্রসার

॥ ১ ॥

মদিনা থেকে মুলতান অবধি ইসলামের প্রসার বলতে গেলে প্রায় অবাধেই ঘটেছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ইসলামের সঙ্গে পরিচয়-মুহূর্তে স্থানীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজে ও ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সমাজে নবপরিচয়জাত যে বিচলন দেখা দিল, তাতে স্বশাস্ত্রে বিরাগ ও স্বসমাজে দ্রোহ জাগল বটে, এবং একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনও ঘটল বটে, যার ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ বহুলাংশে ভাঙল এবং বৌদ্ধ সমাজ

লোপ পেল, কিন্তু ইসলামী মতের অভিঘাতে ভাঙা সমাজ মুসলিম সমাজ গঠনের সহায়ক হল না। দক্ষিণাপথে ও উত্তরাপথে সন্ত-সন্ন্যাসী নামের সনাতন শাস্ত্র ও সমাজ-দ্রোহীরা দেব-দ্বিজ বেদদ্বেষী হল বটে এবং চৈত্য ও মন্দির ছাড়ল বটে, কিন্তু মসজিদের আহ্বানে সাড়া দিল না। পথ চলে পথের দিশা খোঁজার নেশায় তারা পথে নামল, দিগন্তহীন উদার আকাশের বিস্তারে মঠে-আখড়ায় আশ্রিত হল এবং চিত্তলোকে সন্ধান করল সৃষ্টির রহস্য, হৃদ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করল লীলাময় স্রষ্টাকে, আর স্বেচ্ছায় স্বীকার করল প্রীতি ও ভক্তির বন্ধন। বৈরাগ্য ও ভজন হল সম্বল, ভক্তি হল পাথেয়। এই সন্ত-সন্ন্যাসীর আহ্বানে সাড়া দিল আর আকর্ষণে ঘর ছাড়ল নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের লক্ষ লক্ষ মানুষ। গড়ে উঠল গুরুবাদী বহু সন্ত বা ভক্ত সম্প্রদায়। ফলে ইসলামের প্রসার উত্তর ভারতে হল মন্থর আর দক্ষিণ ভারতে হল রুদ্ধ।

লক্ষণীয় যে সিন্ধু-মুলতান-গান্ধারে ইসলামের প্রসার ছিল প্রায় অবাধ, এসব অঞ্চল এক সময় পারশ্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, পরে আলেকজান্দার বৈনাশিক জিঘাংসা নিয়ে যখন পারশ্য সাম্রাজ্য ধ্বংসাভিযানে অগ্রসর হন, তখন সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমা পাঞ্জাব অবধি তিনি অধিকার করেন। ফলে ইরানী ও গ্রীক অধিকারে তথাকার বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সমাজে হয়তো আচার শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ভারতের অন্যান্য এলাকায় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজ ছিল নৃপতি, শাস্ত্রপতি ও সমাজ-সর্দারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে। তাই বোধ হয় এ পার্থক্য। তারপর ছয়-সাত শ' বছর ধরে তুর্কী-আফগান-মুঘলরা এদেশ শাসন করেছে। কিন্তু রাজধানীতেও মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি। কাজেই রাজ-শক্তি ইসলাম প্রচারের সহায়ক হয় নি। ইসলাম প্রচার করেছেন সুফী দরবেশরা, খ্রীস্টান মিশনারীদের মতো তাঁদেরও ছিল সেবাব্রত ও অধ্যবসায় এবং প্রীতি; করুণা আর কেরামতি। তাঁরা খানকা, সরাই, চিকিৎ-সালয়, লঙ্গরখানা প্রভৃতির মাধ্যমে দুস্থ মানবতার সেবা যেমন করতেন, তেমনি ঝাড়-ফুঁক তাবিজ-কবজ দিয়ে তাদের আপদ-বিপদ দূর করতেন। এভাবেই তাঁরা আকৃষ্ট করেছেন গাঁয়ের গঞ্জের দরিদ্র মানুষকে। দরিদ্র-অসহায় মানুষ তাঁদের আশ্রিত হত। লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধাই ছিল তাঁদের ইসলাম প্রচারের পুঁজি। যদিও বিদ্যা, বিত্ত ও বর্ণাভিমানী শহুরে মানুষ তাঁদের প্রভাব কৃচিৎ স্বীকার করেছেন। শহুরে মানুষ সংখ্যায় কম এবং গাঁয়ে বিত্তশালী মানুষের সংখ্যা চিরকালই নগণ্য। কাজেই গাঁয়েই প্রচারকদের সাফল্য ছিল বেশী। খ্রীস্টান প্রচারকরাও নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষকেই সহজে দীক্ষিত করেছে। বাঙলাদেশের গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে যে-সব দরবেশ ইসলাম প্রচার করেছেন, তাঁদের কারো কারো নাম, দরগাহ ও কিছু পরিচিতি আজো টিকে আছে এবং তাঁদের

পরিচিতিই এখানে দেয়া হল। এতে বাঙলাদেশে ইসলাম প্রচারের কাল ও কারণ সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা করা সম্ভব হবে। তুর্কী বিজয়ের আগেই এখানে আরব-ইরানী বেনেদের সঙ্গে দরবেশ-প্রচারকদের আগমন শুরু। তাঁরা গাঁয়ে-গঞ্জে সপার্ষদ ছড়িয়ে পড়েন।

দু'হাজার বছর ধরে বিদেশী বিভাষী শাসিত এদেশের সাধারণ মানুষের উচ্চ-পদে, স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিকার ছিল না। বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে অধিকাংশ বৃত্তিও ছিল কোন রকমে অন্ন সংস্থানেই সীমিত। অবাধে ধন-সম্পদ অর্জনের উপায় ছিল না কামার-কুমার-তাঁতী-নাপিত-ধোপা-হাড়ি-ডোম-বাগদী-কৈবর্ত-মুচি-মেথর প্রভৃতি কারো। কাজেই ইসলামী সাম্যের সমাজে—জন্মসূত্রে নয়,—কর্ম ও যোগ্যতা সূত্রে জীবন রচনায় ও ব্যক্তির মানবিক মর্যাদায় প্রলুব্ধ হওয়া এ শ্রেণীর মানুষের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। তাই চৈতন্য দেবের ইসলাম-প্রভাবিত নব বৈষ্ণব মত প্রচারিত হওয়ার (১৫০৯ খ্রীঃ) পূর্বাবধি বাঙলায় ইসলামের প্রসার প্রায় অপ্রতিরোধ্য ছিল। যেহেতু চৈতন্যদেব তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেই ভিন্ন-রাজ্যে উড়িষ্যার নীলাচলে চলে যান, সেজন্যে বাঙলায় বৈষ্ণবমত আশানুরূপ বিস্তার পায় নি। তবু ইসলামের প্রসার এই অভিঘাতে মন্থর হয়ে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে কালে মুসলিম সংখ্যাগুরু হয়ে উঠে।

॥ ২ ॥

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে সূফী-দরবেশ এসেছিলেন কি না, ইতিহাস তা বলতে পারে না।[১] তবু পাহাড়পুরে ও ময়নামতীতে আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রাপ্রাপ্তি[২] ও সোলেমান, খুরদাদবেহ, আলইদ্রিসী, আলমাসুদী প্রমুখ লেখকদের এবং হুদূদুল আলম গ্রন্থের বিবরণের প্রমাণে[৩] স্বীকার করতে হয় যে, অন্তত আট শতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। অবশ্য 'Periplus in the Erythrean Sea'-এর আলোকে যাচাই করলে এ সম্পর্ক

১. সাহিত্য পত্রিকা: বর্ষা সংখ্যা ১৩৭০। বাঙলাদেশে মুসলমান আগমনের যুগ: ডক্টর আবদুল করিম, পৃঃ ৯২—১০২।

২. ক. পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম: ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পৃঃ ৯২।
খ. Memoirs of the Archaeological Survey of India; K. N. Diksit. p. 87.
গ. F. A. Khan: Pakistan Quarterly (মাহেনও, মার্চ ১৯৬৪ সন)।

৩. History of India etc: Elliot & Dawson, Vol. I, p. 2.

খ্রীস্টীয় প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেয়া সম্ভব। চট্টগ্রাম বন্দরে আরব বেনেরা বছরে কয়েক মাস থেকে যেত। সে সূত্রে বন্দর এলাকায় তারা বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়েছিল কিনা জানা নেই। তবে পরবর্তী কালের পর্তুগীজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বেনেদের জীবন যাপন রীতির কথা স্মরণে রাখলে এ সম্পর্কিত অনুমান করা চলে। ইংরেজ আমলে দেখেছি, বাঙালী মুসলমানেরা বর্মায় বর্মী স্ত্রী গ্রহণ করত আর তাদের সন্তানেরা 'জেরবাদী' নামে পরিচিত হত। এমনি সঙ্কর মুসলমান হয়তো কিছু ছিল চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায়। মুসলমান ব্যবসায়ীদের পাহাড়পুরে ময়নামতীতে কিংবা কামরূপে যাতায়াত ছিল কি না, বলা যাবে না। কেন না, তাদের মুদ্রা ওসব অঞ্চলে অন্যভাবেও নীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইসলামের প্রচার ও প্রসার যুগে মুসলিম বেনে বা তাদের সঙ্গীদের কেউ কেউ ইসলাম প্রচারে আগ্রহী হবেন— এ-ই স্বাভাবিক। আমাদের মনে হয় তখনো মুসলিম সমাজে সূফী মতবাদ প্রসার লাভ করে নি বলে এবং দণ্ডশক্তিও বিধর্মীর হাতে ছিল বলে এদেশে যাঁরা ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বা অন্য সূত্রে এসে ইসলাম প্রচারের চেষ্টায় ছিলেন, তাঁরা বিশেষ শ্রদ্ধা কিংবা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। দরবেশ না হলে, তথা কেরামতির আভাস না পেলে, অজ্ঞ লোকেরা ভক্তি করবার কারণ খুঁজে পায় না। কাজেই তেমন লোকের স্মৃতি রক্ষার গরজও বোধ করে না। আর যদি মুসলিম বিজয়ের পূর্বে জালালউদ্দীন তাবরেজীর মতো সূফীরা এসেও থাকেন, তা হলেও মুসলিম বিরল কিংবা বিহীন বিধর্মীর রাজ্যে তাঁদের স্মৃতি রক্ষার আয়োজন করবার লোকই ছিল না। সূফীমত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে সূফীরা বিজিত ভারতেও আসতে শুরু করেন। তখন থেকেই খানকা ও দরগাহ-কেন্দ্রী ইতিহাসেরও আরম্ভ।

কিন্তু চৌদ্দ শতকের এক সূফীর সাক্ষ্যে প্রমাণ, বাঙলাদেশে তাঁর আগেই বহু সূফীর আগমন ঘটেছে। তাঁরা বিভিন্ন মত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেখ আলাউল হক পাণ্ডুবীর সাগরেদ[১] সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী কর্তৃক জৌনপুর সুলতান ইব্রাহিম শরকীর নিকট লিখিত পত্রে আছে:

> God be praised! What a good land is that Bengal where numerous saints and ascetics came from many directions and made it their habitation and home. For example at Devgaon followers of Hazrat Shaikh Shahabuddin Suhrawardi are taking their eternal rest. Several saints of the

১. Akbar-al-Akhyar : p. 166.

Suhrawardi order are lying buried in Mahisun and this is the case with saints of Jalalia order in Deotala. In Narkoti some of the best companions of Shaikh Ahmad Damishqi are found. Hazrat Shaikh Sharfuddin Tawwama, one of the twelve of the Qadar Khani order whose chief pupil was Hazrat Shaikh Sharifuddin Maneri, is lying buried at Sonargoan. And then there were Hazrat Bad Alam and Badr Alam Zahidi. In short, in the country of Bengal, what to speak of the cities, there is no town and no village where holy saints did not come and settle down. Many of the saints of the Suhrawardi order are dead and gone under earth but those still alive are also in fairly large number.[১]

এতে বোঝা যায় চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাঙলাদেশে সূফীপ্রভাব গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে।

কিন্তু যে কয়জন প্রাচীন সূফীর কাহিনী এবং খানকা ও দরগাহ্‌র খবর আমরা জানি, তাঁদের আগমন ও অবস্থিতি কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত নন। যেমন বাবা আদমশহীদ।[২] বিক্রমপুরস্থ রামপালের এই আদমশহীদ বিক্রমপুরের এক সেনরাজা বল্লালের সমসাময়িক। আনন্দ ভট্ট রচিত 'বল্লালচরিতম' সম্ভবত এঁরই জীবন চরিত[৩]—লক্ষ্মণ সেনের পিতা প্রখ্যাত বল্লাল সেনের নয়। বল্লাল চরিতোক্ত 'বায়াদুমবা' (Bayadumba) সম্ভবত বাবা আদমেরই নামবিকৃতি।[৪] নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে[৫] বল্লাল সেন চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক। কাজেই বাবা আদমও ঐ সময়ের।

চট্টগ্রামের পীর বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম বর্ধমানে.. ...., দিনাজপুরের হেমতাবাদের বদরুদ্দীন এবং 'বদর মোকাম' খ্যাত বদর শাহ বা বদর

১. Bengal : Past & Present : Vol. LXVII St. No. 130 ; 1948 p. 35-36.

২. JASB. 1889. Vol. LVII, p. 12ff.

৩. JASB, 1896 (N. N. Basu) pp. 36-37.

৪. Social History of the Muslims in Bengal down to 1538 A. D. ; Dr. A. Karim, p. 87.

৫. JASB, 1896, pp. 36-37.

আউলিয়া আর মাঝিমাল্লার পাঁচ পীরের অন্যতম পীর বদর সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে এঁর অবস্থিতি কাল কারো মতে ১৩৪০ আর কারো ধারণায় ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে।[১]

শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজীর নাম 'শেক শুভোদয়া'-র সঙ্গে জড়িত। 'শেক শুভোদয়া' সূত্রে কারো কারো বিশ্বাস শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণ সেনের আমলে লখনৌতিতে বাস করতেন। অমৃতকুণ্ড তাঁরই আগ্রহে অনূদিত হয়। তাঁরই মাহাত্ম্য-মুগ্ধ হলায়ুধ মিশ্র তাঁর কীর্তি-কথা বর্ণনা করেছেন 'শেক শুভোদয়ায়' (শেখের শুভ উদয়)।

ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে শাহ্ সুলতান রুমী নামে এক সুফীর দরগাহ্ আছে। ইনি ৪৪৫ হিঃ বা ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান ছিলেন বলে পরবর্তীকালের দলিল সূত্রে দাবি করা হয়।[২] এক কোচরাজা তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাঁকে মদনপুর গ্রাম দান করেন বলে ময়মনসিংহ Gazetteer-এ উল্লেখ আছে।[৩] কিন্তু আরো প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর পরে উক্ত জেলায় কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪] অতএব, উক্ত কোচ রাজা কোনো কোচ জমিদার হবেন, কিংবা সুলতান রুমী চৌদ্দ শতকের লোক।

পাবনা জেলার শাহ্জাদপুরে রয়েছে মখদুম শাহদৌলা শহীদের দরগাহ।[৫] ইনি জালালউদ্দীন বোখারীর সমসাময়িক ছিলেন।[৬] অতএব, ইনি বারো-তেরো শতকের লোক।

বর্ধমানের মঙ্গলকোট গাঁয়ে মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী ওরফে শাহ রাহী পীরের দরগাহ আছে। ইনি স্থানীয় রাজা বিক্রমকেশরীর সাথে লড়েছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে।

১. ক. বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃঃ ১৩২-১৩৩।
   খ. Dist. Gazetteers : Chittagong 1908, p. 56,
      Dinajpur, 1912, p 20
   গ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য - মুহম্মদ এনামুল হক, পৃঃ ২২-২৩।
২. বঙ্গে সুফী প্রভাব : (১৯৩৫) পৃ. ১৩৮।
৩. District Gazetteer, Mymensingh 1917 : p. 152.
৪. History of Assam, 1926 ; E. Gait : p. 46ff.
৫. District Gazetteer, Pabna 1923 : p. 121-26.
৬. Sufiism and Saints etc. : J. A. Sobhan, p. 236.

বগুড়ার মহাস্থান গড়ের শাহ সুলতান মাহি আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙজীবের সনদসূত্রেও (১০৯৬ হি: ১৬৮৫-৮৬) মেলে।[১] তাঁর সম্বন্ধে লোকশ্রুতি এই যে, তিনি মুসলিম বিদ্বেষী রাজা বলরাম ও পরশুরামকে হত্যা করেন। পরশুরামের ভগ্নী শিলাদেবী করতোয়া নদীর যেখানে ডুবে মরেছিল তা এখনো শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত।[২] ইনি সম্ভবত চৌদ্দ শতকের লোক। মনে হয় মাহি আসোয়ার (মৎস্যাকৃতির নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চৌদ্দ শতকের পরের লোক নন। কেন না, পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্থলপথ জনপ্রিয় হয়। আর ষোল শতকে পর্তুগীজরা জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত।

সিলেটের শাহ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙলা দেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৩] ইনি রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

মখদুম উল মুলক শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া ও তাঁর ওস্তাদ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামাহ সোনারগাঁয়ে ১২১০-৩৬ বা ১২৭০-৭১ কিংবা ১২৮২-৮৭ খ্রীস্টাব্দে[৪] এসেছিলেন। ইনি এবং 'মক্তুল হোসেনে' মুহম্মদ খান বর্ণিত শেখ শরফুদ্দীন অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বলবার উপায় নেই।

শেখ বদি উদ্দীন শাহ্ মাদার সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। এঁর পিতার নাম আবু ইসহাক শামী। ইনি মুসা নবীর ভাই হারুনের বংশধর।[৫] ইনিই সম্ভবত শূন্যপুরাণোক্ত নিরঞ্জনের রুশ্মার দম-মাদার এবং মাদারীপুরও সম্ভবত তাঁর নাম বহন করছে। চট্টগ্রামের মাদার বাড়ি, মাদারশাহ এবং দরগাহ সংলগ্ন পুকুরের মাছের মাদারী নাম, শাহ্ মাদারের স্মরণার্থ বাঁশতোলার বার্ষিক উৎসব প্রভৃতি

১. ক. District Gazetteer: Bogra : 1910, pp. 154—5.
খ. JASB. 1878, pp. 92—93.

২. বঙ্গে সুফী প্রভাব। পৃ ১৪০—৪১

৩. Ibn Battuta : Gibb.

৪ ক. Hadith literature in India : Dr. M. Ishaq, pp. 53-54.
খ. Islamic Culture : Vol. XXVII, No. January 1953, p. 10, note 9.
গ. Social History of Muslims in Bengal : Dr. A. Karim, pp. 67-72

৫. ক. Mirat I-Madar by Abdur Rahman Chisti : A. H. 1064, Ms. D U., No 217. (ডক্টর আবদুল করিমের Social History. পৃ: ১১৩-এ উদ্ধৃত)।

মাদারিয়া সম্প্রদায়ের সুফীর বহুল প্রভাবের পরিচায়ক বলে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন।[১]

মখদুম জাহানিয়া জাহানগস্ত ওরফে জালালউদ্দিন সুরক্‌পুশ (Surkpush) নামে এক দরবেশও বাঙলায় এসেছিলেন। জাহানগস্ত-র মৃত্যু হয় ১৩৮৩ খ্রীস্টাব্দে এবং উচ্ছ্-এ (Uchh) তাঁর সমাধি আছে।[২]

শেখ আখি সিরাজউদ্দিন উসমান নিযামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা ছিলেন। ইনি পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের পীর। ইনি চৌদ্দ পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাঙলা দেশে চিশতিয়া তরিকার প্রসার হয়। পীরের নামানুসারে বিভিন্ন চিশতিয়া পীরের শিষ্যরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। আলাউল হকের শিষ্যরা 'আলাই'। তাঁর পুত্র নুর কুতুব-ই আলমের সাগরেদরা নুরী[৩] এবং আলাউলের খলিফা শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর সম্প্রদায়ের সুফীরা হোসেনী নামে পরিচিত ছিল।[৪] শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষ যুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর। সে জন্যে তাঁর শিষ্যরা 'খালিদিয়া' নামেও অভিহিত হত। আলাউল হকেরই পুত্র ছিলেন নুর-কুতুব-ই আলম। গণেশ-যদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নুর কুতুব ই-আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার গণেশ কর্তৃক সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত ও পরে নিহত হন। নুর কুতুব-ই-আলমের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ জাহিদও সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ ওরফে যদু শেখ জাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।[৫]

মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী শেখ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন। এঁর চিঠিগুলো সেকালের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। সৈয়দ আশরাফ সিমনানী জৌনপুর সুলতান ইব্রাহিম শরকীর সমসাময়িক ছিলেন। সিমনানী ইব্রাহিম শরকীকে লিখিত এক

---

১. বঙ্গে সুফী প্রভাব : পৃ: ১১২—১৩।

২. ক. Memoirs of Gaud and Pandau, p. 92.

খ. Sufiism and its Saints etc., J. A. Sobhan (1933) pp. 236-37.

৩. Bengal : Past & Present : Prof. S. Hasan Askari : 1948, p, 36, note 13.

৪. Social History of Bengal : Dr. A. Rahim, p, 77.

৫ Riyad-as-Salatin, p. 115—16,

পত্রে বদ্‌ আলম ও শদর আলম যাহিদ নামে দু'জন সুফীর উল্লেখ করেছেন। শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukarposh) এর ছেলে রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হলে সিমনানী তাঁকে প্রবোধ দিয়ে যে পত্র লেখেন, তা থেকে আভাস মিলে যে, গণেশ সোহ্‌রওয়ার্দিয়া ও রুহানিয়া সুফীকে হত্যা করেন।

Those who Traverse the path of God, have many calamities to suffer from. It is hoped through the spiritual grace of the souls of Suhrwardia and Ruhania saints of the past that in near future that kingdom of Islam will be freed from the hands of the luckless non believers.[১]

শেখ বদরুল ইসলাম নূর-কুতুব-ই-আলমের সমসাময়িক। রিয়াজুস সালাতিন-এ বর্ণিত ঘটনায় প্রকাশ: রাজা গণেশের দরবারে ইনি রাজাকে অভিবাদন না করেই আসন গ্রহণ করেন। রুষ্ট রাজা তাঁকে হত্যা করে তাঁর ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেন।[২]

এঁরা ছাড়া শাহ সফীউদ্দীন, জাফর খান গাজী[৩], খান জাহান আলী, শাহ আনোয়ার কলি হালবী[৪], ইসমাইল গাজী[৫], মোল্লা আতা[৬], শাহ জালাল দাখিনী (মৃত্যু ১৪৭৬ খ্রী:)[৭], শাহ মোয়াজ্জেম দানিশ মন্দ্‌ ওরফে মৌলানা শাহ দৌলা (রাজশাহী, বাঘা)[৮], শাহ আলি বাগদাদী (মীরপুর, ঢাকা), শেখ ফরীদউদ্দীন শাহ লঙ্গর, শাহ নিয়ামতুল্লাহ, শাহ লঙ্কাপতি[৯] প্রমুখ দরবেশের নাম উল্লেখ্য।

জালালউদ্দীন তাবরেজী (মৃত্যু ১২২৫ খ্রী:)[১০] মখদুম জাহানিয়া (১৩৭০-৮৩) ও শাহ জালাল কুনিয়াঈ (মৃ: ১৩৪৬) সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া মতবাদী ছিলেন।

শেখ ফরিদুদ্দিন শকরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯), আখি সিরাজদ্দিন (মৃ: ১৩৫৭), আলাউল হক (মৃ: ১৩৯৮), শেখ নাসিরুদ্দিন মানিকপুরী, মীর সৈয়দ আশরাফ

---

১. Bengal Past & Present 1948, pp. 36 37

২. Riyad-es Salatin : p. 110-11.

৩.—৪. District Gazetteer : Hooghly, p. 297 ff, pp. 302-03.

৫. (ক) JASB, 1874, p. 215 ff. (খ) Risalat-al-shuhda ; (গ) বাংলা একাডেমী পত্রিকা: ১৩৭৬ সন ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার।

৬. JASB, 1872, pp. 106-07, 1873, p. 290.

৭. (ক) Akhbar-al-Akhyar : p. 173, (খ) Khazinat-al-Asfiya, Vol. 1, p. 399.

৮. JASB, 1904, No. 2, p. 108 ff.

৯. বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃ: ১৪৩-৪৪।

১০. Akhbar-al-Akhyar : pp. 44-45.

জাহাঁগীর সিমনানী, শেখ নূর কুতুব-ই আলম (মৃঃ ১৪১৬), শেখ জাহিদ প্রমুখ চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সুফী ছিলেন।[১]

শাহ্ সফীউদ্দীন (মৃঃ ১২৯০—৯৫?) কলন্দরিয়া সূফী ছিলেন। শাহ্ আল্লাহ মদারিয়া এবং সেখ হামিদ দানিশ মন্দ্ নকশ্‌বন্দিয়া সূফী ছিলেন।[২] ষোল শতক অবধি চট্টগ্রামের সূফী শাহ সুলতান বলখী (বায়জীদ?), শেখ ফরিদ, পীর বদর আলম, কাতালপীর, শাহ্ মসন্দর বা মোহ্‌সেন আউলিয়া, শাহ্‌পীর, শাহ্ চাঁদ প্রমুখ এবং কবি মুহম্মদ খানের মাতৃকুলের শরফউদ্দীন থেকে সদরজাহাঁ আবদুল ওহাব ওরফে শাহ্ ভিখারী অবধি অনেক পীরের নাম মেলে।

গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্, সিকান্দর শাহ্, গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্, জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ (যদু), রুকনুদ্দিন বারবক শাহ্, হোসেন শাহ প্রমুখের দরবেশ ভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবার শাহ্ জালালুদ্দীন কুনিয়াঈ, আলাউল হক, নূর কুতুব ই-আলম, আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী, ইসমাইল গাজী, জাফর আলি খান, খান জাহান খান প্রমুখ সূফী রাজনীতিক ও সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

আর্তের সেবা, কাঙালভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতির দ্বারাই সূফীরা গণমন জয় করেন।

৫

সাহিত্যের রূপে ও রসে বিবর্তনের ধারা

বর্বরতম যুগে মানুষে আর পশুতে কোন ভেদ ছিল না। পশুর মতো তারও সেদিন কাম্য ছিল ক্ষুন্নিবৃত্তি ও কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। সেটাও ভোগেচ্ছা। সেদিন সে শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াসী ছিল, বাস্তব-ব্যবহারিক জীবনে আর কোন ভোগ্যবস্তুর প্রত্যাশী ছিল না সে। সে-বোধই জাগে নি তখনো; কাজেই বঞ্চিত জীবনের হতবাঞ্ছার কোন বিক্ষোভ ছিল না তার মনে। সেজন্যে ব্যবহারিক প্রয়োজনের কোন চিন্তাই তাকে বিচলিত করতে পারে নি। তাই বাস্তব জীবনোপলব্ধির কোন গরজ, জীবনকে যাচাই করবার কোন প্রেরণাই সে বোধ করে নি সেদিন। তবু তার 'মন' বলে

---

১. Riyad-as-Salatin : pp. 115-16

২. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পঃ ৯৩-১১৯।

পশুর থেকে উন্নততর একটি বৃত্তি ছিল ; ফলে, তার শুধু পেটে ক্ষুধা নয়, মনেও ছিল পিপাসা। সে তাকিয়েছিল তার চারদিককার অজানা ও রহস্যাবৃত চিরবিস্ময়কর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের দিকে। তা-ই তাকে করেছিল চকিত, বিস্মিত, ভীত, ত্রস্ত ও উল্লসিত। সেজন্যেই সে—চাটাইয়ে নয়, ঘাস বা পাতায় শুয়ে স্বপ্ন দেখত, পাখীর মতো দূর-দূরান্তরে উড়ে যেতে ; খুঁজত আকাশের কিনারা—দুনিয়ার শেষ। সে কল্পনা করত, মানুষের অগম্য হিমালয়-সাহারা-অলিম্পাসে না জানি কি আছে, কারা আছে। নিশ্চয়ই সেখানে এমন কিছু আছে, এমন কেউ থাকে, যা কাম্য, যা শ্রেয়, যা সুন্দরতর ও মহত্তর এবং আকৃতি-প্রকৃতিতে, রূপে-গুণে, বলে-ছলে যে বা যারা বিচিত্রতর।

মানুষ যা জানে না, যা বোঝে না, যা রহস্যাবৃত, যা অচেনা, তাকে জানবার, বুঝবার ও আয়ত্ত করবার এক উদ্দাম বাসনা, এক অসহ্য ব্যাকুলতা বোধ করে। মন দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, বুদ্ধির সাহায্যে, বোধির প্রয়োগে, চিন্তার মাধ্যমে তার একটা যুক্তিসহ বা বুদ্ধিগ্রাহ্য সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা না দিয়ে সে স্বস্তি পায় না। এভাবে সে বাহ্যজগতের সবকিছুর একটি সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দিয়ে আত্মপ্রবোধ পেয়েছিল, লাভ করেছিল আত্মপ্রসাদ।

এমনি করে মানুষ সেদিন কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করেছিল। তাতে ছিল পক্ষীরাজ ঘোড়া, বিচিত্র হাত-পা-মাথা-মুখ-চোখ-কানওয়ালা দেব-দৈত্য-পরী-জ্বীন-রাক্ষস-ড্রাগন। কল্প-লোকের এসব জীবের কল্পিত রোমাঞ্চকর জীবনোপাখ্যানই ছিল সেদিন মানুষের মনের রস-পিপাসা—মনের ক্ষুধা মিটাবার অবলম্বন। এ মনের প্রতিফলন দেখি রূপকথায়। রূপকথা সে যুগের জীবন্তিকা। রূপকথার জন্ম হল এ ভাবেই। কথায় বলে—'অদারু দারু হয় শিলে পিষিলে। অকথা কথা হয় লোকে ঘোষিলে।' ফলে রূপকথাই যুগান্তরে হয়ে দাঁড়াল মানুষের অতি-শোনা প্রতিবেশী রাজ্যের সত্য কাহিনী। মাটির গড়া রক্তমাংসের মানুষের বাস্তব জীবনে প্রতিবেশীর প্রভাবের মতো সে প্রভাব পড়ল মানুষের মনে-মানসে আর ব্যবহারিক জীবনে। এসব কল্পলোকবাসী মানুষের ব্যবহারিক জীবনের গরজে কল্পিত হয় দুইরূপে—অরি ও মিত্ররূপে। দেবতারা শক্তিমান অতি-মানুষ ও মানুষের সহায়করূপে কীর্তিত ; আর সব দেব-মানবের শত্রুরূপে কল্পিত। এদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে দেব-মানব পরস্পরের সহায়। বর্বরতম মানুষের শৈশব অতিক্রান্ত হল এভাবে। মানুষের জীবনবোধের কিছুটা প্রসার হল। হতে থাকল জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বোধির উন্মেষ। পূর্বের কল্পনালব্ধ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়ে চলল।

জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অর্জন করেছে আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি। কল্পনা ও ভাবপ্রবণতা হয়েছে পরিমিত, কাঁচা মন হয়েছে পাকা। সে এখন বিশেষ মানুষ। পূর্বপুরুষের চাইতে জীবনে তার চাহিদা বেশী, সে দেহে শক্তিমান, কৌশলে কুলীন আর মনে উচ্চাভিলাষী। শিশুমানবের - পশুমানুষের মন এভাবে একটু একটু করে ক্রমে জেগে উঠেছে। বিস্ময়বিমূঢ় মনে, শঙ্কাকাতর মনে, কল্পনা-প্রবণ মনে, আত্মপ্রত্যয়হীন মনে, ত্রাসদলিত মনে অঙ্কুরিত হল কামনা — সে-কামনা ভোগের, আত্মপ্রসারের — পরাক্রান্ত মনের। উচ্চাভিলাষী শক্তি-বিলাসী মনে সাড়া দিয়ে নড়ে উঠল অজ্ঞাতপূর্ব দুটো লোভ — জমির আর জরুর। যেমন-তেমন জমি নয় — রাজ্য, আর যে-সে 'কন্যা' নয় — সুন্দরীতম ডানা-কাটা-পরী। দুটোই দুর্লভ। তাই শুরু হল অভিযান, বেধে গেল সংগ্রাম, দেখা দিল পদে পদে সংঘাত। এ অভিযানে দেবতা হল মানুষের সহায়, আর দেও-জীন-রাক্ষস দাঁড়াল পথ রোধ করে। মানুষের মধ্যে এ উচ্চাভিলাষী সংগ্রামী দলে রয়েছে শক্তিমান ও বুদ্ধিমান। রাজকুমার, মন্ত্রীপুত্তুর, সদাগর আর কোটাল। এভাবে কল্পলোকের সঙ্গে যুক্ত হল ইহলোক। স্বপ্নরাজ্যে-মনোরাজ্যে ঘটল মিতালি, স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত হল জৈব-কামনা। জীবন পরিব্যাপ্ত হল জীবনেতর লোকে। দেব-মানবে জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। এবার রূপকথা নয়, কল্পলোক নয় আবার তাকে বাদ দিয়েও নয়। এবার প্রলুব্ধ জীবনের জয়যাত্রা — আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসার স্পৃহার মূর্ত-স্বরূপ। এ-যুগ রোমান্সের যুগ। সভ্যতার ইতিহাসে মহাকাব্যের যুগ। — ইলিয়াড-ওডেসী আর রামায়ণ-মহাভারতে বিধৃত রয়েছে এর স্বরূপ। এ থেকে মনুষ্য সমাজেও সৃষ্টি হল শ্রেণী — তুচ্ছ ও উচ্চ মানবশ্রেণী। উচ্চ মানুষের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসার দেখে সেদিন তুচ্ছ মানুষ ঈর্ষা করে নি, বরং স্বাজাত্যবোধে সে উল্লসিতই হয়েছিল মানুষের জয়যাত্রায়। নির্বোধ তুচ্ছ মানুষ সেদিন আত্মভোলা হয়ে স্বজাতির প্রগতিতে আত্মপ্রসাদই লাভ করেছিল, উপভোগ করেছিল পরমানন্দ। এভাবে মনুষ্যজীবনে সার্থক হয়ে উঠল স্বপ্ন ও সত্য, কল্পনা ও মনন, মাটি ও আকাশ, আর জীবন ও জিজ্ঞাসা। বাস্তব জীবনই ব্যাপ্ত হল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে। এ ত্রয়ীর পটভূমিকায় সংঘাতে-ঈর্ষায়-বিদ্বেষে ও প্রীতি-অনুকম্পায় দেব-দৈত্য-নর রইল পরস্পরের প্রতিবেশী হয়ে।

এ-যুগটি মানুষের জীবনে তথা ইতিহাসে দীর্ঘতম স্থায়ী স্তর। মনুষ্যজাতির কোন কোন সম্প্রদায়ে আজো এর পূর্ণ ও প্রবল জের চলছে। এক সমাজেও প্রতিবেশ ও শিক্ষাগত কারণে সব মানুষ একই স্তরে উন্নীত হতে পারে না। তাই আলো ও আঁধারি, কায়া ও ছায়া, কল্পনা ও বাস্তব, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বোধি ও প্রজ্ঞা,

ভাব ও বুদ্ধি, ভয় ও ভাবনা, চেতনা ও অবচেতনা, শঙ্কা ও কৌতুক, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা মিশ্রিত বহু বিচিত্র এ-জীবন-লীলার মোহ কোন ছলেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না মানুষ। যতই ভাবে, যতই দেখে, ততই রহস্যের মায়াজালে আত্মসমর্পণ করে আত্মসমাহিত হতে চায়, গদ গদ কণ্ঠে বিমুগ্ধ ও অতৃপ্ত চিত্তের বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠে একটি কথায়—'আহা!' কিংবা একটি উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসে। এ-যুগে মানবজাতি হাতিয়ার ও সাংস্কৃতিক মানানুসারে নানা স্তরে বিভক্ত রয়েছে। আমরা এর সবচেয়ে প্রগতিশীল সম্প্রদায়কেই আমাদের বক্তব্যের অবলম্বন করব।

মনুষ্যের জাতীয় জীবনের তৃতীয় স্তর শুরু হয়ে গেল। এ-যুগে আর রাজকুমার, মন্ত্রীপুত্র, সদাগর ও কোটালে জীবনবোধ, উচ্চাভিলাষ ও ভোগেচ্ছা সীমাবদ্ধ রইল না। রাজ-রাজড়াদের সান্নিধ্যে, দেশ-দেশান্তরের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগে, শিক্ষার প্রসারে জনমনেও ফুটে উঠল প্রসারিত জীবনের মোহময় রূপ। জীবনবোধ হয়ে উঠল সূক্ষ্ম। এবার আর স্বর্গ-পাতাল নয়,—শুধু মর্ত্য, ভাবপ্রবণতা নয়,- ভাবনা, পক্ষীরাজের পিঠ নয়,—আকাশের কিনারা নয়, জীবনের শারীর চাহিদা মিটাবার আগ্রহই মানুষকে কল্পনার স্বর্গলোক থেকে কঠিন মাটির সংগ্রামে নিয়োজিত করল। এবার আর আকাশ-বিহারের সাধ নয়, জমিচাষের গরজবোধই কর্মমুখর করে তুলল মানুষকে। এবার গানে-গাথায় দেও-জীন-রাক্ষসের কথা নয়, পরী-বিদ্যাধরী-অপ্সরীর কামনা নয়, বাঞ্ছাহত জীবনের বিক্ষোভ, 'বঞ্চিত বুকের সঞ্চিত ব্যথার' আক্ষেপ, তৃপ্ত হৃদয়ের প্রশান্তি, কৃতার্থ মনের উল্লাস, বিজয়ী বীরের আস্ফালন ও দলিতজনের আর্তনাদই হল সাহিত্যের সামগ্রী। 'কাম আর অর্থ'—এ দ্বিবিধ বর্গীয় ফল লাভেচ্ছাই গণজীবন নিয়ন্ত্রিত করছিল এ স্তরে।

এবার দেশ-কালের প্রতিবেশে প্রয়োজনবোধই নিয়ন্ত্রণ করছিল মানুষের জীবন চেতনা ও জগৎ-ভাবনা। তাই এবার আর বৃহৎ বা মহৎ কোন জিজ্ঞাসা নয়, নিতান্ত বাসনা চরিতার্থ করাই জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য। জীবন ও জীবিকার তফাৎ আর রইল না, জীবিকাই জীবন অর্থাৎ জীবিকা দ্বারাই জীবনের স্বরূপ অভিব্যক্তি পেতে শুরু করেছে। আগে মানুষ ছিল কম। পৃথ্বী ছিল বিপুলা, তার উপর নিতান্ত উদরপূর্তির সামগ্রী ছাড়া অন্য সামগ্রীর প্রয়োজনবোধ তখনো জাগে নি বলে হানাহানির কারণ ছিল না আহার্য নিয়ে। কেননা, তখনো সঞ্চয় বুদ্ধি জাগে নি, পশু-পাখির মতো দিনভর খুঁজে-পেতে আহার করাই ছিল কাজ। তখনো মন অবচেতন স্তর পার হয়ে আসে নি, কাজেই কৃত্রিম হয়ে উঠে নি যৌনবোধ ও যৌন-উত্তেজনা। তবু আহার্য সংগ্রহ-ঘটিত দ্বন্দ্ব আর যৌন-সম্ভোগ-সংক্রান্ত ক্ষণস্থায়ী সংঘাত যে ঘটে নি তা' নয়। তবে তা' মনে পুষে

রাখার মতো নয়, পশুতে, পাখিতে এসব ব্যাপার যেমন ঘটে এবং যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এও তেমনি আর ততক্ষণ ও ততটুকু।

তারপর ক্রমে মানুষ জাগল। মানুষের জীবন-বিলাস বহু বিচিত্ররূপ ধরে বিকশিত হয়ে চলল। মানুষ বাড়ল। টান পড়ল ভোগ্য সামগ্রীতে। প্রতি-যোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল শুরু। লাগল কাড়াকাড়ি, মারামারি আর হানাহানি। পৃথিবী হয়ে উঠল বসবাসের প্রায় অযোগ্য। নিশ্চিত—নির্বিঘ্ন—নিরুদ্বেগ জীবন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। দুর্বলের সহায়, কল্যাণ ও শান্তিকামী, করুণা-বিহ্বল মানুষ এমনি সংকটে উচ্চারণ করেন একাধারে সাবধান ধ্বনি ও অভয়-বাণী; তাঁদের এক চোখের দৃষ্টিতে থাকে ধমক, আর চোখে থাকে আশ্বাসের দীপ্তি। তাঁরা দোহাই কাড়েন। বাহুবল, ধনবল, জনবল নয়, জ্ঞানবল ও বাক্যবলই তাঁদের মূলধন আর দোহাই-ই তাঁদের অস্ত্র। আল্লাহ্‌র দোহাই ও স্বর্গ-নরকের দোহাই, লাভ-ক্ষতির দোহাই, রোগ-শোক-মৃত্যুর দোহাই ও আপদ-বিপদের দোহাই কেড়ে তাঁরা লোকমনে এমন এক ভয়-ভাবনা ও আশা-আশ্বাসের পার্থিব-অপার্থিব পরিবেশ ও সংস্কার সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তার সত্যাসত্য নির্ণয় অসম্ভব। ফলে দুর্বল নির্বোধ হল অদৃষ্টবাদী দাস, শ্রমিক ও শোষিত। বুদ্ধিমান দুর্জন দুরাত্মা হল শোষক, শাসক ও প্রভু। এ রহস্যঘন, ত্রাসদুষ্ট, সন্দেহ শঙ্কাপুষ্ট সংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে বের হওয়া দুঃসাহসী লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য হয়ে রইল। তাতেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিমিত ও লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রিত হয়ে মনুষ্য সমাজের আবহ স্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। এ-স্তরের মনুষ্য-মনের প্রতিচ্ছবি পাই এ-যুগে সৃষ্ট সাহিত্যে। সে-সাহিত্য রোমাঞ্চময় ও রোমান্টিক। তাতে রয়েছে বাস্তব জীবনে পাওয়া-না পাওয়া হৃদয়ের স্বরূপ। জীবনের সাধ-আহ্লাদ, দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চিত বুকের বিক্ষোভ, তৃপ্ত হৃদয়ের মধুর প্রসাদ ও প্রশান্তি অভিব্যক্তি পায় এ-সাহিত্যে। তাতে অলৌকিক-অসম্ভবতা আর রইল না, থাকল জীবনে সম্ভব অথচ অসাধারণ-অস্বাভাবিক পরিবেশে ও উপায়ে কামনা পূর্ণ করবার দিশা। এ-সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শের স্বরূপ 'এই জীবনে যে-সাধ মিটাতে পারি নি, সে সাধ জেগেছে গানে।' অথবা 'জীবন যাহার অতি দুর্বহ—দীন দুর্বল সবি। রসাতলে বসি গড়িছে স্বর্গ, সেইজন বটে কবি।' যেমন গত শতকে রচিত রোমান্সগুলো।

শুধু জীবনবোধের প্রসারেই মানুষের জৈব চাহিদা বাড়ে নি, সভ্যতার দান তথা আবিষ্ক্রিয়াও মানুষের প্রয়োজন বাড়িয়ে দিচ্ছে। যতই রকমারি ভোগ্য

সামগ্রী বাড়ছে, ততই অসংযত হয়ে উঠেছে মানুষের বাসনাও। তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি কিছুতেই হচ্ছে না। চাহিদা মিটাবার লক্ষ্যে জীবিকার ধান্দাতেই ছুটোছুটি করে জীবন কাটছে, চোখ তুলে চারদিকে দেখবার, ভাববার বা বিস্মিত হবার আগের মতো অবকাশই বা কোথায়। কারো যদি অবকাশ ঘটেও যায়, তবু জ্ঞানে প্রবীণ পৃথিবীর লোক জগৎ ও জীবনের, প্রকৃতি ও নিসর্গের, আকাশের আর পাতালের সব রহস্য, সব খবর এমন করে বিশ্লেষণ করে নগ্ন করে তুলে ধরেছে জনসমক্ষে যে, জগতে আর জীবনে নতুন কিছুই রইল না যা মানুষের ভয়-বিশ্বাস, ত্রাস-শঙ্কা বা আনন্দ-উল্লাস-ঔৎসুক্য জাগাতে পারে। ফলে 'খাও, গাও আর নাচ' এই হয়ে উঠেছে জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শন। কেননা, জানা গেছে, আর কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। সব ফাঁকি, সব ভাঁওতা। যুগ-যুগান্তর লালিত মানুষের পূর্বার্জিত বিশ্বাস-সংস্কারের ভিত উবে যাচ্ছে চোরাবালির মতো। ধসে পড়ছে ধর্ম-বিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার ও নৈতিক মূল্যমানের সৌধ। ভেঙে যাচ্ছে পারলৌকিক অস্তিত্বের স্বপ্নে গড়া আশা-আশংকার মনোময় ইমারত। কিসের ভরসায়, কার ভয়ে কোন্ মহৎ ও বৃহৎ প্রেরণায় মানুষ ভোগে থাকবে বিরত, বঞ্চিত হৃদয়ে প্রবোধের শান্তি বারি ছিটোবে; আর কেমন করে দিন-রজনীর অভাবে ধৈর্য ধারণ করবে? ফলে আজ আস্তিক ও আচারনিষ্ঠ মানুষও দ্বিধা দ্বন্দ্বের শিকার ও বিকৃত সত্তায় দুষ্ট।

মহৎ ও বৃহৎ আদর্শবিহীন, জীবাত্মা-পরমাত্মারহস্য পরাঙ্মুখ, পরলোক-বিভ্রান্তিবিমুক্ত জৈব-জীবন-সর্বস্ব বস্তু-নির্ভর প্রত্যক্ষবাদীরা তাই একান্ত ভাবে ভোগ্যবস্তু-লোলুপ। তাদের ধ্যান জ্ঞান আর কর্ম ভোগেচ্ছা পূরণেই নিয়োজিত। তাদের বুকে বিক্ষোভ, মুখে অভিযোগ, চোখে লোভ।

আজকাল মানুষ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত—ভোগী ও ভোগেচ্ছু, ধনী ও গরীব, ভোগী ধনীরা সংখ্যায় কম, কিন্তু বিত্তে বড়। ভোগেচ্ছুরা সংখ্যায় অগুণতি। তারা সব এক জোট হয়েছে। তাদের বক্তব্য এই—পৃথিবী ও পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী প্রকৃতির দান, আমরাও প্রকৃতিসৃষ্ট। কাজেই এতে সবার সমান অধিকার রয়েছে, এ কারো বা কোন দল বিশেষের একচেটিয়া ভোগ্য হতে পারে না। ধনী, তুমি অট্টালিকায় আছ, রাজা তুমি প্রাসাদে রয়েছ, মধ্যবিত্ত, তুমি ভবনবাসী—আমরা এত গরীব-কাঙাল যখন কুটির আর গাছতলা সার করেছি, আর সবার জন্যে যখন অট্টালিকা ও প্রাসাদের ব্যবস্থা করা যাবে না, তখন তোমরাও প্রাসাদ-অট্টালিকা-ভবন থেকে নেমে এস, আমরাও গাছতলা থেকে উঠে যাই। সবার জন্যে বিত্ত ও ভোগের ব্যবস্থা হয়ে যাক। সুখে থাকি আর দুঃখে পড়ি

তাতে আর ক্ষোভ বা ঈর্ষা থাকবে না। এ-মনের অভিব্যক্তি যে-সাহিত্যে লাভ করেছে. তার নাম গণসাহিত্য। মানবতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, গণজীবনে শ্রদ্ধা ও দরদ, প্রচলিত সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবজ্ঞা, বিত্তশালী শোষকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ এ সব সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। বাস্তব জীবনায়নের গৌরবে, মানবতার বাণী-প্রচারের দম্ভে, জীবন ও জীবিকার অভিন্ন স্বরূপ উদঘাটন-গর্বে, জগৎ ও জীবনের যথার্থ সূত্র আবিষ্কার ও অকৃত্রিম সংজ্ঞা প্রয়োগ-গৌরবে এ-সাহিত্য আজ বিশ্বনন্দিত ও গণবন্দিত। এ-সাহিত্যের মহান আদর্শ হচ্ছে—মানুষের জন্যে, জীবন জীবিকার জন্যে, মানবতাবোধ প্রসারের জন্যে, মানব কল্যাণের জন্যে, সমাজ-উন্নয়নের জন্যেই সাহিত্য। এ সাহিত্য ভূমি-নির্ভর, কল্পনা সর্বস্ব নয় -এ-সাহিত্য পীড়ন-শোষণ সমস্যা সঙ্কুল বাস্তব জীবন-ভিত্তিক।

একদিন যখন অভাবমুক্ত সভ্য মানুষের জীবন ছিল সুখের, তখন তারা কামনা করেছে অমৃত। ক্রমে জীবন যখন হল দুঃখাকীর্ণ ও বন্ধন-জটিল, তখন কাম্য হয়েছে মোক্ষ। তারও পরে যখন জীবনে অভাব ও অপ্রাপ্তি বেড়েছে, তখন মর্ত্য জীবনে হতাশ অদৃষ্টবাদী মানুষের বাঞ্ছিত হয়েছে অভাবমুক্ত স্বর্গসুখ। শোষণ-পীড়ন ক্লিষ্ট মোহমুক্ত আজকের মানুষের চাহিদা হল প্রাণে বাঁচার জন্যে কেবল অন্ন আর মনে বাঁচার জন্যে নিরাপত্তার স্বস্তি।

মানুষের সাহিত্য দেশ-কালের পরিবেশে মানুষের প্রয়োজন সঞ্জাত মন-মননেরই প্রতিচ্ছবি—মানুষের আন্তর্জীবনেরই বাক্-বদ্ধ রূপ। এ-অর্থে সাহিত্য চিরদিনই বাস্তব-জীবন ও বাস্তববোধ-ভিত্তিক। কাজেই কোনকালের সাহিত্যই সমকালে কৃত্রিম অবাস্তব অলৌকিক ছিল না। মানুষের জীবনবোধ যে-যুগে যেমনটি ছিল, সাহিত্যে তেমনটিই বিবৃত হয়েছে। এক কথায় সেকালের সাহিত্য ছিল ভয়, বিস্ময়, কল্পনা, আবেগ, ও বিশ্বাস-ভিত্তিক এবং ব্যক্তির বাস্তব জীবন-জীবিকার সমস্যা সম্পর্কবিহীন. আর আজকের সাহিত্য হচ্ছে রূঢ় বাস্তব জীবন-জীবিকা সংপৃক্ত চিন্তা-চেতনা ও সম্পদ-সমস্যা সংক্রান্ত যুক্তি, বুদ্ধি, প্রত্যয় ও মনন-ভিত্তিক জীবনায়ন।

৬

বাঙলা-সাহিত্যের তথাকথিত আঁধার যুগ

চর্যাগীতিকে সাত বা দশ থেকে বারো শতকের বাঙলা রচনা বলে ধরা হয়। এর পরে তেরো শতক থেকে চৌদ্দ শ' পঞ্চাশের মধ্যেকার কোন বাঙলা রচনার নিশ্চিত

নিদর্শন মেলে না। তাই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ মনে করেন, এ সময় বাঙলায় কিছুই রচিত হয় নি এবং তাঁরা তুর্কী বিজয়কেই এ-জন্যে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন, তুর্কী বিজয়ের ফলে বাঙলা দেশে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলে। দেড় শ' দু' শ কিংবা আড়াই'শ বছর ধরে হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার চালানো হয় কাফেরদের ওপর। তাদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্ম-সংস্কৃতির ওপর চলে বেপরোয়া ও নির্মম হামলা। উচ্চবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই মরল, কিছু পালিয়ে বাঁচল, আর যারা এর পরেও মাটি কামড়ে টিকে রইল, তারা ত্রাসের মধ্যেই দিন-রজনী গুণে গুণে রইল। কাজেই, ধন, জন ও প্রাণের নিরাপত্তা যেখানে অনুপস্থিত, যেখানে প্রাণ নিয়ে সর্বক্ষণ টানাটানি, সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিলাস অসম্ভব। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্মেষ-বিকাশের কথাই ওঠে না। এ-ই হল তাঁদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত।

প্রায় সব ইতিহাসকারেরই একই সিদ্ধান্ত। বাঙলা দেশে তুর্কী বিজয় সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মনে একটা বিজাতীয় বিরূপতা সব সময় সক্রিয় থাকে, ফলে তাঁদের সহজ বিচার-বুদ্ধি এখানটায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। নইলে এমন সিদ্ধান্তের অসারতা সহজেই বোধগত হত।

যে-তুর্কী বর্বরতার বরাত দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের বন্ধ্যা যুগের ইতিকথা তৈরী হয়েছে, সে তুর্কী শাসনের খসড়াচিত্র আগে (পৃঃ ৩৮-৪৭) তুলে ধরেছি।

মধ্যযুগের ইতিহাস সে-যুগের আবহেই যাচাই করতে হবে। সে-যুগে পর-মতসহিষ্ণুতার কিংবা বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সৌজন্যমূলক শ্রদ্ধার একান্ত অভাব ছিল। পরাক্রান্ত শক্তি মাত্রেই পরপীড়ক ছিল। তার ওপর ছিল ফৌজী বর্বরতা—যা এ-যুগেও বিরল নয়। অশোক, এটিলা, চেঙ্গিজ, হালাকু থেকে তৈমুর-নাদির অবধি এশিয়ার যে-কোন দিগ্বিজয়ীর কথা স্মরণ করলেই এ তথ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শাসক কিংবা বিজেতার কোন জাত-ধর্ম নেই। তাঁদের লোভের কিংবা ক্ষোভের কবলে যে পড়ে, সে-ই উৎপীড়িত হয়। তাই দুনিয়ার রাজবংশাবলীর ইতিহাসে আত্মীয় হত্যার নজিরই বেশী। দুনিয়াতে চিরকাল রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত, শোষক-শোষিত—এ দুই শ্রেণীই আছে। সেই রাজা, শাসক বা শোষক স্বদেশী-স্বজাতি হোক কিংবা বিদেশী-বিজাতি হোক তাতে কোন ইতর-বিশেষ হয় না। বিশ্বাসঘাতকতার এবং আত্মীয় ও জ্ঞাতি হত্যার নজির হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান নির্বিশেষে পৃথিবীর রাজবংশের ইতিহাস মাত্রেই বিদ্যমান।

ঐতিহাসিক মধ্যযুগে মুসলমানরাই প্রধানত পরাক্রান্ত ও দিগ্বিজয়ী। কাজেই তাদের অন্যায়, উৎপীড়ন ও বর্বরতার দৃষ্টান্ত সহজেই চোখে পড়ে। আসলে

সে-যুগের সভ্যজগতের ইতিহাস সর্বত্রই একরূপ। পনেরো শতকের ইটালীতে পোপ পঞ্চম নিকোলা (১৪৪৭—৫৫) পেগান মন্দির, মূর্তি, ইমারত ও শিল্পকৃতি ভেঙ্গে প্রাসাদ ও গির্জা তৈরী করিয়েছিলেন।[১] ফরাসী বিপ্লবকালে লুই ও রাজবংশীয়দের হত্যা, গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধে গ্রীকদের আনাতোলীয়া অঞ্চলে তুর্কী নিধন, হিরোসীমা-নাগাসাকীর হত্যাকাণ্ড, ইন্দোনেশিয়ায় বা চিলিতে স্বদেশী-স্বভাষী হত্যা প্রভৃতি পুরোনো প্রবৃত্তিরই নতুন প্রকাশ। উত্তেজনাবশে ভাল মানুষও যে হিংস্র শ্বাপদ হয়ে ওঠতে পারে, তার চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের পাক-ভারতে অনুষ্ঠিত ১৯৪৬—৫০-এর বেপরওয়া হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজে। সেকালের যুদ্ধনীতি ও শাসনরীতি ছিল ভিন্ন। রাজা-প্রজা তথা শাসক-শাসিতের কর্তব্য, দায়িত্ব এবং অধিকারবুদ্ধিও ছিল অন্য রকম। জাতি ও বর্ণ-দ্বেষণা আজো সুসভ্য আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতে তীব্র সমস্যা হয়েই রয়েছে। সে যুগে যে ছিল—তা এমন আর ক্ষোভের কি। তবু যারা ক্রীতদাসকেও নিজের সমান মর্যাদা দিয়েছে, উচ্চপদে বসিয়েছে, জামাতা করেছে, সিংহাসন দিয়েছে, তারা কি একেবারে অমানুষ হতে পারে? উদারতার ও মানুষের প্রতি নিঃসঙ্কোচ শ্রদ্ধার এমনি দৃষ্টান্ত আর কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। সত্য বটে, মুসলমানেরা সব বিজেতাদের মতো অমুসলিম দেশ জয় করতে গিয়ে ধনের লোভে ও ফেরারী শত্রুর খোঁজে গির্জা-মন্দির-বিহার আক্রমণ করেছে, মন্দির ও মূর্তি ভেঙ্গেছে, ধন-রত্ন লুট করেছে। যেখানে স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে, সেখানে গির্জা-মন্দিরকে মসজিদ করেও নিয়েছে। আত্যন্তিক স্বধর্মপ্রীতি ও বিধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা এমনি অপকর্মে সেনাদলকে চিরকালই অনুপ্রাণিত করে। পৌত্তলিকতার প্রতি অবজ্ঞাটাও ছিল তীব্রতর। কাজেই যুদ্ধকালে বর্বর ফৌজী উত্তেজনার সময় মন্দির মূর্তি ভাঙা ও ধনরত্ন লুট করা সে-যুগের কোন বিজেতা-বাহিনীর পক্ষে কলঙ্কের কথা নয়। বিজাতি বিধর্মী বিজেতারা চিরকালই তা' করেছে, দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বত্র এর নজির রয়েছে। মুসলমানেরা এর ব্যতিক্রম নয়। যুদ্ধ ছাড়া শান্তির সময়ে খেয়ালের বশে কিংবা বিজাতি-বিদ্বেষের প্রাবল্যে কোন মুসলমান শাসক মন্দির-মূর্তি ভাঙ্গেন নি। বরং কেউ কেউ পাপের ভয় উপেক্ষা করেও মন্দির তৈরীতে অর্থ সাহায্য করেছেন, দেবোত্তর জমি দিয়েছেন। "এদেশে আসিয়া মুসলমান রাজারা সংস্কৃত হরফে মুদ্রা ও লিপি ছাপাইয়াছেন, বহু বাদশা হিন্দু মঠ ও মন্দিরের জন্য বহু দানপত্র দিয়াছেন। সে সব ঐতিহাসিক নজির দিন দিন নূতন করিয়া বাহির হইতেছে।" (ক্ষিতিমোহন সেন)। তারপর

১. The Story of Civilization : Will Durant, Vol. V, p. 376.

যখন হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত দেশে রাজায়-বাদশায় যুদ্ধ হয়েছে, তখন ধর্মস্থানের উপর হামলা (বিশেষ কারণ না ঘটলে—যেমন মন্দিরে শত্রুর আশ্রয় নেয়া, আত্মগোপন করা ইত্যাদি) হয় নি। তাছাড়া সব সুলতান অবিবেচক অমানুষ ছিলেন না, এবং দেশের সর্বত্র সংঘর্ষ হয় নি। দেশ জয়ের পরে দেশ-দ্রোহীর খবরও মেলে না। ভারতের কোন মুসলমান বিজেতাই স্বধর্ম-প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে দেশ জয় করেন নি—রাজত্বলোভেই অস্ত্রধারণ ও প্রয়োগ করেছেন। মুসলমান বিজেতারা এদেশে রাজ্য স্থাপন করেই হিন্দু পাইক (পদাতিক সৈন্য) ও কর্মচারী নিয়োগ করতে থাকেন। "রাজ্য শাসনে ও রাজস্ব ব্যবস্থায় এমন কি সৈনাপত্যেও হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।" এবং "গৌড়ের সুলতানেরা মুসলমান হইলেও রাজকার্য প্রধানত হিন্দুর হাতেই ছিল।" (সুকুমার সেন)। "অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীরগুলি ধনবান হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন।—এই জায়গীর-গুলির ইজারা সমস্ত ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।" (স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস) "পাঠান রাজত্ব-কালে জায়গীরদারেরা দেশের ভিতরে রাজস্ব আদায়ের কাজে হস্তক্ষেপ করেন নি। দেশে শাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য হিন্দুদের উপরেই তাঁদের নির্ভর করতে হত। সেই জন্য পাঠান আমলে হিন্দু ভূস্বামী ও অধিকারীদের যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।" (বাঙলার নব জাগৃতি, বিনয় ঘোষ, পৃ: ২৮। এবং জাতি-বৈর পরিচ্ছেদ, পৃ: ৭৬-৭৭ দ্রষ্টব্য)

কাজেই তখনকার নতুন অভিযানে মন্দির ভাঙায় বাস্তব বাধা ছিল। আর ফৌজী বর্বরতার কথা বাদ দিলেও শাসকদের কেউ হয় নরদেবতা আবার কেউ বা নরদানব—এ একান্তভাবে ব্যক্তিক-চরিত্রের কথা। সুশাসন কুশাসন ব্যক্তিক যোগ্যতা ও স্বভাবের উপরই নির্ভরশীল। এ জন্যে জাত তুলে খোঁটা দিলে বুদ্ধির তারল্যই প্রকাশ পায়।

আমরা জানি, তুর্কী শাসকেরা কেবল নিজেদের মধ্যে মারামারিই জিইয়ে রাখেন নি, রাজ্যবিস্তারেও উদ্যোগী ছিলেন। রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দুকে শত্রু করে রেখে, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সৈন্যও নিয়ে (যেমন তুঘান খান, ১২৭২-৮১) যুদ্ধাভিযান করা কিছুতেই সম্ভব হত না। কাজেই রাজ্যের স্থায়িত্বের গরজেই হিন্দু-নির্যাতন সম্ভব ছিল না।[১] আর সুবাদারেরা ঘন ঘন মসনদ

১. এ প্রসঙ্গে 'Early Muslim Rulers in Bengal and their non-Muslim subjects (Down to A. D. 1538) by Dr. Abdul Karim, Journal of Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1957. দ্রষ্টব্য।

নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন বটে, তাতে রাজধানীতে ও যুদ্ধক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা ও প্রজার দুর্ভোগ হওয়া সম্ভব, অন্যত্র নয়। তখন গ্রামীন জীবন ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ। নগরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সামান্য। বিশেষ করে দুইজনের কাড়াকাড়ির অবসরে প্রজারা প্রশ্রয় পাওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন মুসলমান, তখন এরূপ ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুর ওপরই পীড়ন হওয়ার কারণ নেই। সে যুগে রাজধানীর যুদ্ধ ও রাজা বদলের সংবাদ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছয় মাসে নয় মাসেই পৌঁছত। প্রজাসাধারণের তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধির তেমন কিছু ছিল না। রাজাবদলে প্রজার ক্ষতি-বৃদ্ধি ক্বচিৎ এবং সামন্যই হত। প্রজার কাছে রাজা ছিলেন তখন ভাড়াটে বাড়ির কিংবা জমির মালিকের মতো। এ-যুগের মতো রাষ্ট্রিক জাতীয়তা বোধ ছিল না প্রজাদের। যুগান্তকর পলাশী যুদ্ধের খবরই বা কাকে বিচলিত করে-ছিল? শহরে রাজনীতি, আন্দোলন কিংবা হাঙ্গামা এ দেশে আজো গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ১৯৪২, ৪৬ ও ৫০-এর রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা স্মর্তব্য। আরো আগের ইতিহাসের দৃষ্টান্তও নেয়া যায়। আকবরের সময়ে (১৫৭৫ খ্রী:) বাঙলা বিজিত হল বটে; কিন্তু আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে নিরঙ্কুশ মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কেননা মুঘলে-পাঠানে তথা রাজশক্তি ও সামন্ত শক্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। শাহ্‌জাহানের আমলে বাঙলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল সত্য; কিন্তু হার্মাদদের উপদ্রবে মানু-ষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ছিল না; আবার আওরঙ্গজীবের আমলে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় বণিকদের দৌরাত্ম্য নতুন উপসর্গরূপে দেখা দিল। তা সত্ত্বেও বাঙলায় সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা বন্ধ ছিল না। আর ভারতে ইসলাম প্রচারে কোন কোন রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না, তা' ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার কাহিনীও অমূলক।[১] এ ব্যাপারে বলবনী শাসন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের পূর্বোদ্ধৃত (পৃ: ৪১) মন্তব্য স্মরণীয়।

এবার বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসাগুলো পেশ করছি:

১. ''হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ/আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন। হিন্দুরা কি করে তারে যার যেই কর্ম / আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।

—বৃন্দাবন দাস''

ক· তুর্কী আক্রমণ ও বিজয় কি কেবল বাঙলা দেশেই ঘটেছিল, ভারতের অন্যত্র ঘটে নি? সেখানকার অবস্থা কিরূপ দাঁড়িয়েছিল?

খ· যুদ্ধকালে জীবন ও সম্পদ নষ্ট অনিবার্য। কিন্তু তাই বলে যারা রাজত্ব করতে আসে, তারা বিজিতদের ওপর নির্বোধের মত চিরকাল বেপরওয়া অত্যাচার চালায় না। এবং চালালে সে রাজ্য ও রাজত্ব টেকে না। রাজনীতি ও শাসননীতিতে এমন নির্বোধ policy থাকতে পারে না। যাঁরা কথায় কথায় বাঙলা দেশে দেড় শ', দু' শ' বা আড়াই শ' বছর ব্যাপী হিন্দু পীড়নের কথা বলেন, তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি, যে এটা ছয় থেকে দশ পুরুষ প্রক্রমের (generations) ব্যাপার? ইতিমধ্যে শাসক বদল হয়েছে কয়বার; generation ঘুরেছে কয়বার? দেড় শ'- আড়াই শ' বছর ধরে পুরুষানুক্রমে একই মতাদর্শে আস্থা রাখা, একই পীড়ন-নীতি চালু রাখা কিংবা একই কর্মে সক্রিয় থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব কি?

গ· জনাব গোপাল হালদার (বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খণ্ড) বলেছেন, বৌদ্ধদেরও উপর অত্যাচার হয়েছিল। দুর্গভ্রমে মগধের বৌদ্ধবিহার আক্রমণ ও সৈন্যভ্রমে ভিক্ষু হত্যার ব্যাপারটি যে একান্তই অজ্ঞানকৃত তা' ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধদের সংখ্যা তখন বাঙলায় নেহাত নগণ্য এবং দণ্ডশক্তি তাদের কারো হাতে ছিল না। তারা তখন ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিগ্রহপিষ্ট ও অনুকম্পাজীবী। কাজেই তাদেরকে নিপীড়িত করবার কারণ ও সুযোগ দু-ই ছিল অনুপস্থিত। মুসলমান বিজয়ে ব্রাহ্মণ্য পীড়ন-মুক্তির উল্লাসই কি 'নিরঞ্জনের রুষ্মায়' ব্যক্ত হয় নি।

ঘ· ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, উচ্চ বর্ণ ও বিত্তের লোকদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। তারপরেও বাঙলা দেশে—বিশেষ করে গৌড়ে-নদীয়ায় উচ্চবর্ণের এত হিন্দু রইল কি করে? বাঙলা দেশে উচ্চবর্ণের লোকের আনুপাতিক সংখ্যা যত, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তত আছে কি? বাঙলার যে অংশ সুলতানদের পদতলে ও পদপ্রান্তে ছিল সেখানে হিন্দুর সংখ্যা বেশী কেন? 'রক্তে' ও 'আগুনে' এত কিছু ধ্বংস করার পরেও সব রইল কি করে? মন্দির ধ্বংস কিংবা হিন্দু নাগরিক হত্যা না করেও পূর্ববঙ্গ এক শত বছর পরে (১৩০১ খ্রীঃ) জয় করা হয়। [পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে আসলে ১৫০ বছরের বেশী সময় লেগেছিল।] রাঢ় অঞ্চলও তেরো শতকের তৃতীয়পাদ অবধি গঙ্গারাজদের দখলে ছিল। সেখানকার বাঙলা ও সংস্কৃত অবদানের নিদর্শন কি এবং কোথায়?

ঙ. সে-যুগে কি নির্দিষ্ট প্রান্তরে নির্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধ হ'ত না? এবং সেনাপতির নিধনে, দুর্গ দখলে কিংবা তখ্‌ত অধিকারে গোটা দেশ জিত হ'ত না? গেরিলা যুদ্ধ তথা গণসংগ্রাম ছিল কি? 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়'—কথাটা কি আক্ষরিক অর্থে সত্য ছিল না? আমাদের মধ্যযুগীয় শেষ লড়াই 'পলাশীর যুদ্ধ'ও এরূপ যুদ্ধ নয় কি? জয়ের পরে দুই একদিন নিশ্চয়ই যুদ্ধ-ক্ষেত্রের চারপাশে, রাজধানী প্রবেশের পথে ও রাজধানীতে লুটতরাজ চলত (এ-ই নিয়ম)। তাই বলে তা' বছরের পর বছর ধরে চলেছে বলে ভাববার কারণ কি? বর্গীর হামলার মতো রাজশক্তির ও রাজার সুপরিকল্পিত cold-blooded বর্বরতা, লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ডের নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে আর আছে কি? তবু বর্গী উপদ্রুত অঞ্চলে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, পালা-পার্বণ ও বিবাহ-উৎসবাদি কি বন্ধ ছিল? দেড় শ' আড়াই শ' বছর ধরে নিপীড়ন চললে তা কি গা-সহা বা অভ্যস্ত হয়ে উঠে না? সে অবস্থায় জীবনযাত্রা কি বিকৃত ভাবেও স্বাভাবিকতা লাভ করে না? তখন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় খুব বাধা থাকে কি? ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষকালে যখন বাঙলা দেশের প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ হারালো, তখনো কি কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখিত এবং বাঙলার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে কি ছাপা হয় নি? পলাশীর যুদ্ধের পরে, সিপাহী বিপ্লবকালে, ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে কিংবা ১৯৪৬-৫০-এর পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেপরওয়া হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজের সময়ে (সংবাদ-পত্রাদির মাধ্যমে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও এবং অনেকের আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ ও সম্পদহানি হওয়ার পরেও) বাঙলা দেশের অধিকাংশ লোকের প্রাত্যহিক জীবনে ও মননে বিপর্যয় ঘটার প্রমাণ আছে কি? তখন কি স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত, পার্বণ ও বিবাহাদি উৎসব বন্ধ ছিল?

চ. মুসলমান আক্রমণকারীরা না হয় গৌড়-লখনোতিতে চলার পথে, যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা রাজধানী দখলের সময়ে মন্দির ভেঙ্গেছে, প্রধান ব্যক্তিদের হত্যা করেছে, গ্রাম লুট করেছে কিন্তু তাদের সংখ্যা কয়টি ও কয়জন? দেশব্যাপী হিন্দু যারা বেঁচে রইল তাদের বাড়ীর এবং দেশের অন্যান্য মন্দিরের পুথিপত্র নষ্ট হবার কারণ কি? এ তো গৌড়ের কথা! রাঢ়ে-বঙ্গে তো মুসলমানের পা বহুকাল পড়ে নি, যখন পড়েছে, তখন যুদ্ধক্ষেত্রেই জয়-পরাজয় নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয়েছে, মন্দির ভাঙ্গার কিংবা নির্বিচারে লোক হত্যার প্রয়োজন হয় নি। সেখানকার হিন্দুর বাঙলা-সংস্কৃতে কি অবদান আছে? গৌড়-লখনোতিতে কাফেররা কি কেবল নিগৃহীতই হচ্ছিল; রাজনীতি ও কূটনীতির নিয়মানুসারে কেউ কেউ কি অনুগৃহীত

হয় নি ? তাদের দান কি ? তাদের রাজত্বে হিন্দু রইল, তার শাস্ত্র রইল, পূজা-পার্বণ-বিবাহ, গান-বাজনা, সন্তান উৎপাদন, উৎসব-অনুষ্ঠান সব সম্ভব হল, জেলে-জোলা-কামার-কুমার-চাষী-মজুর সবাই স্ব স্ব পেশায় নিযুক্ত রইল, কেবল ছন্দে ছড়া আর্যা-তর্জা-পদ রচনাতেই পীড়ন প্রসূত অনীহা ছিল—এ যুক্তি হাস্যকর।

ছ. ভারতের সর্বত্র ইংরেজের শাসনকাল সমান নয়। বাঙলাতেই তো ১৮২ বছর মাত্র। তবু আমরা কি দেখলাম ? এর মধ্যেই আমাদের সর্বাত্মক বিবর্তন ও রূপান্তর জন্মান্তরেরই নামান্তর নয় কি ? তা হলে মুসলমান রাজত্বের প্রথম আড়াই শ' বছরেও (বিজ্ঞান যুগ নয় বলে হয়ত খুব মন্থর গতিতে) দেশের সমাজ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রূপান্তর ও বিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটেছে, যার ক্রমিক ও পূর্ণ বিকশিত রূপ পাচ্ছি ভাস্কর-রামানুজ-নিম্বার্ক-বল্লভ কলন্দর-রামানন্দ-কবীর-নানক-একলব্য-রামদাস-দাদু-রজ্জব-চৈতন্যের মতবাদে। ক্ষিতি মোহন সেনের 'ভারতের মধ্যযুগে সাধনার ধারা,' 'হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা,' তারাচাঁদের 'Influence of Islam on Indian Culture', সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের 'The Hindu view of life', বিনয় ঘোষের 'বাঙলার নবজাগৃতি,' উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারত দর্শন সার' প্রভৃতি গ্রন্থে আমাদের উক্তির সমর্থন রয়েছে।

এ ব্যাপারে সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, বনদেবী-বনবিবি, কালুরায়-কালুগাজী, ওলাদেবী-ওলাবিবি প্রভৃতি উপ ও অপদেবতার উদ্ভব ও পূজা-শির্‌নীর কথাও স্মরণীয়।

'বৃহৎ বঙ্গে' দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন, 'বাঙলা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল, এই পরাধীনতার যুগে সেই শ্রী শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। এই পাঠান প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল।' অরবিন্দ পোদ্দারের 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ও মানবধর্ম' গ্রন্থেও তুর্কী বিজয়ের সুফলের কথা আছে। এবং বৈষ্ণব মত যে সুফী মতের প্রভাব প্রসূত তা সুকুমার সেনও কিছুটা স্বীকার করেন। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—পূর্বার্ধ পৃঃ ২৪৫)।

জ. বাঙলা দেশ উজাড় হ'ল বলে বাঙলা সাহিত্য দেড় শ'-আড়াই শ' বছর ধরে সৃষ্টি হয় নি, এ-ই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সিদ্ধাদের চর্যাপদ ছাড়া বাঙলায় [?] আর কিছু সৃষ্টি হয়েছিল কি ? উচ্চবিত্তের গৃহী বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মুসলিম বিজয়ের পূর্বেকার কোন বাঙলা রচনার সন্ধান বা উল্লেখ পাওয়া যায় কি ? লক্ষ্মণ সেনের সভায় বাঙলায় লিখিয়ে কবি ছিলেন কি ?

শৌরসেনী ছাড়া অন্য কোন অবহট্টেই কি লিখিত বিশেষ কোন রচনা আছে [ODBL—P. 113] ? গৌড়ী অবহট্টে রচনার রেওয়াজ না থাকলে প্রাচীন বাঙলাতেই বা থাকবে কেন ? ধ্বংসের মধ্যেও 'মূর্খাহত' বাঙালী 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলন করবার প্রেরণা ও সংকলনের জন্য কবিতা পেলেন কোথায় ? আর প্রাকৃত-অবহট্টের মতো বাঙলা কবিতা থাকলেও কি এরূপ সংকলন হত না ? এ-সময়ে রচনার অনুকূল পরিবেশ না থাকলে এ-সময়কার কিছু কিছু সংস্কৃত রচনার (টীকা-ভাষ্য পুরাণাদির) সন্ধান মিলল কিরূপে ? বাঙলা কি তখন শিক্ষিত লোকের সাহিত্য রচনার বাহন হবার যোগ্য হয়েছিল ? সে-যুগের ধর্ম-সম্পৃক্ত সাহিত্য 'ভাষায়' সৃষ্টির বা অনুবাদের পক্ষে বাধা ছিল না কি ? চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ছাড়া কোন বামুন আদি স্তরে বাঙলায় কিছু লিখতে সাহস বা আগ্রহ দেখিয়েছেন কি ? ব্রাহ্মণ্য-শাসনে শাস্ত্রপতিদের পাঁতি উপেক্ষা করে বাঙলা চর্চা করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল কি ?

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

কিংবা 'কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে আর বামুনঘেঁষে এ তিন সর্বনেশে' বুলিটা আঠারো শতক অবধি কথায় ও কাজে অন্তত কিছুটা কি চালু ছিল না ? অতএব বাধা ছিল শাস্ত্রিক ও সামাজিক,—তুর্কী বিজয়েই সে বাধা অপসারিত হয়।

ঝ. হিন্দুর বেদ পুরাণাদি রইল, লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিদের গ্রন্থও রইল, মুসলমানেরা কি শুধু বেছে বেছে বাঙলা বই নষ্ট করেছিল যে চর্যাপদ নেপাল দরবারের আশ্রয়ে টিকে রইল আর শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) বাঁকুড়ার গোয়াল ঘরে আশ্রয় পেল ? শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভের আর কোন কপি পাওয়া গেল না কেন ? 'শেখ শুভোদয়া'[১] কি বলে ? বাঙলা দেশে কি আগুন-পানি-উই-কীট সে যুগে ছিল না ? জনপ্রিয় না হলে এযুগের ছাপা বইও কি দুর্লভ ও ক্রমে লুপ্ত হয় না ? ভাষার পরিবর্তনে ও জনপ্রিয়তার অভাবে (যদি বাঙলায় কিছু রচিত হয়েও থাকে) আলোচ্য যুগের বাঙলা বই কি লুপ্ত হতে পারে না ? 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' কি লুপ্ত বা লুপ্ত-প্রায় গ্রন্থ নয় ?

---

১. 'শেখ শুভোদয়ার' অকৃত্রিমতায় অনেকে সন্দিহান। কিন্তু ষোল শতকের সেই ইতিহাস-বিহীন যুগে হলায়ুধ মিশ্রের নাম জানা এবং তাঁর নামে ভণিতা দিয়ে জাল বই রচনা করা কেবল মুসলমানের পক্ষে নয়, অতি বুদ্ধিমান হিন্দু পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব। অবশ্য প্রাপ্ত পুথিতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ ও বিকৃতি আছে।

নেপালেই বা চর্যাপদের একাধিক পুথি পাওয়া গেল না কেন? ষোল-সতেরো শতকে রচিত বহু পুথি কি লুপ্ত হয় নি? শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তারিখটি এবং কৃত্তিবাসের 'আত্মকথা' প্রচুর পাওয়া না যায় কেন?

আমাদের ধারণায় তুর্কীবিজয় ও তার পরেরকার গৌড়রাজ্যের চিত্র এরূপ: তুর্কীরা যুদ্ধ করে যখন দেশ জয় করেছে [আসলে বখ্তিয়ার খালজী অনায়াসেই দেশ দখল করেন, হত্যাকাণ্ডের বিশেষ প্রয়োজন হয় নি, কারণ রাজা পালিয়ে গিয়েছিলেন]; তখন সাময়িক ভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চলেছিল (যেমনটি চলে থাকে)। তারপর দেশ শাসনে তারা মনোযোগী হয়। গোড়ার দিকে উদ্ধত অসহযোগীদের শায়েস্তা করতে হয়, ফলে বিশেষ বিশেষ লোকের উপর অত্যাচার চলে। কিছু কিছু লোকের ধন-জন-প্রাণ হরণ করা হয় (যেমনটি নিয়ম ও প্রয়োজন)। তারপর রাজত্ব স্থায়ী করার গরজেই শাসিতদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা দানে শাসকবর্গ বাধ্য হয়। এবং যেহেতু দেড় শ' বছর ধরে গৌড় সিংহাসনের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা ছিল না, মসনদ নিয়ে নিত্য কাড়াকাড়ির আশঙ্কা থাকত, সেহেতু সিংহাসনাভিলাষীরা সামন্ত, সর্দার ও ভূঁইয়াদের স্বপক্ষে টানবার জন্যে সুশাসন চালাবার চেষ্টা করতেন [যেমন মন্ত্রী হিসেবে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ করেছিলেন।] এবং সে সূত্রে সুশাসনের নামে বেশ কিছুটা অতিরিক্ত উদারতা ও সদাশয়তা দেখাতেন এবং জনপ্রিয়তার জন্যে জনগণকে প্রশ্রয় দিতেন। এ-ও অনুমান করা যায় যে, তাঁরা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবার গরজে প্রজাদের গোড়ার দিকে করভারে পীড়া দিয়েছেন। ইংরেজদের যেমন দেখেছি, তেমনি মুসলমানেরাও উত্তম্মন্যতা (Superiority complex) নিয়ে চলত, আর শাসিতদের অবজ্ঞা ও অনুকম্পা দেখাত; নির্বোধ ও সাধারণ মুসলমানেরা সে-অবজ্ঞা কথায় ও আচরণে প্রকাশ করত। [কীর্তিলতা[১] ও চৈতন্যমঙ্গলে যেমন দেখা যায়] এজন্যে হিন্দুর

১. বিক্ষুব্ধচিত্ত হিন্দুর কাছে নির্যাতন মনে হয়েছে বটে, আসলে কীর্তিলতায় বর্ণিত 'তুর্কীর হিন্দু নির্যাতনের' চিত্রটি অশিক্ষিত নির্বোধ মুসলমানের রসিকতা ছাড়া কিছুই নয়। সেকালীন স্থূল রসিকতা ও বিদ্রূপের ধরনই ছিল ঐরূপ। 'ফোট চাট জনউ তোড়। উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়।।—এ নির্যাতন নয়—রসিকতার বিকৃত ধরন। এতে কবিজনোচিত অত্যুক্তিও আছে। যেমন:—

গোরি গোমঠ পুরলি মহী।
পদরুহ দেবাক ধাম নহী।।—

মিথিলার হিন্দু রাজার প্রসাদপুষ্ট বিদ্যাপতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা এ নয়—কল্পিতচিত্র মাত্র।

মনেও ক্ষোভ ছিল (যেমন মধ্যযুগের হিন্দুরচিত নানা গ্রন্থে মুসলমানদের প্রতি বিরূপতা দেখা যায়; ব্রিটিশ আমলের দেশীয় সাহিত্যে যেমন ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকট)। এ-জন্যে সময় ও সুযোগমত তারা তিলকে তাল করে রটিয়ে দিত। (কয়েক বছর আগে যেমন পাকিস্তানে হিন্দু-নারী হরণের ও হিন্দুর উপর নানা লঘু-গুরু অত্যাচারের অলীক সংবাদ কলকাতায় শোনা যেত)। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক বিজাতির ও বিদেশীর হলে এমনটিই হয়, না হয়ে পারে না। শাসকের দোষ খোঁজার ও দেখার জন্যে এবং ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগের জন্যে এমনি অবস্থায় মনটি তৈরী হয়েই থাকে। (গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধীদলের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।) ঐতিহাসিকের কর্তব্য সব কথা আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস না করে সত্য ও সারটুকু ছেঁকে নেয়া। আর অদ্ভুত ও অসম্ভব কথা এ-যুগেও রটে—সুতরাং সে-যুগে নানা কারণে এর বাহুল্য যে ছিল এবং অজ্ঞতার সুযোগে এবং যাচাই করবার উপায়ের অভাবে সেগুলো যে সহজে বিশ্বাস্য হত তা না বললেও চলে। আজকের মতোই ভালয়-মন্দয় শাসনকার্য চলত, মাঝে মাঝে অমানুষ শাসকের হাতে পড়লে তার ব্যতিক্রম ঘটত—আজও যেমন ঘটে। এজন্যে মানুষের ভাব-চিন্তা কিংবা আনন্দ-উৎসব বন্ধ থাকে নি—থাকে না। তবে অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশে তার উৎকর্ষ-অপকর্ষ ঘটে। তাও এসব বাধার যা-কিছু গুরুত্ব সাধারণের কাছেই—প্রতিভাধরের কাছে কখনোই নয়। তার প্রমাণ বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য।

এবার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কথায় আসা যাক। চর্যাগীতি যে বাঙলা, এ বিশ্বাস থেকেই বাঙলা সাহিত্যের 'তামস-যুগ' তত্ত্বের উদ্ভব। অথচ চর্যাগীতি যে প্রাচীন বাঙলা তা' আজো সর্বজন-স্বীকৃত সত্য নয়। হিন্দি, মৈথিল, উড়িয়া, অসমীয়াও এর দাবীদার। ডক্টর শহীদুল্লাহ্, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ বাঙালী বিদ্বানেরাও ওদের দাবীর আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১] সব সিদ্ধার বাড়ি বাঙলায় নয়, বাঙলা তখনো শালীন ও লেখ্য

১. ক. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪; বাঙ্গালা প্রভৃতি নবীন আর্যভাষা দশম শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে প্রাদেশিক রূপলাভ করিতে থাকিলেও সামনে কোন আদর্শ ছিল না বলে তা সাহিত্যে সদ্য সদ্য গৃহীত হয় নাই। তবু কথ্যভাষার পদ ও বাক্রীতি সমসাময়িক অবহট্ট রচনার মধ্যে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং কালানুক্রম ও বিষয় ধরিয়া নয়, ভাষা ধরিয়া এই সময়ে অর্থাৎ দশম হতে চতুর্দশ শতাব্দের অবহট্ট সাহিত্যকে নবীন আর্যভাষার সাহিত্যের উপক্রম-পর্ব বলিয়া গ্রহণ না করায় ইহা তাই উপেক্ষিত হয়। বাঃ সাঃ ইঃ ১ম পূর্বার্ধ সুকুমার সেন, পৃঃ ৪৬।

সাহিত্যের ভাষা নয়, আঞ্চলিক বুলি মাত্র। কাজেই উড়িষ্যার, মিথিলার কিংবা আসামের লোকের বাঙলা পদ রচনা করার তখনো সাধ-সাধ্য থাকার কথা নয়। অতএব সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, চর্যাপদ অর্বাচীন প্রাচ্য (গৌড়ী?) অবহট্‌ঠে রচিত। সে সময় আঞ্চলিক বিকৃতিজাত সামান্য প্রভেদ থাকলেও উড়িয়া-বিহারী-বাঙলা ও আসামী অবহট্‌ঠ মোটামুটি অভিন্ন ছিল। নাথ ও সহজিয়া পন্থের অন্যতম প্রসারক্ষেত্র চন্দ্ররাজদের রাজ্য পূর্ববঙ্গ। কাজেই মানিক চাঁদ-ময়নামতী-গোপীচাঁদের দেশে (আধুনিক কুমিল্লাদি জেলায়) বহুল চর্চার ফলে [নেপালেও চর্যাগীতি সম্ভবত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশাদি পূর্ব বাঙলার লোকেরাই নিয়ে যান] চর্যাগীতিতে বঙ্গ-গৌড়ীয় বিকৃতি এসেছে। এতেই বাঙলার দাবী জোরালো হয়েছে। মুনিদত্তের টীকাযুক্ত চর্যাগীতি নেপালে বঙ্গাক্ষরে [নেওয়ারী হরফে?] লিখিত পুঁথিতেই পাওয়া গেছে। বিদেশে বিভাষীর পক্ষে ভিন্ন ভাষায় অলিখিত শাস্ত্রচর্চা সম্ভব নয়। কাজেই চর্যাগীতি নেপালে স্বাভাবিকভাবেই লিখিত ও টীকা সম্বলিত হয়েছে। কিন্তু আসাম-বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যাতেও তার লেখ্যরূপ ছিল বলে মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই। নাথ-সহজিয়া পন্থ যোগ-তান্ত্রিক বজ্রযান বৌদ্ধদের বিকৃত উপশাখা। কাজেই উপসম্প্রদায়ের লোক সংখ্যায় বেশী ছিল না এবং তারা স্বাভাবিক সামাজিক জীবন যাপন করে নি। অতএব সেকালের বাঙালী-বিহারী-আসামী-উড়িয়া সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বের দাবী বা যোগ্যতা এদের ছিল না। সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পাল আমলের মধ্যকাল থেকেই সংস্কৃত চর্চা করত। কারণ শাস্ত্র চর্চার ও শাসন পরিচালনের বাহন ছিল সংস্কৃত। তাই প্রাচ্য অবহট্‌ঠেরও লেখ্যরূপ মিলে না। গৌড়ী-মাগধী অবহট্‌ঠেই যদি লেখার রেওয়াজ না থাকে, তা হলে তখনো নিতান্ত অবজ্ঞেয় আঞ্চলিক মুখের বুলি আসামী-বাঙলা-উড়িয়া-বিহারীতেই বা লেখ্য রচনার সম্ভাব্যতা কোথায়? কাজেই এ দেশে চর্যাগীতির কোন লেখ্যরূপ ছিল না এবং এ-গুলো মুখে মুখে রচিত ও গীত লোকসাহিত্য বা লোকায়ত

• "চর্যাগীতিগুলি" প্রাচীন বাংলায় লেখা হলেও এতে অবহট্‌টের ছাপ ও ছাঁদ খাটায়... কোন কোন বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ধরলে চর্যাগীতির ভাষাকে প্রাচীন উড়িয়া বা প্রাচীন অসমীয়া বললেও অন্যায় হয় না, পৃঃ ৬০। খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১।২, পৃঃ ৬৭—৭৭; গ. চর্যাগীতি পদাবলী; পৃঃ ৩৯; ঘ. ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৯৫ (৪র্থ সং); ঙ. উড়িয়া সাহিত্য—প্রিয়রঞ্জন সেন, পৃঃ ৮; চ. বিজয় চন্দ্র মজুমদার—The History of the Bengali Language.

শাস্ত্ররূপেই চালু ছিল বলে আমাদের ধারণা। অতএব, আমাদের অনুমান এই যে, চর্যাগীতি লিখিত রচনাও নয়, বাঙলাও নয়—শৌরসেনী প্রভাবিত অর্বাচীন গৌড়ী-মাগধী অবহট্‌ঠ এবং মৌখিক রচনা। ডক্টর সুকুমার সেনও বলেছেন "অসমীয়া ভাষী-দের দাবী অযৌক্তিক নয়, কেন না ষোড়শ শতাব্দী অবধি (বাঙলা ও অসমীয়া) দুই ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিল না"[১] এবং "উড়িয়া-আসামীদের সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আদিতে এই তিনটি একই ভাষা ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে মূল ধারা হইতে উড়িয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।"[২] কাজেই ভাষার এক সাধারণ স্তর থেকে বাঙলা, উড়িয়া, মৈথিল অসমীয়ার উদ্ভব। ডক্টর সুকুমার সেন এর নাম দিয়েছেন, প্রত্ন-বাঙ্গালা-অসমীয়া উড়িয়া।[৩] এই সাধারণ স্তর আমাদের ধারণায় অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বা আধুনিক ভাষাগুলোর লক্ষণ স্ফুটন-কালীন অবহট্‌ঠ। অতএব, চর্যাগীতি কেবল বাঙলার নয়, উক্ত অপর ভাষা-গুলোরও সাধারণ ঐতিহ্য এবং এর ভাষা আলোচ্য সব কয়টি ভাষার জননী। ভারতের সর্বত্র প্রচার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত ও পণ্ডিতদের জন্যে যাঁরা সংস্কৃতে তত্ত্বগ্রন্থ ও ভাষ্য রচনা করেছেন এবং সাধারণ সাক্ষর লোকের জন্যে শালীন ও লেখ্য শৌরসেনী অবহট্‌ঠে যাঁরা দোহা রচনা করেছেন, তাঁরাই পূর্বাঞ্চলের বুলিঘেঁষা রীতিতে গণবোধ্য চর্যাগীতি রচনা করেছেন তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে।

ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজাশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোন বুলিই লেখ্য সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদি যুগে সংস্কৃতই ছিল ভারতের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভাব-বিনিময়ের বাহন। তাই কোন আর্য-ভাবতিক আঞ্চলিক বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা কিংবা শালীন সাহিত্যের বাহন হবার সুযোগ পায় নি। বৌদ্ধ ও জৈন মত প্রচারের বাহনরূপেই প্রথম দুটো বুলি—পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেক কাল রাষ্ট্র শাসনের কিংবা ধর্ম-প্রচারের কাজে লাগে নি বলে কোন বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা পায় নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠী ও মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত রাজাদের প্রতিপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ভাষার রূপ পায়। তাই ঐ শালীন দরবারী ভাষা শৌরসেনী

১. চর্যাগীতি পদাবলীর—পৃঃ ৩৯।
২. ভাষার ইতিবৃত্তঃ ৪র্থ সং : পৃঃ ৯৫।
১-২. ডঃ শহীদুল্লাহ ও ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ও এ মত পোষণ করেন।
৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পূর্বার্ধ : পৃঃ ১।

অবহট্‌ঠ প্রাচ্য অঞ্চলের লিখিয়েদেরও আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে একই কারণে উত্তর ভারতীয় ভাষা অনুকৃত হয়ে 'ব্রজবুলি' সৃষ্ট হয়।

এর পরে তুর্কী আমলে ফারসী হল দরবারী ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাব-বিপ্লব এল, বিশেষ করে তারই ফলে আধুনিক ভারতিক আর্য ভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। এ ক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এ-ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্দর, নানক, কবীর, দাদু, একলব্য, রামদাস, চৈতন্য, রজ্জব প্রভৃতি সন্তগণের দান মুখ্য ও অপরিমেয়। তুর্কী বিজয়ের ফলে ও তাদের প্রভাবে ব্রিটিশ বিজয়ের মতোই মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, আর্থিক, শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক উপপ্লব-বিপ্লব-রূপান্তর লঘু-গুরুভাবে নিশ্চয়ই ঘটেছিল। শহুরে দেশীয় লোকদের আচারে-আচরণে, বসনে-ভূষণে, মনে-মতে, চিন্তায়-চেতনায়, আসবাবে-তৈজসে, ভাষায়-সাহিত্যে, চিত্রে-সঙ্গীতে, স্থাপত্যে ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইংরেজ আমলের মতোই শাসক গোষ্ঠীর অমোঘ প্রভাব প্রকট হয়ে উঠছিল।

এদিক দিয়ে পূর্বী বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেয়ে ভাল। এ সব বুলি যখন সৃজ্যমান তখন এদের জননী অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের যোগ-তন্ত্র ও শৈবমত-প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন-ভজনের মাধ্যম হবার সুযোগ পায়—যার ফলে আধুনিক আর্য ভাষার (অবহট্‌ঠ থেকে ভাষাগুলোর সৃষ্টিকালের বা দুই স্তরের অন্তর্বর্তীকালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শন-স্বরূপ চর্যাগীতি-গুলো পেয়েছি।

তুর্কী আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হল। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল বৈষ্ণবমত ও দেব পাঁচালী। পরবর্তীকালে খ্রীস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের, হিন্দু সমাজ সংস্কারের এবং কোম্পানীর শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এ সব আকস্মিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করে নি, কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজীর চাপে পড়ে বাঙলা কোন দিন জাতীয় ভাষা বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায় নি। আজ অবধি বাঙলা একরকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পুষ্ট।

শিক্ষার, সাহিত্যের ও দরবারের ভাষা শিক্ষিত লোকের ভাষা। সেকালে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কাজেই প্রাকৃতজন তাদের ভাব-ভাবনা ও অনুভূতি-উপলব্ধি প্রকাশ করত নিজেদের মুখের বুলিতেই। এভাবে তারা গান,

গাথা, ছড়া, বচন ও রূপকথা-রসবার্তা তৈরী করে মুখে মুখে প্রচার করতে থাকে। বহু মুখের স্পর্শে ওগুলো রূপ ও রস বদলায়, ফলে ও-গুলোকে ব্যক্তিক রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় না। তাই আজকাল এ সাহিত্যকে গণরচনা বলে নির্দেশ করা হয়। আমাদের আধুনিক সংজ্ঞায় এগুলোই লোক-সাহিত্য বা পল্লী-সাহিত্য। আঞ্চলিক বুলিতে রচিত বলে লোক-সাহিত্য সাধারণত অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে দেশময় ব্যাপ্ত হতে পারত না। পল্লী-সাহিত্য সাহিত্য-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস-প্রসূত নয়। তবু মানব মনের কোমল অনুভূতির আন্তরিক প্রকাশ বলেই এগুলো সুন্দর এবং স্থানে স্থানে শিল্পগুণে মণ্ডিত। মুখের বুলির পষ্টি ও বিকাশ হয়েছে প্রাকৃতজনের রচনা লোক-সাহিত্যের মাধ্যমেই। বাঙলা লোক-সাহিত্যের আদি নিদর্শন হচ্ছে ডাক ও খনার বচন, ছড়া, প্রবাদ, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা যোগিপাল-ভোগিপাল মহীপাল গীত (অপ্রাপ্য), ময়নামতী-গোপীচাঁদ-মানিকচাঁদ গীত, মীননাথ-গোর্খনাথ-হাড়িপা-কাহিনী; শিবের ছড়া, রাধাকৃষ্ণ ধামালী, রাম পাঁচালী, ভারত কথা প্রভৃতি। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাহিনীগুলো রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও মঙ্গল কাব্যাদিতে পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ বিলুপ্তির, ফলে বৌদ্ধ কাহিনী ময়নামতী-গোপীচাঁদ কথা গাথা রূপেই রয়ে গেছে, এবং পাল গীতি লোপ পেয়েছে।

অন্যান্য দেশের বুলি যেমন ধর্মমত প্রচারের বাহন বা রাজ্য শাসনের মাধ্যম কিংবা প্রাকৃতজনের রচনার অবলম্বন হয়ে ক্রমে সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত হয়েছে, বাঙলার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এখানে বলে রাখা ভাল, বাঙলার সুলতান-সুবেদারেরাও শাসিতদের জানবার ও শাসন পরিচালনার গরজেই বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পোষকতা করেন। লেখ্য ভাষা বইপত্র ছাড়া শেখা যায় না, কাজেই গ্রন্থ লিখিয়ে নিতে হল—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যেমনটি হয়েছিল। আর ভাষার বুনিয়াদ দ্রুত গড়ে ওঠে এবং ভাষা পুষ্টি লাভ করে অনুবাদের মাধ্যমে। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি।

অতএব, আলোচ্য দু'শ' বছরের মধ্যেকার বাঙলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন না মেলার আমাদের অনুমিত কারণ এই:

ক. ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্য শাসনের বাহন হয় নি বলে বাঙলা তুর্কী বিজয়ের পূর্বে লেখ্য ভাষার মর্যাদা পায় নি।

খ. ফলে, তেরো-চৌদ্দ শতক অবধি বাঙলা ভাষা উচ্চবিত্তের লোকের সাহিত্য রচনার যোগ্য হয়ে উঠে নি। এ সময় প্রাকৃতজনের মুখে মুখে গান, গাথা ও ছড়া-পাঁচালীই চলত।[১]

গ. সংস্কৃতেতর কোন ভাষাতেই রস-সাহিত্য চৌদ্দ শতকের পূর্বে রচিত হয় নি। ভাষাকে লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহন রূপেই প্রাকৃতজনেরা গ্রহণ করে। সাহিত্যের ভাষা তখনো সংস্কৃত, প্রাকৃত বা শৌরসেনী অবহট্ঠই ছিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ভাষায় রচন, পঠন ও শ্রবণ ছিল নিষিদ্ধ। সংস্কৃতের মাধ্যমে বৌদ্ধ শাস্ত্রেরও চর্চা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর অপরিণত বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির কল্পনা ও সম্ভাব্যতা কোন উচ্চ শিক্ষিত লোকের মনে জাগে নি। পাল ও সেন আমলে সংস্কৃত চর্চা হয়েছে এবং তুর্কী বিজয়ের পর প্রাকৃতজনেরা প্রশ্রয় পেয়ে বাঙলা রচনা করেছে মুখে মুখে। তাই লিখিত সাহিত্য অনেককাল গড়ে উঠে নি। কিন্তু এতে ভাষা বিকশিত হয়েছে; তার প্রমাণ মেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে (তথা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে)। এ গ্রন্থেই দেখা যায়, ইতিমধ্যে এক ডজন ফারসী-তুর্কী শব্দ বাঙলা সাহিত্যের ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে।

ঘ. তেরো-চৌদ্দ শতকে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ছিল হিন্দু-শাসিত মিথিলায়, তাই এ সময় বাঙলা দেশে সংস্কৃত চর্চা বিশেষ হয় নি, কেবল কিছু কিছু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুশীলন হয়েছিল। মিথিলার পণ্ডিত চক্রায়ুধের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ

---

১. ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে, দুই-চারিটি ছড়া এবং এক আধটি গান ছাড়া এমন কিছু কালের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। বড়ুগোছের কোন রচনা এ সময়ে লেখা হইয়া থাকিলে তাহার স্মৃতিরেশও বোধ করি থাকিয়া যাইত। তবে পরবর্তী কালের সাহিত্যের গঠন ও প্রকৃতি বিচার করিয়া বলিতে পারি যে এই সময়ে মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামায়ণ কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোট বড় গানে অথবা পাঁচালীতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষ্যে দেবমন্দিরে। অধ্যাত্মভাবনা ও ধর্মানুষ্ঠানের সহিত সম্পৃক্ত নয়, সম্পূর্ণরূপে লোকায়তিক (Secular) এমন ছড়া ও গানও এই সময়ে চলিত ছিল, —এই অনুমান করিবার কারণ আছে।" [—বাঃ সাঃ ইং, পৃঃ ১।৩ পূর্বার্ধ। পৃঃ ৭৭—৭৮।]

সমগ্র উত্তরাপথে শিষ্ট জীবনের ও সাহিত্যের একটি মাত্র আদর্শ ছিল। সে সংস্কৃত শাস্ত্রের ও সাহিত্যের আদর্শ। [ঐ পৃঃ ৮০] খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ অবধি যাঁহাদের হাতে শিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি নির্ভর করিত, তাঁহারা ছিলেন প্রধানভাবে সংস্কৃত শাস্ত্র-সংস্কৃতি সম্পন্ন। ব্রাহ্মণ্যপন্থী হোন অথবা বৌদ্ধতান্ত্রিক মতাবলম্বী হোন, তখন যাঁহারা সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তাঁহারা উচ্চস্তরের ব্যক্তি—রাজসভাসদ অথবা সমাজপতি। [ঐ পৃঃ ৭৬।]

সংস্কৃত চর্চার তথা শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠে। তার আগে হয়তো রাজধানী গৌড়েই মিলত প্রখ্যাত পণ্ডিত।

ঙ. তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করা যায় যে, আলোচ্য যুগে বাঙলায় কিছু কিছু পুথিপত্র রচিত হয়েছিল, তা হলেও জনপ্রিয়তার অভাবে, ভাষার বিবর্তনে এবং অনুলিপি করণের গরজ ও আগ্রহের অভাবে তা নষ্ট হয়েছে। যত্ন করে রক্ষা না করলে অপ্রিয় বা বাজে ছাপা বইও লোপ পায়। আগুন-পানি-উই-কীট তো রয়েইছে। কিন্তু এ-যুগে যে ভাষায় কিছু লিখবার রীতি ছিলনা, তার বড় প্রমাণ, পনেরো শতকের শেষাবধি নানা মঙ্গল গীত, রামায়ণ গান, ভারত পাঁচালী এবং বিশ শতকেও পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ময়নামতী গানের লিখিত-রূপ পাওয়া যায় নি অথচ এগুলো সুপ্রাচীন।

চ আবার লিখিত হলেও কালে লুপ্ত হওয়ার বড় প্রমাণ চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), শেখ শুভোদয়া প্রভৃতির একাধিক পাণ্ডুলিপির অভাব।

ছ. চর্যাগীতি রচনার শেষ সীমা যদি বারো শতক হয়, তা হলে তেরো চৌদ্দ শতক বাঙলা ভাষার গঠন যুগ তথা স্বরূপ প্রাপ্তির যুগ। কাজেই এ সময়কার কোন লিখিত রচনা না থাকারই কথা। চর্যাগীতি ছাড়াও বারো শতকের বাঙলা-ঘেঁষা রচনার নমুনা মেলে 'শেখ শুভোদয়ার' আর্যায় ও প্রাকৃত পৈঙ্গলের কোন কোন পদে। বাঙলা তুখন সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে, লক্ষ্মণ সেনের সভায় আমরা বাঙলা কবিও দেখতে পেতাম। এবং পূর্ববঙ্গ ও রাঢ়ের মত হিন্দু শাসিত অঞ্চলে তেরো শতকে লিখিত বাঙলা রচনার নিদর্শন পাওয়া যেত। বাঙলা পদের সংকলন গ্রন্থও মিলত।

জ. দেশজ মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাঙলা। বাঙলায় লেখ্য রচনার রেওয়াজ থাকলে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বের বা পরের মুসলমানের রচনা নষ্ট হবার কারণ ছিল না। এবং মুসলিম বিজয়ে বা শাসনে তাদের রচনার ধারাবাহিকতা ছিন্ন হওয়ার কারণ ঘটে নি। কেবল তাই নয়, বাঙলা লেখ্য ভাষা হলে গৌড়-সুলতানের দরবারে রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে গৌড়া থেকেই অন্তত বাঙলা ফরমান লিখিয়ে মুসলমান পাওয়া যেত। অথচ গোড়া থেকেই উপদেষ্টা রাজপণ্ডিত ছিল। তা ছাড়া আমরা জানি, দেশ জাত ধর্ম উপেক্ষা করে, ব্যক্তিগত স্বার্থে ও আত্মোন্নয়ন লক্ষ্যে কিছু লোক চিরকালই দেশ ও জাতির শত্রুর সঙ্গে—বিদেশী বিজাতি শাসকের সঙ্গে জুটে যায়—সেসব মানুষ থাকে কৃপাপুষ্ট। দেশে বাঙলায় রচনার রেওয়াজ থাকলে, তাদের কেউকেউ তেরো চৌদ্দ শতকে কিছু রচনা করতেন এবং তার উল্লেখ অন্তত

পেতাম। হিন্দুরা যে অশ্রদ্ধাবশত বাঙলায় কখনো সাহিত্য সৃষ্টি করতে চায় নি, লৌকিক দেবতার পূজা প্রচার প্রয়াসীই ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে আঠারো শতক অবধি লিখিত হিন্দুর রচনায়।

বিদেশী বিভাষী বিজাতি বিধর্মী ঘাড়ে চেপে বসবে, ভাতে ও ভিটেতে ভাগ বসাবে, আর দেশী লোকেরা তাদের সাদরে আত্মীয় রূপে বরণ করে নেবে, এমন অসম্ভব আশা নিশ্চয়ই কেউ করে না।

কাজেই পরাধীনতার ক্ষোভ ও গ্লানি হিন্দু মনে অবশ্যই ছিল। তেমন অবস্থায়ও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে, তার সাক্ষ্য রয়েছে উনিশ-বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যে চার শ' বছরেও আশানুরূপ উন্নতি ও বিকাশ হয় নি, বাঙলা দরবারী কিংবা জাতীয় ভাষার মর্যাদা পায় নি বলেই।

অতএব, আমাদের অনুমান এই যে বাঙলা বারো, তেরো ও চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ অবধি লেখ্যভাষার স্তরে উন্নীত হয় নি। এটি হচ্ছে বাঙলার স্বাকার প্রাপ্তির কাল ও মৌখিক রচনার যুগ।

৭

বাঙলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ

[ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোনো বুলিই লেখ্য সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদি যুগে সংস্কৃতই ছিল ভারতের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের ভাব-বিনিময়ের বাহন। বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারের বাহনরূপেই প্রথম দুটো বুলি—পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেককাল রাষ্ট্র-শাসন কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগে নি বলে আর কোনো বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা পায় নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠী ও মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত রাজাদের প্রতিপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ভাষার রূপ পায়।

এরপরে তুর্কী আমলে ফারসী হল দরবারী ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাব-বিপ্লব এল; বিশেষ করে তারই ফলে আধুনিক পাক-ভারতিক আর্যভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের

ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এ ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্দর, নানক, কবীর, দাদু, একলব্য, রামদাস, চৈতন্য, রজব, শঙ্করদেব, মীরাবাঈ প্রভৃতি সন্তগণের দান মুখ্য ও অপরিমেয়।

এদিক দিয়ে পূর্বী বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেয়ে ভাল। এ সব বুলি যখন সৃজ্যমান, তখন এদের জননী অবাচীন অবহট্‌ঠ বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের যোগ-তন্ত্র-শৈবমত প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন-ভজনের মাধ্যম হবার সুযোগ পায়—যার ফলে আধুনিক আর্য ভাষার (অবহট্‌ঠ থেকে ভাষাগুলোর সৃষ্টিকালের বা দুই স্তরের অন্তর্বর্তীকালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শন স্বরূপ চর্যাগীতিগুলো পেয়েছি।

তুর্কী আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হল। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল চৈতন্য প্রবর্তিত মত। আবার আঠারো-উনিশ শতকে খ্রীস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের, হিন্দুসমাজ সংস্কারের এবং কোম্পানীর শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এসব আকস্মিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীন বিকাশ লাভ করে নি; কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজীর চাপে পড়ে বাঙলা কোনোদিন জাতীয় ভাষার বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায় নি। আজ অবধি বাঙলা এক রকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পুষ্ট।]

হয়তো দেশশাসনের প্রয়োজনেই দেশী ভাষার অনুশীলনে প্রবর্তনা দিয়েছিলেন সুলতান-সুবাদারগণ। যেমনটি ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজে দেখেছি পরবর্তীকালে। কিন্তু সুলতান সুবাদারের প্রবর্তনা সত্ত্বেও সাধারণভাবে অনেক কাল অভিজাতরা বাঙলা ভাষার প্রতি বিরূপ ছিল। হয়তো 'বুলি' বলেই এ অবজ্ঞা। ফলে উনিশ শতকের আগে বাঙলা কোনো দিন শক্তিমানের পরিচর্যা পায় নি। তাই অন্তত দশ শতক থেকে বাঙলা ভাষায় লৌকিক সৃষ্টিকর্ম শুরু হলেও তা সময়ের অনুপাতে অগ্রসর হতে পারে নি। শেক্সপীয়র যখন তাঁর অমর নাটকগুলো রচনা করছিলেন, তখন আমাদের ভাষায় মুকুন্দরাম ও সৈয়দ সুলতানই শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রতিভার অভাব হেতুই আমাদের হিন্দু-মুসলমানের রচনা পুচ্ছগ্রাহিতায় তুচ্ছ।

মধ্যযুগে হিন্দুরা বাঙলাকে ধর্মকথা তথা রামায়ণ-মহাভারত-ভাবগত ও লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহনরূপেই কেবল ব্যবহার করতেন। মালাধর বসুর কথায়—'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার। পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব-সংসার'—এ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অতএব, তাঁরা গরজে পড়ে ধর্মীয় প্রচার-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্য-শিল্প গড়ে তুলবার প্রয়াসী হন নি। দেবতার

মাহাত্ম্যকথা জনপ্রিয় করবার জন্যেই তাঁরা প্রণয়-বিরহ কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন, এবং এতে সাহিত্য-শিল্প যা' গড়ে উঠেছে তথা সাহিত্যরস যা' জমে উঠেছে, তা' আনুষঙ্গিক ও আকস্মিক, উদ্দিষ্ট নয়। কাজেই বলতে হয় মধ্যযুগে হিন্দুদের বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না। লৌকিক ধর্মের প্রচারই লক্ষ্য ছিল। এর এক কারণ এ হতে পারে যে, শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত। কাজেই শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করত। তাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টির গরজ কেউ অনুভব করেন নি। তাঁরা অশিক্ষিতদেরকে ধর্মকথা শোনানোর জন্যে ধর্ম-সংপৃক্ত পাঁচালী রচনা করতেন। তাতে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের অনুসৃতি ছিল। পরে সংস্কৃতের প্রভাব কমে গেলেও এবং বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পেলেও পূর্বেকার রীতির বদল হয় নি আঠারো শতক অবধি। আঠারো শতকেই আমরা কয়েকজন হিন্দু প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি।

বাঙলাদেশের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান। তাই বাঙলা সাহিত্যের উন্মেষ যুগে সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষণ পেয়ে কেবল হিন্দুরাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, মুসলমানরাও তাঁদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন। এবং মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, দেব-ধর্ম প্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্যে তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য পেয়েছি তাঁদের হাতেই। কাব্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যদানের গৌরবও তাঁদেরই। কেন না, সব রকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনার অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা এই মানব-রসাশ্রিত সাহিত্যধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের একই সূত্রে এবং একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও স্বীকরণে তাদের সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে ছয় শ' বছরেও তা' পুরো সম্ভব হয় নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন, হিন্দু লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতি-মানব জগতের মোহমুক্ত হ'তে পারেন নি। যদিও এই দেবভাব একান্তই পার্থিব জীবন ও জীবিকা সংপৃক্ত।

মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা—যা মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই নির্দেশ করে। বাহুবল, মনোবল আর বিলাস-বাঞ্ছাই সে-জীবনের আদর্শ। সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে-জীবনের ব্রত

এবং ভোগই লক্ষ্য। এক কথায়, সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে অভিব্যক্ত।

ভারতে মুসলমান অধিকার যেমন ইরানী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশ-বাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এরূপে বাঙালীরা ইরানী ও হিন্দুস্থানী ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এ-দুটোর আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়েছে।

অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের প্রায় সব রচনাই (বৈষ্ণবসাহিত্যও) মূলত অনুবাদ ও অনুকৃতি এবং মুখ্যত পৌনপুনিকতা দুষ্ট। মৌলিক রচনা দুর্লক্ষ্য। এর কারণ প্রতিভাধর কেউ সাধারণত বাংলা রচনায় হাত দেন নি, অর্থাৎ সংস্কৃতে কিংবা ফারসীতে লিখবার যোগ্যতা যাঁর ছিল, তিনি বাঙলায় সাধারণত লেখেন নি। বাঙলা তখনো তাঁদের চোখে বুলি মাত্র। এ-যুগে শিক্ষিতজন যেমন লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে কিংবা পাঠে বিমুখ, সে যুগে তেমনি তাঁরা বাঙলা ভাষার ও বাঙলা রচনার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাচ্ছিল্যজাত এ অবহেলা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ মন্থর করেছিল। বাঙলার প্রতি ইংরেজী শিক্ষিত জনেরও এমনি অবজ্ঞা ছিল উনিশ শতকে। তাই ঈশ্বরগুপ্ত গভীর ক্ষোভে বলেছেন: 'হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ/দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ। অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে/কোন মতে কেহ নাহি সমাদর করে।'

এ ছাড়াও আর দুটো প্রবল কারণ ছিল: ক. সেন রাজারা বাঙলায় উত্তর ভারতিক ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্কৃতি গঠনে তৎপর ছিলেন। পাছে দেশী সংস্কৃতি স্বজ্যমান ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে বিকৃত করে, সম্ভবত এই আশঙ্কায় শূদ্রের শিক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন, এভাবে দেশী লোককে মূর্খ রেখে দেশের ভাষাচর্চার পথ রুদ্ধ রেখেছিলেন তাঁরা। আর তখন বস্তুত অবহট্‌ঠের যুগ। তাই অবহট্‌ঠের যুগে সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহ দান করা রাজকীয় ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খ. অপরদিকে দেবভাষা সংস্কৃত ও স্বর্গীয় ভাষা আরবী থেকে শাস্ত্রানুবাদ পাপকর্ম বলে গণ্য হত, ভাষান্তরিত হলে মন্ত্রের বা আয়াতের মহিমা ও পবিত্রতা নষ্ট হবে—এ ধারণা আজো প্রবল। মুসলমানদের অতিরিক্ত একটা বাধা ছিল, তারা বাঙলাকে হিন্দুয়ানী ভাষা [১৫-১৬ শতকে হিন্দুস্তানী অর্থে এবং পরে হিন্দুর ভাষা অর্থে।] বলে জানত। এদিকে বিজাতি-বিধর্মী রাজাদের সমর্থন ছিল বলে ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব হয় নি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সমাজ নৈতিক প্রতিরোধের দ্বারা বাঙলা চর্চা ব্যাহত করবার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁরা পাঁতি দিলেন:

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

আঠারো শতক অবধি এ বিরূপতা যে ছিল, তার প্রমাণ মিলে অবজ্ঞাসূচক একটি বাঙলা ছড়ায়। এতে কাশীরাম দাসের নাম রয়েছে:

কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুন-ঘেঁষে
—এ তিন সর্বনেশে।

শাস্ত্রকথার বাঙলা তর্জমার প্রতিবাদে মুসলমান সমাজও সতেরো শতক অবধি মুখর ছিল, তার আভাস রয়েছে বিভিন্ন কবির কৈফিয়তের স্বরে। এঁদের কেউ কেউ তীব্র প্রতিবাদীও:

শাহ মহম্মদ সগীর (১৩৮৯—১৪১০ খ্রীস্টাব্দে) বলেন:

নানা কাব্য-কথা-রসে মজে নরগণ
যার যেই শ্রধাএ সন্তোষ করে মন।
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়
দুষিব সকল তাক ইহ না জুয়ায়।
গুনিয়া দেখিলুঁ আম্মি ইহ ভয় মিছা
না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা।

সৈয়দ সুলতান [১৫৮৪ খ্রী:] বলেছেন:

কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।
ফলে, আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা।
কিন্তু যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষ হয় তার অমূল্য রতন।
তবু যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে।
পঞ্চালি-রচিলুঁ করি আছেত দুষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেতে পড়ি
কিতাবের কথা দিলুঁ হিন্দুয়ানি করি।
অবশ্য, মোহোর মনের ভাব জানে করতারে
যথেক মনের কথা কহিমু কাহারে।

আমাদের হাজী মুহম্মদও [ষোল শতক] নিঃসংশয় নন, তাই তিনি দ্বিধা মুক্ত হতে পারেন নি:

যে-কিছু করিছে মানা না করিঅ তারে
ফরমান না মানিলে আজাব আখেরে।
হিন্দুয়ানি লেখা তারে না পারি লিখিতে
কিঞ্চিৎ কহিলুঁ কিছু লোকে জ্ঞান পাইতে।

মনের দিক দিয়ে নিঃসংশয় না হলেও যৌক্তিক বিচারে এতে পাপের কিছু নেই বলেই কবির বিশ্বাস। তাই তিনি পাঠক সাধারণকে বলছেন:

হিন্দুয়ানী অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা
বাঙ্গালা অক্ষর 'পরে 'আল্লি' মহাধন
তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ।
সে-আল্লি পীর সবে করিছে বাখান
কিঞ্চিৎ যে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ।
যেন তেন মতে যে জানৌক রাত্র দিন
দেশী ভাষা দেখি মনে না করিও ঘীণ।

নীতিশাস্ত্রবার্তার কবি মুজাম্মিলও (ষোল শতক) বলেন:

১. আরবীর ভাষে লোকে না বুঝে কারণ
দেশী ভাষে কৈলুঁ তবে পয়ার বচন।
যে বলে বলৌক লোকে কারলুঁ লিখন
ভালে ভাল মন্দে মন্দ না যাএ খণ্ডন।

২. আরবী বচন/বঙ্গদেশীগণ/সবে না বুঝে বিশেষ
নিজ দেশ 'বুলি'/ভণিলুঁ পঞ্চালি/লেখিলুঁ হিন্দুয়ান অক্ষরে

এঁর পরবর্তী কবি মুতালিবেরও (১৬৩৯ খ্রী:) ভয়:

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।
মুসলমানি শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করিলুঁ
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।

মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ ক্ষেমিবেক।

আমীর হামজা (১৬৮৪ খ্রীঃ) রচয়িতা আবদুন নবীরও সেই ভয় :

মুসলমানী কথা দেখি মনেহ ডরাই
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই।
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভয়
দৃঢ়ভাবে রচিবাবে ইচ্ছিল হৃদয়।

রাজ্জাক নন্দন আবদুল হাকিমের [সতেরো শতক] মনে কিন্তু কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব তো নেই-ই, পরন্তু যারা এসব গোঁড়ামি দেখায়, তাদের প্রতি তাঁর বিরক্তি তীব্র ভাষায় ও অশ্লীল উক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন তিনি :

যেইদেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেইবাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবেরগণ।
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।

হিন্দুয়ানী মাতৃভাষার প্রতি এতখানি অনুরাগ সে-যুগের আর কোনো মুসলিম কবির দেখা যায় না।

অতএব, সতেরো শতক অবধি মুসলমান লেখকেরা শাস্ত্রকথা বাঙলায় লেখা বৈধ কি-না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। আমরা শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম প্রমুখ অনেক কবির উক্তিতেই এ দ্বিধার আভাস পেয়েছি। সুতরাং যাঁরা বাঙলায় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা দ্বিধা ও পাপের ঝুঁকি নিয়েই করেছেন। এতে তাঁদের মনোবল, সাহস ও যুক্তি-প্রবণতার পরিচয় মেলে।

উন্নাসিক ব্রাহ্মণ্য অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'ভাষা'। উন্নাসিক মুসলিমদের কাছে 'হিন্দুয়ানী ভাষা'। কারুর চোখে 'প্রাকৃত ভাষা' [দ্বিজ শ্রীধর

ও রামচন্দ্র খান], কারুর মতে 'লোক ভাষা' [মাধবাচার্য : ৬ শতক], কেউ বলেন লৌকিক ভাষা [কবি শেখর ১৭ শতক], অধিকাংশ লেখক 'দেশী ভাষা' এবং কিছু সংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাষা' 'বাঙ্গালা' ব'লে উল্লেখ করতেন। বহিরাঞ্চলে এ ভাষার নাম ছিল গৌড়িয়া।

মধ্যযুগে হিন্দুয়ানী ভাষার প্রতি মুসলমানদের বিরূপতা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস-প্রসূত। কিন্তু উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে সে বিরূপতাও রাজনৈতিক যুক্তিভিত্তিক হয়ে আরো প্রবল হবার প্রবণতা দেখায়।

৮

বাঙলা সাহিত্যের যুগ-বিভাগ

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যে-সময়ে কথ্যপ্রাকৃত অবহট্ঠ বুলির স্তরে নেমে আসে সে-সময়ে বাংলাদেশেও যে অবহট্ঠ এবং তারপরে ক্রমে অর্বাচীন অবহট্ঠ বা প্রাচীনতম বাঙলা বুলি চালু হয়েছিল, তা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই ভাষা-প্রবাহের সঙ্গত ও স্বাভাবিক বিবর্তন ধারার বিজ্ঞানসম্মত অনুমান থেকে নিঃসংশয়ে মেনে নেয়া চলে। তবে অবশ্যই স্বীকার্য যে বুলিমাত্রই ব্যক্তিক, পারিবারিক ও আঞ্চলিক উচ্চারণে ও অজ্ঞতায় বিভিন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম পার্থক্য প্রায় প্রতি মুহূর্তেই সৃষ্টি করে।

বক্তার শারীরিক অসামর্থ্য, অজ্ঞতা, আবহাওয়ার প্রভাব, সমাজের সংখ্যাগুরুর বুলির প্রভাব প্রভৃতি উচ্চারণ, অভিধা ও বাক্‌রীতির বিকৃতির প্রত্যক্ষ কারণ। কাজেই বাঙলাভাষী অঞ্চলেও যথাকালে ও যথানিয়মে মাগধী প্রাকৃত তথা পূর্বীপ্রাকৃতের অপভ্রংশে অবহট্ঠে বিবর্তন হলেও স্থানিক ও আঞ্চলিক পার্থক্য ছিল প্রকট। বস্তুত দুনিয়ার তাবৎ লেখ্য বা লিখিত কৃত্রিম ভাষাই বুলি বৈচিত্র্যের বাধা অতিক্রম করে একটা বিরাট অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিত্ব ভাষিক ঐক্য সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং আচারিক মিল ও দৈশিক বা রাষ্ট্রিক সংহতি রক্ষা করে। অতএব লিখিত কৃত্রিম ভাষাশৈলী কারুর মুখের বুলি না হয়েও বহু মানুষের মধ্যে জ্ঞাতি-জাতি-সংস্কৃতি, দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে অভিন্ন সত্তাচেতনার জন্ম দান ও লালন করতে পারে। ভাগলপুর থেকে গৌহাটি, গোয়ালপাড়া কিংবা কুচবিহার থেকে টেকনাফ অবধি বিভিন্ন জাত-বর্ণ-ধর্মের মানুষকে ভাষিক বাঙালী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সংহত করেছে—তাদের স্ব স্ব বুলি নয়—লেখ্যভাষার প্রতি আনুগত্যই।

অতএব, আমরাও প্রাচীন লিখিত ভাষার নিদর্শন ধরেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যুগ ও যুগান্তর নিরূপণ করার চেষ্টা করব।

এ তথ্য উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে ভাষা-সাহিত্যের রূপান্তর-যুগান্তর যতটা ব্যক্তিক, ততটা সামাজিক, স্থানিক কিংবা গোষ্ঠীগত নয়। ১৮৪৭ সনের বিদ্যাসাগরী ভাষাশৈলী আর ১৮৮০ সনের রাবীন্দ্রিক ভাষাশৈলী অভিন্ন নয়; শব্দচয়নে, বাক্য-গঠনরীতিতে, বাক্‌বিন্যাসে ও বাক্‌ভঙ্গিতে এই মৌলিক, গভীর ও ব্যাপক ব্যবধানের উৎস স্থান-কাল নয়—মূলত ব্যক্তিত্ব তথা ব্যক্তি-সত্তার, রুচি-মননের ও প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য তথা অনন্যতা। এ তাৎপর্যেই 'Style is the man'—অভি-ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেরই নিদর্শন অথবা ব্যক্তিত্বেরই অন্য নাম। আবার তিনটে স্বতন্ত্র মন মত রুচি আদর্শ নিয়ে ১৮৯১ সন অবধি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশে ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সহাবস্থান করেছেন। কাজেই একই কালে ও স্থানে বিভিন্ন ভাব চিন্তানীতি-আদর্শ ও রুচি-শৈলী সমান্তরালভাবে চলে,—কোনটা ক্ষীণভাবে, কোনটা স্ফীতধারায়।

সুতরাং ভাষা-সাহিত্যের জন্মলগ্ন কিংবা বিবর্তন-রূপান্তর দিন-সন দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে না। সবটাই হবে লাক্ষণিক ও আনুমানিক। তাও আবার কোথাও স্থূল, কোথাও সূক্ষ্ম, কখনো আঙ্গিকগত, কখনো বা মর্মগত তাছাড়া স্থান-কাল-প্রতিবেশ (শাস্ত্র-সমাজ-সরকার) অভিন্ন থাকা সত্ত্বেও সামাজিক, আর্থিক শৈক্ষিক নৈতিক অবস্থানভেদে মানুষের ব্যক্তিক ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ বিপরীত-মুখী এবং বহু ও বিচিত্র হতে পারে। কাজেই কোন যুগই একক লক্ষণে-মর্মে আঙ্গিকে-বক্তব্যে চিহ্নিত হতে পারে না।

এতো কথা বলতে হল এ জন্যে যে কোন সাহিত্যেরই—বাঙলা সাহি-ত্যেরও দেয়ালতোলা যুগবিভাগ সম্ভবও নয়, স্বাভাবিকও নয়, এমন কি বাঞ্ছিতও নয়।

॥ ২ ॥

চর্যাপদাবলীকে বাদ দিলে আমরা পনেরো শতকের পূর্বে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ কোন পূর্ণাঙ্গ লিখিত গ্রন্থ পাই নে বটে, তবে শব্দে, ছড়ায়, আর্যায়, মীননাথের পদে, চর্যার দু'একটি পদে, হলায়ুধমিশ্রের 'শেখ শুভোদয়া'য় নাড়পাদের সেকোদ্দেশটীকায়, মানসোল্লাসে ও সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে লিখিত বাঙ-লার নিদর্শন মেলে। কাজেই প্রাচীন বাঙলা বুলির জন্ম আরো অনেক আগে—

হয়তো পঞ্চম-ষষ্ঠ-শতকে। সে বুলি নিশ্চয়ই অবহট্‌ঠের মাতৃত্বছাপ মুক্ত ছিল না। এই সময়কার লেখ্য অবহট্‌ঠের সন্ধান মেলে দোহায় ও চর্যাগীতিতে। আমরা জানি, লেখ্য ভাষার পরিবর্তন অতি মন্থর। তাই প্রাকৃত পৈঙ্গল, দোঁহাকোষ কিংবা চর্যাপদের চল বারো-তেরো-চৌদ্দ শতক অবধি পাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের বুলি শেখ শুভোদয়াব কিংবা শূন্যপুরাণের বাঙলার, অথবা ডাক-খনার বচনের কোন কোন প্রাচীনরূপের কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রক্ষিত প্রাচীনতররূপের বা প্রাচীনরূপে রক্ষিত চলতি আর্যার ভাষার রূপ পেয়েছিল। কেননা, মানুষ ছিল, তার জীবন-জীবিকার ধান্ধা ছিল, আর মন-মানসের অভিব্যক্তি ছিল না,—এমন হতেই পারে না। কাজেই তখনো তার মৌখিক গান-গাথা, রূপকথা, উপকথা-শাস্ত্রকথা এবং ইতিকথাও ছিল। সেগুলোই আমরা বারো-তেরো-চৌদ্দ শতকের কথকতায় গান ও গাথারূপে উৎকর্ষে সুষ্ঠু ও কলেবরে স্ফীত হয়ে জনপ্রিয় হতে দেখি। এবং পনেরো শতকে লিখিতভাবে পাঁচালী কাব্যে কিংবা গীতধামালীতে সংহত সাহিত্যরূপে সংকলিত দেখতে পাই।

অতএব, বুলি রূপে বাঙলার উন্মেষ ১৩/১৪ শ' বছর আগে হলেও লেখ্য বা লিখিত বাঙলার উদ্ভব আট শ' বছরের বেশী নয়। এ সূত্রে একটা প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। আমরা বুলির দিক দিয়ে মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অবহট্‌ঠের প্রভাবিত অঞ্চলের লোক হলেও, প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ দেশের মানুষ শাস্ত্র, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শাসন ব্যাপারে উত্তর ভারতকেই আদর্শ রূপে জানত ও মানত। তাই বৌদ্ধ শাস্ত্রও শৌরসেনী লেখ্য প্রাকৃতে (তথা পালিতে) লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বৌদ্ধ সংস্কৃতও শৌরসেনী লেখ্য প্রাকৃত তথা পালি মিশ্রিত। লিখিত পালি-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠের শৌরসেনী প্রাকৃতভিত্তিক। কাজেই কাহ্নপা-সরহ-শান্তির দোঁহা কিংবা চর্যাগীতি এবং আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় লিখিত বাঙলা মাগধী প্রাকৃত-অবহট্‌ঠও বিবর্তিত রূপ নয়, বরং শৌরসেনী প্রাকৃত-অবহট্‌ঠের অনুকৃত রূপ। এ বিষয়ে নিষ্ঠ গবেষণা ফলপ্রসূ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ইতিপূর্বে দীনেশচন্দ্র সেন হিন্দুবৌদ্ধযুগ-গৌড়ীয়যুগ-চৈতন্যযুগ-সংস্কারযুগ-কৃষ্ণচন্দ্রীয়যুগ নামে বাঙলা সাহিত্যের যুগবিভাগ দেখিয়েছেন, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক—প্রাক-তুর্কীযুগ-তুর্কী আমল-স্বাধীন মুসলিম বাঙলা-মুঘল আমল-ইংরেজ আমল-পাকিস্তানযুগ নামে কালগত ভাগ করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার বিবর্তন ভিত্তিক যুগ বিভাগ করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন শতকের কাঠামোয় বিষয়ানুগ আলোচনা পসন্দ করেছেন। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দ, পঞ্চদশ শতাব্দ, ষোড়শ শতাব্দ, সপ্তদশ শতাব্দ শিরোনামে বিভিন্ন শাখার

ও বিষয়ের কবি-কাব্য আলোচিত হয়েছে। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম পর্ব-আদিযুগ (১০—১২ শতক), দ্বিতীয় পর্ব প্রাকচৈতন্যযুগ (তেরোশতক থেকে ১৪৯৩ খ্রী), চৈতন্যপর্ব (১৪৯৩-১৬০৫ খ্রী) উত্তর চৈতন্য পর্ব (১৬০৬ থেকে ১৮ শতক: ১৭ শতক, ১৮ শতকের প্রথমার্ধ, ১৮ শতকের শেষার্ধ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ)। এখন স্থূল লক্ষণের ভিত্তিতে অর্থাৎ বিষয় ও লক্ষ্য বিচারে বাঙলা সাহিত্যের একটা কাজ চালানো গোছের যুগ ও যুগান্তর দেখানোর চেষ্টা হতে পারে মাত্র।

প্রথমত রাজনৈতিক পরিবর্তনে তথা শাসক গোষ্ঠী বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী হলে তাদের প্রভাবে যুগান্তর ঘটে। আমরা মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন শাসন আমলকে প্রাচীন যুগ, তুর্কী বিজয়োত্তর কালকে মধ্যযুগ এবং ব্রিটিশ আমলকে আধুনিক যুগ বলে চিহ্নিত করি। অবশ্য কেবল শাসন পবিবর্তন হলেই যুগান্তর ঘটে না। নতুন জাতির সঙ্গে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় নতুন মনন ও সংস্কৃতির জন্ম দেয়। নতুন মন-মত-ধর্ম-আচার-মনন-আদর্শ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ব্যষ্টির চিন্তা-চেতনায় যে অভিঘাত আসে, তারই প্রভাবে বাহ্য জীবনে-সমাজে আচারে-আচরণে, এক কথায় মানস ও ব্যবহারিক জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে, তা-ই ঘটায় যুগান্তর। বিদেশী তুর্কী-মুঘল-ইংরেজ শাসনে এ কারণেই আমাদের জীবনে-সমাজে-সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে যুগান্তর ঘটে। এ যুগে অবশ্য এ জন্যে আর রাজ্য-রাজত্বের হাত বদল হতে হয় না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও কৃৎকৌশলের বিস্ময়কর বিকাশের ফলে আজকের যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত সংহত পৃথিবীতে ভাব-চিন্তা-মত-পথ-বস্তু-বিদ্যা-কৌশল কিংবা সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংস্থা-সংগঠন প্রভৃতির সবটাই ঘরে বসে অনুকরণে-অনুসরণে কিংবা গ্রহণে-বরণে জীবন-চেতনায় ও জীবিকাপদ্ধতিতে রূপান্তর ঘটিয়ে মনন ও জীবন-যাত্রায় নবনব যুগ সৃষ্টি করা যায় এবং হয়ও।

১. তুর্কীবিজয়পূর্ব কালকে সাধারণভাবে প্রাচীন যুগ বলে চিহ্নিত করলে তেরো-চৌদ্দ শতককে 'আদি মধ্যযুগ' নামে অভিহিত করা বাঞ্ছনীয়।
   তেরো চৌদ্দ শতকে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র, শাসক ও সমাজপতির ভয়মুক্ত হয়ে গণমানব আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সংস্কার অনুগ চিন্তা-চেতনা মৌখিক রচনার তথা কথকতার মাধ্যমে উৎসবে-পার্বণে জলসায় অভিব্যক্ত করতে থাকে। যেহেতু অধিকাংশ হিন্দুই দেশজ বৌদ্ধদের বংশধর, সেজন্যে রাজশক্তির প্রশ্রয়ে বৌদ্ধ যোগ-তান্ত্রিক মত প্রভাবিত সাহিত্যই গোড়ার দিকে বহুল প্রচলিত ছিল। এই কথকতার যুগে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তত্ত্বকথা—গোপীচাঁদ-ময়নামতী-মানিকচাঁদ কাহিনী,— আদিনাথ-মীননাথ-হাড়িফা-কানফা সম্বাদ, যোগিপাল-ভোগিপাল-মহীপাল গীত, যক্ষের

ব্রতকথা, ধর্ম-ঠাকুর, বাসুলী (বৎসলা) ও তাঁহার মাহাত্ম্য, ডাক-যোগী-ডাকিনী-যোগিনীকথা প্রভৃতি যোগতন্ত্র, দেহতত্ত্ব ও দেবতা-মাহাত্ম্য কথাই আসরে আসরে বিশেষভাবে গীত হয়েছে। রাম-কৃষ্ণ শিব-মনসা-চন্ডীর লৌকিক মাহাত্ম্য কথাও চালু ছিল। এ কথকতার ভাষা ছিল বুলি ভিত্তিক।

২. পনেরো শতক : লিখিত লোকসাহিত্যের ও অনুবাদমূলক পৌরাণিক সাহিত্যের যুগ। পূর্বে বর্ণিত ধারার অতিরিক্ত ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শূন্যপুরাণ, মনসার ভাসান এবং খ. সংস্কৃত থেকে অনুবাদমূলক রামায়ণ ও ভাগবত। এ শতকেই রাজশক্তির আগ্রহে বাঙলায় অনুবাদের শুরু এবং ভাষা তখনো বুলি-দুষ্ট, যদিও ছন্দ-চেতনা ও রাগ-রাগিণী প্রীতিও লক্ষণীয়।

৩. ষোল শতক : ভাব-বিপ্লব যুগ বা রেনেসাঁস যুগ। এ যুগে বাঙলা রচনা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে সর্বজনীনতা লাভ করে। এ সাহিত্য লক্ষণে গ্রামীণ,—নগুরে নয়। ভাষাও সংস্কৃত শব্দবহুল পরিশীলিত গ্রামীণ। চৈতন্য দেবের 'নরে নারায়ণ ও জীবে ব্রহ্ম' তত্ত্ব এবং সর্ব মানবে প্রেম-প্রীতি ও সাম্যতত্ত্ব বাঙালীর জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা অন্তত এক শতক ধরে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর জীবনচর্যার প্রভাবই বাঙালীর চিন্তা-চেতনায় রেনেসাঁস আনে। এ শতকে পূর্ব ধারার অতিরিক্ত ক. বৈষ্ণব সাহিত্য খ. অনুবাদ-মূলক প্রণয়োপাখ্যান, গ. মহাভারত ও নবীকাহিনী পাই।

৪. সতেরো শতক : লৌকিক পীর-নারায়ণ 'সত্য' আশ্রয়ী শোষিত বাঙালীর মিলনমুখী সাধনার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগ। সাম্রাজ্যবাদী মুঘলের শোষণের পরিণামে নির্জিত গণমানব 'সত্য' পূজায় পার্থিব দুঃখ-যন্ত্রণা-অভাব-অনটনের অবসান কামনা করেছিল। গীতা -কোরআন অনুসারীরা আকস্মিকভাবে কেন আবার বৌদ্ধযুগ সুলভ লৌকিক দেবতা-উপদেবতার (সত্য-বড় গাজী-দক্ষিণরায়-কালু-বনদেবী ও কাল্পনিক পীরের) পূজায় আসক্ত হয়েছিল, তার কারণ মিলবে সমকালীন বাণিজ্যক-আর্থিক-প্রশাসনিক বিকারের মধ্যে। এ কাল ক. পূর্বে-কার বিভিন্ন শাখায় সৃষ্টিপ্রবাহে স্ফীতির যুগ— এ সময় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বহু কবির রচনায় স্ফীত হয় বটে, কিন্তু আনুপাতিক উৎকর্ষ দুর্লক্ষ্য। একাল -- খ. পীর-নারায়ণ সত্যের পাঁচালী ও অন্যান্য উপদেবতা ও পীরের পাঁচালীর প্রসার কাল। এই রচনার ভাষা স্থানে স্থানে দোভাষী (বাঙলা-হিন্দি)। গ. লোকগাথার বিকাশ কাল। ঘ. মুসলিম শাস্ত্রকথা ও নবী-বীর কাহিনী।

৫. আঠারো শতক : নওয়াব-ব্রিটিশ শাসন-শোষণজনিত অবক্ষয় যুগ। সতেরো শতকের শেষার্ধ থেকে মঘ-হার্মাদের হামলা ও য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তি

বেড়ে চলেছিল। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর প্রভাব ক্ষীণ হতে থাকে। নওয়াব মুরশিদ কুলি খাঁর রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা নতুন নতুন মধ্যস্বত্বভোগীর জন্ম দেয়। মুরশিদ কুলি খাঁর মৃত্যুর (১৭২৭ সন) পর থেকে ১৭৭২ অবধি যুদ্ধ-দ্রোহ-বর্গীর লুণ্ঠন, সামন্ত স্বৈরাচার, বিদেশী বেনের একচেটিয়া বাণিজ্য, দুর্নীতি-দুঃশাসন প্রভৃতি গণমানবের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তা আনে। পূর্বেকার গ্রামীণ প্রবাহের অতিরিক্ত ক. শহুরে শায়ের ও কবিওয়ালার উদ্ভব।

নওয়াবী শাসনের অবসান ও কোম্পানী শাসনের আরম্ভ কালীন নৈরাজ্য নৈরাশ্যের প্রসূন হচ্ছে শায়েরদের দোভাষী রচনা এবং কবিওয়ালাদের খেউড় আখড়াই টপ্পা গান ও অশ্লীল কথকতা। এ হচ্ছে প্রায় শতাব্দী ব্যাপী স্থায়ী যুগ-সন্ধি (১৭৬০-১৮৬০ সন) কাল। মোটামুটিভাবে ১৭৬০ থেকে ১৮২০ অবধি শায়ের কবিওয়ালার প্রাবল্যের যুগ।

মধ্যযুগের সাহিত্যে নাগরিক পরিস্ফূর্তি দুর্লক্ষ্য (অবশ্য পদাবলী এর ব্যতিক্রম) একটা গ্রামীণ আবহ ও আবরণ প্রায় সর্বত্র দৃশ্যমান। বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী বিভাষী তুর্কী বিজয়ের ফলে শাস্ত্র ও সমাজ-শাসিত গণমনে সামাজিক শাসন-মুক্তির একটা উল্লাস জেগেছিল। সমাজ ক্ষেত্রে স্বাধীন আচরণের সরকারী প্রশ্রয় পেয়ে তারা এতাবৎ অশাস্ত্রীয় বলে অবৈধ-ঘোষিত কিন্তু বুকের কোণে লালিত লৌকিক বিশ্বাস সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও দেবতা-অপদেবতার ভয়-ভরসা স্বাধীনভাবে কথায় ও কাজে প্রকাশ করার সুযোগ পেল। বাঙলা ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঐ নির্জিত গণমানবের মানস বাঞ্ছাপূর্তির ও অকুণ্ঠ অভিব্যক্তির বাহন রূপেই।

অতএব, রাজ্য-রাজত্ব হাত বদল হওয়ার ফলে মানস ও ব্যবহারিক জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে, তার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা কাল পরিসরকে আমরা চারভাগে ভাগ করে দেখতে অভ্যস্ত।

যেমন:

১. মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন শাসন কাল—প্রাচীন যুগ।

২. তুর্কো-আফগান-মুঘল শাসনকাল—মধ্যযুগ।

   ক. আদিমধ্যযুগ—তেরো-চৌদ্দ শতক।

   খ. মধ্যযুগ—পনেরো-আঠারো শতক।

৩. ব্রিটিশ শাসন কাল—আধুনিক যুগ।

৪. স্বাধীনতা-উত্তর কাল—বর্তমান যুগ।

এখানে আমাদের আলোচ্য কেবল মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙলা সাহিত্য। কাজেই পূর্বে ব্যাখ্যাত বৈশিষ্ট্যের আলোকে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য-প্রবাহের যুগানুগ সংক্ষিপ্ত নাম হবে নিম্নরূপ :

প্রথমযুগ : ১৩-১৪ শতক—সৃজ্যমান লোকায়ত সাহিত্যের কথকতার যুগ।

দ্বিতীয় যুগ : ১৫ শতক—লিখিত লৌকিক দেবসাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের যুগ।

তৃতীয় যুগ : ১৬ শতক—ভাব-বিপ্লব যুগ বা রেনেসাঁস যুগ।

চতুর্থ যুগ : ১৭ শতক—লোকায়ত পীর-দেবতাদের যুগ।

পঞ্চম যুগ : ১৮ শতক—অবক্ষয় যুগ।

বলেছি, যুগান্তর সম্ভব হয় নতুন চেতনার উন্মেষে। নতুন চেতনার উন্মেষ বিপরীত কিংবা উন্নতমানের চেতনার অভিঘাতেই সম্ভব। আমাদের দেশে সাড়ে সাতশোর্ধ্ব বছর আগে তা সম্ভব হয় তুর্কীবিজয়ের দরুন। শাসক শাসিতের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী উপজাত হচ্ছে পরস্পরের ধর্ম, মনন ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সে-পরিচয় সম্ভব হয়েছে পরস্পরের ভাষা জানাজানির ফলে। নইলে শুধু চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাতে কেউ কারো প্রভাবে পড়ে না। তার প্রমাণ তিন শ' বছর ধরে য়ুরোপীয় বেনেরা ভারতে যাতায়াত করছিল, কিন্তু তবু প্রতীচী আমাদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে ভাষার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপ তার মন-মননের ঐশ্বর্যের দ্বার অবারিত করল আমাদের কাছে। আমাদের জীবনেও যেন অমারজনীতে সূর্যোদয় ঘটল। আমাদের জীবনে ও মননে আকস্মিকভাবে ঘটল কালান্তর। তুর্কীর ধর্ম, মনন ও সংস্কৃতির প্রভাবে যে-নতুন চিন্তা-চেতনার লাবণ্য এদেশে দেখা গেল, তাও ইংরেজ-প্রভাবের মতোই ছিল ব্যাপক ও গভীর ভক্তিবাদ-সন্তধর্ম-প্রেমবাদ তারই প্রসূন। তাতে বিজ্ঞান-বুদ্ধি ছিল না বটে, কিন্তু উচ্চমার্গের তাত্ত্বিকচেতনা ছিল। তাতেও ছিল নতুন জ্ঞানের আলো,—তার অবশ্য ঔজ্জ্বল্য ছিল না তেমন, তবে মানবতার ও সংবেদনশীলতার স্নিগ্ধতা ছিল। সেদিনও নির্জিত-নিপীড়িত-নির্বিত্ত নিম্নবর্ণের মানুষের মনে মুক্তির আকাঙক্ষা ও দ্রোহের সাহস জেগেছিল, সে দিনও শঙ্করীয়-রামমোহনী কায়দায় ধর্মতত্ত্বে নতুন ব্যাখ্যা মিলেছিল,—সমাজতত্ত্বে ফাঁকির ফাঁক ধরা পড়েছিল। জন্মসূত্রে নয়—সামর্থ্য ও আত্মপ্রত্যয় সূত্রেই যে জীবন নিয়ন্ত্রিত—সম্ভব হয়েছিল সে উপলব্ধিও। ফলে মানুষের জীবনে জীবিকায় উন্মুক্ত হল সম্ভাবনার অসীম দিগন্ত। শাস্ত্রের জন্যে যে জীবন নয়—জীবনের জন্যেই শাস্ত্র তাও বোধগত হয়েছিল। আত্মপ্রত্যয়ী

মানুষের সাফল্য-সম্ভাবনার দিগন্ত যে অশেষ, তা দেব-দ্বিজ-বেদ-জুজুর মিথ্যা ভয়-মুক্ত মানুষের কাছে আর অজানা রইল না। তুর্কীপ্রভাবে দেশী মানুষের চিন্তা-চেতনায় যে-বিপ্লব এল, তারই প্রসূন সন্তধর্ম ভক্তধর্ম ও প্রেমধর্ম সেদিন ভারতে জীবন-জিজ্ঞাসায় ও জগৎ-ভাবনায় যুগান্তর ঘটিয়েছিল। ধর্মান্তরে, কর্মান্তরে, চিন্তা-চেতনার রূপান্তরে সাহিত্যে-শিল্পে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে-সঙ্গীতে-শস্ত্রে-সমরে-পোশাকে-প্রশাসনে সর্বাত্মক পরিবর্তন এসেছিল, যেমনটি ঘটেছিল পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে। এ মানসমুক্তি স্বাতন্ত্র্যগর্বী অভিজাত উচ্চবিত্তের মধ্যে যত না ঘটেছিল, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী এসেছিল নিম্নবর্ণের ও বিত্তের লোকের মধ্যে। এই গণমানবই এ-সময় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে উন্মুখ ও উদ্যোগী হয়। তাই আমাদের সাহিত্যে ভাস্কর্যে-সঙ্গীতে গেঁয়ো গণমানবের প্রভাবই দেখতে পাই। এ সাহিত্যে দৃষ্টি ও সৃষ্টি নতুন হওয়া সত্ত্বেও ভাব-ভাষা-বিষয়-রূপ-রস-নীতি-আদর্শ সবটাই স্থূল, অপরিস্রুত, আবর্তিত ও নিম্নমানের হওয়ার মূলে রয়েছে স্বল্পশিক্ষিত ও স্বল্পবিত্ত গেঁয়ো মানুষের পরিচর্যা। এখানে দেবতা ও মানুষ হিংসা-ঈর্ষা অসূয়া-রিরংসায় অভিন্ন, ছল-চাতুরী-প্রতারণায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। হর-গৌরী দরিদ্রতম গৃহস্থ প্রতীক। বাঙলার শিক্ষিত মনীষার প্রসূন চৈতন্যদেবের জাত-বর্ণ-শ্রেণী দ্রোহী প্রেমধর্ম, আর অশিক্ষিত মনীষার ফসল হচ্ছে পীর-নারায়ণ রূপী 'সত্যের' স্বীকৃতিতে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে সহযোগিতায় সহাবস্থান নীতির উদ্ভাবন।

আঠারো শতক অবধি বাঙলা সাহিত্যে এই চিন্তা-চেতনার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি লক্ষণীয়। বিষয়গত আবর্তন-অনুবর্তন সত্ত্বেও মন-মানসের প্রসার ঐ সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য ছিল না। ফারসী ভাষা-সাহিত্যের প্রভাবও এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। এমনি করেই ঘটে প্রাচীন যুগের মধ্যযুগে উত্তরণ—প্রাচীনতার সময়োপযোগী কালিক রূপান্তর। যদিও এ সাহিত্যে পরিস্রুত দরবারী জৌলুস ছিল দুর্লভ।

ইংরেজ-প্রভাবে পরিবর্তন এসেছিল কেবল শহুরে মানুষের মননে ও আচরণে। কিন্তু তুর্কী-মুঘল প্রভাবে গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে সর্বত্র সমভাবেই নড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র আর সমাজের ভিত। এবং পরিণামে শাস্ত্র আর সমাজও ফাটলে-ভাঙনে হীনবল ও হৃতগৌরব হয়েছিল। তখনো অবশ্য বসনে-ভূষণে, আচারে-আচরণে বাহ্য প্রভাবটা ব্রিটিশ আমলের মতোই গাঁয়ের চেয়ে শহরে বন্দরে শিক্ষিত সমাজেই ছিল প্রকট।

৯

বাঙলা সাহিত্যের মৌখিক স্তরের কাল

বাঙলাদেশে জনবসতি কবে শুরু হয়েছিল, ইতিহাস তা বলতে পারেনা। আধুনিক সংজ্ঞার জনপদ কবে থেকে গড়ে উঠে সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। আমরা জানি পুণ্ড্রবর্ধন তথা উত্তর বঙ্গ অন্ততঃ মৌর্য শাসনভুক্ত ছিল। আমরা আরো জানি, রাঢ় অঞ্চলে তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর ও জৈন শ্রাবকরা খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেই অনুপ্রবেশ করে বর্বর প্রায় মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতকের পাণিনির কাছে এদেশ অজ্ঞাত ছিল না। ঐতরেয় আরণ্যকে-ব্রাহ্মণে রামায়ণে মহাভারতে এই পুরাঞ্চলের উল্লেখ যখন রয়েছে তখন খ্রীস্টপূর্ব দশ শতকেও বাঙলা দেশের অন্ততঃ রাঢ়-পুণ্ড্র অঞ্চলে যে লোক বসতি ছিল, তা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা চলে। সে মানুষ কারা? আমাদের মতে অস্ট্রিক। এদের সঙ্গে আর্য-ভারতের পরিচয় ঘটে শাস্ত্র ও শাসনের মাধ্যমে। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মমত গ্রহণ করেই তারা উত্তরাপথের ভাষা-শাস্ত্র সমাজ-সরকার স্বীকার করে। বাঙালীর আর্যায়ণ সম্ভব হল এভাবেই। মৌর্যরা ও পালেরা ছিলেন বৌদ্ধ, গুপ্তরা ও সেনেরা ছিলেন বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ্যবাদী। প্রথমে ধর্মপ্রচার ও পরে দেশ অধিকার কিংবা আগে বাণিজ্য পরে সাম্রাজ্য নীতির বাস্তবায়ন দেখি মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাসে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উত্তরাপথের শাস্ত্র সমাজ শাসন সভ্যতা সংস্কৃতির জৌলুস ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এদেশের অনুন্নত অস্ট্রিক মানুষগুলো চিরকালের জন্যে নির্জিত জীবন-জীবিকার শিকার হয়ে রইল। তারাই নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের বলে পরিচিত ধনে-মনে চিরকাঙাল অস্পৃশ্য দাস এবং দু হাজার আড়াই হাজার বছর ধরে তারাই গৃহপালিত পশুর মতো জীবনযাপনে বাধ্য রয়েছে। এদের কিছু লোক শাসকদের কৃপায় উচ্চবর্ণে ঠাঁইও পেয়েছিল; কিন্তু হাড়ি, ডোম, চাড়াল, বাগদী, কৈবর্ত, চামার, কুমার কামার, —এ নাম এ কালে এদের কারা দিয়েছিল? সেই শাসক গোষ্ঠীরাই তো? তারা কারা? বিদেশী শাসক ও শোষক; দেশে ছোটলোক কারা—দেশের আদি অকৃত্রিম বাসিন্দা অস্ট্রিক মঙ্গোল।

তাই সামন্তের ও মহাজনের বোঝা বয়ে বেঁচে থাকা গণমানবরা বঞ্চিত ছিল সবপ্রকার মানবিক ও মৌলিক অধিকার থেকে। আকাঙ্ক্ষা পোষণের স্বাধীনতা

ও মনের আবেগ প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না তাদের। তাই হাজার বারো শ' বছর ধরে তাদের উচ্চারিত ধ্বনির কোন নিদর্শন নেই দেশে। তবু তারা ছিল। বাইরে তারা মানবাধিকার হৃত হলেও তাদের অন্তর্লোকে জগৎ-ভাবনা ও জীবন-চেতনা ছিল, জাগতিক জীবনে বঞ্চিত ছিল বলেই পারত্রিক জীবনে তারা ভরসা রাখত ঐহিক বাঁচার তাগিদেই। আশা ও প্রত্যাশা ছাড়া তাদের অন্য সম্বল, অন্য পাথেয় ছিল না, —'ভাগ্যই জীবনের নিয়ামক'—এ তত্ত্বে আস্থা না রেখে তাদের উপায় ছিল না। তাই তারা দেব ও দৈব শক্তি নির্ভর। অব্যক্ত সুখ-বাঞ্ছাই তাদের যাদুবিশ্বাসী ও দৈবপ্রতীকে আস্থাবান করেছিল।

বিদেশীর শাস্ত্র-সমাজ ও শাসন-সভ্যতা সংস্কৃতি বরণ করে সে তার ভাষা হারিয়েছে, হারিয়েছে তার ব্যবহারিক জীবন পদ্ধতির অনেক কিছুই। কিন্তু ধরে রেখেছিল তার সুপ্রাচীন গোত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কার, মনের কোণে জাগিয়ে রেখেছিল তার জন্ম ও জীবনের রহস্য-চেতনার ঐতিহ্য। তাই গুপ্ত শাসনের অবসানে ব্রাহ্মণ্যবাদের তীব্রতা হ্রাস পেল যখন, তখন বৌদ্ধ পাল শাসনে বৌদ্ধ শাস্ত্রের আবরণে তার সাংখ্য যোগ-মন্ত্র-তন্ত্র ভিত্তিক সহজযান মত প্রচারে ও আচরণে উৎসাহ পায় সে। সাংখ্য ও যোগ অস্ট্রিক আর মন্ত্র-তন্ত্র মঙ্গোলীয়। এগুলো সুপ্রাচীন ও আর্যপূর্ব কালের। এদের সাধনার ও চর্যার বীজমন্ত্রগুলোর ভাষা ও ধ্বনি দেখেও অনুমান করা চলে এগুলো সুপ্রাচীন। তারা মৌর্যপূর্ব যুগে, মৌর্য-কন্ব-সুঙ্গ-গুপ্ত ও পাল আমলে সমকালীন ভাষায় প্রকাশ্যে না হোক গোপনে অন্তত তাদের বিশ্বাসানুগ তত্ত্বকথা নিজেদের মধ্যে মুখে মুখে চালু রেখেছিল। পাল আমলে তা রাজকীয় প্রশ্রয়ে আসরে উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করার সুযোগ মেলে তাদের। এমনি করেই সাংখ্যসম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব, যৌগিক দেহতত্ত্ব, তান্ত্রিক দেহচর্যা প্রভৃতি প্রকাশ্যে প্রবল হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীদেরও প্রভাবিত করে। জগৎ-কারণ অনাদি আদি আদ্যাতত্ত্ব 'মহাযান' নামে, জগৎ-কারণ সূর্য ত্রিশরণের অন্যতম ধর্ম নামে, দেহ-পরিণাম 'শূন্য' বা 'নির্বাণ' নামে, দেহচর্যা হঠযোগ নামে, দেহতত্ত্ব মন-পবনলীলা নামে, দেহাধার 'নীর-ক্ষীর-চন্দ্র-রজঃ-নদী পদ্ম' প্রভৃতি নানা রূপকে অভিব্যক্ত। বজ্র-তারা, প্রজ্ঞা-উপায় প্রভৃতি পরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের প্রতীক। সেন আমলে আবার ব্রাহ্মণ্য হুমকির মুখোমুখি হয়ে এই নির্জিত মানুষেরা পুনরায় আত্মগোপনে আত্মরক্ষার প্রয়াসী হয়। তখন আবার আদিনাথ চন্দ্রনাথ—শিবরূপে, আদ্যাশক্তি—তারা মহামায়া কালীরূপে, বৎসলা—বাশুলী রূপে, জাঙ্গুলী—মনসা রূপে, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী রূপে, বজ্র-তারা, প্রজ্ঞা-উপায়—শিব-উমা, মায়া-ব্রহ্ম, বিষ্ণু-লক্ষ্মী এমনকি বৈষ্ণবরূপী সহজিয়াদের রাধা-কৃষ্ণ রূপে

এবং বৌদ্ধ চতুষ্পদ্ম—ষড়পদ্ম রূপে, কায়—চক্র রূপে নবব্রাহ্মণ্য সমাজেও আত্ম-রক্ষায় সমর্থ হয়। পরবর্তী কালে দেশী মুসলিম সমাজেও ঐ যোগ-তন্ত্র সূফী চর্যার আবরণে আরবী ফারসী পরিভাষা গ্রহণ করে চালু রইল। চতুষ্কায় তখন লতিফু, কশিফু, ফানা ও বাকা নামে, পদ্ম 'লতিফা' নামে, বজ্র বা বীর্য 'শির' নামে, রাকিনী, শাকিনী প্রভৃতি জিব্রাইল, মিকাইল নামে পরিচিত হতে থাকে। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় তাই বলেন: "(আদিবাসীর) এই আদিমতম ধর্ম কর্ম ও ধ্যান ধারণার উপরই বাংলার বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য এবং অবৈদিক বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতিষ্ঠা।" (বাঃ ই)

পাল আমলের গোড়ার দিকে এই তত্ত্ব-সাহিত্য বৌদ্ধ সংস্কৃতে প্রাকৃতে অবহট্‌ঠে রচিত ও লিপিবদ্ধ হয়ে দেশান্তরেও প্রচারিত হয়। সম্ভবত সেন আমলে স্বদেশে বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে ঐসব পাণ্ডুলিপি স্বদেশে লোপ পেলেও নেপালে-তিব্বতে মধ্য এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ সমাজে মূল ভাষায় ও অনুবাদে ধ্বংসাবশেষেও কিছু রয়ে গেছে। অর্বাচীন অবহট্‌ঠে রচিত 'চর্যাগীতি' ঐ সাহিত্যের অন্যতম।

তুর্কী বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণ্য হুকুম ও হুমকিমুক্ত হয়ে নির্জিত বাঙালীরা তাদের জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে প্রকাশ করতে থাকে উপকথা, ইতিকথা, ব্রতকথা, ও তত্ত্বকথা রূপে। ধর্মপূজা বিধান, শূন্য পুরাণ, অনিল পুরাণ, এবং ধর্মঠাকুরের, মঙ্গলচণ্ডীর, বাসুলীর, জাঙ্গুলীর, যক্ষের, আদিনাথ-মীননাথ-গোরক্ষনাথের, কানুফা-হাড়িফার কথা আর জীবন-জিজ্ঞাসার রূপক যোগিপাল-ভোগিপাল-মহীপাল মাহাত্ম্য-কথা ও তান্ত্রিক সাধনার কথা আসরে আসরে, পূজা মণ্ডপে, পার্বণিক উৎসবে নাচ-গান-বাজনার মাধ্যমে গায়েন কথকরা উচ্চ কন্ঠে প্রচার করতে থাকে। যারা এ তত্ত্ব-সাহিত্য রচনা ও প্রচার করত সেই অস্ট্রিক-মঙ্গোলরা বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধরূপে এবং বৌদ্ধবিলুপ্তির পরে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী রূপে—এমনকি বিভিন্ন নামের বাউল ও সূফী রূপে দেশী মুসলিমরাও তা করত। লক্ষণীয় যে গীতা-স্মৃতি-পুরাণের আদর দেশী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে কমই ছিল। আজো বাঙালী হিন্দুরা দেশজ লৌকিক দেবতার পূজারী যাঁদের খবর মেলে না গীতা স্মৃতি সংহিতায়। ষোল শতকের কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর সমকালীন রাঢ় অঞ্চলের হিন্দু সমাজের 'ধর্ম-কর্মের' ফিরিস্তি স্পষ্ট ভাষায় দিয়েছেন:

> ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে
> মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন
(দুর্গা) পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহুধন।

বাসুলী পূজএ কেহো নানা উপচারে
মদ্যমাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।

যোগিপাল ভোগিপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিবারে সব লোক আনন্দিত।

উত্তর বঙ্গেও তখন অবৈদিক ধর্মের প্রচার প্রবল:

উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার
শৈব শাক্ত কর্মী যোগী বিভিন্ন আচার।

মদ্য মাংস মৎস্য মাস মুদ্রাতে সাধন
কামাখ্যার ব্রত মহীপালের জাগরণ।

যোগিপাল ভোগিপালের যাত্রা মহোৎসব
ভোট কম্বল চট পরিধান সব। (নিত্যানন্দের বংশ বিস্তার)

এ সূত্রে উল্লেখ্য যে বৈদিক কর্মকাণ্ড কিংবা ঔপনিষদিক তত্ত্ব এদেশে কখনো জনপ্রিয় হয়নি। গীতা স্মৃতি সংহিতার প্রভাব ব্রাহ্মণের মধ্যেই ছিল সীমিত; আর বিদেহ-উদ্ভূত উপনিষদের অনেক তত্ত্বে সাংখ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্য অনেককাল অম্লান ছিল। এখানে আদিনাথ মীননাথ গোরক্ষনাথ হাড়িফা কানুফা ময়নামতী মানিকচাঁদ গোপীচাঁদ তত্ত্ব ও মহাত্ম্য কথা লেখকের জীবন-জিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্ম-পিপাসা মিটাত। নাথযোগী (তাঁতীরা), ধর্মপূজারী, বাউল-সহজিয়া ও শৈব গোরক্ষপন্থী বৈরাগীরা আজো একহিসাবে সনাতন তথা আদিবাসী অস্ট্রিক মঙ্গোলের মৌল ধর্মপন্থী ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

দশ-এগারো শতক থেকে প্রসারমান ব্রাহ্মণ্যমতের প্রভাবে লৌকিক রাধা-কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ-মহাভারত কাহিনী এবং দশ-এগারো শতকে রচিত নানা পুরাণ কথাও বাঙলাদেশে চালু হল—এগুলো আসরে আসরে নাচ-গান-বাজনা সহযোগে গায়েন-কথকরা প্রচার করে বেড়াত। এভাবেই একটা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ক্রমশ দেশময় পরিব্যাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ্য পুরাণের মধ্যেও প্রাচীন তত্ত্ব প্রকট ও প্রচ্ছন্নভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে—একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। মনসা বিজয় ও পদ্মাপুরাণে তাই আমরা যথাক্রমে ধর্ম-নিরঞ্জন ও কামরূপ কামাখ্যার ডাকিনী-যোগিনীর উল্লেখ পাই। সেন আমলে যা ছিল গুপ্ত আচারের ও অন্তরঙ্গ আলাপের

বিষয়, তুর্কী আমলে তা প্রকাশ্য চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়াল এবং পনেরো শতকের গোড়ার দিকে কিংবা চৌদ্দ শতকের অন্তিম পাদে তা লিখিত রূপ পেতে থাকে মুখ্যত গায়েন-কথকের স্মৃতি সহায় রূপে। রামাই পণ্ডিত, ময়ূর ভট্ট, মানিক দত্ত, কানা হরি দত্ত, মানিক গাঙ্গুলী, প্রভৃতির নাম তাই আমরা বিভিন্ন শাখার বিলুপ্ত রচনার আদি কবি হিসেবে উল্লেখিত দেখতে পাই। মৌখিক রচনাও বহু মুখের পরিচর্যার ও পুনরাবৃত্তির ফলে রাগে ছন্দে অলঙ্কারে ও কলেবরে স্থানিক ও কালিক উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তার নিঃসংশয় প্রমাণ মেলে অব্যবহিত পরেরকার বলে স্বীকৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসাবিজয়, পদ্মা-পুরাণ, গৌরীমঙ্গল প্রভৃতি পাঁচালীর ভাষিক উৎকর্ষে, ছান্দসিক লালিত্যে, রাগ বৈচিত্র্যে, কাহিনীর জটিল বিন্যাসে ও বিদেশী শব্দের সুষ্ঠ প্রয়োগ নৈপুণ্যে এবং অনুবাদ সৌকর্যে। বাঙলা নিরক্ষর নিঃস্ব নিম্নবর্গের বুলি বলেই লিখিত বাঙলা সেন আমল অবধি চালু হতে পারেনি। সংস্কৃত প্রাকৃত অবহট্ঠ ও অর্বাচীন অবহট্ঠেই ছিল রচনার বাহন। সাংখ্যগুরু নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষের লোকায়ত ভাব ভাবনার প্রথম প্রকাশ ঘটে অশ্রেণীর নিরক্ষর কিংবা সাক্ষর লোককবি ও গায়েন-কথকের মুখে এবং সংখ্যালঘু কায়স্থ বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গণদাবী প্রতিরোধ কিংবা অস্বীকার করতে পারেনি বলেই, ব্রাহ্মণ্য মত ও বর্ণের অভিমান ত্যাগ করে ওদের হয়ে ওদের চিন্তা-চেতনার কথা প্রচার করতে থাকে। আর যেহেতু তারাও দেশজ ব্রাহ্মণ্যবাদী, সেহেতু অবচেতন আনুগত্যে ও বিশ্বাসে তারাও ঐ তত্ত্বে প্রত্যয়ী হয়ে উঠে—এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। রেওয়াজ বা ঐতিহ্য ছিল না বলেই বাঙলাকে লেখ্যরূপ দান চৌদ্দ শতকের আগে সম্ভব হয়নি। এবং লেখা শুরু যখন হল, তখনো দেবাদেশের দোহাই উচ্চারণ করেই দ্বিধা-সংকোচ-নিন্দা এড়াতে হল। স্থানীয় ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণ্য কিংবা রাজকীয় প্রশ্রয় অথবা শ্রদ্ধা থাকলে সেনরাজ দরবারে বাঙলা কবি দেখা যেত কিংবা 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বা সুভাষিত রত্নকোষের মতো বাঙলা প্রবাদ প্রবচন ও প্রাচীন কবিতার সংকলন গ্রন্থও মিলত। শেখ শুভোদয়া ধৃত বাঙলা আর্যা লিখিত চর্চার অভাবই নির্দেশ করে।

আমরা জানি মৌখিক বাণী মাত্রই জনান্তরে, স্থানান্তরে ও কালান্তরে ভাষা বদলায়, কাজেই আজো প্রচলিত রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, ডাক-খনার বচন মূলত সুপ্রাচীন কালের হলেও ভাষায় ভঙ্গিতে অনবরত রূপান্তরিত হচ্ছে। সেই রূপান্তর স্থানিক এবং কালিক। তাই 'খনা ডেকে বলে যান। রোদে ধান ছায়ায় পান' 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজা পুণ্য দেশ' অথবা 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' বা 'আপন মাংসে হরিণ জগৎ-বৈরী'—ভাষায় একালের।

কাজেই হাজার বছর আগেকার মৌখিক বাঙলা রচনার যে-কিছু ভাষায় আজো টিকে রয়েছে সেগুলোর (কয়েকটি শব্দের ব্যতীত) ভাষাতাত্ত্বিক কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু ভাষান্তরেও বর্ণিত বিষয়ধৃত দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কার ও সংস্কৃতি হারিয়ে যায় নি। তাই ভাষা যা-ই হোক, রচনা হিসেবে গোরক্ষনাথ মীননাথ হাড়িফা কানফা ময়নামতী-মানিকচাঁদ গোপীচাঁদ কাহিনী, শূন্যপুরাণ-ধর্মপূজাবিধান, পালগীতি প্রভৃতি হাজার বছরের পুরোনো। এগুলো যে বৌদ্ধ যুগের ও বৌদ্ধ সমাজের তাতে সন্দেহ নেই। নাথ-সাহিত্য বঙ্গ-সমতটে সৃষ্ট এবং ধর্ম-সাহিত্য রাঢ় অঞ্চলের দান।

পনেরো ষোল শতকে লিখিত পাঁচালী পাওয়ার আগ পর্যন্ত ধর্ম গীতি, চণ্ডী গীতি মনসা গীতি, রাধা-কৃষ্ণ কথা, ভারত কথা, রামায়ণ গীতি প্রভৃতি যে আসরে আসরে গীত হত তা আমরা অনুমান করতে পারি। তাছাড়া সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত সাহিত্যও লোকমুখে বর্ণিত হয়ে লোকশ্রুত ও পুনরাবৃত্ত ছিল—এ অনুমান অযৌক্তিক নয়।

অতএব বাঙলা সাহিত্যের মৌখিক উদ্ভবকাল দশ এগারো শতক। এ সাহিত্য লোকধর্ম ও জীবনকে অবলম্বন করে স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠেছে। এগুলো একাধারে লোক ও লোকায়ত সাহিত্য। জনে জনে স্থানে স্থানে ও কালে কালে এগুলোর ভাষিক রূপান্তর যেমন হয়েছে, কলেবরেও তেমনি স্ফীত হয়েছে। পরবর্তী কালের লিখিত পাঁচালীতেই বিবর্তন রুদ্ধ হয়ে সব কিছু স্থিতি ও স্থায়িত্ব পেয়েছে। এমনি বহু রূপকথা, উপকথা, ইতিকথা, ব্রতকথা, গান, ধাঁধা ও প্রবাদে-প্রবচনে-ছড়ায় বিবৃত জ্ঞানকথা কখনো লিপিবদ্ধ হয় নি এবং কালান্তরে লোপ পেয়েছে। মৌখিক রচনা তথা লোক-সাহিত্য কেবল চিত্তবিকাশের অবলম্বন ছিল না, লোকশিক্ষারও বাহন ছিল. জৈবিক নৈতিক জীবনাচরণ, ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনাচার এবং প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী সম্পৃক্ত জ্ঞান দানই ছিল প্রবাদ-প্রবচন-ছড়া-কিংবদন্তী-রূপকথা প্রভৃতির লক্ষ্য। মানুষ সবাক প্রাণী। অনুভূতি ও চিন্তাশীলতা তাকে অবাধ বাকময়তা দিয়েছে। কাজেই মানুষ মাত্রেরই জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা ভাষায় অভিব্যক্ত হয়। অতএব দশ থেকে চৌদ্দ শতক - এই পাঁচশ বছর ধরে বাঙলা ভাষায় লোকায়ত বিষয়ে মৌখিক লোকসাহিত্য সৃষ্টি ও লয়ের মাধ্যমে চালু ছিল। এই মৌখিক অনুশীলনের মাধ্যমেই বাঙলাবুলি লেখ্য ভাষার ও শিল্প-সুন্দর সাহিত্যের বাহন হওয়ার মতো উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তাই প্রথম লিখিত রচনাতেও আমরা রাগে-ছন্দে-অলঙ্কারে সজ্জিত ভঙ্গি-সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষা প্রত্যক্ষ করি। বলা বাহুল্য, মৌখিক রচনা মূলে ব্যক্তি বিশেষের রচিত হলেও বহু মুখের উচ্চারণে তা স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে নির্বিশেষ জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক অবদান হয়ে দাঁড়ায়। তাই এগুলো

গণ-রচনা বা লোক-সাহিত্য নামে পরিচিত। এবং মৌখিক রচনার ভাষা সাধারণত আঞ্চলিক।

১০

বাঙলা ভাষার ও রচনার লিখিত নিদর্শন

পাল আমলে বাঙলা বুলি তথা ভাষা স্বরূপে আত্ম প্রকাশ করেনি। তখনো স্থানিক ও আঞ্চলিক বিকৃতিবহুল অর্বাচীন অবহট্‌ঠই লোকমুখে চালু ছিল। এ অর্বাচীন অবহট্‌ঠ মাগধী প্রাকৃতেরই বিকৃত বিবর্তিত রূপ। কিন্তু লিখিত শিষ্ট পালি ও শিষ্ট প্রাকৃত মধ্যদেশীয় (যা' শৌরসেনী নামে অভিহিত) ভাষা। সংস্কৃত নাটকে ও অন্যত্র ছোটলোকের বুলি হিসেবে মাগধী প্রাকৃত এবং গানের ও কবিতার বাহন রূপে মারাঠী প্রাকৃত ব্যবহৃত হলেও, শিষ্ট জনের ভাষা চিরকাল শৌরসেনী বুলিই ছিল। কোন কোন বিদ্বানের মতে পালিও সংস্কৃত শব্দবহুল শৌরসেনী। বৌদ্ধ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শাস্ত্রকথা সুবোধ্য করবার জন্যে বৌদ্ধ শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রবিদরা এই কৃত্রিম শৈলী অবলম্বন করেছিলেন। উল্লেখ্য পালি কেবল হীনযানী (পরে থেরবাদী) বৌদ্ধদেরই শাস্ত্রীয় ভাষা, মহাযানী বিজ্ঞানবাদীদের নয়। মহাযানীরা প্রাকৃত মিশ্রিত সংস্কৃতে এবং শৌরসেনী প্রাকৃতে-অবহট্‌ঠেই শাস্ত্র সংকলন ও আলোচনা করেছেন।

আমাদের পূব-দক্ষিণ অঞ্চলেও (বিহার-উড়িষ্যা বাঙলা-আসামে) লেখ্য শিষ্ট ভাষা হিসেবে প্রথমে শৌরসেনী পালি, পরে শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহৃত হত। তাই অর্বাচীন অবহট্‌ঠে রচিত চর্যাগীতির ভাষাও স্থানিক-বিকৃতি বহুল শৌরসেনী অবহট্‌ঠই এবং আমাদের বাঙলার বাকপদ্ধতি তথা বাক্য গঠন রীতিও সেই শৌরসেনী অবহট্‌ঠ ভিত্তিক—আঞ্চলিক তথা মাগধী প্রাকৃতজ গৌড়-বঙ্গ মাগধী অবহট্‌ঠ নয়। মাগধী প্রাকৃতে শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে স্থিত ব্যঞ্জন ও সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণে বিবর্তন বিকৃতি ও বিলোপ তত্ত্বের এবং কারক চিহ্নের আলোকে চর্যাগীতির কিংবা প্রাচীন লিখিত বাঙলার শব্দ, উচ্চারণ ও বাকরীতি যাচাই করা হলে আমাদের ধারণা সমর্থন পাবে। লিখিত বাঙলায় মাগধী প্রাকৃতের বিবর্তন ধারার লক্ষণ দুর্লভ দেখেই ডক্টর শহীদুল্লাহ 'গৌড়ী প্রাকৃত' তত্ত্ব চালু করেছিলেন।

বাঙলা বুলির প্রাচীনরূপ প্রকট হয়ে উঠে দশ শতকে এবং শ্রুতি ও দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপে অনন্যতা লাভ করে এগারো শতকে এ অনুমান একান্তই কাল্পনিক নয়।

উড়িষ্যা বাঙলা-মিথিলা-আসামের তথা পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলের লেখ্য অর্বাচীন অবহট্‌ঠে লিখিত চর্যাগীতি এর অন্যতর প্রমাণ। গীতিগুলো ঐ চার অঞ্চলের কবি রচিত। এগুলি রচনাকালে উড্ডিয়ানা-নালন্দা-সোমপুরী বিহারের প্রভাব সমাজে অম্লান ছিল বলে মনে করি। বাঙলা বুলিরূপ মাগধী অবহট্‌ঠের বিকৃতি প্রসূত হলেও, লেখ্য বাঙলার আদর্শ ছিল লেখ্য অর্বাচীন অবহট্‌ঠ তথা শৌরসেনী অবহট্‌ঠ যাতে সরহ কানুফা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিদ্বানেরা শাস্ত্রিক দার্শনিক গ্রন্থ এবং দোহা ও গান রচনা করেছেন। তাই প্রাচীন বাঙলা রচনার নমুনায় স্থানীয় বুলির প্রভাব সামান্য এবং সংস্কৃত শব্দ গ্রহণের আগ্রহ প্রকট।

বিভিন্ন বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বাঙলা শব্দের ও ছড়ার বা পদের সাক্ষাৎ মেলে। এ-সব গ্রন্থের রচনা কিংবা সংকলন কাল বা লিপিকাল বারো থেকে চৌদ্দ শতক.

ক. শেখ শুভোদয়া : এটি ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের পরে কোন সময়ে রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণসর্বস্ব নামের স্মৃতি সংকলক হলায়ুধ মিশ্র রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ। হযরত জালাল উদ্দীন তাবরেজী নামের দরবেশের মাহাত্ম্যকথা এতে বর্ণিত। কাহিনী বর্ণনা সূত্রে বাঙলায় কয়েকটি আর্যা (ছড়া), গান এবং সংলাপাংশ বিধৃত রয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে 'সেগুলির ভাবে ও ভাষায় পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেকার রেশ অনুভূত হয়।... (হঙ যুবতী পতিয়ে হীন পদে) নামক্রিয়া পদে প্রাচীনত্ব লক্ষণীয়।'—হঙ, পতিয়ে, কাজ, সিনাইবাক, মুঞি জাঙ, গেইল, (বা. সা. ই. পৃঃ ৩২৭-৮০)। এ গ্রন্থে বিদেশী শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে— কাজি, খাতক, জহাজ চাবি, নমাজ প্রভৃতি। বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

নমুনা

১. হঙ জুবতী পতিএ হীন
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইএ দিন ॥

দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ।
বায়ু ন ভাঙ্গএ ছোট গাছ ॥

ছাড়ি দেহ কাজ্জ মুঞি জাঙ ঘর।
সাগর মৈদ্ধে লোহাক গড় ॥

হাত জোড় করিঞা মাঙ্গো দান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান ॥

বড় সে বিপাক আছে উপাএ।
সাজিয়া গেইলে বাঘে ন খাএ ॥

পুন পুন পাএ পড়িয়া মাঙ্গো দান।
মৈদ্ধে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ ॥

শ্রীখণ্ড চন্দন অঙ্গে শীতল।
রাত্রি হৈলে বহএ আনল ॥

পীন পয়োধর বাঢ়ে আগ।
প্রাণ ন জায় গেল বহিএঁা ভার ॥

নয়ান বহিএা পড়ে নীর নিতি।
জীএ ন প্রাণী পালাএ ন ভীতি ॥ —ডাকিনীদ্বয়

২. মকদম সেক সংজলাল তবরেজ তব পাদে করোঁ পরনাম
চৌদীশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম।
বারেক রক্ষা কর মোর পণ প্রাণ
দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্দ্ধেক দান ॥ — বণিক

৩. বনের শাক খায় সেক বনের গোনা।
ঝিকরির পোটলি বান্ধিয়া দেয় সেক
হাটে বিকাইলে হয় সোনা ॥ —ভাট

৪. শ্রীমল্ লক্ষ্মণ সেন মহাবীর।
কর্ণরন্ধ্রে ভেজে তীর।
শ্রী লক্ষ্মণ কি রাজা বড় বীর।
অভ্যাসের কারণে ভেজে তীর ॥ -- ভাট ও মদন

৫. কবে কেন ?
যবে যেন। — সেক ও মন্ত্রী

খ. চর্যাগীতির মুনিদত্ত কৃত টীকায় উদ্ধৃত চারটি পদাংশও বাঙলা বলে দাবী করা যায়। মুনি দত্তের 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়-'র টীকা চৌদ্দ শতকে রচিত বলে অনুমিত হয়। নাড়পাদের সেকোদ্দেশ টীকায় ও ভুসুকুর 'চতুরাভরণ'-এ উদ্ধৃত কিছু রচনাংশকে বাঙলা মনে করা হয়। চর্যাপদাবলীর ভাষা যদি অর্বাচীন অবহট্‌ঠ হয়, তা' হলে এগুলোও অবহট্‌ঠ,—বাঙলা নয়।

১. কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্মকুরঙ্গ সমাধিক পাট
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা। - মীননাথ

২. সে তেতীসেঁ ন বর্তীসেঁ
এতিঅ মণ্ডল নাহি বিশেষে। —অজ্ঞাত

৩. ঘাট ন গুন্মা খড়তড়ি বোহঅ
অক্খি বুঝিআ মাগ চালী। —ঐ

গ. নাড়পাদ রচিত সেকোদ্দেশ টীকায় কাহ্নুর একটি, শান্তির চারটি ও শবরের একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রাপ্ত টীকার লিপিকাল ১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দ। পদগুলো বাঙলা ভাষায় রচিত বলে অনুমিত।

১. বামে দাহিনে গুম ঘাট।
ভনই কাহ্নু আন্তরালেঁ বাট।। —কাহ্নু

২. অম্বর ফুলিলা মাকাএ অপতিঠাণ গরুআ
ভাবাভাব বিমুক্কা রে সকলই সুদ্ধ সরুআ।
চিন্তা চিন্তুতে পোহাই গেলি রাতী
দীবা জালী বাট চাহন্তি শান্তি।। —শান্তি

৩. উইঅউ রে ভূসুকু তারা।
শান্তি ভনই পোহান্তি পহারা।। —ঐ

৪. কীস কএলেক অবভুআ
চান্দ সুজ্জ বান্ধি জালিলিক দীপা।
হসই শান্তি সঅ আপন করী সখী
আকাস বিআঅল দেখী।। —ঐ

৪. অপূর্ব বসন্ত দুকেল্লা শবরো অম্বর ফলই ফুল্লই।
তোড়িঅ হাথে ন চাহিঅই বিরহেঁ কেলি করেই।। —শবর

ঘ. 'চতুরাভরণ' ভুসুক রচিত এক মহাযানী চর্যাগ্রন্থ। নেপাল থেকে পুথিটি সংগৃহীত। কোলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর পুথিশালায় রক্ষিত, লিপিকাল ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দ।

১. অম্বু পসরতু চন্দন বারহ অক্ক।
হেটঠ কমল করি শয়ন থক্ক॥
সূজ চাপ্পি শশি সমরস জাই।
রাউতু কেলে জর-মরণ নাই॥
বেঅদণ্ড চউদ্দ চর্যাহ।
স্থরকায় ছাড়ি ন যাই॥
সো দূর যোগীএ ন জানিহু খোজ।
গুরু নিন্দা করি যোগ॥

২. রবিকলা মেলহ, শশিকলা বারহ, বেণি বাট বহন্ত
তোড়হ সমস্তা সমরস জাউ ন জায়তে কাগ ন জগফলা খায়॥

ঙ. মানসোল্লাস বা অভিলাষার্থচিন্তামণি সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ। এটি চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের আগ্রহে ১১২৯ খ্রীস্টাব্দে সংকলিত। 'গীতিবিনোদ' নামের সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ক অধ্যায়ে উদ্ধৃত কোন কোন পদাংশ বাঙলা বলে অনুমান করেছেন ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

'জে ব্রাহ্মণের কুলে উপজিয়া কার্তবীর্যা জিনে বাহু ফরসে খণ্ডিয়া পরশরামু দেবু সে মোহার মঙ্গল করউ।" (যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে বাহুস্পর্শে কার্তবীর্য খণ্ডিত করে জয় করেছিলেন, সেই পরশুরামদেব আমার মঙ্গল করুন।)

চ. হেমচন্দ্র কর্তৃক বারো শতকে সংকলিত 'দেশীনামমালা' গ্রন্থের কিছু শব্দে বাঙলার আদল প্রত্যক্ষ করেছিলেন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।

অলট্টপলট্ট—উল্টাপাল্টা	ঝাড়—ঝাড়
উত্থল্ল-পত্থল্ল—উথাল পাথাল	ঝাড়ী—ঝাড়
টিপ্পনী—টিপ	ডালী—ডাল
টুংটো—ঠুটো	ডোলা—ডোলা
ডলো—ডেলা, ঢেলা	ঢংকনী—ঢাকনী
কাট্টারী—কাটারী	ঢংঢল্ল—ঢলঢলে
খড়—খড়	থরহরিয়—থরহরি
খড়কী—খিড়কী	ধন্ধা—ধাঁধা
খলী—খোল	ফগগু—ফাগু

গঢ়—গড়	বল্লা—বোলতা
চট্ট—চাটু	বিহান—বিহান
চাউল—চাউল	রোল—রোল
চিল্লি—চিল	হড্ড—হাড়
চূড়ো—চূড়া	হেলা—হেলা
ছিনাল—ছিনালী/ছিনাল	ছিবই—ছোঁয়া
জড়িত—জড়িত	ঝলঝলিয়া—ঝলমলে
ঝলসিঅ—ঝলসানো	ঝলা—ঝলা

ছ. ১১৫৯ খ্রীস্টাব্দে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ রচিত 'টীকাসর্বস্বে' প্রায় তিনশোর মতো বাঙলা শব্দ মেলে বলে বিদ্বানদের ধারণা।

উআরী—কাছারি	তেলাবনী—তেলন, হাঁড়ি	জুমাল—জুয়াল
ওসার—ওসার	নেবালী—নবমল্লিকা	ঝম্পান—ঝাঁপান
কিঞ্চোছি—কেঁচো	পরসু—পরশু	শিহড়—শিকড়
খড়কি—খিড়কি	পেড়া—পেটরা	হাথইড়া—হাতুড়ি
খলি—খইল	ফরিঙ্গ—ফড়িং	হেন্ট—হেট
ঘাঘরী—ঘাগরী	ফোড় – ফোড়া	চাল – চাল
বাদিয়া—বেদে	চিড়া—চিড়া	বোন্ট—বোঁটা
তেলাকোচ—তেলাকুচা	বেঙ্গ—ব্যাঙ	

জ. ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত 'চৈনিক-সংস্কৃত' অভিধানে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কিছু বাঙলা শব্দের সন্ধান পেয়েছেন।

আইশ—এসো	খট—খাট
পর্হ্যন—পরা	ভতার—ভাতার
বসন—বসা	মইস—মহিষ
মোট্ট—মোটা	মুগ—মুগ
এহ—এই	হট—হাট

ঝ. এ ছাড়া প্রাচীন পট্টোলী-অনুশাসনেও কিছু বাঙলা শব্দ মেলে :

আঢ়া—আড়ি	জঙ্গাল—বাঁধ, আল
খাড়ী—খাড়ী	জোল—নালা
খিল—পতিত জমি	নাল—চাষের জমি

বরজ—বরোজ

১১

বাঙলাভাষার বিবর্তন ধারার নমুনা

অলিখিত রচনার ভাষা কখনো অবিকৃত থাকে না। স্থানে স্থানে, কালে কালে মুখে মুখে তা বদলায়। এ জন্যে মূলত ব্যক্তি বিশেষের রচনা হলেও তথা ব্যক্তি বিশেষের কল্পনা বা প্রজ্ঞাপ্রসূত হলেও রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা ইতিকথা, কিংবদন্তী, প্রবাদ, প্রবচন, গান, গাথা প্রভৃতি লোকসাহিত্যের অন্তর্গত যা কিছু আজ অবধি চালু রয়েছে, সে সবের কোনটারই ভাষা উদ্ভবের বা রচনার সমকালের নয়। ডাক-খনার বচনরূপে আজো যা চালু রয়েছে সেগুলোর ভাষাও আমাদের সমকালের রূপ প্রাপ্ত। তবু দীনেশ চন্দ্র সেন-বিধৃত কয়েকটি প্রাচীন রূপের নমুনা দেবার চেষ্টা করছি। ডক্টর দীনেশ সেনের মতে ডাক-খনার বচনের উদ্ভব কাল আট থেকে বারো শতক।

ক. ডাকের বচন :

১. আদি অন্ত ভুঝসি
ইষ্ট দেবতা জেহ পূজসি
মরণের যদি ডর বাসসি
অসম্ভব কভু না খায়সি।

বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড
আগল হইলে নিবারিব তুণ্ড
যাহার বহু ঝি দূর জান্তি
তাহার নিকট বসে অসতী

৩. জন্ম মাত্র বলে ডাক
পো এড়িয়া পোয়াতি রাক
ধুইয়া পোঁচছাআ দিহ কোলে
যবে ফুল নাম্বিবেক ভালে
নাড়ি ছেদিয়া দিহ জয়
ডাক বলে এই হয়।

ঘরে আখা বাহিরে রান্ধে
অলপ কেশ ফুলাইয়া বান্ধে
ঘন ঘন চাহে উলটিয়া ঘাড়
বলে ডাক এ নারী ঘর উজার।

খ. খনার বচন :

১. আষাঢ়ে কাড়ান নামকে
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে
ভাদরে কাড়ান শীষকে
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে।

৩. খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি
ঘরে বসে পুছে ভাত
তার ভাগ্যে হাভাত।

২. আঘনে পৌটি পৌষে ছেঁউটি
মাঘে নাড়া ফল্গুনে কাঁড়া।

গ. রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ

'শূন্য পুরাণ' যে বৌদ্ধ যুগের তথা বৌদ্ধ বিলুপ্তির আগেকার তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্যে ষোল-সতেরো শতকের দিকে লিখিত রূপ পেলেও 'শূন্য পুরাণের' ভাষায় কিছু কিছু প্রাচীনতার ছাপ রয়ে গেছে।

১. দুআরিরে ভাই ধর গিআ তুহ্মার দণ্ডর নন্দন।
পশ্চিম দুআরে দানপতি যাঅ।
সোনার জাঙ্গালে পথ বাঅ ।।
সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে।
বসুআ আপুনি আইল সেইত বরণর চনা
শেতাই পণ্ডিত চারিশঅ গতি।
চন্দ কোটাল নাহি ভাঙ্গএ চনার বিবেচনা।

২. ধর্ম হৈল যবনরূপী মাথাএত কাল টুপী
হাতে শোভে ত্রিরুচ কামান
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিআ এক নাম ।।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলে দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যে একমন
আনন্দে পরিল ইজার ।।

ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল শূলপাণি।
গনেশ হৈল গাজী কার্তিক হৈল কাজী
ফকীর হৈল যত মুনি।।

ঘ. শেখ শুভোদয়া

হলায়ুধ মিশ্রের 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থ (বারো শতকের শেষ দশকে বা) তেরো শতকের প্রথম দশকে রচিত বলে মনে করি। সংস্কৃতে লেখা এ গ্রন্থেও কিছু বাঙলা আর্যা ও কবিতা আছে।

যেমন,—

১. (ভাটিয়ালী রাগেন গীয়তে)
হও জুবতী পতিএ হীন।
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইএ দিন।।
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ।
বায়ু ন ভাঙ্গএ ছোট গাছ।।
ছাড়ি দেহ কাজ্জু মুঞি জাও ঘর।
সাগর মৈদ্ধে লোহাক গড়।।
হাত জোড় করিঞা মাঙো দান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান।।

ঙ. প্রাকৃত পৈঙ্গল।

পিঙ্গল রচিত ছন্দ শাস্ত্রের এই গ্রন্থ চৌদ্দ শতকের। এতে অপভ্রংশ বলে উদ্ধৃত কিন্তু বাঙলার লক্ষণাক্রান্ত একটি গান মেলে:

তরুণ তরণি তবই ধরণি
পবণ বহ খরা।
নগ-নগি জল বড় মরু থল
জন-জীবন হরা।।
দিসই ব্লই হিঅঅ দুলই
হমি একলি বহু।
ঘর নহি পিঅ সুনহি পহিঅ
মন ইচছই কহু।।

চ. ময়নামতী মানিকচন্দ্র গোপীচাঁদের গাথা। এ কাহিনী সমতটে চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের আমলের। কুমিল্লা জেলার লালমতী, ময়নামতী পাহাড় এখনো রয়েছে, শালবন বিহার ও রাজবাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত গোবিন্দচন্দ্রদেবই 'গোপীচাঁদ' রূপে গাথায় পরিচিত। যোগ-তান্ত্রিক সিদ্ধির মাহাত্ম্য প্রচারই নাথ সাহিত্যের লক্ষ্য। মুখে মুখে নাথ-গাথা আজো চালু রয়েছে। এই শতকে সংগৃহীত হয়ে মুদ্রিতও হয়েছে। তার আগে অবশ্য 'গোরক্ষ বিজয়' ও 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' লিখিত পাঁচালীর রূপ পেয়েছিল ষোল সতেরো আঠারো-উনিশ শতকে। আমরা দীনেশ সেন সংগৃহীত লোক-গাথার কিছু অংশ 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' থেকে উদ্ধৃত করছি। যদিও এই গাথার উদ্ভব চন্দ্ররাজ গোবিন্দচন্দ্র ও রাজমাতা ময়নামতীর সমকালের অর্থাৎ দশ শতকের। [কেননা ইতিহাস বিহীন সেই যুগে দীর্ঘ সময়ের পরে আধুনিক নাটক উপন্যাসের মতো মুদ্রিত ইতিহাস দেখে পুরা কাহিনী নিয়ে গাথা রচনা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সব বিস্মৃতির অতলে ডুবে যেত] এবং ভাষা স্থানিক ও কালিক রূপান্তর পেয়েছে, তবু ভাষার মধ্যে (এবং কাহিনীর মধ্যেতো বটেই,) প্রাচীনতার কিছু ছাপ রয়ে গেছে।

তু যে মহাগুরু সেবা করিলাহুঁ বাবুঁ।
কর্ণে মন্ত্র পাই খিলে কারণ পাইবু॥
তারই মারই গুরু বচন প্রমাণ।
গুরু সেবা কলা লোক লভন্তি কারণ॥
যার সেবা নাহি গুরু পশু বলি তাকু।
গুরুর আজ্ঞাএ মোক্ষ হুঅই পিণ্ডকু॥
পিতা-মাতা ঠারু গুরু বড় বলি জান।
মন দৃঢ় করি ধর শ্রীগুরু চরণ॥
শিষ্য পুত্র হোই সেবে গুরুকো আশ্বাসী।
দুই বল লাগি মধ্যে রো ভেলা ভাসী।

ছ. শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' বীরভূম জেলায় প্রাপ্ত এবং একে বাঙলা ভাষায় প্রাপ্ত লিখিত সাহিত্যের প্রাচীনতম ও অকৃত্রিম নিদর্শন বলে স্বীকার করা হয়। চৌদ্দ শতকের গোড়ার দিকে এ গ্রন্থ রচিত বলে অনুমিত। এটি মূলত গায়েনের মুখ নিঃসৃত গীতি-নাট্যের লিখিত রূপায়ণ। তাই বোধ হয়, এর ভাষায় আঞ্চলিক বুলির কিছু ছাপ ছিল।

১. বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিনী।।

কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভি মুলে দুই কুচ লুলে।।

২. চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা
মো পরিহরিলোঁ তোরে।
বাপ নন্দঘোষ মাঅ যশোদা।
তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে।।

সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ।
জুড়িএ আগুন তাপে
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে।।

যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ
তোর সুরতির আশে।
বোল দিআঁ মোক ভার বহায়িলেঁ
দেখি লোক উপহাসে।।

জ. শাহ্ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর আমলে (১৩৮৯-১৪১০ খ্রী:) রচিত বলে নানা প্রমাণে ও অনুমানে আমরা বিশ্বাস করি।

শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য (আনু: রচনাকাল ১৩৮৯-১৪১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে)

বনের অন্তরে যদি চলে ভ্রাতৃগণ।
ইছুফক প্রহার করিতে হইল মন।।

কোহ্ন ভাই করাঘাত অঙ্গেতে মারিল।
কেহো দুষ্ট বাণী বুলি কর্ণ মোচরিল।।

কেহো মারিলেন্ত ঠেলা মারিয়া চাপড়।
একে একে কাড়ি লইল গায়ের কাপড়।।

কোহ্ন ভাই ক্রুদ্ধ হয়ে মারে অনুরাগে।
আর ভাই নিকটে যায়ন্ত দয়াভাগে।।

সেহো ভাই ঠেলা দিয়া ফেলে একপাশে।
আর ভাই কাছে গেল হইয়া হতাশ।।
সেহো ভাই নিদয় হৃদয় লইয়া মারে।
আর ভাই নিকটে যায়ন্ত বস্ত্র কাড়ে।।
কোহ্ন ভাই মায়া নাহি সবে মারে বেড়ি।
কান্দিতে লাগিলা তবে বাপ অনুসারি।।

গদ্যের নমুনা :

১. ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ কর্তৃক অহোমরাজ (আসামরাজ) চুকামফাস্বর্গদেবকে লিখিত পত্রাংশ : লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমরা এগোট কর্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুম সর্দ্দার উদ্ভণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

২. ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে (১৫৫৩ শকাব্দে) গৌহাটির ফৌজদার নওয়াব আলেয়ার খান কর্তৃক আসাম রাজাকে লিখিত পত্রাংশ :

স্বস্তি বিবিধ গুনগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলেয়ার খাঁ সদাশয়েষু। সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্রহিত আসিয়া আমার স্থান পহুঁছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ মনস্বিতা না রহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছো তোমার আমার অদ্বয়ভাব প্রীতি বাটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক। "

৩. একটি চুক্তিপত্র —১১০৩ সালে বা ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত :

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসহেষু।

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস আগে আমরা দুই লুকে করার করিলাম জে কিছু বারে সুনারগায় ও গর খ রিক্রি সকরাত ২দু ই রূপাইয়া করিয়া আরত দালালি লইব আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নিঅমে করা পত্র দিলাম স ১১০৩ তে ১৪ আগ্রান"।

৪. ১১৮৫ সালে তথা ১৭৭৮-৭৯ খ্রীস্টাব্দে লিখিত অভিযোগ বা আবেদন-পত্র :

গরিবনেওয়াজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুহ গ্রাম দরিয়াশীকিশতী হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শ্তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মাল গুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুঁচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবণ।

ফিদবী

জগতধির রায়।

৫. "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৩৫ সনে রচিত ১৭৪৩ সনে লিসবনে মুদ্রিত)

গুরু। অপূর্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে আমি মালা জপি না; তথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জপি খ্রিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজনা করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্য। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন; সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরানীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরানীর ভজনা বিনে আর যত ভজনায় বাছ মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরানীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই শোন।" পৃঃ ৫৪।

৬. ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ (১৭ শতকের শেষপাদে রচিত)

"ব্রা। যদি পরমার্থে জিগ্গাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএনা যে পরমেশ্বর এমত করেন; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা যেত্তো কালের পাপে করমাক্কিতে লওয়াএ।"

৭. একখানা অবৈষয়িক পত্রাংশ : ১৭৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত)

৭ শ্রীশ্রীহরি ।। সকাব্দা ১১৭৫ ।। তাং ১৭ বৈশাখ ।।

বৈকালিক নিদ্রা হইতে উঠিয়া কৃষ্ণরাম গোবিন্দ স্মরণ করিলাম ২৩ চন্দ্র শর্মা দ্বারে ডাণ্ডাইয়া কহিলেন তোমার এটা কষ্ট কল্পনা ২ বার কহিলেন এবং হাস্য করিলেন শুনিলাম উত্তর করিলাম না ১৯ রোজ এক পয়ার চাহিলাম কহ লিখি তাহাতে বড় বেজার হইলেন এবং মুক নামিয়া কহিলেন আমিহ দেখিয়া পুথি বান্ধিলাম ক্ষনেক পরে কহিলেন পাঁচজন একত্রে বসিয়া হাঁসিবা একারণ মিছে আর কিছু নহে শুনিলাম উত্তর করিলাম না পরে ২৫ পচিসা রোজ [কু] সরকারে [র] সহিৎ বৈকালিক গ্রন্থ লৈয়া করিতেছিলেন " (ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত

[পুথি পরিচয় ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০]

৮. সাহিত্যের গদ্য : মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র (আঠারোশতক) :

মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনবতি সোড়ষ বরিষ্যা সুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেধের রঙ্গ চক্ষু আকর্ন্ন পর্যন্ত যুগ্ম্য ভ্রূর ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিম বর্ণ হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্ব ফল রূপলাবন্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন সুন্দরি সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পণ করিয়াছে রাত্রের মধ্যে যে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব।...একখাটে কন্যা সোয়ে একখাটে রাজপুত্র সোয়ে। যে রাজপুত্র জেমন জ্ঞানবান হয়, সে সেইরূপ কথা সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না : সকালে উঠে : রাজপুত্র : ঘরে জায়।

[৭ সংখ্যক ব্যতীত সব উদ্ধৃতি সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' থেকে নেয়া।]

১৮-১৯ শতকের য়ুরোপীয়দের লিখিত বাঙলা গদ্যের নমুনা দেয়া এ-ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কেননা, বাঙালীরা ওদের গদ্যকে আদর্শ করেনি।

তৃতীয় অধ্যায়

১

চর্যাগীতি পাঠের ভূমিকা

বৌদ্ধ বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গোটা ভারতের মাটি থেকে বৌদ্ধ শাস্ত্র, সাহিত্য এবং ঐতিহ্যেরও বিলুপ্তি ও বিস্মৃতি ঘটে। মাত্র শতোর্ধ্ব বছর আগে পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা [জার্মান পণ্ডিত ইউজেন বুনফ (১৮৪০ সনে) বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনায় পথিকৃৎ] এবং তাঁদের অনুসরণে দেশী পণ্ডিতেরা সিংহল, বর্মা, শ্যাম, ইন্দো-চীন, নেপাল তিব্বত ও চীন থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্য নতুন করে আবিষ্কার করে আলোচনা শুরু করেন। তিব্বতী, চীনা ও মঙ্গোলীয় ভাষায় অনূদিত হয়েই মুখ্যত বৌদ্ধশাস্ত্র ও ধর্মীয়সাহিত্য রক্ষিত হয়েছে। অনেক গ্রন্থেরই মূল গেছে হারিয়ে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত মূলের ক্বচিৎ কোন খণ্ডিত বা অখণ্ড পুঁথিও মিলেছে নেপালে ও মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু সে পাঁচ-সাতটি মাত্র। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ও ধর্মদ্বেষণা আস্তিক মানুষে এত প্রবল যে বিধর্মীর শাস্ত্র নষ্ট করা পুণ্য কর্ম বলেই তারা জানে। তাই ভাবতে কেউ কৌতূহল বশেও বৌদ্ধগ্রন্থ রক্ষা করে নি। গোটা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত একটা ধর্ম-সংস্কৃতির জন্মভূমে এমন নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তি ও বিস্মৃতি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি একদিন ভারতকে বহিঃবিশ্বে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দু'হাজার বছর আগে বহিঃ-বিশ্বে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি ও অনুকৃতি বৌদ্ধদেরই সাংস্কৃতিক বিশ্ববিজয়ের স্মারক।

এত করেও সবটা লোপ করা যায়নি। প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদী ও মুসলিমদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব, সাধন-চর্যা এবং নানা পার্বণিক ও আনুষ্ঠানিক বিশ্বাস-সংস্কার প্রায় অবিকৃতভাবে রয়েই গেছে। এমনকি কোন কোন বৌদ্ধ লৌকিক দেবতাও স্বনামে ও নামান্তরে হিন্দুর বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুর পূজ্য ও উপাস্য হয়ে রয়েছেন, যেমন—আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, লোকনাথ, অবলোকিতেশ্বর, ধর্ম ঠাকুর, তারা, তারিতা, বাসুলী (বৎসলা), ক্ষেত্রপাল, যক্ষ প্রভৃতি। মুসলমানদেরও কদমমোবারক,

হযরত বাল, দরগাহপ্রীতি, প্রভৃতি বুদ্ধের নখ-অস্থি-কেশ প্রতীক বৌদ্ধস্তুপের স্মারক। বাঙলার বৈষ্ণব-সহজিয়া, বাউল, ও সূফীসাধনা নামান্তরে বৌদ্ধ যোগতান্ত্রিক সাধনাই। ভারত ব্যাপী ভাস্কর্যে, মূর্তিশিল্পে, ও চিত্রকলায় বৌদ্ধ অবদান আজো গৌরব-গর্বের। মগ্ন-চৈতন্যে বৌদ্ধ-সংস্কারের, সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের প্রভাব না থাকলে কেবল মুসলিম তুর্কী প্রভাবেই দেব-দ্বিজ-বেদ-বিরোধী রামানন্দ, কবির, রাম-দাস, দাদু, নানক, চৈতন্যের আবির্ভাব সম্ভব হত না, বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন বেদান্ত-দর্শ-নের থেকেও সূক্ষ্ম, জটিল ও 'বিচিত্র হয়ে যে উঠেছিল, তা' আজকাল আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিভিন্ন মতের বৌদ্ধ দর্শনের আজো সম্যক আলো-চনা হতে পারেনি স্বভাষায় মূলগ্রন্থের অভাবে। কিন্তু চীনা তিব্বতী গ্রন্থসূত্রে ছিটেফোঁটা যেসব তথ্য ও তত্ত্ব মেলে---তাতে এককালের এদেশী মনীষার বিস্ময়-কর প্রকাশ-বিকাশেরই আভাস পাই। জটিলতায়, সূক্ষ্মতায়, চিন্তার উৎকর্ষে ও ঔজ্জ্বল্যে অত্যাধুনিক অস্তিত্ববাদের, হেগেলের ডায়লেকটিসের কিংবা নিটসের ও বাগর্স-র তত্ত্বের প্রতিস্পর্ধী বৌদ্ধ যোগাচার ও মধ্যমক দর্শন। উৎস উপনিষদ হলেও শঙ্করের জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদ প্রত্যক্ষ বৌদ্ধ প্রভাবেরই ফল। তাই এই তত্ত্ব দিয়েই বৌদ্ধ বিলোপ সম্ভব ও ত্বরান্বিত হয়েছিল।

বিশেষ করে বাঙালীর লোকায়ত বিশ্বাসে, সংস্কারে, আচারে ও লৌকিক দেব-কল্পনায় বৌদ্ধ প্রভাব প্রকট। এক কথায় বাঙালীর তত্ত্ব-চেতনার মূলে রয়েছে বৌদ্ধ যোগতন্ত্রের প্রভাব---যা এক কালে মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজ-যানরূপে বাঙালীর জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করত।

কাজেই চর্যাগীতি আলোচনার আগে পটভূমি হিসেবে বৌদ্ধশাস্ত্রের সামান্য পরিচিতি আবশ্যক বলে মনে করি। গৌতম বুদ্ধ মানবের জীবন-যন্ত্রণার অবসান বা উপশম চেয়েছিলেন, এই মানব-দুঃখের কারণ ও প্রতিকার-উপায় আবিষ্কারই তাঁর কীর্তি - মানব সভ্যতায় ও ধর্মদর্শনে তাঁর অবদান। তিনি দুঃখের কারণ স্বরূপ যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তার নাম 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' বা সংশ্লিষ্ট কারণ-পরম্পরা। এরা সংখ্যায় বারোটি—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ইন্দ্রিয় বা ষড়া-য়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরা-মরণ। এগুলোই জীবন-যন্ত্রণার উৎস। দৈহিক ইন্দ্রিয় দিয়ে চেতনায় এদের প্রবেশ এবং ধর্ম (ভাব) ও সংস্কার (ভাবলব্ধ জগৎ-চেতনা) রূপে এরাই চিত্ত বা মন বা চেতনাকে চালিত করে। বুদ্ধের চোখে সবটাই দুঃখজনক—জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ, অলাভ ও পঞ্চইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু বা ভাব,---এই অষ্ট প্রকার রূপান্তর বা অনুভূতিকে অষ্টস্কন্ধ বলা হয়। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়জ ভাব ও জ্ঞান অনিত্য,

প্রাতিভাসিক সত্য, মায়া বা মিথ্যা—অবিদ্যা জাত কাম, রূপ ও অরূপ তৃষ্ণা। এর দ্বারা বিভ্রান্ত বা চালিত না হবার মতো অক্লেশ অবৈর অনাসক্ত চিত্ত-স্থিরতারই নাম তথা নির্বেদ আত্মার নাম নির্বাণ বা শূন্যতা— সর্বম অনিত্যম সর্বংশূন্যম'—বুদ্ধের উপলব্ধ এই তথ্য ও তত্ত্বই বীজরূপে গ্রহণ করে নির্বাণের স্বরূপ ও উপায় সম্বন্ধে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কালে কালে ও জনে জনে বিচিত্র ও বহুধা হয়ে উঠে। এভাবে বহু মতের ও তত্ত্ব-দর্শনের এবং চর্যাপদ্ধতির ও সিদ্ধি-মার্গের উদ্ভব ঘটে। ফলে তত্ত্ব, চর্যা, দর্শন ও মার্গ যেমন জটিল, স্বতন্ত্র ও বহু হয়েছে তেমনি সমসংখ্যার মতবাদী সম্প্রদায় এবং চর্যাপদ্ধতিও গড়ে উঠে।

গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাস্তু—এখনকার নেপালের তরাই অঞ্চল। তিনি মঙ্গোল রক্তসম্ভূত। লিচ্ছবীরা তাঁর মাতৃকুল। পিতৃকুল শাক্য। তারাও আর্য বা অষ্ট্রিক নয়। গৌতম গৃহত্যাগ করে নেমে আসেন সমতলে। সাধনা করেন গয়া-বারাণসীতে। তাঁর সাধনালব্ধ সত্য তিনি প্রচার করেন আধুনিক বিহারেরই নানা অঞ্চলে।

মানুষের কোন চিন্তাই নিরবলম্ব নয়। সে কারণে কুচিৎ মৌলিক হয়। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভিত্তি হয় সমকালের নানা চিন্তা-চেতনা, তথ্য-তত্ত্ব কিংবা সমস্যা-সম্পদ। তাই গৌতম বুদ্ধও তেমন কোন স্বকীয় মৌলিক তত্ত্বের উদ্ভাবক নন,— যা তাঁর সমকালীন শাস্ত্রে-দর্শনে জড় রূপে বর্তমান ছিল না। যেমন—বর্ণাশ্রম, ঈশ্বর, যজ্ঞ, পূজা, বলিদান, প্রভৃতির বিরোধী মতবাদী তখনো ছিল। তাঁর শূন্য ও নির্বাণতত্ত্ব ব্রাহ্মণ্যতুরীয় অবস্থা যা মোক্ষের প্রায় সদৃশও। কিংবা তাঁর চার আর্য-সত্য—চিকিৎসাশাস্ত্রের চারতত্ত্বের মতোই—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও উপশম উপায়—রোগ, তার উৎপত্তির কারণ, নিরাময় উপায় ও ওষুধের সঙ্গে মিলে যায়। যোগও সংসার (জন্ম) সংসার হেতু (জন্ম হেতু) মোক্ষ ও মোক্ষের উপায়-চেতনা ভিত্তিক। আবার নৈরাত্ম্য, নিরীশ্বর সাংখ্য ও যোগ এবং নির্গ্রন্থ মহাবীর তাঁর পূর্ববর্তী। তীর্থিকের মধ্যে সঞ্জয়, কাত্যায়ন, অজিতকেশকম্বলী, পূরান কাশ্যপ, গোসাল, নাস্তিক কপিল, চার্বাক, পতঞ্জল, ও আজীবিকরা জৈন-বুদ্ধের পূর্বেও সমকালে দেব-দ্বিজ-বেদ বিরোধী ছিলেন। ওঁরা বর্ণাশ্রম সমর্থন করতেন না। বুদ্ধও বলতেন, শুদ্ধ চিত্ত ও সমদৃষ্টি সম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞানীই ব্রাহ্মণ। জন্মসূত্রে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারেনা। বুদ্ধও বলেন, সব কিছু অনিত্য ও শূন্য। রূপ, বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান সবই ইন্দ্রিয়-লব্ধ চেতনাপ্রবাহ এবং কাল সব কিছুর অস্তিত্ব বিনষ্ট করে (কালো ঘসতি ভূতানি)। স্বভাব ধর্ম ও সংস্কার যে ইন্দ্রিয়জ অনিত্য ভাবপ্রবাহ মাত্র তাও নতুন নয়, বৈদান্তিক সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ।

বুদ্ধদেবের কোন লিখিত রচনা নেই। স্থানীয় ভাষায় তিনি উপদেশচ্ছলে তাঁর পূর্ব জাতক কাহিনী ও গাথা ভক্ত সমাজে মুখে মুখে বিবৃত করতেন বলে কথিত। তাঁর জীবৎকালে তাঁর মুখের বাণী লিপিবদ্ধ হলে তা হত মাগধী কিংবা অর্ধমাগধী-প্রাকৃতে। দুনিয়ার কোন ধর্ম-প্রবর্তক এমনকি ঋষি-সাধু-সন্ত-দরবেশও কখনো লিখিত বাণী প্রচার করেছেন বলে জানা নেই। তাঁরা কেবল উচ্চারণই করেন এবং শ্রুতিধর ভক্তরা সযত্নে স্মরণ করে রাখে—এই হচ্ছে নিয়ম। আমাদের লালন ফকির অবধি তাই চলেছে।

থেরবাদী বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটক আমরা মাগধীতে নয়, পালি ভাষাতেই লিপিবদ্ধ দেখি। এই পালি শৌরসেনী তথা অবন্তী-মথুরার প্রাচীন প্রাকৃত বলেই ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর ধারণা। মুখ্যত থেরবাদী শাস্ত্রেরই বাহন পালি এবং দক্ষিণ এশিয়ার থেরবাদী বৌদ্ধদের মধ্যেই প্রচলিত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত প্রাকৃতেও ধর্মপদ লিপিবদ্ধ হয়েছিল, সংস্কৃতেও হয়েছিল।

অতএব বোঝা যাচ্ছে বুদ্ধের সমকালে বা নির্বাণের পরেও বহুকাল এই শাস্ত্র সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে পুরো লিখিত রূপ পায়নি। তাই সর্বভারতে প্রচার বাঞ্ছায় শিষ্ট ও লেখ্য জনপ্রিয় প্রাকৃতে এবং সংস্কৃতে ও পরে লেখ্য ও শিষ্ট শৌরসেনী অপভ্রংশে ত্রিপিটকাদি নানা শাখার বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্য অনূদিত, লিপিবদ্ধ ও রচিত হয়। অনার্য উচ্চারণে বিকৃত মাগধী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ তাই বোধ হয় পরে ব্যবহৃত হয়নি। গোড়ার দিকে বুদ্ধবাণীর কিছু মাগধীতেও হয়তো লিপিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু জৈন-প্রাকৃত ও মারাঠী ছিল মাগধী ও অর্ধমাগধী প্রাকৃতজ। বৌদ্ধ প্রাকৃতেও সর্বত্র বিশেষ বিশেষ মাগধী বুলি রয়ে গেছে।

অতএব বুদ্ধের বাণীই কেবল বৌদ্ধ শাস্ত্র নয়। আনন্দ, শারিপুত্র, মৌগগল্যপুত্রতিষ্য, অসঙ্গ, বসুবুদ্ধ, নাগার্জুন, আর্যদেব, চন্দ্রকীর্তি, শান্তিদেব, কুমারাত, ধর্মপাল, শান্তরক্ষিত, সরোজবজ্র (সরহ) তিল্লোপা, কাহ্নপা প্রমুখ অনেক ভিক্ষু-শ্রাবক-যোগী-সাধক-তাত্ত্বিকের অবদানে গড়ে উঠেছে বহু যান সমন্বিত বৌদ্ধ ধর্ম ও বিপুল কলেবর শাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শন এবং বহুবিধ চর্যা ও সাধন পন্থ। আর পালিও বৌদ্ধ শাস্ত্রের একমাত্র বাহন নয়। সিংহলে,বার্মায়, শ্যামে কম্বোজে, ইন্দোচীনে হীনযানী-থেরবাদীদের গ্রন্থ পালিতে বটে, কিন্তু মহাযানী গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ সংস্কৃতে, প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে ছিল বলে তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ সূত্রে আভাস মেলে।

মনে হয় গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ লাভের শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ সমাজে মতভেদ দেখা দেয়। এবং তা-ই বৌদ্ধদের দুটো স্বতন্ত্র মত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম পাঁচশ' বৎসরের মধ্যে 'সঙ্গীতি' নামে চারটি সর্ব-ভারতীয় মহাসম্মেলন বা মহাসভা আহূত হয় যথাক্রমে—রাজগৃহে, বৈশালীতে, পাটলিপুত্রে ও জালন্ধরে। প্রথম সভা আহ্বান করেন (খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে) মহারাজ কণিষ্ক। শাস্ত্রীয় মতানৈক্য সম্পর্কে বিতর্ক, আলোচনা এবং মীমাংসাই ছিল সম্মেলনের উদ্দেশ্য। তবু বিভেদ ঘোচেনি। বরং স্থায়ী ও বহুধা হয়েছে। প্রথম দুটো প্রধান ভাগের নাম হীনযান ও মহাযান। হীনাযানীরা রক্ষনশীল, শাস্ত্রা-চারনিষ্ঠ ও তত্ত্ববিমুখ তথা বাহ্যাচরণনিষ্ঠ প্রাচীন পন্থী। এঁদের একদল কেবল পাপভীরু ও পুণ্যকামী। বোধিসত্ত্ব কিংবা বুদ্ধত্ব অর্জন এঁদের লক্ষ্য নয়—এঁরা শ্রাবকযানী বা অর্হত্ব প্রত্যাশী। অন্যদল ব্যক্তিগত বুদ্ধত্ব অর্জনে যত্নবান। কিন্তু করুণা ও মৈত্রীর মাধ্যমে সর্বমানবের নির্বাণকামী নয়। এঁরা হচ্ছেন প্রত্যেক বুদ্ধ-যানী। এঁদের মধ্যেও সীমিত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ছিল। এই তত্ত্বচিন্তার নাম বৈভাষিক দর্শন। হীনযানীদের মধ্যে ক্রমে থেরবাদ (স্থবিরবাদ) তথা গুরুআনুগত্যে শাস্ত্র-সম্মত আনুষ্ঠানিক ধর্মপালন প্রবল ও জনপ্রিয় হয়—অনেকটা রোমান ক্যাথলিক-দের মতোই।

আবার বৌদ্ধ সঙ্ঘের মধ্যেও তথা ভিক্ষুদের মধ্যে নির্বাণ ও শূন্যতত্ত্বের স্বরূপ ও সিদ্ধিপন্থা এবং আচার-আচরণের নানা খুঁটি-নাটি নিয়ম-নীতি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। বুদ্ধের নির্বাণের দু'আড়াইশ' বছরের মধ্যেই আঠারোটি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে বৌদ্ধ সমাজ। এদের দশটি ক্রমে প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করে—স্থবিরবাদ, হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদ, মূল সর্বাস্তি-বাদ, সম্মিতীয়, মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদ। এদের মধ্যেও আবার সর্বাস্তি, মূলসর্বাস্তি, মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদী দল প্রভাবে ও প্রসারে প্রবল ও স্থায়ী হয়ে যায়। সর্বাস্তি ও মূল সর্বাস্তিবাদ হীনযান মত ধরে থাকলেও মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদীরা কার্যত মহাযান পন্থী হয়ে উঠে। উক্ত দশটি মতেরই সমর্থনে শাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শন রচিত হয়েছিল। এঁদের রচনার বাহন ছিল মুখ্যত সংস্কৃত বা মিশ্র-সংস্কৃত।

মহাযানীরা সর্বমানবের কল্যাণে স্ব স্ব জীবনে বোধিসত্ত্ব ও তথাগতের (তথতা—সেই রকম সত্য নিয়ে আগত বা ভূমিষ্ঠ যিনি তিনিই তথাগত, যেমন গৌতমবুদ্ধ) মতো করুণা ও মৈত্রীর অনুশীলন ও চর্যা গ্রহণ করে বোধিসত্ত্ব—অর্হত্ব বা বুদ্ধত্ব লাভের প্রয়াসী। এরা গৌতমবুদ্ধের মতো সর্বমানবের সুখ, শান্তি ও কল্যাণকামী;

—সব্বেসত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, সুখী অত্তারং হরিহরন্তু। সব্বেসত্তা দুকখাপমুঞ্চন্তু। সব্বেসত্তা মা যথালদ্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।—-

—সকল জীব সুখী হোক, বৈর মুক্ত হোক, সুখে কাল যাপন করুক, সব জীব দুঃখমুক্ত থাকুক, সর্বজীব যথালব্ধ সম্পতিচ্যুত না হোক। --গৌতম বাঞ্ছিত এই 'হিতবাদ'ই তাদের অনুসরণীয়। ঐ করুণা ও মৈত্রী চর্যার সূত্র বা নীতির নাম পারমিতা। এ-ভাবে প্রজ্ঞা পারমিতা, মৈত্রী প্রভৃতি বহুধরণের পারমিতা ও ধারণী (যা ধারণ বা আচরণ করা হয়) উদ্ভাবিত হয়। ক্রমে মহাযান মতেও তাত্ত্বিক ও আচারিক বিভেদ সৃষ্টি হয়। সে মতভেদের বা পন্থাভেদের ফলে মহাযানীরা প্রথমে দুটো প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়— মাধ্যমিক ও যোগাচারী বা বিজ্ঞানবাদী। নাগার্জুন মধ্যমক তথা বৈভাষিক ও সৌত্রান্ত্রিকের মধ্যপন্থা নামের তত্ত্ব ও চর্যাদর্শনের প্রবর্তক। এতে প্রজ্ঞা ও উপায় সমন্বয়ে অদ্বয় সত্তার নির্বেদ নির্বাণ লভ্য।

আর যোগাচার চর্যা ও বিজ্ঞানবাদের প্রবর্তক হলেন অসঙ্গ ও তাঁর ভাই বসুবন্ধু। এ সঙ্গে আরো একজনের নাম উল্লেখ্য, তিনি মৈত্রেয়। এ সূত্রে বুদ্ধচরিত প্রণেতা মহাযানী কবি অশ্বঘোষের নামও স্মর্তব্য। বুদ্ধ-উক্ত সূত্রভিত্তিক যে তত্ত্ব তার নাম সৌত্রান্ত্রিক— এর প্রবর্তক ছিলেন কুমারাত ও হরিবর্মণ। ইন্দ্রিয় ধর্ম ও সংস্কারের বাহ্যাবলম্বন বস্তুকে গুরুত্ব দেন বৈভাষিকেরা। সৌত্রান্ত্রিকরা বস্তুর বাহ্য অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁরা চেতনাপ্রবাহে বা বিজ্ঞানেই সব কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে বলে মানেন, অর্থাৎ মনে আছে ত আছেই—যা মনে নেই তা বাইরেও নেই।

মহাযানীদের অপর কিন্তু বাঙলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল ও তিব্বতে প্রবল শাখা হচ্ছে মন্ত্রযান। এর উপশাখা হচ্ছে বজ্র, কালচক্র ও সহজযানগুলো। এদের তত্ত্ব ও সাধনগ্রন্থ লিখিত হয়েছিল সংস্কৃতে ও অপভ্রংশে। নেপালে তিব্বতে এসব জনপ্রিয় ছিল। কাজেই বৌদ্ধধর্ম মূল ত্রিপিটক—সূত্র-বিনয়-অভিধর্মকে ছাড়িয়ে অনেক গভীর, ব্যাপক ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব-দর্শনভিত্তিক হয়েছিল এবং চর্যা (আচরণ) আর লক্ষ্যও হয়েছিল বিচিত্র।

সাংখ্য থেকেই তন্ত্রের উৎপত্তি—অর্থাৎ সাংখ্যের 'পুরুষ-প্রকৃতি' তত্ত্বই শিব-শক্তি (ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত) রূপে মৈথুনাত্মক তন্ত্রমত ও সাধন পদ্ধতির উদ্ভব। আদি সাংখ্যতত্ত্বেও চর্যা-পদ্ধতির নাম ছিল যোগ। পরে যোগ স্বতন্ত্র দর্শনরূপে বিকাশ

পায়। মূল সাংখ্য-যোগই যোগতন্ত্ররূপে অধ্যাত্ম ও গুহ্য সাধনার অবলম্বন হয়। এ সাধনা দেহভিত্তিক ও নিরীশ্বর।

দেহ পঞ্চভূতে গঠিত। এই ভূতজ দেহ হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধ — রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ রূপে ওগুলো ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিরই প্রসূন। চিত্ত ইন্দ্রিয়জ ও ইন্দ্রিয় চালিত; তাই স্কন্ধ পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ। ইন্দ্রিয় ধর্ম তথা ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভব সংস্কারের জন্ম দেয়। ঐ সংস্কারই সমন্বিত চেতনা বা মন বা চিত্তরূপে হেতু পরম্পরায় অনিত্য চেতনা বা বিজ্ঞান প্রবাহে অবর্তিত হয়। অতএব পঞ্চভূতের রাসায়নিক সমন্বয়ে মন বা চিত্ত নামে যে চেতনা-প্রবাহ জীব দেহে সঞ্চারিত, তাকে অন্যেরা জীবাত্মা বলে বটে, কিন্তু বৌদ্ধেরা তাকে নিয়ত পরিবর্তনশীল অনিত্যধর্ম ও সংস্কার বলে জানে। এই অস্তিত্ব তাই প্রাতিভাসিক বা মায়া তথা মিথ্যা।

জীব দেহগত এই চেতনাই সর্ব দুঃখানুভূতির আকর ও কারণ। দেহ নিরপেক্ষ যখন চেতনা নেই তখন এই চেতনার রূপ বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করতে হবে দেহ নিরীক্ষা করেই। দেহাধারে কর্তৃত্ব আসলে ঐ চৈতন্যের তথা মন কিংবা চিত্তের নিয়ন্ত্রণ, নিরোধ এবং বিনাশও সম্ভব। তাই কায়া সাধনই সাধনার লক্ষ্য। চেতনার বীজ হচ্ছে বজ্র বা শুক্র। বজ্র দৃঢ়তা ও কাঠিন্যের প্রতীক। বজ্রসত্ত্ব দৃঢ়, সার, অচ্ছিদ্র, অভেদ্য ও অবিনাশী। বজ্রসত্ত্ব শূন্যতা সত্ত্বেরই নামান্তর। বজ্রে নিয়ন্ত্রাধিকার জন্মালে জীবন জীবের ইচ্ছা শক্তির বশে আসে। তাই বজ্রেই বোধি চিত্তের স্থিতি—বজ্রই বোধি-চিত্ত। ফলে বজ্রধর, বজ্রসত্ত্ব আর বোধি-চিত্ত তথা বুদ্ধও অভিন্ন। বজ্র নিয়ন্ত্রণের জন্যেই দেহ নিয়ন্ত্রণ দরকার। এর নাম কায়াসাধন। যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ সাধনা চলে। দেহের তিনটি প্রধান নাড়ী ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না বা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মাধ্যমে লিঙ্গমূল থেকে শুক্রধারার (মূলাধারের কুণ্ডলিনী শক্তির) উর্ধ্বায়ন ঘটিয়ে ক্রমে তাকে ললাটদেশে মৌজুত করে রাখাই এদেহ চর্যার লক্ষ্য। বজ্রযানী ও সহজযানীরা এ সাধনাই করে। এ সিদ্ধির নাম অদ্বয় করুণা-শূন্য, প্রজ্ঞা-উপায় মিলন প্রসূত শূন্যাবস্থা বা সহজানন্দ অবস্থা কিংবা মহাসুখাবস্থা—হিন্দুর সচ্চিদানন্দ বা তুরীয় অবস্থা বা নির্বেদ সমাধি অবস্থা। এই অবস্থায় 'ঘুমই ন চেবই সপরিবিভাগা।' এবং 'চেঅন ন বেঅন ভর নিদ গেলা। সঅল মুকল করি সুহে সুতেলা।' এই সহজ দ্বারাই 'চিঅ সহজে শূন সংপুন্ন' হয়, এবং তখন 'অদ্বয় চিত্ততুরু অবহু গউ তিহুআণঁ বিথার। করুণা ফুল্লী ফল

ধরই পাউ পরও উগার।'—(-সরহ)। তখন 'কাহ্ন বিলসঅ আসবমাতা। সহজ নলিনীবন পইসি নিবিত্তা'—। সরহও বলেন, 'দেহ সরসিঅ তিথ মই সুহ অণ্ণ ণ দিট্‌ঠঅ। আই ণ অন্ত ণ মজ্‌ঝ ণউ ণউ ভব ণউ নিব্বাণ। এহু সো পরম মহাসুহ ণউ পর ণউ অপ্পাণ। ইন্দিঅ জথু বিলঅ গউ ণ ঠিউ অপ্পসহাবা। সো হলে সহজ তণু কুড়।" (সরহ)। তখন 'কমল কুলিস বেরি মজ্‌ঝঠিউ জো সো সুরঅ বিলাস। কোন ন রমই তহ তিহু অণেহি কস্‌স ন পুরই আস (সরহ)।"—এটিই বৈষ্ণবের অদ্বৈততত্ত্ব, অভেদতত্ত্ব ও সুফীর বাকাতত্ত্বের সদৃশ। বজ্রতত্ত্ব হচ্ছে ওদের 'যুগলতত্ত্ব' ও 'ফানাতত্ত্বের' সদৃশ। শূন্য-করুণা, প্রজ্ঞা-উপায় (হিন্দুর মায়া-ব্রহ্ম, শিব-শক্তি) ও বজ্রসত্ত্ব-বজ্রতারা পুরুষ-প্রকৃতির অভিন্ন অবস্থা মাত্র। সহজিয়া ও বাউল গানে এই সব তত্ত্বের সবটাই মেলে। তবে আস্তিকতা ও অজ্ঞতা-আক্রান্ত সহজিয়া বাউলে আত্মা ও ঈশ্বর অতিরিক্ত এসেছে আস্তিক ধর্মগুলোর প্রভাবেই।

গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে এ সাধনা চলে এবং এ সাধনা গুহ্য সাধনাও বটে। তাই নিয়ম-নির্দেশ সবটাই প্রহেলিকার মতো গূঢ় ইঙ্গিতময়। চর্যাগীতি সেই সাধন তত্ত্ব সম্বলিত প্রহেলিকাপদ। এ সূত্রে একালের সহজিয়া-বাউল পদও স্মর্তব্য। এই সাধনায় অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়—"খড়্‌গাঞ্জন পাদলেপান্তর্ধান রসরসায়নখেচর—ভূচর-পাতালসিদ্ধিপ্রৈমুখাং সিদ্ধিং সাধয়ে (সাধন মালা)।" অর্থাৎ, হটযোগ সাধনায় শত্রু বিনাশী খড়্‌গ লাভ হয়। চোখের এমন অঞ্জন মেলে যাতে দৃষ্টি সর্বত্রগামী হয়। এমন পাদুকা মেলে যার সাহায্যে সর্বত্র গমন করা চলে, আত্মগোপনের শক্তি আয়ত্তে আসে, এমন রসায়ন মেলে যাতে দেহ জরা-মুক্ত থাকে, পাখির মতো বিমানে উড়বার ক্ষমতা জন্মে, সমুদ্র-পর্বত লঙ্ঘনের সামর্থ্য থাকে এবং পাতালে প্রবেশও সম্ভব। সহজ সিদ্ধির ফলে উক্ত সব শক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব। যারা সিদ্ধি লাভ করে তারাই সিদ্ধ বা সিদ্ধা।

হয়তো জন্ম ও জীবন কালনিয়ন্ত্রিত বলেই কালানুসারী চর্যাই কালচক্রযানে নির্দিষ্ট। কালচক্রযানে সাধনা গ্রহ-নক্ষত্র-তিথি-লগ্ন ক্ষণ ও রাশি নির্ভর। গুরু-মন্ত্র, চর্যা ও তিথির গুরুত্ব মন্ত্র ও কালচক্রযানে অশেষ। মন্ত্রযানে সাধনভিত্তি তন্ত্র ও যোগ এবং তন্ত্র গুহ্যসাধন পদ্ধতি, আর তা' বজ্র, কালচক্র এবং সহজ সাধনারও আবশ্যিক অঙ্গ। এ-সব সাধনার অধিকারী ভেদ আছে এবং সেই ভেদানুসারে সাধকরা পাঁচকুলে বিভক্ত। এদের নাম বজ্র, পদ্ম, কর্ম তথাগত ও রত্ন এবং এদের সাধন-সঙ্গিনীরও নাম যথাক্রমে ডোমনী, নটী, রজকী,

ব্রাহ্মণী ও চণ্ডালী। প্রমূর্ত স্কন্ধই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ বা পঞ্চতথাগত।[১] সাংখ্যের পঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে পঞ্চস্কন্ধ-প্রতীক রূপ-বৈরোচন, বেদনা-রত্নসম্ভব, সংজ্ঞা-অমিতাভ, সংস্কার-অমোঘসিদ্ধি এবং বিজ্ঞান-অক্ষোভ্য বুদ্ধরূপে কল্পিত। এ সাধনায় যারা সিদ্ধ হয় তারাও যথাক্রমে বৈরোচনবুদ্ধ, রত্নসম্ভববুদ্ধ, অমিতাভবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধিবুদ্ধ ও অক্ষোভ্যবুদ্ধ হয়। কাজেই বজ্র-সহজযানে সাধকের প্রথমত কাল নিরূপণ করতে হয়। সেজন্যেই কৌলজ্ঞাননির্ণয় নামের তন্ত্রে তথা গুহ্য চর্যায় প্রবর্তকালে অনুশীলন আবশ্যিক। অতএব মূল মন্ত্রযানই সাধন লক্ষ্য এবং স্তর ভেদে তা-ই কালচক্র, বজ্র ও সহজযান নামে পরিচিত। আর যোগ ও তন্ত্র চর্যা ও পদ্ধতি হিসেবে উক্ত চার মতেরই ভিত্তি ও বাহন। সুচন্দ রচিত টীকা 'লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা বা 'বিমল প্রভা' এবং অভয়াকর গুপ্ত রচিত 'কাল-চক্রাবতার' ও 'বুদ্ধকপালতন্ত্রটীকা'-ই কালচক্রযান সম্পর্কিত আধুনিক জ্ঞানের উৎস। 'সেকোদ্দেশটীকা'ও এই সূত্রে স্মর্তব্য। কালচক্র শূন্যতা ও করুণার অদ্বয় প্রতীক ও আধার এবং মহাসুখ স্বরূপ নির্বেদ ও নিত্য প্রজ্ঞাবস্থাই সিদ্ধি। কালচক্রযান তান্ত্রিক আচারসর্বস্ব হয়ে যাভা-সুমাত্রায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে তেরো চৌদ্দ শতকে।

পঞ্চভৌতিক দেহটা প্রাকৃতিক প্রতিবেশে লালিত। তাই প্রকৃতি তথা সেই আদি যাদুশক্তির চর্চাও তান্ত্রিক বজ্র-সহজযানীদের অবলম্বন হয়েছে—মন্ত্র-মুদ্রা ও মণ্ডলের মাধ্যমে! সেজন্যে নেপালী বজ্রযানীরা নানা প্রতীক দেবতার পূজারী। আমাদের দেশেও বৌদ্ধযুগে তা' নিশ্চয়ই ছিল—যাদুঘরে তেমন মূর্তি দুর্লভ নয়। দেব পূজারীরা গৃহী বজ্রযানী। আর গুহ্যসাধক তান্ত্রিক বজ্রযানীরাই হয়তো সহজযানী রূপে পরিচিত। 'বজ্রতন্ত্র' ও 'হেরুকতন্ত্র' এ মতের আকর গ্রন্থ। অতএব চর্যাগীতিতে মূল বৌদ্ধ অঙ্গীকারগুলো ছাড়াও আমরা মন্ত্রযানী, কালচক্রযানী বজ্র-যানী ও সহজযানী তান্ত্রিক চর্যার নানা তাৎপর্য-প্রতীক পরিভাষা দেখতে পাই। আগেই বলেছি উক্ত যানগুলোর বিভিন্নতা সাধন স্তর ও লক্ষ্য জ্ঞাপক—স্বাতন্ত্র্য সূচক নয়। কাজেই চর্যাগীতির তত্ত্ব দেহতত্ত্বই তথা শুক্র-নিয়ন্ত্রী কায়াসাধনাই, যার আধুনিক রূপ সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল চর্যায় লভ্য।

বজ্র, শূন্য, সহজ, জিনবুদ্ধ, তথতা, তথাগত, সহজানন্দ, মহাসুখ, নির্বাণ, পঞ্চ স্কন্ধ, পঞ্চ ডাল, সূর্য, চন্দ্র, ধমন, চমন, নৈরামণি, ডোম্বী, মাতঙ্গী, চণ্ডালী, শুণ্ডিনী, পদ্মখাল, করুণা, ত্রিধাতু, মন্ত্র, তন্ত্র, মন, পবন, রবি, শশী, নাদ-বিন্দু

১ রূপবেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান এবচ পঞ্চবুদ্ধস্বভাবং তু স্কন্ধোৎপত্তি বিনিশ্চিতম—(বজ্র-বরাহীকল্প-মহাতন্ত্র) শশিভূষণ দাসগুপ্ত : বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যাগীতি, পৃঃ ৬৩।

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ত্রিশরণ, ব্রাহ্মণ, কাপালিক প্রভৃতি বার বার আবৃত্ত হয়েছে এ সাহিত্যে। বজ্র-সহজযানী সাধকরা সিদ্ধা তথা সিদ্ধপুরুষ বলে পরিচিত। চৌরাশি আঙুল পরিমিত দেহ সাধনায় সিদ্ধ বলে তারা চৌরাশিসিদ্ধা নামেও আখ্যাত। ৩, ৯, ১৯, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৪২, ৪৩ সংখ্যক চর্যাপদগুলোতে সাধন ও সিদ্ধিতত্ত্ব প্রকট এবং স্পষ্টই বলা হয়েছে কিন্তো মন্তে, কিন্তো তন্তে, কিন্তোরে ঝাণে বখানে'(দারিক)। আট শতকের বঙ্গ-মগধ শাসক পালেরা এবং সমকালের ইন্দোনেশিয়ার (যবদ্বীপের) শৈলেন্দ্ররাজারা বজ্রযানী ও তন্ত্রের অনুরাগী ছিলেন 'বজ্রধর, বজ্রতারা ও মঞ্জুশ্রী শ্যামতারার [কালীর] পূজা জনপ্রিয় ছিল। যাভা-সুমাত্রায় বজ্রধর ও তারা সেকালের জনপ্রিয় দেবতা (হিমাংশু ভূষণ সরকার, বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ ৮৫)।

চর্যাগীতি ছাড়াও বাঙলা সাহিত্যের 'গোপীচাঁদ ময়নামতী'র গানে, নাথ সাহিত্যে, গোরক্ষবিজয়ে, আগম-জ্ঞানসাগরে, সুফী সাহিত্যে, যোগ-তান্ত্রিক হাড়মালায়, সাধন-মালায় 'হঠযোগ প্রদীপিকা' প্রভৃতি যোগগ্রন্থে, বৈষ্ণব সহজিয়া শাস্ত্রে ও সঙ্গীতে এবং বাউল চর্যায় ও গীতিতে বৌদ্ধ যোগতন্ত্র ও বজ্রসহজযানী তত্ত্বের সাক্ষাৎ মেলে। আজো সেই মণ্ডলচক্র ও যোগিনীচক্রের মতো বাউলদের মধ্যে নৈশচক্র গোপীচক্র প্রভৃতি রয়েছে। এতে যৌন সাধনার ব্যবস্থাও থাকে। বজ্রগীতি চর্যা-গীতি, সহজিয়া-বাউল গীতি গেয়ে কামভাব জাগরুক করা হয় এবং নাদ-বিন্দু-নীর ক্ষীর, চারিচন্দ্র, বজ্র-রজ প্রভৃতির বাস্তব অনুশীলনও নাকি হয়। এগুলোর সঙ্গে হিন্দুর তান্ত্রিক ভৈরবী-চক্র কিংবা বৈষ্ণব রাসচক্রের তত্ত্বগত মিল কম নয়। বস্তুত বাঙলার ও বাঙালীর অন্তরঙ্গ পরিচয় এতেই নিহিত। এ সাহিত্যে অনিত্যতা ও শূন্যতা-বাদী গৌতমবুদ্ধ উচ্চারিত জীবনাদর্শ—বৈর-ক্লেশ-আসক্তিহীন আনন্দিত জীবন-বাঞ্ছাই প্রতিফলিত। শ্রাবক-শ্রমণ-ভিক্ষু-যোগী-সন্ন্যাসী-সাধু-দরবেশ রূপে আজো অনেকে সেই জীবনই খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

বৌদ্ধমতে আত্মা অস্বীকৃত। কেবল পঞ্চ স্কন্ধই স্বীকৃত। এই পঞ্চস্কন্ধ 'নাম' রূপে ও 'বস্তু' রূপে প্রতীয়মান থাকে। রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে কোন 'হেতুপ্রত্যয়' বা হেতুপরম্পরা নেই অর্থাৎ কারণ-ক্রিয়া সম্বন্ধ নেই। রূপ বা বস্তুর উৎপত্তি আকস্মিক কিংবা সহস্থিতি বা সমস্থিতি জ্ঞাপক। এটিই বৌদ্ধ দর্শনের মূল তত্ত্ব। এর নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ (পটিচ্চসমুপ্পাদ) বা অস্তিত্বপ্রত্যয়তা [ইদপ্পচ্চয়তা]। সবটাই অবিদ্যা বা মায়া প্রপঞ্চ প্রসূত—'আইএ অনুঅনা এজগ রে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই (৪১ নং) ইত্যাদি, অদভুঅ ভব মোহা রে দিসই পর অপ্যণা। এজগ জলবিম্বাকারে সহজে সুন আপনা (৩৯সং)। যেমন অবিদ্যা থেকে

সংস্কার, তার থেকে বিজ্ঞান, তার থেকে নামরূপ, তার থেকে ষড়ায়তন (ষড়ইন্দ্রিয়), তার থেকে স্পর্শ, তার থেকে বেদনা, তার থেকে তৃষ্ণা, তার থেকে উপাদান, তার থেকে ভব, তার থেকে জাতি (জন্ম), তার থেকে জরা-মরণ-দুঃখ-শোক ইত্যাদির জন্ম। এরই নাম ভবচক্র। এ কিন্তু হেতু পরম্পরা নয়,— আধুনিক চলচ্চিত্রের চিত্র প্রবাহের বা জলস্রোতের মতো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন (কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ও পরম্পরাগত বলে প্রতীয়মান) চেতনাপ্রবাহের সামষ্টিক রূপ মাত্র। তাই শূন্যতা বা নির্বাণ সৎ (অস্তিত্ব) নয়, অসৎ নয়, সৎ-অসৎ-এর অদ্বয় রূপও নয়, আবার সৎ-অসৎ কোনটাই নয়—তাও বলা চলে না। [ভব নই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী ইত্যাদি (৫নং পদ)] অবাঙমনসগোচর বা অজ্ঞেয় বলেই এমনি বোধের নাম 'চতুষ্কোটিবিমুক্ততা' তথা ভব-নির্বাণ-অস্তি-নাস্তিবোধ হীন অবস্থা। 'জাহের বাণ চিহ্ন... ণ মিচছা (২৯নং) ইত্যাদি।

পঞ্চস্কন্ধ থেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-অনুভূতি রূপ রূপান্তরে চেতনা-প্রবাহকে বিভিন্ন খাতে আকৃষ্ট করে। এরই নাম তৃষ্ণা বা বন্ধন। এই ভবতৃষ্ণা বা বন্ধনই জন্মান্তর বা রূপান্তর ঘটায়, এই তৃষ্ণা বা বন্ধনই নামান্তরে ধর্ম বা কর্ম। এখানেও হেতুপরম্পরা নেই। তবে এ তৃষ্ণা বীজ-বৃক্ষ-ফল-বীজ-এর মতো আবর্তন ধর্মী। জন্মপ্রবাহের (ভবচক্রের) উৎস অনির্ণীত :

জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম। (২২নং)

গৌতম বুদ্ধ ঐ স্কন্ধজ তৃষ্ণা বা বন্ধনকে দেহরূপ গৃহ নির্মাণ (তথা জন্মান্তরের জন্যে দায়ী) বলে জেনেছেন। 'অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা। মিছে লোঅ বন্ধাবঅ আপনা' (২২নং)। অতএব তৃষ্ণা বা সংস্কার বিমুক্তিই কর্ম ও জন্ম বিমুক্তির উপায়। জন্মবিমুক্তিই নির্বাণ। বুদ্ধ বলেছেন: গহকারকং দিট্‌ঠোসি গেহং ন কাসসি। বিসংখারগতং চিত্তং তণহানং খয়মজ্ঝগা।—দেহরূপ গৃহনির্মাতাকে দেখেছি, সে আর গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না। আমার চিত্তে সংস্কার ও তৃষ্ণা লয় পেয়েছে।" চার আর্যসত্যের ভিত্তিতে 'অষ্টাঙ্গিক'[১] মার্গের ষড় বা দশ পারমিতা অঙ্গীকার[২] করে অথবা পঞ্চপ্রতিবন্ধক (কাম-দ্বেষ-তন্দ্রা-গর্ব-মোহ) পঞ্চ কুশল

১. অষ্টাঙ্গিক মার্গ
শীল সম্পর্কিত ১. সম্যক বাক ২. সম্যক কর্মান্ত ৩. সম্যক আজীব। **চিত্ত সম্পর্কিত** ৪. সম্যক ব্যায়াম ৫. সম্যক স্মৃতি ৬. সম্যক সমাধি **প্রজ্ঞা সম্পর্কিত** ৭. সম্যক সঙ্কল্প ৮. সম্যক দৃষ্টি। এ সূত্রে দশ শিক্ষাপদ স্মর্তব্য।

২. ষড়পারমিতা: দানশীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা + অন্য চারটি—উপায় কৌশল্য, প্রণিধান, বল ও জ্ঞান—দশ পারমিতা।

ধর্ম (শীল, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি) অবলম্বনে সাধনা করে বোধিসত্ত্ব বা অর্হত্ব কিংবা নির্গুণ নির্বেদ একটা অবস্থা লাভ সম্ভব। এরই নাম শূন্যতা বা নির্বাণ। তখন ভবচক্র থেকে অব্যাহতি মেলে। মোহ বিমুক্কা জই মাণা। তবে তুঁটই অবণাগমনা (৪৬নং)। পঞ্চকুশলধর্ম বিশেষ করে ভিক্ষুদের জন্যেই। একটা অদ্বয় বা অব্যয় তত্ত্বই তাদের পরমতত্ত্ব। আবার শূন্যতা বা নির্বাণের অপর নাম বোধি-চিত্ততা। যেমন অদ্বয়বোধি চিত্ত অর্জন সম্ভব হয় শূন্যতা-করুণার বা প্রজ্ঞা-উপা-য়ের বা নাদ-বিন্দুর বা নিবৃত্তির (হিন্দুর শিব-শক্তির, মায়া—ব্রহ্মের) সামরস্যে বা অদ্বয় অবস্থায়—মহাসুখাবস্থায়, সহজানন্দাবস্থায় (হিন্দুর সচ্চিদানন্দ বা তুরীয় অবস্থায়) ।

কাহ্নের জবানীতে 'ঘুমই ণ চেবই সপরিবিভাগা। সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাজা। চেঅণ ণ বেঅণ ভর নিদ গেলা। সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা ।

স্বপনে মই দেখিল ভিহুবণ সুণ
ঘোরিঅ অবণা গবণ বিহুণ। (কাহ্ন ৩৬নং)

—সহজাবস্থা এরূপ শান্ত ধ্রুমস্বরূপ।

মূলাধার থেকে শুক্রকে ঊর্ধ্বগামী করতে করতে মস্তকে নিয়ে রাখলেই সহজ অবস্থা লাভ হয়।

[গোটা দেহকে মন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহজযানীরা দেখেছেন একটা যন্ত্র স্বরূপ]

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দেহস্থান	চক্র বা কায়	পদ্ম	মুদ্রা	আনন্দ	দেবী	ক্ষণ
নাভি	নির্বাণ চক্র বা কায়	নাভিপদ্ম চৌষট্টি দল	কর্মমুদ্রা	আনন্দ	লোচনা	বিচিত্র
হৃদয়	ধর্মচক্র ”	হৃৎপদ্ম বত্রিশ দল	ধর্মমুদ্রা	পরমানন্দ	মামকী	বিপাক
কণ্ঠ	সম্ভোগচক্র ”	কণ্ঠপদ্ম ষোড়শ দল	মহামুদ্রা	বিরমানন্দ	পাণ্ডুরা	বিমর্দ
মস্তক	সহজচক্র ”	উষ্ণীষ পদ্মচতুর্দল	সময়মুদ্রা	মহানন্দ	তারা	বিলক্ষণ

এদের সঙ্গে রয়েছে চার সাধনাঙ্গ—সেবা, উপসেবা, সাধনা ও মহা সাধনা।
স্পষ্টত হিন্দু ষড়পদ্ম ও ষটচক্র এরই বিকাশ।

মহাযান পন্থীর 'মন্ত্র নয়' থেকে তন্ত্রযান তজ্জাত বজ্রযান তজ্জাত কালচক্রযান ও সহজযান বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সবাই শূন্যতা, আনন্দাবস্থা ও নির্বাণ লক্ষ্যে সাধনা করেন। সবাই কায়া-সাধক। সবাই যোগী ও তান্ত্রিক—কেউ বামা-চারী কাপালিক যোগী, কেউবা বামা-বর্জিত সাধক, যেমন বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে হিন্দু-নামে পরিচিত গোরক্ষপন্থী, নাথপন্থী-শৈব-নাগা-অবধূত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা শেষোক্ত মার্গী। আর সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল ও সূফী নামে পরিচিত কিছু সাঁইবাদী (গুরুবাদী) সাধকরা বামাচারী। কিন্তু নাদ-বিন্দু, চারিচন্দ্র, নীর-ক্ষীর, রজ-বীর্য নিয়ন্ত্রণ সাধনারই কম-বেশি লক্ষ্য। কায়াসাধনায় সিদ্ধির ঋজু বা সহজ পন্থা —

উজুরে উজু ছাড়ি মা জাহুরে বঙ্ক
নিয়ড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক।"

তারা জানে কায়া বা মন হচ্ছে তরু, পঞ্চ স্কন্ধ বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় তার শাখা, (১,৪৬), চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হয়—'কাল ঘসতি ভূতানি'। কাজেই কালপ্রভাবকে প্রতি-হত করতে হবে।

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র—এই তিন আদি অনার্য দর্শন, দেহতত্ত্ব ও সাধনা কালে কালে আর্য ধর্মশাস্ত্র বরণ করেও যে বাঙালী কোনদিন পরিহার করেনি, সে তথ্য আজ আর অস্বীকৃত নয়। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী মত ঐ তত্ত্ব-দর্শনের সঙ্গে আপোশ করে এবং সমন্বিত হয়েই টিকে রয়েছে গণমনে। বৌদ্ধ চতুষ্পদ্ম বা চক্র হিন্দু যোগতন্ত্রে ষড়পদ্ম ও ষটচক্র হয়েছে। এতেই বোঝা যায়—হিন্দু যোগতন্ত্রের বিকাশ বৌদ্ধ পরবর্তী। এমন কি শূন্যতত্ত্বও অবিরল-অবিকৃত রয়েছে নামান্তরে। নিরাকার আল্লাহও শূন্য, তাদের কাছে দুই-ই অভিন্ন।

ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, 'নাথ পন্থী-গোরখপন্থী সাধকেরাও চর্যাসাধনার ঐতিহ্য অনুসারী।' 'চর্যাকারদের সাধনা বাহিরের দিকে অবলুপ্ত হইলেও ভিতরে ভিতরে প্রবহমান ছিল। সে সাধনার উত্তরাধিকারী ষোড়শ ও পরবর্তী শতাব্দীর রাগানুগ বৈষ্ণব ও মরমীয়া সহজ সাধকেরা।" (চর্যাগীতি পদাবলী পৃঃ ৪৭, ৪৫)

"শৈব যোগীদের বৌদ্ধ যোগীদের এবং চর্যাগীতির পরবর্তী কালের শিবসঙ্গী-তের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। (ঐ পৃঃ ৪০)" চর্যামতের এ ধারাটি বাউলদের সাধনায় অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে (ঐ পৃঃ ৪২)। অনিল পুরাণে ধর্মঠাকুরের গাজনের ছড়াতেও চর্যাগানের ভগ্নাংশ রক্ষিত আছে। সূফী, সহজিয়া ও বাউল সাহিত্যে মৌলতত্ত্ব ও লক্ষ্য অভিন্ন। ষোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতান (১৬৮২-৮৪ খ্রীঃ) বলেন :

১.　দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য।
তুল: জাহের বাণ চিহ্ন　(লুই: ২৯সং চর্যাপদ)

২.　আপনে শূন্যকার আছে সৃষ্টিকর্তা
অজর অমর হএ চিন্তি নিরঞ্জন।

৩.　বিন্দু বিন্দু নাথ (নাদ) বিন্দু নহে ভিন্নাভিন
শিব শক্তি দোহ এক ভিন্নমাত্র নাম
শিব ধরিতে শক্তি লিঙ্গেত বিশ্রাম।
তুল: সরহ (১৭নং নাদ-বিন্দু ইত্যাদি)

৪.　বাউত করহ নর আয়ুর উদ্দেশ।

তুল :　মার রে জোইআ মুসা পবনা জেঁন তুটঅ অবণাগবণা (২১সং ভুসুকু)

৫.　ঘটে ঘটে ব্যাপিত আছএ নৈরাকার। (—সৈয়দ সুলতান)

তুল : ১.　অসরিরি কোই সরিরহি লুক্কো
জো তহি জানই সো তহি মুক্কো।

২.　ঘরে আচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই
পই দেক্খই পড়িবেশী পুচ্ছই।

৩.　দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জানই।

৪.　আমার মনের মানুষ আছে মনে।
আমি তাই হেরি তাই সকল খানে।

সতেরো শতকের শেষার্ধের কবি শেখ চাঁদ বলেন:

১.　শূন্যময় করতার শূন্যে বাঁধা ঘর
শূন্যে উঠে শব্দ, মিশে শূন্যের ভিতর।
শূন্যে আয়ু, শূন্যে বায় শূন্যে মোর মন
আকলি ফিকির আর শূন্যের ত্রিভুবন।
শূন্যে দম শূন্যে খোম, শূন্যে মোর বান্দা
শূন্যে জিউ শূন্যে পিউ শূন্যে সব জিন্দা। —তালিব নামা

২.　তনের গুরু মন, মনের গুরু পবন
পবনের গুরু শূন্য, শূন্যের গুরু নির্গুণ।

৩. আউট হস্ত নৌকার প্রবন্ধর কাণ্ডারী
বাসত্তর দেব সঙ্গে মন ইচ্ছার পাড়ি। —হরগৌরী সম্বাদ ·

তুল: গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাও —(১৪নং ডোম্বী)

৪. উজানে উজাএ নৌকা লাহুতেত থানা
আমনা গমনা করে শূন্যে উড়ে মনা। —(আলিব নামা)

তুল: পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ু আল
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআ জাল। (১৩নং)

৫. চন্দ্র সূর্য কাম বিন্দু শরীর মাঝার
অনাহত পুরুষ পরাণপুরে বাস
এ ঘরের দশ দুয়ার করিল প্রকাশ।—(শেখ চাঁদ)

তুল: (এদেহে) এথু সে চাঁদ দিবাকর
দেহ সরিসঅ তিথ মহ
সুহ অণ্ণ ণ দীটঠও। —(সরহ)

তুল: (শুক্র) টলে জীব, অটলে ঈশ্বর
তার মধ্যে (শুক্রমধ্যে) খেলা করে রসিক শেখর। —বাউল গান

আঠারো শতকের প্রথম পাদের কবি মনসুরের মতে:

১. ঈশ্বর পুরান (অনাদি) জান সেই এক দম
সে দমতু হইয়াছে এ দুই আলম।

তুল: বায়ুতে করহ নর আয়ুর উদ্দেশ (সৈয়দ সুলতান)

২. (দেহে) অনাহত শব্দ উঠে করি হুলুস্থুল
কাসা করতাল শব্দ আনন্দ বহুল।

তুল: অনহা ডমরু বাজএ চীর নাদে।—(কাহ্ন ১১নং)

আলি রজার মতে:

১. শূন্য রূপে এক আল্লা সতত উজ্জ্বল
সংসারে ফকির শূন্য রূপে শূন্য নাম
শূন্য হস্তে ফকিরের সিদ্ধি সর্বকাম।
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।

শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
যথাতে পরম হংস তথা যোগ ধ্যান।
যে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী
সেহ সব শুদ্ধ যোগী হএ শূন্য ভোগী।
সিদ্ধা এক শূন্য এক এই সে যুগল
যে সবে এ তত্ত্ব পালে সে তনু নির্মল।

২. শূন্য সূক্ষ্ম তনু হএ রূপ শূন্যাকার
রূপের সাগরে সিদ্ধি যত বনিজার।
শূন্য সিন্ধু হন্তে ব্যক্ত রূপের সাগর।

উল্টা সাধনা :

৩. পিরীতি উল্টা রীতি না বুঝে চতুরে
যে না চিনে উল্টা সে না জিএ সংসারে।
সম্মুখ বিমুখ হএ বিমুখ সম্মুখ
পলটা নিয়মে সব জগত সংযোগ।

তুল : দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে
স্থিতি হয় দশম দলে চতুর দলে বারাম খানা। (বাউল গান)

কায়া প্রতীক—

৪. কায়া হএ কামিনী পুরুষ হএ মন
মন হএ রমণী পুরুষ নিরঞ্জন।

পরকীয়া সাধনা :

৫. স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেম রস।
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস (জ্ঞান-সাগর)

তুল : (১) জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি (—গুণ্ডরীপা (৪নং))
(২) তু লো ডোম্বী… (কাহ্নপা ১০নং)

সাধন তত্ত্ব—

৬. শবদ স্থির হয় যদি স্থির হএ মন
মন স্থির হন্তে অতি স্থির হএ তন।
তন স্থির হন্তে হএ কায়ার সাধন। —আলি রাজা

তুল: মন থির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির।
বিন্দু থির তো কন্ধ থির
বলে গোরখদেব সকল থির। —হঠযোগপ্রদীপিকা

১. পাগল করিল গোর্খ দিয়া শূন্যজ্ঞান। গোরক্ষবিজয় (আঃ করিম পৃ ১৬২)

২. শূন্যমন্ত্র শুনাইয়া পাগল করিব (পৃ ১১৬)

৩. মন হয় পবন পবন হএ সাঞি
হেন তত্ত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞি।

তুল: ১. মাররে জোইআ মুসা পবণা/জেণ তুটঅ অবণা গবণা/...তবেঁ বান্ধন ফিটঅ (২১নং)

২. কাআ ণাবড়ি খান্টি মণ কেডুআল। (সরহ ৩৮নং)

বাউলেরাও দেহকে মন-পবনের নাও' বলে জানে। গোরখবাণী, যোগীকাচ, প্রভৃতি সর্বত্র যোগতন্ত্র ও বামাচারী সাধনার কথা মেলে। এমনি করে বাঙলার সূফী তত্ত্বে ও সাহিত্যে, বাউলগানে ও তত্ত্বে, সহজিয়া সাধনায় ও গানে আমরা চর্যাপদাবলীতে বর্ণিত সব তত্ত্ব ও রূপক ভাষান্তরে পাই। গোরক্ষ বিজয়ে চর্যাপদের মতো হেয়াঁলী বা সন্ধাভাষায় ব্যক্ত তত্ত্বও মেলে:

১. পুকুরে পানি নাই পাড় কেন ডুবে
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে।
নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘরে চাল
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল।

২. গুরু মীননাথর উল্টা উল্টা ধারা
পুকুর মুড়ে ধান শুকাইয়া উগার তলে বাড়া—

৩ মরা মানুষে ভাত রান্ধে জীতা মানুষের পেটে।

তুল: পূতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল পর্বত ভাসিয়া যায়
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল পল্লব মুঞ্জরিল পাষাণ বিঁধিল ঘুণে।
—অনিল পুরাণ, সহদেব চক্রবর্তী

এবং মাদলের ধ্বনি দিয়ে মীননাথের চৈতন্য সম্পাদনও এ সূত্রে স্মর্তব্য।
সহজিয়া গানে:

১.　সাপের মাথায় ভেকেরে নাচাবি,

২.　মাকড়সার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে　…ইত্যাদি

৩.　জলেতে নামিবি নীর না ছুঁইবি

৪.　তোরা না হইবি সতী/না হবি অসতী।

৫.　মৃত্তিকার উপর জলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ।

বাউল গানে : ১. আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর
তথা এক পরশী বসত করে।

২.　আমার জন্মের ষোল বছর পরে
পিতার জন্ম হল।

৩.　উঠন ঠন ঠন করে রে ভাই ঘরে জলের ঢেউ
নৈরামণি নিরঞ্জনে পায় না খুঁজে কেউ।

এমনি উদাহরণ বাউল গানে অসংখ্য মেলে।

সন্ত কবীরের পদেও চর্যাগীতির অনুসৃতি মেলে :

১.　বৈল বিয়াই গাই ভঈ বাঁঝ।
বছরা দুহৈ তীনূঁ সাঁঝ।
মাস পসারী চীহল রখবারী।
মূসা খেবট নাব বিলইয়া
মীড়ক সৌবৈ পহরুইয়া।

২.　দেখত সিংহ চরাবত গাঈ
জলকি মুছলি তরুবর ব্যাঈ। ইত্যাদি।

নাথ সাহিত্যে ১.　মশার লাথিতে পর্বত ভাঙ্গিল
ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি।
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু
কাঁকড়া ধরিল কাছি।

২.　সরিষা ভিজাইতে জলবিন্দু নাই
ডুবিল দেউল চূড়া।

সর্বপ্রধান কথাটাই সর্বশেষে বলছি : জিন বর্ধমানমহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ ছিলেন শাসন-শোষণ-পেষণ ক্লিষ্ট অনার্য মানবতার দ্রোহী নেতা। মহাবীর বলেছেন

তাঁর আগে আরো তেইশ জন তীর্থঙ্কর তাঁর অনুরূপ বাণী প্রচার করেছেন: গৌতম বলেন তাঁর আগে বহু বোধিসত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছেন। এতে বোঝা যায় আর্য পীড়নের বিরুদ্ধে অনার্য অসন্তোষ-দ্রোহ ছিলই; তবে তা সুফল-প্রসূ হয়নি। আমরা জানি স্পার্টাকাসের মতো কোন কোন দ্রোহী (দৈত্য-যক্ষ-রাক্ষস-কুকুর গোত্র-প্রধান অসুররূপে) নিহত-লাঞ্ছিত হয়েছে। যে দেব-দ্বিজ-বেদের দোহাই দিয়ে এ পীড়ন চলত সেই দেব-দ্বিজ-বেদের অস্বীকৃতিই এ দ্রোহের বীজমন্ত্র। এর ফলে বিজাতি ও বিজেতা আর্যের কাছে ঘৃণ্য নির্জিত অনার্য গণমানব ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র সমাজ-শাসন-শোষণ-লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি পেল। অনার্য অধ্যুষিত মগধ-গৌড়-বঙ্গ-বরেন্দ্র উৎকলেই তাই জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের প্রাথমিক প্রচার ও প্রসার এবং ভারতের সর্বত্র নিম্নবর্ণের ও নির্বিত্তের লোকেরাই আত্মকল্যাণেও ব্যবহারিক জীবনে মুক্তি-বাঞ্ছায় জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। উচ্চ বর্ণের ও বিত্তের লোক নব ধর্ম বরণ করেছে কম। একালে শাস্ত্র-সমাজ-সরকারের বিরুদ্ধে বলা ও দল-করা সহজ। সেকালে শাস্ত্রে-সমাজে সরকারে পরিবর্তন আনবার জন্যে অপৌরুষেয় শক্তির ও নির্দেশের দোহাই দিতে হত। তাই আজকাল যা' রাজনীতি সেকালে তা-ই ছিল ধর্মনীতি। কিন্তু কারণ-করণ, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। কেবল উপায় ছিল ভিন্ন। তাই সেকালের রাজনীতিক, আর্থনীতিক কিংবা সামাজনীতিককে হতে হত শাস্ত্রকার, ধর্মসংস্কারক কিংবা নবধর্মের প্রবর্তক। যা কিছু হত সবটাই ঐ পারত্রিক জীবনের, শাস্ত্রের ও ধর্মতত্ত্বের আবরণেই সম্ভব হত। ফলে একালে আমরা সেকালের সমাজ কিংবা ধর্ম-বিবর্তন ও বিপ্লবকে একালের মতো ঠিক আর্থিক সামাজিক কারণ-কার্যের তত্ত্ব প্রয়োগে ব্যাখ্যা করবার উপায়-উপকরণ পাইনে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজ ভাঙবার জন্যেই যে মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ নবলব্ধ অধ্যাত্ম সত্যের অজুহাতে দ্রোহ-বিপ্লবের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার অস্বীকৃতি থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। কাজেই জৈন-বৌদ্ধ মত মানুষের পীড়ন-মুক্তির দিশারী ও নব চিন্তাচেতনার প্রবর্তক। এ সূত্রে নব শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং দর্শনও গড়ে উঠল। বৌদ্ধমত প্রচারের মাধ্যমেই গোটা এশিয়ায় তথা বহির্বিশ্বে ভারতের ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি ও সভ্যতা স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেল। সে কারণে বৌদ্ধমত আমাদের গৌরবের ও গর্বের স্মারক। চার আর্যসত্য ভিত্তিক বৌদ্ধদর্শন পার্থিব ও শারীর জীবনের যন্ত্রণা, অসারতা ও পরিণাম-ভয়াবহতাকে একান্ত ভাবনা ও আলোচনার বিষয় করেছিল। ফলে অবিদ্যা, স্কন্ধ, তৃষ্ণা প্রভৃতি বৌদ্ধমনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল এবং তা-ই জাগিয়েছিল বিষয়-বিরাগ, ভোগ-ভীতি এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যে মাধুর্যে ও আনন্দে বীতরাগ। কাজেই চতুষ্কোটিবিমুক্ততা, শূন্যতা ও নির্বাণ ব্যতীত

তাদের বাঞ্ছিত ও সাধ্য আর কিছুই ছিল না। প্রাণ-মন সমন্বিত জৈবজীবনের পক্ষে এ তত্ত্ব ও শিক্ষা বাস্তবে সনিষ্ঠ আচরণ ও রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। তাই এতো সূক্ষ্ম তত্ত্বচিন্তা প্রসূত মুক্তির আশ্বাসও ভোগকামী মর্ত্যমায়ামুগ্ধ সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। ফলে বৌদ্ধমতাদর্শের উদ্ভব ক্ষেত্রেই বৌদ্ধ মতের ও সমাজের বিকৃতি ও বিলুপ্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল।

২

চৌরাশীসিদ্ধা তত্ত্ব

প্রাচীন ও মধ্য যুগের ধর্মসাহিত্যে 'চৌরাশী' সংখ্যাটি গভীর তাৎপর্যবহ। তত্ত্ব সাহিত্যে ঐ সংখ্যাটি এতো বহুল ব্যবহৃত যে পাঠক-শ্রোতার দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়েই পারে না। সংস্কৃতে প্রাকৃতে অবহট্‌ঠে ও আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত অধ্যাত্মতত্ত্ব ও সাধন সম্পর্কিত মরমীয়া সাহিত্যের প্রায় অপরিহার্য অংশ ঐ চৌরাশী সংখ্যাটি। এ ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক ও অনার্য সংস্কার প্রসূত। এ অনেকটা আরবী ঐতিহ্যের ও ইসলামী ঐতিহ্যের 'সত্তর' সংখ্যার মতো। অসংখ্য নির্দেশক এই 'সত্তর' আরবী ভাষার বাগ্বিধির অঙ্গ এবং প্রাত্যহিক ও সর্বজনীন ব্যবহারে সুপরিচিত। চৌরাশীও 'অসংখ্য'-'অগণিত' অর্থে প্রযুক্ত হত। প্রাচীন সংস্কারের ও তাৎপর্যের বিস্মৃতি ঘটলেও আজো তিন-পাঁচ-সাত-নয় প্রভৃতি সংখ্যা যেমন দূর-অতীতের যাদু-বিশ্বাসের অবোধ্য ইঙ্গিতবহ, 'চৌরাশী'ও তেমনি এক বিস্মৃত সাংকেতিক সংখ্যা।

ফলে, অন্তত চৌদ্দ শতক থেকে চৌরাশী' সংখ্যার তাৎপর্য-নিরূপণ প্রয়াস বিকৃত ভাবে শুরু হয়। ঐ শতকের প্রথম পাদে মিথিলার কবি শেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর তাঁর 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে 'অথ চৌরাশীসিদ্ধা বর্ণনা' শীর্ষক অধ্যায়ে মাত্র আটাত্তর জন সিদ্ধার নামের তালিকা সংকলন করেছিলেন। তিব্বতী সূত্রে প্রাপ্ত চৌরাশীজন মহাসিদ্ধের নাম ও পরিচয় সংকলন করেছেন Albert gruenwedel, কিন্তু জোতিরীশ্বরের ও gruenwedel-এর তালিকায় অভিন্ন নাম বেশী নেই। যদিও চর্যাগীতি ও অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রাপ্ত অধিকাংশ নাম উভয় তালিকায় মেলে। যেমন মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, চামারী (চর্মারু) তন্তি পা, কমারী (কর্মার), কপাল, মেদিনী, দারি পা (দারিক), ধোবী, কামারী, (কমলাম্বর) পাসল (পাচল), কাহ্ন, জালন্ধরী, মবহ (সরহ), বিরূপ, টেঙ্গি, নাগার্জুন, চেন্টস (চেন্টন), চর্পটি, ভাদে (ভদ্র), ধর্ম (ধাম), শবর, শান্তি, চাটল (চাটিল), কমল (শীল)। তিব্বতী তালিকায় আমাদের

পরিচিত আরো কয়েকটি নাম মেলে, যথা লুই, ডোম্বী, হেরুক, ভীনাপা, সরহ, রাহুল ভদ্র, রত্নাকর শান্তি, আর্যদেব, নাড়োপাদ, তৈলিক পা, কঙ্কণ, কম্বল, কুক্কুরী-পাদ, মহী, ইন্দ্রভূতি, বজ্রঘন্ট, জয়ানন্ত (জয়নন্দী) প্রভৃতি।

বৌদ্ধ চৌরাশীসিদ্ধা বা নাথ মহাসিদ্ধার যে-সব নাম উভয় তালিকায় বিধৃত, তাঁদের আবির্ভাব কাল মোটামুটি খ্রীস্টীয় পাঁচ শতক থেকে বারো শতকের মধ্যে। চৌদ্দ শতক থেকে 'চৌরাশী' সংখ্যাটি নাথ বা বজ্র সহজযানী সিদ্ধ পুরুষের সংখ্যা-বাচক ও জ্ঞাপক রূপে 'যোগরূঢ়' হয়ে গেছে। অথচ চৌরাশীর তেমন নিশ্চিত সংজ্ঞা তথ্যবিরোধী।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণায় চৌরাশীর বহুল ও ব্যাপক ব্যবহার ও তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন:

ক. বৌদ্ধ পূর্ব যুগের আজীবিকদের বিশ্বাস ছিল যে চৌরাশী লক্ষ স্তর বা অবস্থা (জন্মান্তর) অতিক্রম করে আত্মা মনুষ্য দেহে স্থিতি পায়।

খ. মৈত্রায়নী উপনিষদে চৌরাশী হাজার বার জন্মের বা জন্মান্তরের উল্লেখ রয়েছে।

গ. কোন কোন তন্ত্রে ও পুরাণে বিভিন্ন অবস্থায় চৌরাশী লক্ষ যোনী ও জন্মের কথা আছে।

ঘ. বৌদ্ধদের 'ধর্মখন্ধ' (ধর্মস্কন্ধ)-এর সংখ্যা চৌরাশী বা চৌরাশী হাজার।

পালি ভাষায় রচিত 'গন্ধবংশ'-এ বলা হয়েছে, যে-সব পণ্ডিত চৌরাশী হাজার সংখ্যক ধর্মখন্ধের-এর টীকা-ভাষ্য রচনা করবেন, কিংবা টীকা-ভাষ্য রচনায় অন্যদের প্রবর্তনা দেবেন, তাঁরা চৌরাশী হাজার চৈত্যনির্মাণের, চৌরাশী হাজার বুদ্ধ মূর্তি গঠনের এবং চৌরাশী হাজার বিহার প্রতিষ্ঠার পুণ্য অর্জন করবেন ও করাবেন। আর যাঁরা সংগ্রহ করতে সাহায্য করবেন, লিপিবদ্ধ করবেন বা করাবেন এবং যাঁরা বুদ্ধ বাণীর পুথি সংরক্ষণ করবেন ও করাবেন তাঁরা ঐরূপ পুণ্য পাবেন।

ঙ. পালি গ্রন্থ 'অনাগত বংশ'-এ ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়ীর বৈরাগ্য বরণ কালে চৌরাশী হাজার বন্ধু, জ্ঞাতি, রাজপুত্র ও চৌরাশী হাজার বেদজ্ঞব্রাহ্মণ তাঁকে অনুসরণ করবে।

চ. যোগ ও তন্ত্রের গ্রন্থে যোগাসনের ব্যায়াম চর্যা পদ্ধতিও চৌরাশী প্রকার, এমনি কোন কোন গ্রন্থে চৌরাশী হাজার বলেও উল্লেখিত হয়েছে। জীব বিবর্তন স্তরও হচ্ছে চৌরাশী হাজার।

ছ. কান কাটা যোগীদের জপমালায় রয়েছে চৌরাশী বিটি বা দান।

ঝ. স্কন্দ পুরাণেও রয়েছে চৌরাশী প্রকার শিব লিঙ্গের বর্ণনা।[১]

কাজেই বজ্র-সহজযানী কিংবা নাথপন্থী সিদ্ধদের চৌরাশীও নিতান্ত সিদ্ধা সংখ্যাজ্ঞাপক না হওয়ারই কথা। এর অন্য গূঢ় সাংকেতিক তাৎপর্য থাকাই সম্ভব। মনে হয় চৌরাশীর সাংকেতিক ঐতিহ্য প্রাগৈতিহাসিক হলেও মহাযানী বৌদ্ধ মতের উন্মেষ, প্রচার ও প্রসার কালেই পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তা লোকপ্রসিদ্ধি লাভ করে। তাই আমরা পূর্ব-ভারতে, নেপালে ও তিব্বতে চৌরাশীর গুরুত্ব দেখতে পাই। এমন কি দাক্ষিণাত্যে ও জাভায়[২] কোন কোন সিদ্ধানাম অজ্ঞাত নয়। বামায় চীনে ইন্দোচীনে ও জাপানে তথা বৌদ্ধ জগতের সর্বত্র এই চৌরাশীর সংস্কার কোন না কোন অর্থে মিলবে বলেই আমাদের ধারণা।

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র যে অনার্য মানস প্রসূত তত্ত্ব ও মত তা' আজকাল আর অস্বীকৃত হয় না। এই যোগ-তান্ত্রিক সাধন পন্থায় যারা কায়া সাধনা করে দেহ ও দেহজ চেতনা নিয়ন্ত্রণে সিদ্ধি বা সাফল্য লাভ করে, তারাই সিদ্ধপুরুষ বা সিদ্ধা। স্মরণাতীত কাল থেকে আজীবিক, কাপালিক, লোকায়তিক, চার্বাকপন্থী, মন্ত্রী, তন্ত্রী, কালচক্রী, বজ্রী-সহজী, সন্তশৈব-নাথপন্থী, বাউল-বৈষ্ণব-সহজী-সুফীরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে যৌগিক এবং (কম-বেশী) তান্ত্রিক সাধনাকেই লক্ষ্য ও সিদ্ধির অবলম্বন করেছে। অজরত্ব,-অমরত্ব ও অলৌকিক শক্তি অর্জনই এ কায়-সাধনার সাধারণ লক্ষ্য। এ সূত্রে যোগী শিবতত্ত্বও স্মর্তব্য। মন্ত্র-তন্ত্র-যোগ-কায় সাধন সবই শিবপ্রোক্ত বলে কথিত। পূর্ব ভারতে বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে স্বধর্ম রক্ষণ প্রয়াসী নির্জিত বৌদ্ধরা প্রচ্ছন্নভাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে আশ্রিত হয়। তাঁতী সম্প্রদায়ের নাথযোগী, ধর্মপূজক, নাথ-গোরক্ষপন্থী, সহজিয়া বৈষ্ণব ও নানা নামের হিন্দু-মুসলিম বাউলরা সেই বৌদ্ধ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ' নাথপন্থ যে বৌদ্ধ তন্ত্রযান হইতে উদ্ভূত বা প্রভাবান্বিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'[৩] সুকুমার সেনও স্বীকার করেন, "মহাযান উপাস্য অনেক দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক উপাসনায় স্থান পাইল এবং লোপোন্মুখ (তান্ত্রিক) বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে ঢুকিয়া গেল" (বা: সা: ইং পৃ-৭৭)।[৩]

১ Obscure Religious Cult as Background of Bengali Literature. C. U. p p. 234-36

২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৯ সন।

৩ বাংলা সাহিত্যের কথা (ন. সং ১৯৬৩ সন), পৃ: ১০-২০ এবং চর্যাগীতি পদাবলী' (৩য় সং ১৯৭৩ সন), পৃ: ৪০-৪২-৪৭।

"চর্যামতের এই ধারাটি (বামাচারী ধারা) বাউলদের সাধনায় অব্যাহত রহিয়াছে" এবং নাথপন্থী ও গোরখপন্থী সাধকেরাও চর্যাসাধনার ঐতিহ্যের অনুসারী।" আবার অন্যত্র ডোমনী-কাপালিকের প্রসঙ্গে শিব-শক্তির লৌকিক ব্রাহ্মণ্য রূপান্তর সূত্রে তিনি বলেছেন: "এখানে শৈবযোগীদের সঙ্গে বৌদ্ধযোগীদের এবং চর্যাগীতির সঙ্গে পরবর্তী কালের শিব-সঙ্গীতের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।"[১] "হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় বিধ তন্ত্র শাস্ত্রে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি একটি অদ্বয়তত্ত্বই হইল পরমতত্ত্ব।"[২] কাজেই কেবল শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ প্রচারণায় নয়, বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রাবল্যেই ভারতব্যাপী সন্ত-যোগী-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর প্রাদুর্ভাব সম্ভব হয়েছিল। বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে এমনি করেই আদিনাথ গোরক্ষনাথ মীননাথ ময়নামতী মানিকচন্দ্র-যোগীপালতত্ত্ব ব্রাহ্মণ্য নাথ-শৈব-শাক্ত ও ইসলামী সূফী আবরণ ধারণ করে। নাদ-বিন্দু বামাচারে কিংবা ব্রহ্মচর্যে সবারই সাধ্য।[৩] তাই মীননাথ গোরক্ষনাথ কানুফা হাড়িফা—সিদ্ধা কাহিনীও বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিমের স্মরেণ্য ও আলোচ্য।

আকস্মিকভাবে চৌরাশীর একটা ব্যাখ্যা মিলেছে ষোল শতকের কবি 'নবীবংশ' প্রণেতা মীর সৈয়দ সুলতান রচিত 'জ্ঞান প্রদীপে'। এ গ্রন্থে সুফীদের যোগ ও দেহতত্ত্ব ভিত্তিক অধ্যাত্ম্য সাধনার শাস্ত্র ও পদ্ধতি বিবৃত।

সৈয়দ সুলতানের বর্ণনায় দেখা যায় মানুষের দেহ স্ব স্ব আঙুলের পরিমাপে চৌরাশী আঙুল পরিমিত, যেমন স্ব স্ব হাতের মাপে প্রত্যেকের শরীরের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত। অতএব চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহ ও দেহজ মন নিয়ন্ত্রণে সিদ্ধ যে সাধক, সেই চৌরাশী সিদ্ধ বা সিদ্ধা।' অর্থাৎ কায়া সাধনে সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ বা নারীই সিদ্ধা। সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহের রূপকার্থক পরিভাষা হচ্ছে 'আউটি'। 'আউটি' মধ্যযুগের সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত (অর্ধচতুর্থী > আউটি?)। তেমনি এই চোরাশীও। ডক্টর সুকুমার সেনও মনে করেন "চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টির মতো চৌরাশী সিদ্ধের চৌরাশীও সাংকেতিক সংখ্যা মাত্র।"[৪]

'চৌরাশী' সংখ্যা সম্বন্ধে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের আবিষ্কৃত তথ্য, চৌরাশী সিদ্ধার বিভিন্ন অপূর্ণ তালিকা এবং তালিকায় নাম বৈসাদৃশ্য আর নাথ ও সহজ

---

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ৭৭ এবং চর্যাগীতি পদাবলী (৩য় সং), পৃঃ ৪৭, ৪০, ৪২।
২. বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি: শশিভূষণ দাশগুপ্ত (৩য় মুদ্রণ), পৃ ৯৫।
৩. বাঙলার সুফী সাহিত্য ও বাউলতত্ত্ব গ্রন্থদ্বয়—আহমদ শরীফ।
৪. ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খ বিজয়-এর ভূমিকা পৃ ১ খ(৬)।

পন্থীদের পরস্পর বিরোধী দাবীর আলোকে বিচার করলে সৈয়দ সুলতানের এ ব্যাখ্যা অযৌক্তিক ও অসত্য বলে মনে হবে না।

সৈয়দ সুলতানের মতে যোগাসনে শরীর চৌরাশী আঙুল পরিমিত হয়, যেমন—

পা থেকে গুহ্যদ্বার			½	আঙুল
গুহ্যদ্বার থেকে লিঙ্গ			½	,,
নিতম্ব থেকে চিতি			১১	,,
চিতি	,,	হাঁটু	৮	,,
হাঁটু	,,	উরু	২½	,,
উরু	,,	শ্রীহাট	৮	,,
শ্রীহাট	,,	দেহকেন্দ্র	৮	,,
দেহকেন্দ্র	,,	মেরুদণ্ড	৩½	,,
মেরুদণ্ড	,,	নাভি	৮	,,
নাভি	,,	হৃৎ	১৪	,,
হৃৎ	,,	কণ্ঠ	৬	,,
কণ্ঠ	,,	জিহ্বা	৪	,,
জিহ্বা	,,	নাসা	৪	,,
নাসা	,,	আঁখি	½	,,
আঁখি	,,	ভ্রূ	½	,,
ভ্রূ	,,	ললাট	২	,,
ললাট	,,	উষ্ণীষ	৩	,,
			৮৪	আঙুল

শুধু যোগাসনে নয় দাঁড়ানো অবস্থায়ও শরীর স্ব স্ব মাপে ৮৪ আঙুল পরিমিত। তালুর সংলগ্ন আঙুলমূল দিয়েই মাপা বিধেয়। জ্ঞানপ্রদীপ থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহের পরিমাপ :

শরীরে কহিমু তত্ত্ব অদ্ভুত আকার।
পদাঙ্গুলি আদি করি মস্তকের স্থল
শরীর আধার মূল চুয়াল্লিশ আঙ্গুল।
শরীরের পাদপদ্ম দ্বাদশ আঙ্গুল
দ্বাদশ আঙ্গুল হএ তার আদি মূল।

সহজে শরীর মধ্যে আঙ্গুল চৌরাশী
চৌরাশী আঙ্গুল হেন সর্বলোকে ঘোষে।
পায়ের আঙ্গুল দেহ নহে ভিন্ন মান
পাও হন্তে অর্দ্ধ আঙ্গুল হএ কুলুপের স্থান।
গুহ্য হন্তে লিঙ্গ হএ অর্দ্ধ আঙ্গুল
জঙ্ঘা হন্তে এগার আঙ্গুল চিত্তি মূল।
চিত্তি হন্তে অষ্ট আঙ্গুল হএ জানু দুই
জানু উরু মধ্যে হএ আঙ্গুল আড়াই।
উরু হন্তে শ্রীহাট হএ অষ্টম আঙ্গুল
তাহা হন্তে দেহমধ্যে অষ্টম আঙ্গুল।
সেই হন্তে মেরু জান আউট প্রমাণ
মেরু হন্তে অষ্ট আঙ্গুল নাভি স্থান।
নাভি হন্তে চৌদ্দ আঙ্গুল হৃদয়
হৃদ হন্তে কন্ঠ হএ আঙ্গুল ছয়।
কণ্ঠ হন্তে চারি আঙ্গুল জিহবা মূল
জিহবা হন্তে নাসা হএ এ চারি আঙ্গুল।
নাসা হন্তে অর্দ্ধ আঙ্গুল চক্ষু স্থান
তার মধ্যে ভাত জ্যোতি দেখিবা সুঠাম।
চক্ষু হন্তে ভুরু মধ্যে অর্দ্ধ আঙ্গুল
এহি স্থানে জান যোগের আদিমূল।
নাভিস্থানের অগ্নি যদি সকল হেতু হএ
তালু মূলে দিবারাত্রি নীর বিন্দু বহে।
ভুরু হন্তে দুই আঙ্গুল কপাল বসতি
কপাল হন্তে তিন আঙ্গুল চুল সিতি।
এহি কর্ম হন্তে জান স্থির হএ মতি
ইহা হন্তে জান হএ অক্ষয় সুগতি।
এহি দ্বাদশ স্থানে বায়ু আরোপিয়া
স্থান হন্তে স্থান বায়ু তুলিবা চাপিয়া।
কহিল অপূর্ব কথা প্রসন্ন হৃদএ
সকল করিয়া দেখ হএ কি না হএ।

গুরু শাহ হোসেন পদে করিএ ভকতি
সৈদ সুলতানে কহে পরস্তাব স্থিতি।[১]

ষোল শতকের শেষ পাদের কবি সৈয়দ সুলতান (নবীবংশ রচনা কাল ১৫৮২-৮৪ খ্রীঃ) নিশ্চয়ই তাঁর সমকালে লোকশ্রুতি কিংবা গ্রন্থসূত্রে এই তথ্য পেয়েছিলেন। নইলে এমন নিশ্চিত বিশ্বাসে 'চৌরাশী' আঙুলের পরিমাপ বর্ণনা করতে পারতেন না।

সহজে শরীর মধ্যে আঙুল চৌরাশী
চৌরাশী আঙুল হেন সর্বলোকে ঘোষে।

'সর্বলোকে ঘোষে'—এ উক্তিতে আমাদের অনুমানের সমর্থন মেলে।

৩

সন্ধ্যা বা সন্ধা ভাষা

চর্যাগীতির আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "সহজিয়া ধর্মের সকল বইই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।"[২]

মুনিদত্ত তাঁর টীকায় সন্ধাভাষ, সন্ধাভাষা, সন্ধ্যাবচন, সন্ধ্যাসংকেত, সন্ধ্যা ও ব্যাজ প্রভৃতি চর্যার রূপকাশ্রিত দুর্বোধ্য অংশের বা প্রতীকী শব্দের ভাষ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বারবার প্রয়োগ করেছেন।

অদ্বয়বজ্রও তাঁর 'দোহাকোষপঞ্জিকা' নামের টীকাগ্রন্থে 'সন্ধাভাষ'-এর উল্লেখ করেছেন। এমনকি বেদেও রূপকার্থে দ্ব্যর্থবাচক সন্ধ্যাভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। অদ্বয়বজ্রসূত্রে এ তথ্যও জানা যায়।[৩]

---

১. New Light on Chaurasi Siddha: Ahmed Sharif. Abdul Karim Sahitya Visharad Commemorial vol, Asiatic society of Bangladesh, 1972, pp 345-51.

২. হাজার বছরের প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধগান ও দোহা, ভূমিকা।

৩. সুকুমার সেন: চর্যাগীতিপদাবলীতে উদ্ধৃত (পৃঃ ৩২)—তয়াশ্বেতচ্ছাগণিপাত নয়া নরকাদি দুঃখমনুভবন্তি। সন্ধাভাষমজানানত্বাৎ চ।"

হেবজ্রতন্ত্রে সন্ধ্যাভাষাকে মহাভাষা সময়সংকেত (Conventional signs) ও যোগিনীদের ব্যবহৃত গুহ্যভাষা বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১]

প্রহেলিকা হেঁয়ালি বাঁধার ও তত্ত্বসংকেতের এবং কাব্যের ভাষা চিরকালই দ্ব্যর্থবোধক, সাংকেতিক ও রূপকাশ্রিত হয়ে থাকে। বিশেষ অভিসন্ধি বশে ব্যবহৃত ভাষার নাম সন্ধাভাষা অথবা বাগর্থের আড়ালে ব্যঙ্গার্থ সন্ধান করতে হয় বলেই এ ভাষা সন্ধা বা সন্ধ্যাভাষা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই এর অপর নাম দিয়েছিলেন আলো-আঁধারি ভাষা। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে এই ভাষার নাম সন্ধা— সন্ধ্যা নয়, সন্ধ্যা লিপিকর প্রমাদ প্রসূত। সম্—ধা অর্থাৎ একটি বিশেষ অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় লইয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে যে ভাষা। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহাকে অনেক সময় 'আভিপ্রায়িক ভাষা'ও বলা হইয়াছে। পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই 'সন্ধা-ভাষা' শব্দটির এই অর্থে (বাচ্যার্থে ও ব্যঙ্গার্থে) বহু প্রাচীন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[২]

ডক্টর সুকুমার সেনের মতে সন্ধা বা সন্ধ্যা 'শব্দটিতে ধ্যৈ' (বা ধা) ধাতুর অর্থ প্রকট আছে। যে ভাষায় বা যে শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় (সম+ধৈ) অথবা যে ভাষায় বা শব্দে অর্থ বিশেষভাবে নিহিত (সম+ধা) তাহাই সন্ধ্যা (অথবা সন্ধা) ভাষা। একটি চর্যার (১২ সংখ্যক) ব্যাখ্যার প্রারম্ভে মুনিদত্তের উক্তিতে এই কথারই সমর্থন আছে।

—পুনরপি তমেবার্থং দ্যূতক্রীড়াধ্যানেন প্রকথয়ন্তি কৃষ্ণাচার্য পাদাঃ।"[৩]

অতএব সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত মিলল না। আলো-আঁধারি, অভিসন্ধি, অনুধ্যান, ব্যঙ্গ্যার্থ, গূঢ়অর্থ, সাংকেতিক অর্থ প্রভৃতি ব্যঞ্জক ও বাচক গুপ্ত মহাভাষার নাম 'সন্ধা বা সন্ধ্যাভাষা—এটুকু মাত্র জানা গেল। তবে সন্ধা বা সন্ধ্যাভাষা যে দ্ব্যর্থক ও রূপকাত্মক সে বিষয়ে মতানৈক্য নেই।

---

১. সন্ধ্যাভাষম মহাভাষম্ সময়সংকেতবিস্তরম্। যোগিনীনাম মহাসময়ম। (হেবজ্রতন্ত্র) ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক The old Bengali Language of Text এ উদ্ধৃত পাদটীকা : পৃঃ ১২-১৩।
বিস্তৃত তথ্যের জন্য তারাপদ মুখোপাধ্যায় 'International language in the Tantras' by A Bharati, Journal of the American Oriental Society V ol. 81, 1961, pp. 261-70. প্রবন্ধের প্রতি জিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

২. ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত : বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (৩ সং), পৃঃ ১৩২।

৩. চর্যাগীতিপদাবলী (৩য় সং), পৃঃ ৩১।

বহু বহু প্রতীকী শব্দ ছাড়াও চর্যাগীতিতে কয়েকটি প্রখ্যাত চরণ রয়েছে। এগুলো সন্ধা বা সন্ধ্যাভাষার ও গূঢ় সংকেতের প্রকৃষ্ট নমুনা :

১. রুখের তেন্তুরি কুম্ভীরে খাই।
২. বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে।
৩. বেঙ্গস সাপ বঢ়িল জাঅ।
৪. জো সো চোরা সোই সাধু।
৫. নিত্তিনিত্তি সিয়াল সিহ সম জুঝে।
৬. পিটা দুহিএ এ তিন সাঝেঁ।

৪

চর্যাগীতির দেশ-কাল ভাষা

এবার আমরা বহু ও বিবিধ বিতর্কের আধার চর্যাগীতির পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। বিতর্কিত সমস্যার সমাধান দেয়ার মতো প্রয়োজনীয় বিদ্যা, বুদ্ধি, গবেষণা আমাদের নেই। ভাষাবিদ, লিপিবিদ, তত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ জ্ঞানী মনীষী বিদ্বান গবেষকরা তা নানা ভাবে গত ষাট বছর ধরে করেছেন, করছেন এবং কোন পাথুরে প্রমাণ না মিললে ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন। তবে কারো কোন মত বা যুক্তি কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগে গ্রহণ-বর্জন-সমর্থনের অধিকার যে-কোন আগ্রহী পাঠকের যেমন থাকে তেমনি রয়েছে আমাদেরও। এ ক্ষেত্রে আমরা কেবল সেই অধিকারই প্রয়োগ করব নিরপেক্ষ ভাবে।

বিতর্কিত বিষয়গুলো এই :

১) চর্যাগীতির নাম কি?—চর্যাচর্যচয়, চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়, আশ্চর্যচর্যাচয়, চর্যাগীতি কোষ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়?

মুনিদত্ত যে প্রাপ্ত সটীক চর্যাগীতি সংগ্রহের টীকাকার তা তিব্বতী সূত্রে আবিষ্কার করেছিলেন ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচি। তিব্বতী অনুবাদের সন্ধান জানতেন ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আর সেই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন প্রবোধ চন্দ্র বাগচি।

মুনি দত্তের চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ছাড়াও অন্যান্য চর্যাগীতি সংকলনের আরো চারটি টীকাগ্রন্থ রচিত হয়েছিল :

ক. চর্যা মেলায়ন প্রদীপ—আর্যদেব।
খ. চর্যাগীতিবৃত্তি—দীপঙ্কর পণ্ডিত

গ. চর্যামেলায়ন প্রদীপ নামটীকা—শাক্য মিত্র।

ঘ. চর্যামেলায়ন প্রদীপ—শুদ্ধাকর বর্মণ।

কাজেই এরূপ শত শত চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল হয়তো। আমাদের প্রাপ্ত চর্যাগীতি সমূহ বিশেষ উদ্দেশ্যে সংকলিত হয়েছিল বলে মনে করি। এবং তাই একই ব্যক্তির রচিত বিভিন্ন চর্যাগীতি বৈষ্ণব পদাবলীর মতো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভাবানুসারে বিন্যস্ত হয়েছে।

এক কীর্তিচন্দ্র বা চন্দ্রকীর্তি মুনিদত্তের সমূল টীকা গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সেই গ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। শীলচারী নামে এক ব্যক্তিও চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদ করেছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও চর্যাগীতির সংকলক বলে কথিত। টীকা গ্রন্থে উদ্ধৃত চর্যাগীতির মূলপাঠের টীকায় প্রাপ্ত পাঠান্তর দৃষ্টে ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন মুনিদত্তের সমূল টীকার প্রাপ্ত পুথির লিপিকর মূল ও টীকা স্বতন্ত্র পুথি থেকে নকল করেছিলেন। কারণ টীকার পুঁথিতে মূল ছিল না। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি দুটো :

১. টীকাকার এক চর্যার টীকা শেষ করে অপর চর্যার টীকার শুরুতে "তমেবার্থং প্রতিপাদয়ন্তি" ইত্যাদি লিখেছেন এবং

২. একক পুথির নকলকার এগারো সংখ্যক চর্যার পরে 'মুনেত্যাদি চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি' লিখতেন না। এ অনুমান যথার্থ বলে মনে হয়।[১] তারাপদ মুখোপাধ্যায়ও এ মত সমর্থন করেন। পাঠান্তর সাধারণভাবে বহুল প্রচলন ও প্রাচীনত্বের দ্যোতক।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেয়া নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। মুনিদত্তের টীকার প্রারম্ভ শ্লোকের আলোকে কেউ কেউ 'আশ্চর্যচর্যাচয়' নামের পক্ষপাতী। 'বিনিশ্চয়' টীকা জ্ঞাপক এক্ষেত্রে মুনিদত্তের টীকাগ্রন্থের পুরো নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বলে অনুমান করা চলে। মুনিদত্তের শ্লোকে উক্ত 'নিমলগিরামটীকাম' থেকে তার টীকার উপযুক্ত নাম 'নির্মলগিরাটীকা' বলে অনুমান করেন ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি হরপ্রসাদশাস্ত্রী প্রদত্ত নাম চালু রাখার পক্ষপাতী।[২] বস্তন হগুার গ্রন্থে সমূল টীকার সমূল অনুবাদগ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতি কোষবৃত্তি'।

মুনি দত্তের টীকার কীর্তিচন্দ্র অনূদিত গ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। কাজেই মূল সংকলন গ্রন্থের নাম চর্যাগীতিকোষ হওয়ারই কথা। 'কোষ' যুক্ত গ্রন্থ নাম সেকালে বহুল প্রচলিত ছিল।

১. চর্যাগীতি পদাবলী (৩য়সং), প্রস্তাবনা ও পৃ: ১। চর্যাগীতি : পৃ: ১৪-১৫।

২. The old Bengali language and Text, p. 4.

অতএব বাঙলায় 'চর্যাগীতি' নামে আখ্যাত করাই সঙ্গত। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে 'চর্যাপদাবলী'ও বলা চলে। 'অইসনি চর্যা কুক্কুরীপাএ গাইউ। চেন্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ'। কাজেই 'চর্যাগীত' নামও রাখা যেতে পারে।

২) চর্যাগীতির পুথির লিপিকাল কোন শতক? লিপি বাঙলা না নেওয়ারী?

প্রাপ্ত সটীক চর্যাগীতির পুথির লিপিকাল চৌদ্দ থেকে ষোল শতকের মধ্যে বলে অনুমিত। এই পুথি বঙ্গাক্ষরে লিপীকৃত বলে বাঙালী বিদ্বানদের ধারণা এবং এই ধারণা নিঃসন্দেহে যথার্থ। কিন্তু লিপিকাল বারোশতক হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কেননা, ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত 'পঞ্চাকার' নামের পুঁথির লিপির সঙ্গে চর্যার লিপির অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।[১]

৩) চর্যাগীতির টীকাকার মুনিদত্ত কোন্ শতকের লোক?

তত্ত্বগ্রন্থের টীকা ভাষার জটিলতার জন্যে রচিত হয় না, তত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্যেই রচিত হয়। কাজেই চর্যাগীতির রচনাকাল ও টীকাকারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আবশ্যিক নয়। তবে মুনিদত্তের টীকার রচনাকাল ও প্রাপ্ত পুথির লিপি-কালের মধ্যে ব্যবধান যে সামান্য ছিল না তার প্রমাণ মূল ও টীকার পাঠে পার্থক্য। মুনিদত্তের সময়ে চর্যার গীতিসংগ্রহটি বহুল প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। কাজেই মুনিদত্তের এই টীকা নেপালীদের জন্যে রচিত হলে অবশ্য ভিন্ন কথা, কিন্তু বাঙালীর জন্যে রচিত হলে তা বৌদ্ধ বিলুপ্তির আগেই রচিত হয়েছিল বলে মানতে হবে। সে ক্ষেত্রে টীকা রচনার কাল এগারো বারো শতকের পরে যায় না।

৪) চর্যাগীতি কোন্ ভাষায় রচিত?—উড়িয়া মৈথিল, বাঙলা, অসমীয়া?

এ প্রশ্ন আলোচনার পূর্বশর্ত হচ্ছে: ক. চৌদ্দ শতকের পূর্বে নব্যভারতীয় আর্যভাষায় শিষ্ট লেখ্য সাহিত্য রচনার রেওয়াজ ছিল কিনা প্রমাণ করা এবং খ. উড়িষ্যা বিহার বাঙলা আসামের তথা গোটা পূর্বভারতের কবিগণ একই ভাষায় পদ রচনা করার মতো রাষ্ট্রিক, ভাষিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের যথার্থ কারণ ও প্রমাণ দেখানো।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পাঁচজন চর্যাকারের রচনা বাঙলা নয় বলে স্বীকার করেন,—শান্তির ভাষা মৈথিলী, আর্যদেবের ভাষা উড়িয়া, কঙ্কণের অপভ্রংশ-ঘেঁষা, মহীধরের মৈথিলী, জয়নন্দীর ভাষা অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বা প্রত্ন উড়িয়া-মৈথিলী-

১. Ibid, pp. 63-64,96.

বাঙলা-আসামী আর কাহ্ন-সরহ-ভুসুকুর ভাষা বঙ্গ-কামরূপী বলে মানেন। এবং চর্যাগীতির ভাষাকে তিনি 'বঙ্গ-কামরূপী' বলে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী।[১] ডক্টর সুকুমার সেন বিভিন্ন সময়ে চর্যাগীতির ভাষা সম্পর্কে যেসব মত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সেগুলো এখানে তুলে দিচ্ছি।—"উড়িয়া বাঙ্গালা ও অসমীয়া এক মূল পূর্বপ্রান্তীয় কথ্যভাষা হইতে উদ্ভূত। সুতরাং বাল্যাবস্থায় তিনটি ভাষার মধ্যে মিল থাকিবেই। কোন কোন বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ধরিলে চর্যাগীতির ভাষাকে উড়িয়া বা প্রাচীন অসমীয়া বলিলেও অন্যায় হয় না।"[২] (সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতের ব্যাখ্যাসূত্রে) চর্যাগীতির ভাষা 'বাংলার প্রত্নমূর্তি—অবহট্‌ঠের সদ্যোনির্মোকমুক্তরূপ'[৩]। চর্যাগীতির রচনাকালে "অবহট্‌ঠের প্রভাব সর্বদা উদ্যত ছিল'।[৪] চর্যাগীতির "ভাষায় একাধিক উপভাষার (পরে যা স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হইয়াছে) মিশ্রণ আছে।"[৫] 'নবীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রথমস্তরে সর্বত্র মোটামুটি একটা মিল ছিল।'[৬] অসমীয়া ভাষীদের দাবী অযৌক্তিক নয়, কেননা ষোড়শ শতাব্দী অবধি বাংলা ও অসমীয়া দুই ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিল না।'[৭] 'উড়িয়া আসামীদের সঙ্গে বাঙালার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ'।[৮] 'চর্যার ভাষায়' অবশ্যই একাধিক উপভাষার মিশ্রণ রয়েছে'।[৯]

তেরো শতকের পরে উড়িয়া এবং ষোল শতকের পরে আসামী যে বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—সে সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর সুকুমার সেন অভিন্ন মত। উক্ত তিন পণ্ডিত এবং ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচিও স্বীকার করেন যে চর্যাগীতি বারো শতকের মধ্যেকার রচনা। তা-ই যদি হয় তা হলে চর্যাগীতির উপর কোন এক অঞ্চলের বা এক ভাষার দাবী স্বীকার করা চলে না। সে ক্ষেত্রে চর্যার ভাষা অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বা লেখ্য প্রত্ন বাঙলা-উড়িয়া-মৈথিল-আসামীর অভিন্ন জননী স্বরূপা বলে মানতে হয়। এ ভাষার ভিত্তি মাগধী বা গৌড়ী অবহট্‌ঠ নয়—শৌরসেনী। চর্যার মূল পাঠে ও পাঠান্তরে উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত যে বৈচিত্র্য রয়েছে, তা এবং বিভিন্ন চর্যায় একই পুরুষে ও কারকে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের প্রয়োগও রচনার দীর্ঘ কালপরিসর ও স্থান-বিস্তৃতির সাক্ষ্য।

১. বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড), ১৯৬৩ সন, পৃঃ ৬৮-৭০, ৮৭-৮৮।
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১/পূ/৩, পৃঃ ৬০।
৩-৬. চর্যাগীতি পদাবলী ৩য় সং—প্রস্তাবনা, পৃঃ ৮, ৪৮।
৭. ভাষার ইতিবৃত্ত (৪র্থ সং), পৃঃ ১৫।
৮. চর্যাগীতি পদাবলী (৩য় সং) পৃঃ ৩৯।
৯. চর্যাগীতি (১৯৬৫ সন)—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৭।

৫) চর্যাগীতির সবকয়টি পদের ভাষা কি সমকালীন ও অভিন্ন ?

মুখে মুখে জনান্তরে, স্থানান্তরে ও কালান্তরে ভাষা যে প্রতি মুহূর্তে বিকৃত বা বিবর্তিত হয়—এ তথ্য অস্বীকৃত নয়। তাছাড়া শ্রোতার উদ্দেশ্যেই গায়েন গানের আসর করেন, লিপিকরও সমকালীন পাঠক লক্ষ্যে তৈরী করেন পুথি। উভয়েরই লক্ষ্য সমকালীন শ্রোতা ও পাঠক। তাঁরা যে সমকালোপযোগী করে শব্দ ও উচ্চারণ বদলান, এমন কি পাঠও ইচ্ছামতো বর্জন, সংশোধন ও সংযোজন করেন, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া লিপিকর প্রমাদতো থাকেই। বিদ্যাপতির মৈথিল পদের বাঙলা রূপ, ডাক, খনার বচন এবং মালাধর বসু কিংবা কৃত্তিবাসের প্রচলিত কাব্যের ভাষা দেখেই তা বিশ্বাস করতে হয়। অতএব বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় রচনা মাত্রেরই ভাষা পরিবর্তিত হয়। কাজেই প্রাপ্ত চর্যাগীতির ভাষায় চর্যাকারদের ভাষা অবিকৃত নেই। এ ভাষা মুনিদত্তের সমকালীন। এমন কি লিপিকরের সমকালীনও হতে পারে। কারণ মূলপাঠ ও টীকা-বিধৃত পাঠ অভিন্ন নয়। যেটিতে প্রাচীনতার লক্ষণ বেশী সেটিই প্রাচীনতর পাঠ। বিভিন্ন কালে ও স্থানে বিভিন্ন কবি রচিত চর্যাগীতির ভাষা ও ব্যাকরণ গোড়ায় অভিন্ন ছিল না। আজো বিভিন্ন চর্যায় উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত পার্থক্য কিছুটা অবিলুপ্ত।

৬) বিভিন্ন চর্যাকারের জীবৎকাল ও জন্মভূম নিরূপণ।

সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে চর্যাকারের জীবৎকাল ও জন্মস্থান নিরূপণ। এ দুটোর সমাধান সম্ভব হলে, চর্যার ভাষা, কাল ও স্থান সহজেই নিরূপিত হতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

৭) চর্যাপদগুলো কোন্ যানীর রচিত ও কোন্ যানের চর্যা বা সাধনতত্ত্ব নির্দেশক ?

মন্ত্র, তন্ত্র, বজ্র, কালচক্র ও সহজ যানে বাহ্য পার্থক্য অস্পষ্ট। চর্যাপদ গুলো কি কোন বিশেষ যানের রচিত অথবা সব যানেরই গুহ্য সাধন পন্থ ও প্রতীক ? বা চর্যা কি মূলত অভিন্ন কিংবা পদগুলো বিভিন্ন যানীর সাধারণ তত্ত্ব-চেতনার স্বাক্ষর ? যেমন মরমীয়া পদে একটা সর্বমানবিক ও সর্বাঞ্চলিক সাধারণ মানব আকূতির জিজ্ঞাসা রূপ পায়, এগুলো কি মত-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বৌদ্ধ মরমীয়া পদ ? এ সব প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন।

বৌদ্ধ মহাযানের উপযান মন্ত্র ও তন্ত্র যানের প্রশাখা হচ্ছে বজ্র, কালচক্র ও সহজযান। সবটাই যোগ-তন্ত্র ভিত্তিক সাধনা সাপেক্ষ। নাদবিন্দু তত্ত্ব সবারই স্বীকৃত। কেউ বামাচারী কেউবা ব্রহ্মচারী—এ-ই যা তফাৎ। চর্যায়ও পার্থক্য সামান্য। শূন্য, নির্বাণ, সহজও প্রায় সমার্থক। সামরস্য, অদ্বয়তা, চতুষ্কোটিবিমুক্ত

নির্বেদ অবস্থা ও ইচ্ছাশক্তি সবারই কাম্য এবং সাধনলক্ষ্য। সবাই মন-পবনের নৌকা এই কায়ার সাধক। শৈব, শাক্ত, নাথ, গোরখপন্থী, সহজিয়া, বৈষ্ণব, বাউল ও সুফীরা আজো এই সাধনার ধারক ও বাহক।

৮) এই ধর্মমত কি প্রাচ্য ভারতের সামাজিক ও গৃহস্থ বৌদ্ধদের মধ্যে চালু ছিল? না অন্তেবাসী নির্গ্রন্থ শ্রমণ-যোগী-তান্ত্রিকদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল? অথবা নির্জিত, নির্বিত্ত, অবজ্ঞেয় সমাজ-প্রান্তিক তথা নিম্নস্তরের আধা বুনো বর্বর মানুষের মধ্যে চালু ছিল?

৯) অঞ্চল বিশেষে বহুল উচ্চারণে তথা চর্চার ফলে লিখিত ভাষাও স্থানীয় বুলির প্রভাবে বিকৃত হয়—উচ্চারণে, ব্যাকরণে, বানানে ও বিভক্তি চিহ্নে। বিতর্কের অবসানের জন্যে, স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্যে এবং বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে এসব জিজ্ঞাসার উত্তর আবশ্যিক।

কয়েকটি তথ্য অঙ্গীকার করে আলোচনা করলে, কিছু জটিলতা এড়ানো হয়তো সম্ভব বলে মনে হয়:

ক. উচঁা উচাঁ পাবত বা টিলার ঘর—বাঙলার নয়, বাঙলা বিহার উড়িষ্যার প্রান্তিক অঞ্চলের এবং আসামের।

খ. শবর-শবরী অরণ্য-পর্বতবাসী—সমতলের নয়।

গ. নেড়ে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ্যবাদী দ্বিজ নয়, মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণ। বুদ্ধ স্বয়ং বলেছেন—বৈর ক্লেশ আসক্তিহীন শুদ্ধচিত্ত সদাচারীই ব্রাহ্মণ,—জন্মসূত্রে নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীই ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধেরা ব্রহ্ম স্বীকার করে না, তবে চালু ব্রাহ্মণ্য পরিভাষা অর্থান্তরে ব্যবহৃত মাত্র। প্রমাণ তিব্বতী অনুবাদে সরহকে 'মহাব্রাহ্মণ ও মহা-শবর বলা হয়েছে। (সুকুমার সেন—চর্যাগীতি ভূমিকা, পৃঃ ১৯)

ঘ. হরিণ বুনো প্রাণী এবং হাতী আসামে ত্রিপুরায় ও পার্বত্য-চট্টগ্রামে লভ্য—বাঙলা-উড়িষ্যা-বিহারে নয়।

ঙ. পঁউয়া খাল—পদ্মা নদী নয়—খাল এবং তা চতুষ্পদ্মারূপ সাধনস্তরে বা থানায় পৌঁছবার জন্যে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নারূপ খাল তথা নাড়ী নির্দেশক।—'পদ্মা গামী খাল। সে খালে 'বজ্রনৌকা বেয়ে চলে ভুসুকু।'

চ গঙ্গা-যমুনা—গঙ্গা (ভাগীরথী শাখা) ও যমুনা বাঙলা দেশে আছে বটে,, কিন্তু এ নদীদ্বয় সর্ব ভারতীয় ঐতিহ্যের ও উল্লেখের উত্তর ভারতীয় নদী, চর্যাপদে ভিন্ন তাৎপর্যে ব্যবহৃত।

ছ. বঙ্গালী-ভইলী কিংবা বঙ্গালদেশ লোড়িউ—অবাঙালীর বাঙালী হওয়া ও বাঙলাদেশ লুঠ করা বোঝায়, ভুসুকু বাঙালী ছিলেন বলে নির্দেশ করে না। তা ছাড়া অন্বয় বঙ্গালদেশ, বঙ্গাল, বঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতির রূপকার্থ রয়েছে।

জ. ময়ূর, তুলাধূনা, নৌকা, নদী, কুমীর একান্তভাবে কোন অঞ্চলের নয়, বরং বধূর কামরূপ যাওয়া যোগতন্ত্রের বিকাশক্ষেত্র (অমৃতকুণ্ড স্মর্তব্য) 'কামরূপ কামাখ্যা' ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্গ বঙ্গাল-এর উল্লেখ যদি চর্যায় বাঙলার দাবী সাব্যস্ত করে, তাহলে কামরূপের দাবীও কম নয়।

ঝ. পালরাজত্বের শুরু ও শেষ মগধেই। গোটা বাঙলাদেশ কখনো পাল শাসনে ছিল না। আরাকান সম্ভূত সমতটের চন্দ্ররা এবং আরাকান রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। নাথ সাহিত্যের সূত্রে বোঝা যায়—এ অঞ্চলে যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ গুহ্য সাধনার প্রসার ও জনপ্রিয়তা ছিল। পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধরাজত্ব ও বৌদ্ধ সাধনার জের তেরো শতক অবধি চলার কথা। তন্ত্রভিত্তিক মন্ত্রযান প্রসূত কালচক্র-বজ্র-সহজযান-পূর্বভারতে, নেপালে, তিব্বতে ও ইন্দোনেশিয়ায় (যবদ্বীপ সুমাত্রায়) জনপ্রিয় ছিল। পূর্বভারতের পালরাজারা ও জাভাসুমাত্রার শৈলেন্দ্র রাজারা বজ্রযানী ছিলেন। বজ্রযানী গৃহী সমাজে পূর্বভারতে-নেপালে-তিববতে-জাভায়-সুমাত্রায়) বজ্রধর-বজ্রতারা-মঞ্জুশ্রী মূর্তি পূজিত হত। মন্ত্র-যানীর একটি উপসম্প্রদায়ে দারু-টোনা-উচাটন মারণ-বশীকরণ প্রভৃতিও প্রবল হয়—যা আজো পার্বত্য চট্টগ্রামে, কামরূপে-কামাখ্যায়-নেপালে-তিববতে সুলভ। চর্যাগীতি নেপালে আজো চালু রয়েছে, যেমন সহজিয়া বাউল গান চলছে আমাদের দেশে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' ১৯১৭ সনে সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ষাট বছর ধরে চর্যাগীতির ভাষা নিয়ে বিতর্ক চলছে বটে, কিন্তু ভাষাটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা-সাহিত্যের ঐতিহ্য বা নিদর্শনের প্রাচীনত্ব দেখিয়ে আঞ্চলিক গৌরব বৃদ্ধি করা। এ সব উদ্দেশ্যমূলক আলোচনায় সত্য উদঘাটনের প্রয়াস আদালতে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয়ের উকিলের যুক্তির মতো। তাই এই বিতর্কের এ অবস্থায় অবসানের আশা নেই।

গোটা প্রাচ্য ভারতে তথা উড়িষ্যা, বিহার, বাঙলা, আসামে ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য এই চর্যাগীতি। এবং উক্ত প্রদেশ গুলোতে চর্যাগীতি স্ব স্ব ভাষা ও সাহিত্যের আদিরূপ ও নিদর্শন হিসেবেই পড়া-পড়ানো হয়। কেউ দাবী ছাড়ে না—কেউ এ দাবী ছিনিয়ে নিতে পারে না। অবস্থাটা 'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ও ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচির সম্পাদিত গ্রন্থদ্বয় ছাড়াও

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বই হিসেবে কাটতি আছে বলে এযাবত বিভিন্ন অধ্যাপক সম্পাদিত প্রায় দশ-বারোটি বিভিন্ন চর্যাগীতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, আরো আছে কিনা আমার জানা নেই, তবে ভবিষ্যতে আরো যে বেরুবে তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। হয়তো আসামে, বিহারে, উড়িষ্যায়ও এমনি ডজন খানেক করে সম্পাদিত 'চর্যাগীতি' মিলবে। বিনা যুদ্ধে তো নয়ই, রণক্লান্ত হয়েও কেউ সূচাগ্র পরিমাণ দাবীও ছাড়বার আভাস দিচ্ছেন না। বরং বাঙালী পণ্ডিত সুকুমার সেনই এক্ষেত্রে কিছুটা উদারতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত মীমাংসার ইঙ্গিতও তাঁর কাছ থেকেই মিলেছে। তাঁর মতে চর্যাগীতি গ্রন্থ বাঙলা-উড়িয়া-আসামী-মৈথিল ভাষায় রচিত। অতএব এটিকে একটি অর্বাচীন বা সর্বশেষ স্তরের অবহট্‌ঠে তথা বাঙলা-উড়িয়া-আসামী-মৈথিল বুলি স্বাতন্ত্র্য লাভের অব্যবহিত পূর্ব সময় পরিসরে রচিত। কাজেই চর্যাপদ মুমূর্ষু অর্বাচীন প্রাচ্য বুলি প্রভাবিত শৌরসেনী অবহট্‌ঠে রচিত। তাই এতে প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষার সাদৃশ্য আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে এবং স্বাধিকারের লাভ ও লোভ কেউ ছাড়তে রাজী হচ্ছেন না। বাঙালীর মুখপাত্র ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অর্ধেক দাবী ত্যাগ করে বাঙালীর দাবী প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু 'সর্বনাশ' ঐ পণ্ডিতযুগল ঠেকাতে পারেন নি, বরং বাঙালীর একক দাবী তাঁদের ঐ স্বীকৃতির ফলেই অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। উভয়েই স্বীকার করেছেন যে তেরো শতক অবধি উড়িয়া বাঙলা-অসমিয়া ভাষা অভিন্ন ছিল: এবং ষোল শতক অবধি আসামী-বাঙলায় কোন তফাৎ ছিল না। তা ছাড়া কোন কোন চর্যাকার অবাঙালী ছিলেন। অতএব বারো শতকের মধ্যে রচিত চর্যাগীতিতে উড়িয়া-বাঙালী-আসামীর এজমায়েলী বা যৌথ অধিকার স্বীকৃতই হল। এ তথ্য অঙ্গীকার করার পরে বাঙালীরা চর্যাগীতিকে প্রাচীন বাঙলা বলে দাবী করতে পারে না। কেননা এ ভাষা কোন একক আঞ্চলিক ভাষার পূর্বরূপ নয়। বাঙালীর গৌরব দুই প্রখ্যাত ভাষাবিদ এ তথ্য অঙ্গীকার করেও কেন চর্যাপদের ভাষাকে বাঙলা বলে দাবী করেন (শহীদুল্লাহ-বঙ্গ-কামরূপী), তা বাঙালী পাঠকের কাছে ব্যাখ্যা করা বাহুল্য মাত্র। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থ বের হবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যাপদ ও দোঁহার ভাষা বাঙলা নয় বলে মত প্রকাশ করেন History of Bengali language গ্রন্থে ১৯২১ সনে। ১৯২৬ সনে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of Bengali language গ্রন্থে চর্যাপদকে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে বাঙলা রচনা বলে শাস্ত্রীর মত সমর্থন করেন। ১৯২৭ সনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ফরাসী ভাষায় লিখিত কাজ

ও সরহের গান ও দোহা পুস্তকে এবং পরবর্তী অনেক প্রবন্ধে ও গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষা বাঙলা বলে প্রমাণ করেন। এমনি প্রমাণ অন্যত্রও মেলে।

বিহারের প্রখ্যাত পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ইংরেজী ও হিন্দীতে অনেক প্রবন্ধ লিখে চর্যার ভাষা মৈথিল বলে দাবী করেন এবং তিনিও ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ উপস্থিত করেন। তারপর ডক্টর জয়কান্ত মিশ্র রচিত History of Maithili literature-এ এবং বিহার সরকার প্রকাশিত Behar through Ages নামের গ্রন্থে চর্যাগীতি মৈথিল ভাষায় রচিত বলে দাবী করা হয়। এখন উড়িয়া আসামীরাও একই রকমের ভাষিক ও অন্যান্য তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে চর্যাগীতিতে স্ব স্ব ভাষার আদিরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। এ ভাষা যে কেবল পশ্চিম বঙ্গের সে দাবীও উঠেছে এবং প্রমাণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় চর্যাগীতি থেকে বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদেরও রূপ এবং বাক্যগঠনরীতির স্বরূপ দৃষ্টান্ত যোগে দেখিয়েছেন। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেনও চর্যাগীতির ভাষার ব্যাকরণ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন। ক্ষেত্রে তাঁদের বাঙলা-প্রীতি লক্ষণীয়ভাবে প্রকট।

আবহাওয়ার প্রভাবে, শারীরিক অসামর্থ্যে এবং ব্যক্তির অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের ফলে শব্দের উচ্চারণে, প্রয়োগে, পদান্বয়ে ও বিভক্তি প্রয়োগে নানা ত্রুটি প্রায় প্রতি উচ্চারণেই কিছু না কিছু হয়ই—এ তথ্য ভাষাবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। কোন মানুষই একই শব্দ একই ভাবে বারবার উচ্চারণ করতে পারেনা, কারণ মানুষ নিষ্প্রাণ যন্ত্র নয়। এ কারণেই একই মূলভাষা শত সহস্র বুলিতে বিকৃত হয়। কালান্তরে ও স্থানান্তরে আমাদের বাঙলাদেশেও বিভিন্ন অঞ্চলের বুলির ব্যাকরণ, পদান্বয়, বিভক্তিপ্রয়োগ ও উচ্চারণ বিকৃতির ফলে শব্দের রূপান্তর এতো পৃথক ও বিচিত্র হয়ে গেছে যে এ সবগুলো যে মাত্র হাজার বছর আগেকার একটি প্রাকৃতেরই উত্তররূপ তা আনাড়িরা কল্পনাও করতে পারে না। মালদহ-কোচবিহার-সিলেট-চট্টগ্রামের মানুষের বুলি বলতে গেলে একেবারে আলাদা, একের বুলি অন্যের কাছে অবোধ্য, কেবল কৃত্রিম লেখ্যভাষাই আমাদের ভাষিক সংহতি রক্ষা করে।

চর্যার বাঙলা বাঙলাদেশের কোন্ অঞ্চলের বুলির আদিরূপ— এ প্রশ্ন তাই সঙ্গত কারণেই উঠে। পশ্চিম বঙ্গীয়রা এ প্রশ্নের জবাব স্বরূপ তাঁদের আঞ্চলিক বুলির দাবী পেশ করেছেন। মৌর্য আমল থেকেই গৌড়-পুণ্ড্রই কেবল প্রাচীন

প্রশাসন ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ। রাঢ় সুহ্মের এ খ্যাতির খবর আমাদের জানা নেই; অবশ্য তাম্রলিপ্ত পরে সপ্তগ্রাম ও বন্দররূপে পরিচিত। কিন্তু সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি কি বন্দরের না রাজধানীর লালনে উন্মেষিত ও বিকশিত হয়? চর্যাগীতি-ধৃত পদান্বয় ও বিভক্তি (কারকের ও ক্রিয়ার) কি পশ্চিম বঙ্গের বুলির পূর্বরূপ?

চর্যাগীতি সেকালের শিষ্ট বা লেখ্য কৃত্রিম ভাষায় যে রচিত নয়,—তার প্রমাণ কি? বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা আসামের পদকার রাঢ়ী ভাষা শিখে সে ভাষায় পদ রচনার গরজ বোধ করলেন কোন প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় কারণে? ঐ ভাষা কি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তথা দরবারী ভাষা ছিল? গোটা প্রাচ্য ভারত কি ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে কোন কালে একচ্ছত্র শাসনে ছিল? আমরা জানি শৌরসেনী প্রাকৃত দরবারী তথা প্রশাসনিক ভাষার মর্যাদা পেয়ে শিষ্ট ও লেখ্যভাষারূপে আড়াই হাজার বছর আগেই প্রতিষ্ঠা পায়। আমরা এ-ও জানি লিখিত ভাষা মাত্রই কৃত্রিম ও রক্ষণশীলতাপুষ্ট। প্রাচ্য অঞ্চলের তাবৎ রচনা—প্রাকৃতপৈঙ্গল, দোহা প্রভৃতি সেই লেখ্য কৃত্রিম শৌরসেনী প্রাকৃতে-অপভ্রংশে-অবহট্‌ঠে নাটকের শিষ্ট প্রাকৃতে যে রচিত, তা অস্বীকার করারও উপায় নেই। এমনকি পনেরো শতকের বিদ্যাপতির কাব্য কীর্তিলতাও মাগধী অবহট্‌ঠে রচিত নয়। চর্যাগীতিও লেখ্য শৌরসেনী অবহট্‌ঠের স্থানিক বিকৃতিদুষ্ট অর্বাচীন শৈলীতে রচিত। চৌদ্দ শতক অবধি কোন নব্য ভারতীয় ভাষাতেই লিখিত সাহিত্য রচিত হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। বিদ্যাপতির কীর্তিলতা, চৌদ্দশতকে সংকলিত প্রাকৃতপৈঙ্গল, সরহ তিলোপা-কাহ্নপার দোহাকোষ ডাকার্ণব লক্ষ্মণ সেনের সভায় বাঙলা কবির অনুপস্থিতি, শেখ শুভোদয়ার মতো গ্রন্থও সংস্কৃতে রচিত হওয়া এবং বাঙলা প্রকীর্ণ কবিতা সংগ্রহ গ্রন্থের অভাব প্রভৃতিই সাক্ষ্য দেয় যে চৌদ্দ শতক অবধি উড়িয়া বিহারী বাঙলা আসামী ভাষায় লিখিত সাহিত্য রচনার রেওয়াজ চালু হয় নি। বহুল চর্চায় সাধনসঙ্গীত হিসেবে নিত্য ব্যবহারের ফলেই তথা স্থানিক লোকব্যবহারে চর্যার ভাষা শিথিলগ্রন্থী ও সরল হয়েছে। তার প্রমাণ প্রাকৃত পৈঙ্গলের কোন কোন পদের এবং কোন কোন দোহার ভাষা কোন কোন চর্যাপদের ভাষার প্রায় অনুরূপ। এ কারণেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দোহাগুলো বাঙলায় রচিত বলে মনে করেছিলেন। 'কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট'। 'কহন্ত গুরু' বললে এ ভাষা পাঁচ শ বছর এগিয়ে আসে। এমনি দৃষ্টান্ত আরো বহু দেয়া যায়। আজ ভুসুকু বাঙ্গালী হইলি/নিজ ঘরণী চণ্ডালী লইলি ইত্যাদি।

সরহ-তিলোপা-কাহ্নপা একাধারে দোহা ও চর্যাগীতি রচয়িতা। চর্যাগীতি যদি বাঙালীর জন্যে রচিত হয়, তবে দোহা কাদের জন্যে রচিত হল?

অন্য যুক্তিও আছে। সমকালীন লেখকদেরও শব্দ চয়ন, বাকরীতি, পদবিন্যাস কৌশল তথা রচনাশৈলীর মধ্যে এতো পার্থক্য থাকে যে তাঁরা যে একই সময়ে লিখছেন, তা বোঝা যায় না। বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, কালী প্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা ১৮৪৭-৬৫ সনের মধ্যেই পাই, আরো বিশ বছর এগুলে চিঠিপত্রের রবীন্দ্র-নাথকেও পাই—এঁদের বাকরীতির পার্থক্য এতই প্রকট যে এঁদেরকে দুশ বছর আগের পরের লেখক বলে চালিয়ে দেয়া যায়। তাছাড়া কোন প্রাচীন লেখকের ভাষা লোকের বহুল চর্চার ফলে কালোপযোগী সংস্কার লাভ করে— গুণরাজ-খানের শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, পদসংগ্রহে বিধৃত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পাঠ, সর্বোপরি বিদ্যাপতির মৈথিল পদের বাঙলা রূপান্তর প্রভৃতিই এ বিবর্তনের রূপান্তরের প্রকট উদাহরণ। প্রাকৃত মিশ্রিত ভ্রষ্ট-ব্যাকরণ বৌদ্ধ সংস্কৃতের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কাজেই চর্যাসঙ্গীত রূপে সাধারণের নিত্য উচচারণের জন্যে রচিত পদের ভাষা বহুজনের বহুকাল ধরে বহু ব্যবহারের ফলে স্থানিক ও কালিক বিকৃতি পাওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। সুতরাং ভাষার রূপ দেখে চর্যাগীতিকে দশ থেকে বারো শতকের রচনা বলে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচি যে রায় দিয়েছেন, তা যথার্থ হয় নি। বর্তমান রূপে চর্যা হয়তো ঐ সময়কার সম্ভাব্য ভাষার রূপই ধারণ করে, কিন্তু বিভিন্ন পদকারের জীবৎকালানু-সারেই পদেরও রচনা কাল মানতে হবে। বিশেষ করে এখন এ তথ্য কেউ অস্বীকার করে না যে, চর্যাগীতির প্রাপ্ত পুথিটি বাঙালীর লেখা এবং বাঙলা হরফে লেখা, এটি এ অঞ্চলে বহুল প্রচলনের সাক্ষ্য। কাজেই বাঙলা বুলির প্রভাবপ্রসূত বিকৃতিও এতে বেশী থাকার কথা। কে না স্বীকার করবে যে লিপিকর পরম্পরায় আনুপাতিক ও কালিক হারে বিকৃতি বাড়তে থাকে।

চর্যাগীতির বাঙালী আলোচক-গবেষকগণ চর্যাগীতিতে বাঙলার প্রাকৃতিক পরি-বেশে নির্বিত্ত ও নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ বাঙালীর জীবন ও জীবিকা-চিত্র আবিষ্কার করে-ছেন। কিন্তু বাঙলা-উড়িষ্যা-আসামের মানুষের জীবন ও জীবিকা পদ্ধতিতে, ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তেমন পার্থক্য লক্ষণীয় কি? মাংস-ভাত-ডোম-চাড়াল-শবর-নদী-শিয়াল-সিংহ ময়ূর-হাতী-হরিণ-কুমীর-কুঁড়ে-নলবন-নেড়েভিক্ষু, দাবা বড়ে, নৌকা, কেড়ু-য়াল, বিয়ের বাজনা, দস্যুবৃত্তি, টিলা, উঁচু পর্বত, তেঁতুল, গঙ্গা-যমুনা-ত্রিবেণী-বাসন্তী শোভা, দুষ্ট বলদ, গাভী, হাড়ের মালা, দিগম্বর শ্রাবক জিন, অবৈধ প্রেম, তুক-তাক-উচাটন-কামরূপ কামাখ্যার সাধনা, ডাকিনী-যোগিনী, নারীহরণ, লাম্পট্য, নারীর কণ্ঠে কবরীতে ফুল, কর্ণকুণ্ডল, তাম্বুল, তুলা ধুনন, কাপাস ফুল, যৌতুক, সাঙ্গা, নানা অলঙ্কার, হাড়ি-পিঠা-গাড়ু প্রাচ্য ভারতের কোথায় দুর্লভ ছিল বা কার অজানা

ছিল যে চর্যাগীতি-ধৃত জীবন-জীবিকার চিত্র একান্তই বাঙলার এবং বাঙালীর বলে নিঃসংশয়ে বলা যাবে। বরং পর্বত, টিলা, হাতী, হরিণ, শবর, চাঙারী আসামেই সুলভ। হাড়িয়া মদ (আসব) ও দিগম্বর জৈন, কাপালিক সুলভ ছিল বিহার উড়িষ্যাতেই।

দোহাকোষের ও চর্যার তাত্ত্বিক বক্তব্য অভিন্ন। এগুলো যে বৌদ্ধ মন্ত্রযানের উপশাখা তান্ত্রিক কালচক্র-বজ্র-সহজযানীর মার্গ-চর্যা সঙ্গীত সে সম্বন্ধেও সবাই মোটামুটি একমত। এগুলোর তত্ত্ব এবং সে সঙ্গে উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষাদি অর্থালঙ্কার মাধ্যমে সমকালীন জীবন-জীবিকার ও সমাজ-সংস্কৃতির যে প্রতিবেশ চিত্রিত হয়েছে, তাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন অনেকেই। চর্যাপদের ছন্দ, সাহিত্যিকমূল্য এবং পরবর্তী সাহিত্যে এগুলোর প্রভাব সম্বন্ধেও সঙ্গত-অসঙ্গত, প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানা আলোচনা রয়েছে। চর্যাগীতি এখন পূর্বভারতে ভাষা-সাহিত্যের পাঠ্য-সূচীভুক্ত। কাজেই সাহিত্যের ইতিহাসে এ সব আলোচনা বিস্তৃত হওয়া আবশ্যিক নয়।

কবির স্বনামে সম্মানজ্ঞাপক পা (পাদ) যুক্ত দেখে ঐ সব পদ গুরুর নামে শিষ্যের রচনা বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কৃত্তিবাসকেও 'পণ্ডিত কৃত্তিবাস' ভণিতা দিতে দেখি। 'সরস্বতী আমার কণ্ঠে স্ফুরে' এই দম্ভোক্তি তাঁর। একালে ফোনে স্বনামে 'বাবু' 'সাহেব' ব্যবহার করেন অনেকেই।

পদকাররা নিশ্চয়ই এ রকম আরো শত শত পদ রচনা করেছিলেন। আরো বহু অজ্ঞাতনাম কবির পদ কদরের অভাবে নিশ্চয়ই লুপ্ত হয়ে গেছে। দীপঙ্কর, আর্যদেব, শাক্যমিত্র, অজ প্রভৃতিও চর্যা সংকলন করেছিলেন বলে তিব্বতী সূত্রে জানা যায়। মুনিদত্ত নিশ্চয়ই বেছে বেছে তাঁর মতে গুরুত্বপূর্ণ ৫১টি পদ সংকলন করে টীকা-ভাষ্য রচনা করতে থাকেন। এগুলোর মধ্যে তিনি লাড়ীডোম্বীপাদের রচিত একটি পদের [১১ সং পদ] টীকা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। টীকার পরবর্তী লিপিকর টীকা বিহীন এই অপ্রয়োজনীয় পদটি বর্জন করেন। রইল সটীক পঞ্চাশটি পদ। তার মধ্যে পুথির চারটি [৩৫ – ৩৮] পত্র বিনষ্টির ফলে ২৩-এর শেষাংশ এবং ২৪, ২৫, ২৮ সংখ্যক পদের পাঠ বিলুপ্ত। অতএব সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ মিলেছে। ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচি চন্দ্রকীর্তি বা কীর্তিচন্দ্রের তিব্বতী অনুবাদ থেকে সেগুলোর বক্তব্য উদ্ধার করেছেন এবং ডক্টর সুকুমার সেন চর্যার ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সেগুলোকে পদকারের রচনার অনুমিত রূপ দিয়েছেন। নেপালে-তিব্বতে পদগুলোর নয়, গুরুত্ব ছিল মুনিদত্তের টীকার। তাই তিব্বতী অনুবাদেও টীকাহীন

পদটি বাদ পড়েছে। মুনিদত্ত কোন্ শতকের লোক তা জানা নেই, তবে সটীক নেপালী পাণ্ডুলিপিটি বঙ্গাক্ষরে চৌদ্দ পনেরো শতকের বলে বিদ্বানেরা অনুমান করেন। অতএব পদের সংখ্যা ৫০। পদকার ২৩ জন। কাহ্নুর ১৩টি, ভুসুকুর ৮টি, সরহের ৪টি, কুক্কুরীর ৩ এবং লুই, শান্তি ও সবরের ২টি করে, বাকী প্রত্যেকের একটি করে পদ সংকলিত হয়েছে।

কাহ্ন, ভুসুকু, সরহ তা হলে সমকালের শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় পদকার ছিলেন। লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিআ, বীণা, তান্তি, শবর, সরহ, আজদেব, ঢেন্টণ, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জয়নন্দী, ধাম—এই তেইশজন পদকার। কোন কোনটি ছদ্ম নাম বা বিরুদও হতে পারে। এবং কাহ্নও একাধিক থাকতে পারেন। মুনিদত্ত কর্তৃক শ্রীলুয়ী (লুই) আদি সিদ্ধার পাদ বন্দনা দিয়ে টীকার শুরু হওয়ায় লুইকে সর্ব প্রাচীন পদকার মনে করার কারণ নেই, লুই তখন জীবিত এবং শ্রেষ্ঠ সিদ্ধাও হতে পারেন। অন্তত লুইর পদের ভাষা সহজতর ও অর্বাচীন বলেও ধরে নেয়া যায়। লুই যে আদি সিদ্ধা নন, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। শ্রেষ্ঠ বা প্রখ্যাত সিদ্ধা হিসেবেও লুয়ীর নাম স্মরেণ্য হতে পারে।

প্রতি চর্যাগানের শীর্ষে গেয় রাগের নির্দেশ রয়েছে আর আছে একটি অভিনব রীতির উদ্ভাবন—সেটি হচ্ছে পদে রচয়িতার নাম সংযোজন [ভণিতা]। তা ছাড়া চরণগুলো অন্ত্যানুপ্রাস তথা পদান্ত মিল যুক্ত। রাগের মধ্যে রয়েছে পটমঞ্জরী, গবড়া (গউড়া), অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী (ধানশ্রী), রামক্রী, বড়ারী, বলাড্ডী-শবরী, মল্লারী, মালশী, মালশী,-গবুড়া, বঙ্গাল কাহ্ন-গুঞ্জরী। সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে পটমঞ্জরী [১২] তারপর মল্লারী, ভৈরবী, কামোদ, গুঞ্জরী, বড়ারী। দেশাখ ও রামক্রী রয়েছে দুইবার করে। চর্যাগীতিকে গানের বাণী বা পদ হিসেবে রচিত স্বীকার করেও এ-গুলোকে কবিতা রূপেও যাচাই করার প্রবণতা রয়েছে বিদ্বানদের। তাই চর্যাগীতির ছন্দ ও কবিত্ব এবং সেই সূত্রে এগুলোর শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বিশ্লেষণের প্রয়াস দেখা যায়।

চর্যাপদের ছন্দের মধ্যে কেউ চার মাত্রার চাল-ভিত্তিক ষোল মাত্রাযুক্ত পাদাকুলক, কেউ পজঝটিকা ছন্দের আদল ও প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন, কেউবা অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ রচনায় ব্যবহৃত ছন্দের অনুসরণ-অনুকরণের নিদর্শন পেয়েছেন। আবার কেউবা এতে পয়ার ত্রিপদীর অর্থাৎ অক্ষর বৃত্তের প্রবণতা

প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব কেউ অক্ষরপ্রাধান্য, কেউবা মাত্রাপ্রাধান্য অনুমান করেই চর্যাপদের ছন্দকে মোটামুটি ষোলমাত্রায়, কিংবা অসম অক্ষরের ত্রুটি স্বীকার করেই পয়ার-ত্রিপদী প্রবণ অক্ষরবৃত্তে ছন্দ পাঠ (Scane) করতে প্রয়াসী। আসলে সুরলক্ষ্যে রচিত পদকে কবিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে এ রকম গোঁজামিলে ত্রুটির ফাঁক পূরণ করতেই হয়। চর্যাগীতি মাত্রার হিসেবে কিংবা অক্ষরের হিসেবে ত্রুটিবহুল, আবেগমুক্ত চিত্তে এ তথ্য স্বীকার করাই ভাল। তা ছাড়া কথাগুলো যখন গীত হবার জন্যই বাঁধা—আমরা জানি, তখন গায়ের জোরে কবিতা বানাবার বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করাই শোভন এবং শ্রেয়ও। কারণ তাতেই পাঠককুল বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তি থেকে নিস্তার পাবে। অবশ্য আমরা জানি—সঙ্গীতরূপেই সাহিত্যশিল্পের শুরু এবং ভারতের বৈদিক রচনা থেকে সব ভাষার সব রচনার মতো বাঙলা কাব্যমাত্রই চিরকালই রাগতাল যোগে গেয় ছিল। কিন্তু সেগুলো মূলত প্রচলিত ছন্দে পাঠযোগ্য করেই রচিত। কিন্তু এ গুলো রচিত গেয় করেই।

তবু আমরা যদি শার্ঙ্গ দেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' (১২১০ ৪০ খ্রী: মধ্যে রচিত) গ্রন্থে এই চর্যাপদাবলীকেই নির্দেশ করা হয়েছে বলে স্বীকার করি, তাহলে চর্যা মুখ্যত 'পদ্ধড়ী' প্রভৃতি ছন্দে পদান্ত প্রাস যোগে রচিত বলে মানতে হবে। শার্ঙ্গ-দেবের শ্লোকটি এই:

পদ্ধড়ী প্রভৃতিচ্ছন্দা: পাদান্তপ্রাস শোভিতা:
অধ্যাত্মগোচরা চর্যাস্যাদ দ্বিতীয়াদি তালত:।

(রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'বাংলার সঙ্গীত'-এ উদ্ধৃত,
প্রথম খণ্ড পৃ: ৪৫)

—'পদ্ধড়ী' সংস্কৃত ছন্দ পজঝটিকা নামের প্রাকৃত রূপান্তর। 'প্রভৃতি' পদে যদি আমরা গুরুত্ব দিই, তাহলে চর্যায় অন্য ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য শার্ঙ্গদেব সুরবিদ—ছান্দসিক নন। তবু চর্যার ছন্দের অপূর্ণতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামের প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে পাদাকুলক ছন্দের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন:

লঘু গুরু এক নিঅম ণহি জেহা
পঅ পখ লেকৃখই উত্তম রেহা।

সুকই ফনিন্দহ কংঠ বলঅং
সোলহ মত্তং পাআউলঅং। ১।১০৪

ডক্টর শহীদুল্লাহর পদ্যানুবাদ :

লঘু গুরু এক নিয়ম নাইক যেথা
পদে পদে লেখা হয় উত্তম রেখা।
সুকবি ফণীন্দ্রের কণ্ঠবলয়
ষোলমাত্রায় পাদাকুলক হয়।

(বাঃ সাঃ কথা, পৃঃ ১৭৪ প্রথম খণ্ড)

চর্যাগীতিতে 'সমাজচিত্র' সন্ধানের একটা রেওয়াজ চালু হয়েছে। ৮–১২ শতকের বাঙালী বুনো ছিল না। তাদের রাজা ছিল, সেকালের উচ্চতর সভ্যতার সবটাই তাদের ছিল—ভাষা-সাহিত্য-দর্শন-চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, দারু-চারু-কারু সবটাই। ৪৬টা পদে প্রাসঙ্গিক ভাবে যে কয়টি বিষয় এসেছে, তা দিয়েই বাঙালীর এমনকি অন্ত্যজ বাঙালীরও সবটা মিলবে না। মানুষের উচ্চারিত বুলি মাত্রই জগৎ, জীবন, জীবিকা ও পরিবেষ্টনী সম্পর্কে কিছু না কিছু নির্দেশ করেই। তা সমকালীন চিন্তা-চেতনার অঙ্গ বটে, কিন্তু তা-ই একমাত্র নয়। চর্যাগীতি বিধৃত সমাজ একান্তভাবে বাঙলার বা বাঙালীর নয়, গোটা পূর্বভারতেরই। চর্যাকারেরা বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগী সিদ্ধপুরুষ। তাঁরা ছিলেন যোগীসন্ত - সামাজিক-গৃহস্থ-বিত্তবান ও শিক্ষা-সংস্কৃতিপুষ্ট বৌদ্ধসমাজ থেকে বিচ্যুত। হীনযানী-থেররাদী-মহাযানী আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারীদের সঙ্গে তাঁদের যে কেবল সম্পর্ক ছিল না তা নয়, তাঁদের চর্যাও ছিল অবজ্ঞেয়। ঐ ধারার সাধক সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলদের আজো কোন সামাজিক স্বীকৃতি বা মর্যাদা নেই। পূর্বভারত ও প্রান্তিক আরণ্য পার্বত্য অঞ্চলই ছিল ঐ গুহ্য সাধনতত্ত্বের ও চর্যার বিকাশ ও প্রসার ক্ষেত্র। কাজেই চর্যা পদে বিধৃত জীবন জীবিকা ও প্রতিবেশ উড়িষ্যা-বিহার-বাঙলা-আসামের প্রতিনিধি স্থানীয় বৃহত্তর সমাজের চিত্র দান করে না, কেবল বহির্গ্রামবাসী অন্ত্যজ শ্রেণীর—যারা সাধারণত নির্বিত্ত নিরক্ষর-নিঃশাস্ত্র নিঃস্ব মানুষ—পারিবারিক, নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক জীবনের খণ্ডচিত্র কিছুটা প্রাসঙ্গিকভাবে—অর্থাৎ রূপক-উপমা-উৎপ্রেক্ষা রূপে বিধৃত দেখতে পাই।

দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেও ধন, বর্ণ ও বৃত্তি বৈষম্য প্রসূত ঘৃণা-অবজ্ঞা-অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে নি নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্তের লোকগুলো।

ধন-বিদ্যা-পেশা-পদ ঘরে বাইরে সর্বত্র বৈষম্যের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর আজো খাড়া করে রেখেছে। তাই 'নগর বাহিরেই ডোম্বীর কুঁড়ে' ঘরে বাস। এবং নেড়ে (মুণ্ডিত মস্তক) বৌদ্ধ শ্রমণ হয়েও ব্রাহ্মণ পরিচয় ঘোচেনি। তাই শবরেরা চিরকাল অরণ্যে পর্বতে বাস করে। টিলাবাসিনী শবরীর প্রতিবেশী থাকে না। সেদিন ফুল্লরাদের হাঁড়িতে ভাত থাকত না। তাঁত—চাঙারী মাছ-মাংস বিক্রি করে কিংবা তুলা ধুনে অথবা নাচিয়ে-গাইয়ে বাজিয়ে হয়ে হাড়ি ডোম মুচি মেথর বাগদী ব্যাধ কৈবর্ত কাণ্ডারীর [ধড়ে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার মতো] জীবিকা অর্জন করতে হত। তার বাড়া কিছুতে তাদের চির অনধিকার। উচ্চকোটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল কেবল বেচা-কেনার বা দাসপ্রভুর। সব দেয়া-নেয়াই ছিল বাহ্য, বৈষয়িক ও ব্যবহারিক—মনের-মানসের যোগ ঘটেনি কখনো।

সভ্যতার আনুষঙ্গিক অভিশাপের শিকার হয়েছে গণমানব সভ্যতার সেই প্রথম প্রভাত থেকেই। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য নির্ভর সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বীর, পীড়ক-পীড়িতের, শোষক-শোষিতের, শাসক-শাসিতের, পেষক-পিষ্টের, প্রভু-ভৃত্যের, মনিব-গোলামের। শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশার শুরু তাই সভ্যতার উষালগ্নেই। অভাব-অনটন-অনশন ও খরা-বন্যা-ঝড়-মারীর চির শিকার গণ-মানবের দুঃখ-দুর্দশায়ও তাই একাল সেকাল নেই। সেকালেও শাহ-সামন্ত সহযোগী ছিল শাস্ত্র-সমাজ-সরকারের ধারক ও বাহক শাস্ত্রী-সরদার-প্রশাসক-নায়েব গোমস্তা মুৎসুদ্দিরা। ওরা ছিল সেকালের মধ্যবিত্ত। 'দুর্জনেরে রক্ষা করে দুর্বলেরে হানার' 'স্বেচ্ছালব্ধ দায়িত্ব ও অধিকার ছিল তাদেরই। এ কেবল সেকালের চিত্র নয়—একালেরও। এ লোকায়ত জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠান, জগৎ-ভাবনা ও জীবন-চেতনা ও দুঃখ-দুর্দশা অবিকৃতভাবে বা রূপান্তরে তেমনিই আছে। কারণ শাস্ত্রিক-সামাজিক-আর্থিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকলে চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন স্বাভাবিক নয়।

নদীবহুল অঞ্চলে ভেলা, বেনি, নৌকা, গুণ, কেড়ুয়াল, মাঙ্গ, চকা, পতবাল, দুখোল, কাছি, খুঁটি, পাল, জলসেচ ও মাঝি-মালার রূপক-উপমা স্বাভাবিক ভাবেই বেশী করে এসেছে। একই কারণে মাছ ও জালের কথা উঠেছে। চণ্ডাল-শবর সূত্রে জাল পাতার ও ডাক হেঁকে হরিণাদি শিকারের ইঙ্গিতও রয়েছে। ধেনো, তেলো, খেজুরে মদ, কাঁজি ও হাড়িয়া পান এক সময় এদেশে এ যুগের পান-তামাকের মতোই সর্বজনীন ও সামাজিক অভ্যাস ছিল। তাই শুণ্ডিণী ও মদ-চোয়ানোর উল্লেখও মেলে। হাড়ি-ডোম বাগদীরা পেশাধারী গাইয়ে, বাজিয়ে ও নাচিয়ে ছিল। প্রস্ফুটিত পদ্ম-দলের উপর নৃত্যরতা নারীর উপমা নৃত্যকলার উৎকর্ষের সাক্ষ্য।

চর্যাপদের ভাষা, বস্তুবাচক শব্দ, উপমান-উপমিত পদ, পেশা, প্রতিবেশ, তৈজস, ঘরবাড়ী, ব্যবহারসামগ্রী প্রভৃতি সবটাই নিঃস্ব নির্জিত মানুষের বাস্তব জীবন-জীবিকা ও সমাজ থেকে গৃহীত। এগুলো বিশেষ জনগোষ্ঠীর জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা সম্পৃক্ত শব্দ, ভাব ও বস্তু। তাদের আপ্ত বচন-বাক্যও তাই আলাদা ও ঘরোয়া। এখানে অর্জিত জ্ঞান অনুপস্থিত, অভিজ্ঞতাই চিন্তা-চেতনার সম্বল। তাই 'দুহিল দুধ কি বেন্টে সামায়, বলদ বিআল গাবিআ বাঁঝে, আপনা মাংসে হরিণা বৈরী, রুক্খের তেন্তুরী কুম্ভীরে খাই, দুলি দুহি পিটা ধরণ ণ জাই। কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল, জিম জিম করিনা করিনীরে রিসই।' -এমনি কথা পাই। এখানে ময়ূর পুচ্ছ, হাড়ের ও গুঞ্জার মালাই সৌন্দর্যের ও প্রসাধনের উপকরণ, মোইনি। মৎস্য, কার্পাসফুল, পাকাধানই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাস! এমনি অভাবদুষ্ট সমাজে অন্নাভাব নয় শুধু নৈতিক চরিত্রও শিথিল হয় এবং শাসন, শান্তি ও নিরাপত্তার অভাব ঘটে। তাই সাধু বেশী চোরই বেশী। কারো সোনা-রূপা থাকে না, যদিবা কিছু থাকে, স্বভাবদোষে নয়, অভাব বশে চোরডাকাত-হওয়া মানুষেরা [রাতে সামান্য কানেটও (কর্ণফুল)] চুরি করে, বাটে খাণ্ডারের (লুঠেরা) ভয়ে ত্রস্ত হয়ে পথ চলতে হয়। জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষের কেউ কেউ অন্নাভাবে তখনো স্ত্রী ও সন্তান হত্যা করত। বাস্তব অর্থে 'মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী' ঐ সাক্ষ্যই দেয়, নইলে ঐ রূপক অবাস্তব হত। আর একটি—'বেঙ্গ সংসার বহিল জাঅ'। তবু জীবনের দাবী মেটাতে হয়, তাই অসতী বধূ রাত হলে অভিসারে কামরূপ যায়, কানে পরে কুণ্ডল, গলায় পরে গুঞ্জের মালা, ময়ুর পুচ্ছে বাড়ায় কবরীর শোভা। বাসন্তী প্রতিবেশ ও পাখীর ডাক মনে জাগায় অজানা পুলক। তাম্বুল কিংবা মদও সেবন করে তারা। বঞ্চিত বুকের বেদনা ভুলবার প্রয়াসে নাচ-গান খেলাধুলাও করতে হয়। বিয়ের উৎসবে নির্বিশেষ মানুষের অধিকার, তাই উৎসব উপকরণ—পটহ, বাদল, ঢোল, কাঁসা, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য ওরা নিজেরাই বাজায়। পার্থিব জীবনে যাদের আকৃষ্ট হবার মতো, আনন্দিত থাকবার মতো কোন অবলম্বন বা আশ্বাস নেই, সে সব বঞ্চিত পরাস্ত পর্যুদস্ত মানুষ পারত্রিক সুখের প্রত্যাশায় আত্মপ্রবোধ পাওয়ার প্রয়াসী না হয়েই পারে না, এভাবেই তারা শাসনে-শোষণে, পীড়নে পেষণে ক্লিষ্ট-পিষ্ট হয়েও বেচে থাকার বলভরসা পায়। ঐরূপ মিথ্যা ভরসা ও হিম্মত না পেলে আত্ম-হত্যাই হতো ওদের আশ্রয়, কিংবা পীড়ন-পিষ্ট প্রজাও হরিণ-হরিণীর মতো আত্মরক্ষায় অনন্যোপায় হয়ে 'এদেশ ছাড়ি হোহ ভান্তো' সিদ্ধান্তই গ্রহণ করত, অথবা পীড়ক রাজার খল-দুষ্ট অধ্যুষিত রাজ্যে টিকে থাকার জন্যে দুর্বল শিয়ালরা মরীয়া হয়েই সিংহের সঙ্গে অথবা প্রশ্রয়পেয়ে সিংহবিক্রমে যুঝবার হিম্মত পায়—তবু

বিড়ম্বনা থেকেই যায়, কেননা 'জো সো চোর সোহি সাধী'। তাই, নিতি নিতি সিআলা সিহ সম যূঝই'।

৫

চর্যাগীতি ধৃত সমাজ-সংস্কৃতির চিত্র

কাহ্ন ও সরহের দোহাকোষ মিলেছে। অন্য চর্যাকারেরাও হয়তো দোহা রচনা করেছিলেন। কেননা দোহারচনা সুপ্রাচীনকালের রীতি। উত্তর ভারতে দোহা আজো জনপ্রিয়। শ্লোকই গাথা, আর্যা, ছড়া ও দোহারূপে তত্ত্ব কথার ও নীতি কথার আধার হয়েছে। 'সদুক্তি কর্ণামৃত' বা 'সুভাষিতরত্নকোষ' রুবাই এবং চোপাইও এ সূত্রে স্মর্তব্য। যাঁরা চর্যাগীতি রচনা করেছেন, তাঁরা দোহাও রচনা করবেন, এ-ই ছিল প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। দুজনের দোহাকোষ মিলেছে, তাই অন্যদেরও অনুরূপ রচনা ছিল বলে অনুমান করছি। অভিন্ন ব্যক্তির বলেই চর্যাগীতিকার রচিত দোহায় প্রাপ্ত উপকরণও আমরা সমাজ-সংস্কৃতির আলোচনায় গ্রহণ করব।

কাহ্ন পা বা সরহের দোহা ও চর্যাপদের ভাষা অভিন্ন নয়। অথচ একই ব্যক্তি তাঁর উদ্দিষ্ট অভিন্ন পাঠকের জন্যে এক ভাষায় দোহা ও অন্য ভাষায় গীতি রচনা করেছেন—এমন অনুমান করার সঙ্গত কারণ নেই। কাজেই উভয় শ্রেণীর রচনা শৌরসেনী অপভ্রংশে বা অবহট্‌ঠে লিখিত হয়েছিল বলেই মানতে হয়। দোহাগুলোর শৌরসেনী অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ রূপ অবিকৃত রয়েছে। তার কারণ ওগুলো সংক্ষিপ্ত সুভাষিত ভাবগর্ভ সুবচন বলে অবিকৃতভাবে স্মরণ করা সহজ ছিল। তাই ভাষায় লক্ষণীয় বিকৃতি ঘটতে পারেনি; চর্যাগীতি জনান্তরে, স্থানান্তরে ও কালান্তরে বহু বহু লোকের ব্যবহারে মৌখিক বিকৃতি পেয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে গায়েন-লিপিকরেরা প্রাচীন শব্দ ও উচ্চারণ পালটিয়ে সমকালোপযোগী করে তথা সমকালের ও স্থানের লোক-বোধ্য করে নতুন শব্দ ও উচ্চারণ গ্রহণ করে। প্রমাণ বাঙলাদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলী এবং ডাক ও খনার বচন। কাজেই দোহা ও চর্যাগীতির ভাষায় যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে, তা হয়তো দোহাকার গীতিকারদের স্বহস্তে লিখিত পুথিতে ছিল না। মানতেই হবে সবটাই ছিল লেখ্য সাহিত্যিক ভাষা এবং তা ছিল শিষ্ট শৌরসেনী প্রাকৃতজ অপভ্রংশ-ভিত্তিক। আমরা চর্যাগীতিতে বহু মুখের বহু উচ্চারণে বিকৃত ও কালপোযোগী অর্বাচীন ও ঈষৎ বিকৃত শৌরসেনী অবহট্‌ঠই দেখতে পাই। প্রত্যাশিত মাগধী-প্রাকৃত-অপভ্রংশ যে নয়, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মাগধীপ্রাকৃত-অপভ্রংশের

শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তঃস্থিত বর্ণের বিবর্তনধারা ও বিভক্তিরূপ স্মরণ করলেই তর্কে উৎসাহ মিলবে না। কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টির দৃষ্টান্ত এখানে একাধিক— যেমন মধ্যযুগের বাঙলা-মৈথিল মিশ্রিত ব্রজবুলি কিংবা আধুনিক বাঙলা ভাষায় যেমন তু, হউ, নই, বাএ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আবার তুমি, আমি, নদী, বাজায় প্রভৃতিতে উন্নীত হয়েছে। পূর্ব-ভারত (বিহার-উড়িষ্যা-বাঙলা-আসাম) চিরকাল অনার্য-অষ্ট্রিক মঙ্গোলের দেশ। কোল-মুণ্ডা-সাঁওতাল-গারো আমাদের নিকট জ্ঞাতি। এ অঞ্চলে বিশেষ করে বাঙলায় উড়িষ্যায় ও আসামে বৈদিক ধর্ম কিংবা গীতা-স্মৃতি-সংহিতা শাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বরূপে কখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। সেনদের প্রয়াসও পুরো সফল হয়নি। তার প্রমাণ লৌকিক দেবতা পূজক পঞ্চোপাসক আজকের বাঙালী হিন্দুর সমাজ। রাজকীয় উদ্যোগে আগত উত্তরাপথের শাস্ত্রীদের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য আচার উচ্চবিত্তের দেশী ও বিদেশী লোক নিশ্চয়ই গুপ্ত আমল থেকেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারা সংখ্যায় নগণ্য থাকারই কথা। তবু বিজিত জাতির দুর্ভোগ-দুর্ভাগ্য থেকে দেশের মাটির সন্তানেরা রেহাই পায়নি। স্বভূমে তারাই স্বাধিকার বঞ্চিত ঘৃণ্য হাড়ি ডোম-বাগদী-চাঁড়াল-শবর রূপে নির্বিত্ত নিঃস্ব নিরক্ষরের অমানবিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল দু'হাজার বছর ধরে। আজো সে-দুর্ভাগ্যের অবসান হয়নি। সে যুগে যন্ত্রের উৎকর্ষের অভাবে জীবিকা-পদ্ধতির কোন পরিবর্তন ছিল না, তাছাড়া শাহ-সামন্ত যুগে একবার নিচে পড়ে গেলে—বিশেষ করে বর্ণাশ্রিত সমাজে, আর উঠবার বাস্তব ও মানস উপায় থাকত না।

চর্যাগীতিতে আমরা ভারতের পূর্ব-প্রান্তিক একটা বিরাট অঞ্চলের (বিহার-উড়িষ্যা-বাঙলা-আসাম) আদিবাসীর মন-মত, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি রেওয়াজ জীবন-জীবিকা ও সমাজ-সংস্কৃতির কিছু রূপরেখা পাই।

চর্যাকারেরাও শিক্ষিত তত্ত্বজ্ঞ ও শাস্ত্রবিৎ। কিন্তু তাঁরা বৈরাগ্যবাদী বলেই হয়তো ঠিক সমাজবাসী ছিলেন না। সংস্কৃত অনুবাদে তাঁদের নাম পাদযোগে সসম্মানে উল্লেখিত হলেও, তাঁরা ছিলেন বিশেষ গূঢ় ও গুহ্য সাধনার গুরু। এখনো যেমন বাউল সহজিয়া গুরুগণ সাধারণ সমাজে প্রতিষ্ঠা পান না, অথচ স্বমতবাদী সমাজে তাঁরা গুরু ও জ্ঞানী রূপে বিশেষ শ্রদ্ধা-সম্মানের পাত্র, মনে হয় তেমনি অবস্থা ছিল আমাদের চর্যাকারদেরও। এঁদের নামগুলোই প্রমাণ করে যে, এঁরা অনার্য ও নিম্নবিত্তের বৌদ্ধ সমাজের লোক। যদিও সিদ্ধপূর্ব জীবনে এঁদের অনেকেই রাজা, রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে কিংবদন্তী সূত্রে মেলে—তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। [মহান্ত মহারাজ স্মর্তব্য] ব্রাহ্মণ এখানে ব্রহ্মজ্ঞানী, অন্য চর্যাকারেরা হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য, সৎশূদ্র বা নমঃশূদ্র। অবশ্য চর্যাকারেরা যে বৌদ্ধ তাতে কণামাত্র সংশয় নেই। কুলীন-অকুলীন,

ব্রাহ্মণ, ডোমনী, শবর প্রভৃতি রূপকাখক প্রয়োগও বটে। এঁরা স্ব স্ব সমাজে অর্থাৎ মহাযানের উপশাখা সাংখ্য তত্ত্ব ভিত্তিক মন্ত্র তন্ত্র বজ্র-কালচক্র ও সহজপন্থীদের অতিমান্য গুরু ছিলেন। তাঁরাও তাঁদের শিষ্যসমাজের গৃহগত ও সমাজগত প্রতিবেশ থেকেই তাঁদের অধ্যাত্মতত্ত্বের ও সাধন চর্যার রূপক গ্রহণ করেছেন। সেই সূত্রেই পাই জীবন-জীবিকার ও সমাজের চিত্র। বৃত্তিজীবী মানুষের উৎপ্রেক্ষাই চর্যায় ব্যবহৃত। তাই নগরে কিংবা কৃষিজীবী মানুষের কথা নেই। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবমুক্ত এবং প্রধানত সমাজ বহির্ভূত নির্বিত্ত বৈরাগ্যপ্রবণ মানুষের জীবন মনন চিত্রই পাই চর্যাপদে। সে কারণে বলতে গেলে চর্যাগীতিতে আয সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত পূর্ব ভারতের (কেবল বাঙলার নয়) গণ-মানবের একটা অকৃত্রিম ছবি মেলে। সেই জীবন, মন ও মনন ধারা আজো গাঁয়ের অস্পৃশ্য ও অবজ্ঞেয় বাউল, সহজিয়া, মুচি-মেথর, ডোম-বেদে-বাগদীর মধ্যে দুর্লভ নয়। সরহের বিভিন্ন দোহাতে আমরা আচারিক ধর্ম ও অন্য মতবাদীর চর্যার নিন্দা দেখতে পাই। যথা—ব্রহ্মনো হি ম জানন্ত হি ভেদ...—ব্রাহ্মণেরা ভেদ (তাৎপর্য) না বুঝে চতুর্বেদ পড়ে। মাটি কুশ জল নিয়ে অগ্নিতে আহুতি দেয়, নিঃষ্ফল অগ্নি হোমের কটুধূমে তাদের চোখ পীড়িত হয় মাত্র (আর কোন লাভ হয় না)।

সন্ন্যাসীদের প্রতিও সরহ অবজ্ঞাপরায়ণ - ''এক দণ্ডী ত্রিদণ্ডী ভঅবঁবেসে...।'' —এক দণ্ডী ত্রিদণ্ডীরা ভগবদবেশে ঘুরে বেড়ায়। (পরম) হংসের উপদেশ পেয়ে (নিজেদের) জ্ঞানী (মনে করে)। কিন্তু তারা ভ্রান্ত। ধর্মাধর্ম কোনটাই তাদের জানা নেই।

জৈন দিগম্বরদের প্রতিও সরহের বিদ্রূপবাণ তীক্ষ্ণ:

দীহ ণকখ জই মলিণেঁ বেসেঁ...

জই ণগগা বিঅ হোই মুত্তি সুণহ সিআলহ...

ভাবার্থ—দীর্ঘ নখা নগ্ন ও মলিনবেশী যোগী মাথার কেশ উৎপাটন করে। ক্ষপণকরা মোক্ষের সন্ধানে পথে পথে বৃথাই ঘুরে বেড়ায়। নগ্ন হলেই যদি মোক্ষ মেলে তাহলে শিয়াল কুকুরের মুক্তি হত। লোমোৎপাটনে মুক্তি সম্ভব হলে যুবতীর নিতম্বও মুক্ত। পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ মেলে, তাহলে পুচ্ছও মুক্ত, উচ্ছিষ্ট ভোজনে জ্ঞান লাভ হলে হাতী-ঘোড়াও জ্ঞানী।

আচার সর্বস্ব ভিক্ষুদের এবং মহাযানী সাধকদেরও তিনি নিন্দা করেছেন। বলেছেন আগম, ন্যায়, মণ্ডলচক্র ও তত্ত্বোপদেশে তারা সিদ্ধি খোঁজে:

"চোল্ল ভিকখু জে স্থবির উএসেঁ।
অণ্ন তহি মহাজাণ হি ধাবই...
অইরিএহিঁ উদ্দুলিঅচ্ছহেঁ..."

—আর্যযোগীরা গায়ে ছাই মেখে, মাথায় জটা রেখে, আর ঘরে দীপ জেলে, ঘন্টা বাজিয়ে চোখ বুজে (ভান করে) লোক ধাঁধায় (ঠকায়)।—এর থেকে আমরা সেকালের বিভিন্ন মতবাদী গুরু পুরোহিতদের ভেক ও জ্ঞানের কথা জানতে পাই। চিরকালই ধর্মধ্বজী ছদ্মধার্মিকরা লোক ঠকানো শাস্ত্রব্যবসায় করে থাকে।

চর্যাকারেরা স্বভাবতই বামাচারী কাপালিক সাধনায় আস্থাবান। সাধনসঙ্গিনী হিসেবে (গুহ্য অর্থে) এবং সাধারণভাবে নীচ জাতীয় নারীই ছিল যোগ্য। এসব নারীর নাচে-গানে ছিল আসক্তি ও কামচর্চায় সতীত্ববোধ ছিল শিথিল। অবশ্য নাচ-গান এরা পেশা হিসেবেও গ্রহণ করত। চর্যায় নীচ জাতীয়া তথা ডোমনী বিধবার সাঙ্গা প্রথা, নৃত্যনৈপুণ্য, কামচর্চার কথা পাই। ডোমনীরা তন্ত্রী বীণা চাঙারী তৈরী করে বিক্রি করত, খেয়ানৌকার পাটনীর কাজও করত। অন্তেবাসী ডোমেরা কুঁড়ে ঘরে বাস করত, গান-বাজনা ছাড়াও জাল পেতে ও মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত, কাপালিকরা কণ্ঠে হাড়ের মালাধারী নগ্ন (নাগা) বামাচারী যোগী ছিল। (১৩সং) তাদের চরণে ঘন্টা, নুপুর, কর্ণে কুণ্ডল, গায়ে ভস্ম ও কণ্ঠে হাড়ের মালা থাকত, হাতে ডম্বরু ও খর্পর বা নরকপাল রাখত। অতএব তারা গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে ছিল। (১১ সং)

আরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার চিত্র পাই শবরের দুটো পদে। দরিদ্রের সংসার। নাগরিক জীবন থেকে বিচ্যুত মানুষ। শবর বধূর পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা, কর্ণে কুণ্ডল, পরিবেশ আরণ্য প্রকৃতির, তাম্বুল-কর্পূরই ব্যসন, তীর-ধনুই জীবিকাউপকরণ। কার্পাস ও কঙ্গু-চিনার (কাগনীধানের) চাষ হয়। শকুন-শিয়ালের উৎপাত থেকে ক্ষেত রক্ষা করার জন্যে বাঁশের কঞ্চির বেড়া দেওয়া হত। এখানেই কৃষির (কার্পাস ও কাগনিধানের চাষ) কথা একটু মিলেছে। তাঁতী, ব্যাধ, সূঁতার, জেলে, শুঁড়ী প্রভৃতি বৃত্তিজীবীর নামও পাই।

ঢেন্টণের পদেও (৩৩ সং) টিলাবাসী প্রান্তিক মানুষের দৈন্য ও দুঃখ-করুণ জীবনের পরিচয় রয়েছে। প্রতিবেশীহীন নিঃসঙ্গ নিঃসহায় জীবন, হাড়িতে প্রায়ই ভাত থাকে না—উপোস করতে হয়, এদিকে পোষ্যের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তার উপর অতিথি আসে অথবা অন্ন জুটাবার জন্যেই নিত্য রাতে দেহব্যবসায়

করতে হয়। গৃহপালিত গরু, দুধ দোহন, সাধুবেশী চোরের দাপট, অবস্থা বৈগুণ্যে সিংহের কাছে শিয়ালের আস্ফালন প্রভৃতির ইঙ্গিত রয়েছে।

আরণ্যজীবনে অভ্যস্ত মানুষের হরিণ শিকারের সময় হরিণ ঘেরাও করা ও তাড়িয়ে নেয়ার চিত্র, ভীত হরিণের ছুটোছুটির চিত্র, হরিণ-হরিণীর ও করী-করিণীর কাম-চেতনার চিত্র, ব্যাধের নিত্য উপদ্রবে হরিণের বনান্তরে বা দূরে পলায়ন, [সামন্ত-পীড়নে প্রজার দেশত্যাগ] উদ্বিগ্ন-শঙ্কিত হরিণের তৃণ ভক্ষণে ও জলপানে অনীহা বাস্তবের প্রতিরূপ। (৬ সং ২৩ সং)

সেকালে রাস্তা ছিল কম, তখনো বাঙলার নিম্নভূমি ছিল রাস্তা বিরল, রাজপথ ও বাট দুচারটা ছিল—নভুলহ রাজপথ কন্ধারা (১৫ সং)। কাজেই জলপথে [খাল-বিল] নৌকাই ছিল যানবাহন। বড় বড় নৌকাও ছিল পাঁচ দাড়ের ও কর্ণের। সেকালে খুঁটির সঙ্গে কাছি দিয়ে নৌকা বাঁধা হত। পতবাল বা কর্ণ ধারার জন্য কাণ্ডারীও থাকত। জাল দিয়ে মাছ ধরার রেওয়াজ ছিল। মাঝিকে কামলিও বলা হয়েছে (৮ সং)। মজুর অর্থে 'কামলা' আজো ব্যবহৃত। নৌকার গুণ টানা (৩৮ সং), নৌকার তলার পানি সিউঁতী দিয়ে সেচনের কথাও আছে (১৪ সং)। রাস্তায় থাকত সাঁকো, সে সাঁকো বড়ো গাছের ফালি জোড়া দিয়ে এবং টাঙ্গি টানা দিয়ে মজবুত করা হত। (৫ সং)

সেকালের তন্ত্রী বা তার যুক্ত বীণা, ডম্বুর, বাঁশী, মাদল, লাউ বা বাঁশের তৈরী বাদ্যযন্ত্র, কাসা, করতাল প্রভৃতি আজকেও টিকে আছে। কামোদ্দীপক গানও (কামচণ্ডালী-গীতি) ছিল, নাটকও ছিল (বুদ্ধ নাটক), এ নাটক নৃত্যনাট্যই হওয়ার কথা। কাজেই নট-নটীও ছিল। বিনিময় মুদ্রা হিসেবে কড়ি-বুড়ির যুগ আমাদের দেশে অবসিত হয়েছে মাত্র শতেক বছরের মধ্যে। বাঙলাদেশে বিশ কর্পদকে হত এক বুড়ি (মৃচ্ছকটি নাটক)। যৌতুক নামে বিয়েতে সেদিনও বরপণ ছিল। বিবাহে বরযাত্রী যেত-পটহ মাদল, কর্ণও কশালা দুন্দুভি, কাঁসা, করতাল, ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্য-সহযোগে বিবাহ অনুষ্ঠান হত (১৯ সং)। বঙ্গ-বঙ্গাল ও বঙ্গালী অবজ্ঞার্থে উচ্চারিত হয়েছে, দেখতে পাই। 'বঙ্গাল' রাগও ছিল। বঙ্গ-বঙ্গাল ছিল নদীবহুল জনাকীর্ণ নিম্ন-ভূমি। হিউএনৎ সাঙ এখানে শতক্রোশ বিস্তৃত বহু হাউর দেখেছিলেন—আজো সব হাউর বিলুপ্ত হয়নি। এসব অঞ্চলে সাধারণত ভাগ্য বিতাড়িত নিঃস্ব লোক এসে বাস করে। তাদের স্বভাবে সংস্কৃতিতে থাকে রুক্ষতা ও স্থূলতা। চরুয়ার (চরবাসীর) প্রতি অবজ্ঞা আজো বর্তমান। তেমনি অবজ্ঞা বর্তমান গঙ্গার পূর্ব-দক্ষিণ পাড়ের লোকের প্রতি। আজো চট্টগ্রামে বাঙাল বলতে ঐতিহ্য আভিজাত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিহীন লোক ও পরিবার বুঝায়। ভুসুকু বা সরহ যে অন্তত বঙ্গদেশী ছিলেন না, এও তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ। অবশ্য বঙ্গ, বঙ্গাল ও বঙ্গালীর ব্যঙ্গার্থও রয়েছে

এবং পঁউয়া খাল দেহের দুই পদ্মের সংযোগ নাড়ী— পদ্মানদী নয়। বড় হোক, ছোট হোক, নদী কখনো খাল নামে অভিহিত হয়নি, হয় না।

১. বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহর বিণানা (৩৯ সং)

২. অদয় বঙ্গালে দেশ লুড়িও (৪৯ সং)

৩. আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ (চণ্ডালী) লেলী (৪৯ সং)

বাগর্থে এর মধ্যে নিন্দা ছাড়া আর কিছুই নেই। এবং কোন বাঙালী কবি এই সব পদ রচনা করতে পারেন না। এখানে নৌকা যাত্রা, দস্যুর উপদ্রব, নারী হরণ বা অসবর্ণে বিয়ের ফলে পতিত হওয়ার কথাই রয়েছে। খাওার জল দস্যুর কথা আছে সরহের পদেও—'বাট অভঅ খান্টা বি বলআ (৩৮ সং)।

ডোম, তাঁতী, ধুনুরী, সুতার, জেলে (কৈবর্ত) কাঠুরে [জো তরু ছো ভেবউ ন জাণাই],—লক্ষণীয় যে এরা আজো সমাজে বৃত্তিজীবী, ছোটলোক। এখানে আজকের মতো ঘরে চুরি, (২ সং) রাহাজানি এবং জলদস্যুর উপদ্রব ছিল, গঞ্জে নগরে নৌকা যোগে পণ্য বিনিময় হত। সোনারূপার সাধারণ্যে ব্যবহার কমই ছিল, যদিও কমলাম্বর সোনায় ভরা নৌকায় রূপা রাখবার ঠাঁই নেই বলে উল্লেখ করেছেন। চর্যাপদে যে শ্রেণীর লোকের উপমা দেয়া হয়েছে, সোনা আজো সে শ্রেণীর লোকের মধ্যে কৃচিৎ মেলে। অবশ্য চুরি হবার মতো দামী কানেটও (কান পাশা) কারো কারো ছিল। চোর-ডাকাতের ভয়ে সেকালেও ঘরে প্রহরী (সুণ বাহ তথতা পহারী (৩৬ সং), জই পবন গমন দুআরে দিঢ়তালা বিদিজ্জই, দোহা: সরহ) ও দুয়ারে তালা দিতে হত। চোর ধরবার জন্যে, চুরি নিবারণের জন্যে দুসাধী (রাজ-চর) থাকত।

যোগ-তান্ত্রিক সাধনার উদ্ভব ও প্রসারক্ষেত্র কামরূপ-কামাখ্যার ডাক-ডাকিনীর, যোগি-যোগিনীর খ্যাতির রেশ আজো বিদ্যমান, 'অমৃতকুণ্ড' এ অঞ্চলেই রচিত। সেযুগে ডাকিনী-যোগিনীরা ছদ্মবেশে বউ-ঝি রূপে ঘরে ঘরে বাস করত। আত্মপরিচয় গোপন রাখার গরজে তারা কপটাচরণের আশ্রয় নিত। তাই রাত্রে শ্বশুর ঘুমায়, কিন্তু বধূ জেগে থাকে। দিনের বেলায় গৃহস্থ বউ কাক দেখলেও ভয় পায়, রাত্রে আবার সে-ই কামরূপ যায়। উল্লেখ্য যে ভূতসিদ্ধি, খেচরসিদ্ধি প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধন বলে যে-কোন জীবে রূপান্তরিত হওয়া, আকাশে উড়া, সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করা প্রভৃতি অসাধ্য সাধন সম্ভব ছিল (মানিকচন্দ্র রাজার গান দ্রষ্টব্য)।

ডাইনীর ভয় আজো বিদ্যমান। তুকতাক-দারু-টোনা-উচাটন-বশীকরণ-তাবিজ-কবজ প্রভৃতির প্রতি আমাদের আস্থা সেই ডাকিনী যোগিনীর প্রভাব-প্রাবল্যেরই স্মারক। ডাকিনী-যোগিনীর ব্যভিচার-প্রবণতার নিন্দাও ছিল,—আসলে বামাচারী সাধনার সঙ্গিনী হিসেবে ডাকিনী যোগিনী-ডোমনী রজকী চণ্ডালী প্রভৃতির সম্বন্ধে লোক-প্রচলিত ধারণার থেকেই তাদেরকে সাধারণভাবে ব্যভিচারিণী মনে করা হত। আজো হাড়ি-ডোম মেথরপাড়া ব্যভিচারদুষ্ট বলে ভদ্রলোকদের ধারণা। গণিকা লম্পট বিহীন ছিল না সমাজ (১৮, ২৮)।

ডোমনী-শবরীদের তথা নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে মধ্যবিত্ত সুলভ নারী পুরুষার্জিত অন্নজীবিনী ছিল না, তারা এখনকার মতোই বহির্দ্বারেও স্বামী-সন্তানের সহকর্মিনী ছিল। তবু পুরুষপ্রাধান্যের দরুন তাদেরও গুরুজন রূপ স্বামীর শাসন মানতে হত। (যেমন 'নিঅ ঘরে ঘরিনী জাবঅ ন মজ্জই'। কিংবা ঘরবই খজ্জই ঘরিনি এহি জহি অবিআর—সরহ, দোহা)

দাবা খেলার চৌষট্টি ঘর বা কোঠা। দাবা বড়ে-ঘুটি, ঠাকুর (রাজা), গজ, মন্ত্রী, চালার দিশাও রয়েছে। প্রথমে বরে তারপর গজ, পরে মন্ত্রীর চাল বিধেয়। দাবা খেলার নাম 'নয় বল'। ঠাকুর তুর্কী শব্দ। খেলাটি মধ্য এশিয়ায় উদ্ভূত বলে মনে হয়। মদের দোকান থাকত, শুঁড়ি-নয়, শুঁড়ি বউ বেচত মদ। সেকালেও কি মদ ঘৃণ্য ছিল? নইলে বেশ্যাবাড়ির মতো চিহ্নদেখে সন্তর্পণে দোকান সন্ধান করবে কেন লোক? দোকান নেশারুদের জন্যে চব্বিশ ঘন্টাই যেন খোলা থাকত, বারুণী মদ সরু নল দিয়ে ঘড়ায় চালা হত। চিকন বাকলে বাঁধা হত মদ? একি বাঁশের চোঙা।

খেদায় বুনো হাতী ধরা হত। গানে মুগ্ধ করে হাতী বশ করবার উপায় জানা ছিল তাদের (১৭ সং বীণা পা)। পোষা হাতী মদমত্ত হলে স্তম্ভ (খুঁটি ৯ সং মহীধর) লগ্ন শিকল দড়ি দড়া ছিঁড়ে নিকটস্থ পদ্মবনে প্রবেশ করে সব পয়মাল করত (১৬ সং) পদ্মবনে (৯ সং) মত্তহস্তীর উপমা আজো ব্যবহৃত হয়। দলবদ্ধ বুনোহাতী পার্বত্য নদীতে জলপান করতে নামত, আজো নামে। (গঅন গিরি নই জল পিএউ—সরহ, দোহা) মূষিকের অপ্রতিরোধ্য উপদ্রবের কথাও বর্ণিত হয়েছে (২১ সং)। ইদুঁর সেদিন ঘরে সংসারে সমস্যা হয়েই ছিল। ইদুঁর কাঠ কাটে, বস্ত্র কাটে, কাটে সমুদয়, তাছাড়া গর্ত খোড়ে ও আমন ধান খেয়ে গৃহস্থের অন্ন নষ্ট করে। সিংহ-শিয়াল-কুকুর-হরিণ-হাতী-বলদ-গাভী-কাক-ময়ূর প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে নানা প্রসঙ্গে।

একটি চর্যায় (৪৭ সং) গৃহদাহ প্রসঙ্গে শাসন [পট্টোলী] পুড়ার কথা আছে। এটি ভূমি বা চৈত্য সংপর্কিত শাসন পট্টোলী হতে পারে। চাঁচড়ি দিয়ে চারবাঁশের খাট তৈরী করে তাতে তুলে শব দাহ করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হত আজকের মতোই (৫০ সং)। পিণ্ড [বলিও] দেওয়া হত। প্রসূতির জন্যে সেদিনও থাকত আলাদা আঁতুড় ঘর।

অলঙ্কারের মধ্যে ঘণ্টা, নূপুর, কঙ্কণ, মুক্তার হার, কুণ্ডল, কানেট প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। খাদ্য বস্তুর মধ্যে পাই ভাত, মাংস, দুধ, মাখন, তেঁতুল, লাউ প্রভৃতি।

তাম্বুল কর্পূর, শয্যাপাতা খাট, বারুনী (মদ), দর্পণ প্রভৃতি ছিল গরীবের বিলাস ও ব্যসন সামগ্রী।

আসবাব তৈজসের মধ্যে পিড়ি, হাড়ি, পিঠা (দোহন পাত্র), বাকল নির্মিত মদ রাখার চোঙ্গা, ঘড়া, গাড়ু, কঠার, খন্তা (নখলি) বাখোর, খুঁটি, কাছি, তালা, চাবি, টাঙ্গি প্রভৃতি। নৌকার বর্ণনায় পাই তৎসম্পর্কিত কাছি, পতবাল (পাল), কেড়ুয়াল, দুখোল, পুলিন্দা (মাস্তল), সেঁউতী মাঙ্গ (গলুই, গুণ ১৩, ১৪) নৌকার মধ্যে নাব, নাবরি, নাবি, ভেলা প্রভৃতি।

আত্মীয় পরিজনের মধ্যে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, শালী, বধু কুটম্ব প্রভৃতি এবং দুষ্ট কুটম্বের উপদ্রব সম্বন্ধে (৩৯ সং) আজকের আমাদের মতোই ক্ষোভ ছিল।

স্থানের মধ্যে বঙ্গ, বঙ্গাল, কামরূপ ও লঙ্কার (৩২ সং) নাম পাই। ঘর-বাড়ির মধ্যে উয়ারি (কাছারি বা থানা) কুঁড়ে বাড়ি মেলে। শহর, সমাজ ও শাসন সম্পর্কে পাই নগর, নয়বল, বল (সৈন্য ৪৮ সং) কড়ি, বুড়ি, রথ, দোসাধি (রাজার চর বা পুলিশ)

কৃষিজ ফসলের মধ্যে কমলি দানা, কঙ্গুচিনা, ধান ও কার্পাসের নাম মেলে।

নদী পর্বতের মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা খাল, ডোবা (৩২ সং) সরোবর (১০ সং) নলিনী বন, ঘাট ও অনির্দেশ্য সমুদ্র, অরণ্য, পর্বত, টিলা ও গিরি শিখর, সন্ধি পাই। তরুলতার কোন বিশেষ নাম নেই। গুঞ্জা ফুল, তেঁতুল, মকুলিত বৃক্ষ প্রভৃতির উল্লেখ আছে বটে।

চর্যায় গুহ্য সাধনার অনেক পরিভাষা রূপক উৎপ্রেক্ষা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি পদে দেহের রূপক হিসেবে নৌকা ব্যবহৃত। আজো তান্ত্রিকদের কাছে মানবদেহ মন-পবনের নৌকা। চর্যাপদে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা এইরূপ—

পাঁচ (স্কন্ধ), ধানী বুদ্ধ, তথতা, তথাগত, ইন্দ্রিয়, ষড় (ইন্দ্রিয়), আট (অষ্টসিদ্ধি, আট প্রকার নিবৃত্তি জাত সিদ্ধি) দশ (ইন্দ্রিয় দ্বার), গঙ্গা-যমুনা

সরস্বতী (ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না), পদ্ম (চতুঃপদ্ম) পটঅা খাল (দুই পদ্মের সংযোগ নাড়ী), অনাহতধ্বনি (কায়তত্ত্ব সম্পর্কিত) পাখুড়ি (দেহস্থ পদ্মের বিভিন্ন সংখ্যক পাপড়ি), বিমুকখা (চতুষ্কোটি বিমুক্ততা), ধমন-চমন (চন্দ্র-সূর্য হঠ যোগ) রবিশশী (হঠ যোগ), সহজ (সহজানন্দাবস্থা). শূন্য (নির্বাণ বা নির্বেদাবস্থা), সমাধি (ধ্যান) ইত্যাদি। বিবিধ : আগম, বেদ, পুথি, গুরু, শিষ্য, নাথ, খপণক, মন্ত্র, তন্ত্র, ব্রহ্মা, নবগুণ, [পৈতা] হরি, হর, ঘনটামালা।

৬

সাহিত্য মূল্য

চর্যাপদ গান হিসেবে রচিত। গানের মাধুর্য বাণীর উৎকর্ষে নয়—সুর লালিত্যে। কথা সেখানে গৌণ, সুরই মুখ্য। তবু এগুলো বাণী-প্রধান গান। চর্যাগীতিতে গুহ্য সাধনতত্ত্বের প্রহেলিকামূলক অভিব্যক্তির বাহন হয়েছে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। কাজেই রূপক-উপমা-উৎপেক্ষার প্রয়োগ ছাড়া এইসব পদ রচনার হয়তো অন্য উপায় ছিল না। তাই অনবরত নিজিত মানুষের জীবন-জীবিকা ও প্রতিবেশ জাত অভিজ্ঞতা থেকেই চিত হয়েছে উপমাদি। চর্যাপদে এই আলঙ্কারিক সৌন্দর্য সর্বত্র দৃশ্যমান। এ কারণেই চর্যাপদ এক কথায় চিত্রধর্মী বা চিত্রকল্প সমন্বিত রচনা। চিত্র যেমন পুরো বক্তব্যটাই দৃষ্টি গ্রাহ্য করে তোলে, তেমনি উপমা-রূপক উৎপ্রেক্ষাও অভিব্যক্তিকে মানস চক্ষুর গোচরীভূত করে।

বক্তার উদ্দিষ্ট বক্তব্য দৃষ্টান্তযোগে পাঠক বা শ্রোতার কল্পনা উদ্দীপ্ত ও অনুভূতি গভীর করে। রচনার সার্থকতা এখানেই। কাজেই সমকালে ব্যঙ্গ্যার্থ না বুঝেও পাঠক বৈষ্ণব পদাবলী ও বাউল গানের মতো এর আপাত অর্থেও আনন্দ পেত। আজ কালান্তরে ঐসব পদ থেকে সাহিত্যরস আহরণ করা আমাদের পক্ষে হয়তো দুঃসাধ্য। স্বাভাবিক অতীত মোহের আবেশ আমাদের চিত্তবীণার তারে যে আবেগ কম্পন জাগায়, তারই বশে আমরাও সুদূর অতীতের সেই জীবনের সঙ্গে ক্ষণিক একাত্মবোধে অভিভূত হই। পুরোনো সাহিত্যমাত্রই আমাদের এ কারণে আকৃষ্ট করে। আগেই বলেছি চর্যাগীতিতে সাহিত্যিক লাবণ্য এসেছে বাকপ্রতিমার সুষম ও দেদার ব্যবহার থেকে। এই বাকপ্রতিমাও কবির সৌন্দর্যবোধ, শিল্প-চেতনা ও মনীষার সাক্ষ্য। রসভোক্তা হৃদয়, পরিবেষ্টনী সচেতন দৃষ্টি, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন না হলে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে জীবনানুভূতির সাদৃশ্য কিংবা বৈপরীত্য সহজে অনুভূত হয় না। অনেক পদকারের এসব গুণ ছিল বলেই ফাঁকে ফাঁকে আপ্তবাক্য ও জীবনসত্য বিদ্যুল্লতার মতো চমক লাগিয়ে দেয়।

ইন্দ্রিয় শাসিত দেহের বর্ণনা কবি পাঁচটি শব্দেই শেষ করেন, তাতেই সব বলা হয়ে যায়—মন তরু পঞ্চ ইন্দি তসু সাহা। আসাবহল পাত ফল বাহা, 'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল। কিংবা প্রহেলিকার অবতারণা করে পাঠককে ভাবিয়ে তোলেন কবি, 'রুখের তেন্তিরি কুম্ভীরে খাই। অথবা 'সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ। বলদ বিআল গাবিআ বাঁঝে—বলে পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে দেন। যে কোন কামুক প্রেমিকের আবেগ প্রসূত চিরন্তন উক্তি:

জোইনি তই বিনু খনহিঁ ন জীবমি
তো মুহ চুম্বি কমল রস পিবমি।

যে কোন চর্যার নদী 'ভব নই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী' অথবা 'তরঙ্গতে হরিণার খুর ণ দীসই। ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই। সোনে ভরিতী করুণা নাবী, রূপা থোই নাহিক ঠাবী। খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি। এবংকার দৃঢ় বাখোর মোড়িউ—সবকথা বলা হয়ে গেল। কাঅ নাবড়ি খাণ্টি মন কেড়ুয়াল। এক সো পদুমা চৌষঠঠী পাখুড়ী। তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী। নিসি অন্ধারী মুসা অচারা' তুল-ধুনি ধুনি আসুঁরে আঁসু। উচাঁ উচাঁ পাবত তঁহি বসই শবরী বালী। মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিন সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী। বসন্তে 'নানা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী। উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা। গঅণহ জিম উজোলি চান্দা ইত্যাদি চোখের সামনে যেন চিত্রপট তুলে ধরে।

আপ্তবাক্য: আপণা মাংসে হরিণা বৈরী। দুহিল দুধ কি বান্টে সামায়। কাঅ নাবড়ি খাণ্টি মন কেড়ুয়াল। বর সুন গোহাল কি মো দুট্ঠ বলন্দে। দুধ মাঝে লড় অচ্ছন্তে ন দেখই। জলে পানিআ টালিআ ভেড় ন জাঅ রাজসাপ দেখি জো চমকই সাঁচে কি তা বোড়ে খাই। ভাগ তরঙ্গ কি সোসই সাঅর ইত্যাদি চর্যাগীতি সাধনার ও সিদ্ধির পন্থা ও সাধ্য বস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করবার জন্যে রচিত। বহু পদ থেকে বেছে সংকলিত মাত্র ৫১টি পদ সাধন পন্থ ও সাধ্য লক্ষ্য সম্পর্কে সঙ্গীতের মাধ্যমে জিজ্ঞাসুকে স্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব জানিয়ে দেয়ার জন্যই—এ আমরা অনুমান করতে পারি। আমাদের এ অনুমান সঙ্গত; কারণ আমরা দেখতে পাই সাধারণ সংকলনের মতো এতে এক চর্যাকারের পদ এক সাথে সংকলিত হয়নি—যেমন কাহ্ন, ভুসুকু, সরহ, কুক্কুরী প্রভৃতির পদ নানা স্থানে বিন্যস্ত হয়েছে; আমাদের মনে হয় ভাব, বক্তব্য ও স্তরের ক্রমানুসারে পদগুলো সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে। যদিও বিভিন্ন জনের স্বাধীনভাবে রচিত পদের সমগ্র ভাব সংকলকের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূরো সহায়ক হয়নি। তবু 'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল' দিয়ে মুনি দত্তের টীকার শুরু আর মহাসুহে বিলসন্তি সবরো লইআ

সুণ মেহেলী—'মারিল ভবমত্তা দহদিকে দিধলী বলী' এবং 'হের সে সবর নিরেবণ ভইলা ফিটলি যবরালী'—বলে শেষ করা—একেবারে নির্লক্ষ্য আকস্মিক বলে বিশ্বাস হয় না।

চর্যার ভাষার টীকাকার প্রদত্ত নাম সন্ধ্যা বা সন্ধা। চর্যাগীতি দ্ব্যর্থবোধক রচনা। বাগর্থ ও ব্যঙ্গার্থ বক্তব্যকে দুর্বোধ্য ও অবোধ্য করেছে বলেই সন্ধ্যাকালীন আলো-আঁধারির অস্পষ্টতার মতো তাৎপর্যের অস্পষ্টতারক্ষক ভাষার নাম সন্ধ্যা ভাষা, অথবা বিশেষ মানস সন্ধান করে বাণীর তাৎপর্য অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে হয় বলে ভাষার নাম সন্ধা। তাহলে সন্ধ্যা বা সন্ধা ভাষা অর্থে আমরা সাংকেতিক ভাষা বা রূপকের ভাষা বুঝব। এ ভাষা অর্থাৎ রচনার এ ভঙ্গি নতুন নয়, বরং সুপ্রাচীন। এত প্রাচীন যে তা মনুষ্য মানস-সংস্কৃতির উদ্ভবের সমকালীন। মানুষের রহস্যচেতনা, পর্যবেক্ষণপ্রসূত বিস্ময়, কল্পনা, অনুভূতি ও বোধ-বুদ্ধির অভিব্যক্তির আদি বাহন হচ্ছে ধাঁধা বা প্রহেলিকা। তুচ্ছকে উচ্চ করে, অদৃশ্যকে দৃশ্য করে, সামান্যকে অসামান্য করে, সরলকে জটিল করে, ঋজুকে বক্র করে, কৌৎসিতো লাবণ্য দিয়ে, প্রত্যক্ষকে পরোক্ষ করে স্বপ্নকে বাস্তবরূপে প্রতীয়মান করা, বাস্তবকে স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়ে অপরূপ করা প্রভৃতিই সাহিত্য-শিল্পকর্ম। তাই শাস্ত্রে-সাহিত্যে-ধাঁধায়-ছড়ায়-বচনে-আপ্তবাক্যে বক্তব্য শব্দে-অলঙ্কারে-ভঙ্গিতে প্যাঁচিয়ে-রসিয়ে জটিল ও বর্ণালী করে ব্যক্ত করাই মানুষের স্বভাব। বাক-বৈচিত্র্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য। অতিক্রান্ত স্বভাবই শিল্প। ঘরোয়া জীবনে আটপৌরে কথায়ও আমরা অসংখ্য idiom ও বাকপ্রতিমা ব্যবহার করে থাকি। প্রাত্যহিকতায় তা মলিন ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে বলেই আমরা তা লক্ষ্য করিনে, তা আমাদের চমকে দেয় না। কাজেই সন্ধ্যা ভাষা বৌদ্ধ চর্যাকারদের সৃষ্টি নয়, তা চিরকাল ছিল এদেশে, তার প্রমাণ মুনিদত্তের টীকাতেই রয়েছে—সন্ধ্যাভাষা, সন্ধ্যা, সংকেত, ব্যাজ প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষণীয়। হেবজ্রতন্ত্রে সন্ধ্যাভাষাকে মহাভাষা ও সময় সংকেত (conventional sign) বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১]

চর্যাকারেরা শিক্ষিত ছিলেন। সেকালে শিক্ষা মানেই ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অপভ্রংশ শেখা এবং বিদ্যা বলতে মুখ্যত ব্যাকরণ-অলঙ্কার শাস্ত্র, ছন্দ, গণিত, ন্যায়-দর্শন বিদ্যাই বোঝাত। আর জ্ঞান বলতে চরম ও পরম জ্ঞান ছিল অধ্যাত্ম বা পরমার্থ জ্ঞান। এঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন, সে অধিকারই তাঁদের ছিল না। এঁরা বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ বিহারে বা টোলে শিক্ষিত। নানা সূত্রে

১. Dr. Tarapada Mukherjee : Old Bengali Language and Texte, pp. 12-13.

জানা যায় নালন্দা প্রভৃতি বিহারে আটশতক থেকে যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ ও তৎসম্পর্কিত যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র-বজ্র-সহজ তত্ত্ব প্রভৃতির চর্চা বৃদ্ধি পায়। এসব মতবাদী-দের যারা বিষয়ী গৃহী-সমাজভুক্ত তাদের আচারিক আনুষ্ঠানিক পূজা-পার্বণ ছিল। দেব-প্রতিমা পূজাও ছিল আর যারা বিরাগী শ্রমণ তাদের অধ্যাত্ম সাধনা চলত গুহ্য পন্থায়। চর্যাগীতিতে সেই বিরাগী বজ্রী-সহজিয়ারই সাধনপন্থ ও সাধ্যবস্তু বিধৃত। এ সাধনার ভিত্তিই হচ্ছে যোগ-তান্ত্রিক পদ্ধতি। চর্যাকারেরা সিদ্ধপুরুষ—তাই বলে তাঁদের অনুসারী শিষ্যদের সবাই পণ্ডিত ছিল, তেমন ধারণা করার কোন কারণ নেই। সব সহজিয়া বাউল যেমন শিক্ষিত কিংবা তত্ত্ববিদ নয়— ওরা অনুকারী অনসারীমাত্র।

৭

চর্যাগীতিকার পরিচিতি

আজ অবধি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ভদন্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তিব্বতী ভাষার নানা গ্রন্থ অবলম্বনে চর্যাকারদের আবির্ভাবকাল ও পরিচয় নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। আর ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষা বিশ্লেষণ করে ভাষা ও রচনাকাল নির্ণয় করতে প্রয়াস পেয়েছেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ সাধারণ-ভাবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতই গ্রহণ করেছেন—অবশ্য যুক্তিসঙ্গত বলে নয়, মাতৃভাষার প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি এবং ভাষাবিদ শিক্ষক সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বশে।

চর্যাগীতিকারদের কাল ও পরিচয় নির্ধারণের জন্যে আজ অবধি যে-সব অনূদিত ও মূল তিব্বতী গ্রন্থ আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে: ১. Sum-Pa mkhan-Po রচিত dPag bSam-Ijon b Zan (রচনাকাল ১৭৪৭ খ্রীঃ), ২. তারনাথ রচিত rgya-gar-Chos byun (বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, রচনাকাল ১৬০৮ খ্রীঃ) Gnub-thob brgyad-Cu-gya-bzhi-rnam thar (চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাস), ৩. চক্রসম্বরতন্ত্র, ৪. Sa-Skya-bka'-Bum, ৫. Deb-ther-sNon বা Blue Annals (রচনাকাল ১৪৭৬-৭৮ খ্রীঃ), ৬. Bu-sTon-Rin-Po-Che-র (সংক্ষেপে Bu ston, রচনাকাল ১৩২২ খ্রীঃ) লেখা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে (পুরাতত্ত্বনিবন্ধাবলী) কয়েকজন চর্যাকারের সম্ভাব্য আবির্ভাব কাল এরূপ :

১.	আর্যদের	আট শতকের মধ্যভাগ	সরহের প্রশিষ্য
২.	কম্বলাম্বর পা	নয় শতকের মধ্যভাগ	বজ্রঘন্টের শিষ্য ও দারিকের প্রশিষ্য
৩.	গুণ্ডরী পা	নয় শতকের প্রথমার্ধ	সরহের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য
৪.	তন্ত্রী পা	নয় শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষ ভাগ	জালন্ধরী পার শিষ্য
৫.	মহী পা	নয় শতকের শেষ ভাগ	কাহ্নপার শিষ্য
৬.	কঙ্কণ পা	নয় শতকের শেষ ভাগ	দারিকের শিষ্য
৭.	বীণা পা	দশ শতকের শেষ ভাগ	ভদ্রপা'র শিষ্য

(সুখময় মুখোপাধ্যায় উদ্ধৃত)

এবং তাঁর সংকলিত 'হিন্দি কাব্যধারা' নামের গ্রন্থেও চর্যাকারদের পরিচয় রয়েছে। সেগুলোও যথাস্থানে উল্লেখিত হচ্ছে।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় (প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় গ্রন্থে, পৃ: ১-১২) তিনটে তিব্বতী গ্রন্থ অবলম্বনে মহাযান সিদ্ধাচার্যদের গুরু-শিষ্য পরম্পরার একটা পীঠিকা তৈরী করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েক জন চর্যাকারও রয়েছেন। এর থেকে চর্যা রচনার কাল-পরিসরও মোটামুটি ভাবে জানা যাবে। এঁদের আবিভাব কালও অনুমান করেছেন অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতে চর্যাগীতিগুলো আট শতকের প্রথমদিক থেকে শুরু করে এগারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময় পরিসরে রচিত।

সরহ পা (রাহুল ভদ্র) (আট শতকের গোড়ার দিকে, ৭০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি)
শবর পা (আট শতকের প্রথমার্ধ)
লূই পা (চর্যাপদ সূত্রেও দারিকপার গুরু, সং ৩৪ আট শতকের মধ্যভাগ)
|
দারিক পা (জীবৎকাল আট শতকের শেষ ভাগ)

চক্রসম্বরতন্ত্র মতে গুরু পরম্পরা
শবর
|
লূই
|
বজ্রঘণ্ট
|

বজ্রঘণ্ট পা

|

কূর্ম পা

|

জালন্ধরী পা (চর্যাসূত্রেও কাহ্ন পার গুরু, সং ৪৬)

|

কাহ্ন পা (কৃষ্ণাচার্য, নয় শতকের মধ্য ও শেষ ভাগ)

|

গুহ্য পা (ভদ্র পা ওর্ফে ভাদে, নয় শতকের শেষ ভাগ এবং দশ শতকের প্রথম ভাগ)

|

বিজয় পা

|

তিল্লি পা

নারো পা (২য় কাহ্ন পা, দশ শতকের মধ্যভাগ অথবা ১০৩৯ সনে মৃত্যু।)

|

শান্তি পা (রত্নাকর শান্তি, দশ শতকের শেষভাগ ও এগারো শতকের প্রথম ভাগ)

|

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ—৯৮০-৮২ খ্রীঃ জন্ম)

কচ্ছ পা (কূর্ম পা)

|

জালন্ধরী পা

|

কাহ্ন পা

|

গুহ্য পা (ভদ্র পা

|

বিজয় পা

|

তিলো পা

|

নারোপা

দীপঙ্কর ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে গৌড়রাজ নয়পাল ও কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের বিবাদে মধ্যস্থতা করে আপোস করান এবং সম্ভবত ১০৪২ সনে বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করে তিব্বতে যান, সেখানে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাদান করে ১০৫০ সনের কিছু পরে মৃত্যু বরণ করেন।

। ২ ।

এবার আমরা বিভিন্ন চর্যাকারের আবির্ভাবকাল ও পরিচিতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মত উদ্ধৃত করছি। এক্ষেত্রে প্রথমে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র পরে রাহুল সাংকৃত্যায়নের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য বিদ্বানের মত সংকলন করে দিচ্ছি।

সংক্ষেপে শহীদুল্লাহ-'শ', রাহুল সাংকৃত্যায়ন-'রা', সুখময় মুখোপাধ্যায়-'সু' এবং সুকুমার সেন—'সু-কু'। এঁদের গ্রন্থগুলো যথাক্রমে বাঙলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড), হিন্দি কাব্যধারা, প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় এবং চর্যাগীতি পদাবলী।

১. শবরী বা শবর পা

শ—শবরী পা বাঙালী। তাঁর গুরুর নাম এক মতে আর্য অবলোকিতেশ্বর, অন্যমতে নাগার্জুন শবর ব্যাধ ছিলেন। কমলশীলকে তিনি দুটো গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছিলেন। গ্রন্থ দুটোর নাম 'ডাকিনী বজ্রগুহ্যগীতি' ও 'মর্মোপদেশ'। কমলশীল তিব্বত রাজ খ্রী স্রোঙ-লদেউ বচনের নিমন্ত্রণে তাঁর দরবারে যান ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে। অতএব শবরী পা ৬৮০—৭৬২ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন।

রা সবরী পা বিক্রমশীলা নিবাসী, কুলে ক্ষত্রিয়, এবং অন্যতম সিদ্ধা। ইনি ৮৮০ খ্রীস্টাব্দের দিকে বর্তমান ছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা, যথা—ক, চিত্ত-গুহ্য গম্ভীরার্থক গীতি, খ. মহামুদ্রাবজ্রগীতি, গ. শূন্যতা দৃষ্টি, ঘ. সহজ সম্বরস্বাধিষ্ঠান, ঙ, সহজোপদেশ স্বাধিষ্ঠান।

সু লুই পার গুরু শবর পার জীবৎকাল আট শতকের প্রথমার্ধ। এবং শবর পার গুরু সরহের জীবৎকাল আট শতকের একেবারে গোড়ার দিক—৭০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি।

২. লুই পা

শ তারনাথের মতে লুই বাঙলাদেশের গঙ্গার ধারে বাস করতেন। তিনি প্রথম জীবনে উদ্যানের (সোয়াতের) রাজার কায়স্থ (লেখক) ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল সামন্ত শুভ। তিনি উড়িষ্যার রাজার ও মন্ত্রীর গুরু ছিলেন। সবর (জীবৎকাল-অনু ৬৮০-৭৬০ খ্রী:) লুই পার গুরু ছিলেন। কাজেই লুই পার জীবৎকাল ৭৩০-৮১০ খ্রীস্টাব্দ। লুইও বাঙালী ছিলেন এবং লুই মৎস্যেন্দ্রনাথ নয়, মৎস্যেন্দ্রনাথ পৃথক ব্যক্তি। দারিক পা ছিলেন লুই পার শিষ্য : লুই-এর একখানি গ্রন্থের নাম 'অভিসময়বিভঙ্গ'। শান্তরক্ষিত 'অভিসময় মঞ্জরী'তে লুই পার উল্লেখ করেছেন।

রা লুই পা কায়স্থ এবং চৌরাশী সিদ্ধার একজন। তাঁর গ্রন্থাবলী 'অভিসময়বিভঙ্গ' 'তত্ত্বস্বভাব', 'দোহাকোষ', 'বুদ্ধোদয়', 'ভগবৎ অভিসময়' ও 'গীতিকা'। তাঁর জীবৎকালের শেষ সীমা ৮৩০ খ্রীস্টাব্দ।

সু লুই পা আট শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। লুই পা ধর্মপালের রাজত্বের (৭৭০-৮০৬ খ্রী:) গোড়ার দিকে 'কায়স্থ'(লেখক) ছিলেন, এ তথ্যের উৎস–Sa-Bum ও পুরাতত্ত্বনিবন্ধাবলী। লুই পা শান্ত রক্ষিতের অভিসময়মঞ্জরীতে উল্লে-

খিত হয়েছেন। ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের কয়েক বছর পরে শান্তরক্ষিতের মৃত্যু হয়। লুই পা তাহলে আট শতকের শেষ পাদের আগেই বর্তমান ছিলেন।

সুকু লূই-এর জীবৎকাল দশম শতাব্দী এবং তাঁর রচিত গ্রন্থ তিনখানি- শ্রীভগবদ-ভিসময়, অভিসময়বিভঙ্গ, এবং 'তত্ত্বস্বভাব দোহাকোষ গীতিকা দৃষ্টি নাম'। মনে হয় শেষোক্ত গ্রন্থটি লূইয়ের দোহা ও চর্যাগীতির সংগ্রহ।

৩. বিরূপ পা

শ বিরূপ দুইজন। একজন নালন্দের জয়দেব পণ্ডিতের শিষ্য, কাজেই সাত শতকের লোক। অন্যজন জালন্ধরী পার শিষ্য। তিনি বাঙালী। তাঁর জন্মস্থান দেবপালের রাজ্য ত্রিপুরায়। এবং তাঁর শিষ্য ডোম্বী পা। বিরূপ আট শতকে বর্তমান ছিলেন। 'বজ্রযোগিনী' সূত্রে জানা যায় বিরূপের গুরু লক্ষ্মীংকরা (ইন্দ্রভূতির ভগ্নী। ইন্দ্রভূতি জালন্ধরী পার অন্যতম গুরু)। লক্ষ্মীংকরার গুরু ইন্দ্রভূতি, তাঁর গুরু কুক্কুরী পা, তাঁর গুরু লুই পা।

রা বিরূআ বা (বিরূপপাদ) ভিক্ষুরূপে সোমপুরী বিহারে (পাহাড়পুরে) বাস করতেন। বিরূপ পা দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের শেষ সীমা ৮৩০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে. জন্মস্থান ত্রিউর। তিনি ভিক্ষু ও চুরাশি সিদ্ধার একজন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা, যথা—'অমৃতসিদ্ধি', 'দোহাকোষ', কামচণ্ডালিকাদোহাকোষ', 'বিরূপগীতিকা', 'বিরূপবজ্রগীতিকা' 'বিরূপ চতুরশীতি', 'মার্গফলান্বিতা ববাদক' ও 'সুনিষ্প্রপঞ্চতত্ত্বোপোদেশ'।

সু বিরূপ নয় শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। উৎস 'বজ্রযোগিনী' গ্রন্থোক্ত শিষ্য পরম্পরা লুই-কুক্কুরী-ইন্দ্রভূতি-লক্ষ্মীংকরা-বিরূপা।

সুকু তারনাথের অনুসরণে সুকুমার সেন মনে করেন কাহ্ন (কৃষ্ণপাদ) নামধারী একজন সিদ্ধাচর্যের নামান্তর ছিল বিরূপা। ১৮ ও ৩৬ সংখ্যক চর্যাপদের বরাদ দিয়ে তিনি কাহ্ন পা ও 'কামচণ্ডালিকাগীতি' প্রণেতা বিরূপা অভিন্ন বলে মনে করেন। ভনিতায় গৌরব সূচক 'ভনন্তি' থাকায় তিনি মনে করেন চর্যাটি বিরূআর কোন শিষ্যের রচনা। তিব্বতী অনুবাদ সূত্রে বিরূপ মহাযোগী, যোগীশ্বর আচার্য 'কর্মচণ্ডালিকাদোহা কোষগীতি', দোহাকোষ এবং 'বিরূপ পদ চতুরাশীতি-'র রচয়িতা।

৪. ডোম্বী পা

শ ইনি ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন বিরূপ বা বিরুআ। গুরু পরম্পরার সূত্রে ডোম্বী পার সময় নিরূপণ সম্ভব। যথা শবর-লুই-ডোম্বী-তেল্লি-নাড়ো-ছোটডোম্বী-কুশলী ভদ্রা। শবর কমলশীলের সম সাময়িক। শবর কমলশীলের জন্য 'বজ্রগীতি' ও 'মর্মোপদেশ' নামে দুখানি বই লেখেন। কমলশীলের গুরু শান্ত রক্ষিত (জীবৎকাল ৭০৫-৬৫ খ্রীঃ)। কমলশীল তিব্বতরাজ খ্রি-স্রোঙ-লদেউ-এর আহ্বানে(রাজত্বকাল ৭৫১-৮৬। ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে তিব্বত রাজদরবারে গিয়েছিলেন এবং ৭৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে চীনা পণ্ডিত হো সাঙের সঙ্গে বিতর্কে অংশ নেন। অতএব ডোম্বী পার জীবৎ-কাল ৭৯০-৮৯০ খ্রীস্টাব্দ।

রা ডোম্বী পার জীবৎকালের শেষ সীমা দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৬-৪৯ খ্রীঃ) ৮৪০ খ্রীস্টাব্দ অবধি। ইনি বর্ণে ক্ষত্রিয়, নিবাস মগধ এবং চুরাশি সিদ্ধার একজন। তাঁর রচিত গ্রন্থ—'অক্ষরদ্বিদেশ', 'গীতিকা' ও নাড়ী বিন্দুদ্বারে যোগচর্যা'।

সু জীবৎকাল আট শতকের মধ্য ও শেষভাগ। এ তথ্যের উৎস তারনাথের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস। 'পুরাতত্ত্বনিবন্ধাবলীতে'ও ডোম্বী লূইপার শিষ্য।

সুকু ডোম্বী জাতিবাচক নাম হতে পারে। তিব্বতী ঐতিহ্যে ডোম্বী দু'জন। একজন ডোম্বী হেরুক। অন্যজন লাড়ী ডোম্বী। হেরুক ত্রিপুরার রাজা (তার নাথের মতে) ইনি বান্ত বিরূআর শিষ্য। টীকায় মুনিদত্তের মতে লাড়ী ডোম্বী চর্যাপদকার ও রাঢ়দেশে অনেককাল বাস করেন। চর্যাকার ডোম্বী যোগী ছিলেন।

৫. দারিক পা

শ ইনি লূই পার শিষ্য। অন্যসূত্রে জানা যায় শালীপুত্রের রাজা ইন্দ্রপালই দারিক পা। ইন্দ্র পালের রাজ্য প্রাপ্তির সন ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ। ইনি রত্ন পালের পরবর্তী রাজা। ইন্দ্রপাল বাঙলাদেশের রাজা বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন। এ যদি সত্য হয় তবে ইনি লুই পার প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন কিনা সন্দেহ। লূইপার শিষ্য হলে দারিক আট শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও নয় শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান থাকার কথা। এঁর চর্যাগীতির ভাষা প্রাচীন বাঙলা।

রা দারিক পার জন্মস্থান উড়িষ্যার শালীপুত্র। ইনি শালীপুত্রের রাজা এবং পরে সিদ্ধা হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মহাগুহ্যতন্ত্রোপদেশ, 'তথতাদৃষ্টি' ও 'সপ্তম সিদ্ধান্ত'।

সু দারিক পার জীবৎকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ। Blue Annals গ্রন্থের মতে ইনি রাজা ছিলেন। গ্রন্থের তথ্যের ভিত্তিতে রাহুল সাংকৃত্যায়ন (পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী) বলেন ইনি উড়িষ্যার রাজা ছিলেন।

সুকু দারিক লুই-এর শিষ্য। তাঁর মতে লুই-এর জীবৎকাল দশম শতাব্দী। কাজেই দারিকও ঐ শতাব্দীর লোক হবার সম্ভাবনা।

৬. ভুসুকু

শ আটটি চর্যাপদের রচয়িতা। বৌদ্ধচর্যাকার, শিক্ষাসমুচ্চয় ও সূত্রসমুচ্চয়— এই তিনখানি গ্রন্থের লেখক হচ্ছেন শান্তিদেব। তাঁর ডাক নাম ভুসুকু। তারনাথের ও Bu-ston-এর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসদ্বয়ে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। শান্তিদেব সৌরাষ্ট্র দেশের রাজপুত্র। নালন্দায় এসে তিনি জয়দেবের শিষ্য হন। তিনি নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করেন। তাই ভুক্তি'র-ভু, সুপ্তির-সু এবং কুটিরের-কু এই তিন আদ্যক্ষর যোগে তাঁকে পরিহাস ছলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এই শান্তিদেব ভুসুকু সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু পদকার ভুসুকুও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের শিষ্য ছিলেন। কাজেই তিনি একাদশ শতকের মধ্যভাগের লোক। সম্ভবত তিনি পূর্ববঙ্গের (বঙ্গালদেশের) লোক [চর্যা সং ৩৯] এবং 'চতুরাভরণে'র লেখক। ভুসুকুর দুটো চর্যায় 'রাউতু ভুসুকু' ভণিতা রয়েছে। ভুসুকু প্রাচীন বাঙলা ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। অবশ্য সেকালের বাঙলা, আসামী ও উড়িয়াতে পার্থক্য ছিল সামান্যই।

রা ভুসুকুর জীবৎকালের শেষ সীমা ৮০০ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ ধর্মপালের রাজত্বকালে (৭৭০-৮০৬ খ্রীঃ) ভুসুকু বর্তমান ছিলেন। এঁর জন্মস্থান নালন্দা। ইনি রাউত তথা রাজপুত্র ছিলেন। এবং পরে ভিক্ষু এবং সিদ্ধ হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'সহজগীতি'। রাজপুত্ররূপে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল শান্তিদেব।

সু একাধিক ভুসুকু ছিলেন। শান্তিদেব ভুসুকু সৌরাষ্ট্রের লোক। দেবপালের সমসাময়িক। সুতরাং নয় শতকের লোক। তারনাথ-উক্ত দ্বিতীয় ভুসুকু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্য। দ্বিতীয় ভুসুকু এগারো শতকের মধ্যভাগের লোক। এই দ্বিতীয় ভুসুকু সম্ভবত বাঙালী ছিলেন।

সুকু ভুসুকু বোধ করি রাজপুত্র ছিলেন। অর্থাৎ অশ্বারোহী যুদ্ধব্যবসায়ী বংশের সন্তান বলেই 'রাউত' নামে অভিহিত। ভুসুকু 'ভুসুক্ষ্ম' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বলে তিনি অনুমান করেন। ভুসুকু নিজেকে এবং শিষ্যদের যোগী বলে অভিহিত করেছেন (চর্যাপদ সংখ্যা ২১, ৩০, ৪১) এবং ভুসুকুর জীবৎকালের নিম্নতম সম্ভাব্য সীমা ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দ। ঐ সনে নকল করা গ্রন্থ চতুরাভরণ এই ভুসুকুরই রচনা। [রাউত অন্যমতে গ্রাম-প্রধান]

৭. কুক্কুরী পা

শ কুক্কুরী পা বাঙলাদেশের লোক। অন্য মতে তাঁর জন্মস্থান কপিলসক্রু। ইনি ইন্দ্রভূতির অন্যতম গুরু। অতএব ইনি আট শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন।

রা কুক্কুরী পা দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। জীবৎ কালের উচ্চতম সীমা ৮৪০ খ্রীস্টাব্দ। জন্মস্থান কপিলবাস্তু। জন্ম ব্রাহ্মণ বংশে এবং ইনি অন্যতম সিদ্ধা। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'যোগভাবানুপদেশ' ও 'স্রবপরিচ্ছেদন'।

সু কুক্কুরী পা আট শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

সুকু সুকুমার সেন মনে করেন ভনিতার কুক্কুরী পা কোন ভক্তের বা শিষ্যের রচনার নির্দেশক। অবশ্য মহামায়া সাধন নামে কুক্কুরী পার রচিত একটি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গেছে। ঐ গ্রন্থে সংকলিত একটি বজ্রগীতির সঙ্গে কুক্কুরী পার নামাঙ্কিত চর্যাপদ দুটোর এই মিল টুকু মেলে যে তিনটিই নারী ভাষিত এবং তিনটিতে মেয়েলী সংকোচহীনতা প্রকটিত। অবশ্য তারনাথের মতে একটি কুক্কুরী সর্বদা সঙ্গে রাখতেন বলেই এই সিদ্ধা কুক্কুরী পা নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

৮ কম্বলাম্বর পা

শ কম্বলাম্বর বা কম্বল ইন্দ্রভূতি ও জালন্ধরী পার গুরু। তিনি কনকারামের বা কঙ্করের রাজপুত্র বলে কথিত। অন্য এক মতে তাঁর জন্মস্থান উদ্যান বা উড়িষ্যা। কম্বলাম্বর লূই পার একখানা গ্রন্থের টীকাকার। ইনি কাহ্নপার পূর্ববর্তী ও কুক্কুরী পার সমকালীন। অতএব কম্বলাম্বর আট শতকের প্রথম পাদের লোক।

রা কমরী পার জীবৎকাল ৮৪০ খ্রীস্টাব্দ অবধি। অতএব তিনি দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। জন্মস্থান উড়িষ্যা, তিনি ছিলেন রাজকুমার, ভিক্ষু এবং সিদ্ধ।

'অসম্বন্ধদৃষ্টি' 'অসম্বন্ধস্বর্গদৃষ্টি' ও 'গীতিকা' তাঁর রচিত গ্রন্থ। তিনি নয় শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনি বজ্রকন্ঠের শিষ্য ও দারিকের প্রশিষ্য।

সুকু কামলী বা কম্বলপাদের সংস্কৃত রচনা আছে। সেখানে তাঁর নামান্তর কম্বলাচার্য। সরহের দোহাকোষের টীকাকার অদ্বয় বজ্র টীকায় তাঁর পাচটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

৯. আর্যদেব

শ মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে বিখ্যাত আর্যদেব ভিন্ন ব্যক্তি। পদকার আর্যদেব কম্বলাম্বরের সমকালীন। তারনাথের মতে ইনি মেবারের রাজা এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। এঁর পদের ভাষা উড়িয়া। অতএব ইনিও আট শতকের প্রথম পাদের লোক।

সুকু তিব্বতী ঐতিহ্যে আজদেব (আর্যদেব) মহাচার্য এবং 'কানেরীগীতিকা' ও 'চর্যামেলায়নপ্রদীপ' রচয়িতা।

১০ কঙ্কণ

শ ...কর্দিয়ে-র মতে কঙ্কণ কমলাম্বরের বংশজ। ইনি প্রথম জীবনে বিষ্ণুনগরের রাজা ছিলেন। সম্ভবত কঙ্কণ কমলাম্বরের শিষ্য ছিলেন। এঁর চর্যাপদের ভাষায় অপভ্রংশের ছাপ রয়েছে।

রা কঙ্কণ পার জীবৎকাল নয় শতকের শেষভাগ এবং ইনি দারিকের শিষ্য।

সুকু তিব্বতী ঐতিহ্যে সিদ্ধা কঙ্কণ কম্বলাচার্যের বংশধর। কঙ্কণ নামটি ছদ্মনাম অথবা উপাধি সূচক। কঙ্কণ যে বৌদ্ধযোগী ছিলেন, তা তাঁর পদে ব্যবহৃত 'স্নুণ' 'সত্তবহি' 'বিন্দুনাগ' ও 'তথতা' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ থেকে বুঝা যায়।

১১. মহীধর পা

শ মহীধর বা মহিল কাহ্ন পার শিষ্য। তিনি গুরুর সঙ্গে চট্টগ্রামেও গিয়েছিলেন। পদের ভনিতায় 'মহিত্তা' নাম মেলে। পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলী।

রা মহীধরের জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ। ইনি বিগ্রহ পাল-নারায়ণ পালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন (৮৫৯-৫৪/-৯০৮ খ্রীস্টাব্দ), জন্মস্থান মগধ। বর্ণে শূদ্র। 'বায়ুতত্ত্ব' ও 'দোহাকোষগীতিকা' এঁর রচিত গ্রন্থ। মহীধর দারিকের শিষ্য।

সুকু মনে হয় মহীধরের আসল নাম মহীণ্ডা এবং তারনাথের মহিলা। রচিত গ্রন্থ--'বায়ুতত্ত্ব', 'দোহাগীতিকা'। 'ভনন্তি' ভনিতা দৃষ্টে মনে হয় চর্যাটি তাঁর শিষ্য বা ভক্তের রচনা। তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনি আচার্য কৃষ্ণের বংশধর।

১২. ধাম বা ধর্মপাদ

শ ধাম বা ধর্মপাদ কাহ্ন পার শিষ্য। বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। পদের ভাষা বাঙলা।

রা ধর্ম বা ধর্মপাদ বিগ্রহ-নারায়ণ পালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ, জন্মস্থান বিক্রমশীলা (ভাগলপুর), বর্ণে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু এবং সিদ্ধা। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কালভাবনামার্গ', 'সুদৃষ্টিগীতিকা' 'হুঙ্কারচিতবিন্দুভাবনাক্রাস'।

সুকু চাটিল নাম যুক্ত চর্যাটি ধামের বলে মনে হয়। ধামের নামাঙ্কিত চর্যায় যোগের প্রক্রিয়া বর্ণিত। তারনাথ জালন্ধরীর শিষ্যদের মধ্যে এক ধামের উল্লেখ করেছেন। জালন্ধরী কিছুকাল চট্টগ্রামে ছিলেন। তারনাথের মতে তিলপাও চট্টগ্রামবাসী। কাজেই চাটিগাঁবাসী অর্থে চাটিল ও তিলপা অভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন।

১৩. ভদ্রপাদ বা ভাদে পা

শ ভদ্রপাদ বা ভাদে পা কাহ্ন পার শিষ্য। তাঁর জন্মস্থল মাহভদ্র পদের ভাষা বাঙলা।

রা ভদ্রপাদ বা ভাদেপার আবির্ভাব কাল বিগ্রহ ও নারায়ণ পালের রাজত্বকাল, নিম্নসীমা ৫৭৮ খ্রীস্টাব্দ, জন্মস্থান শ্রাবস্তী, পেশায় চিত্রকর এবং সিদ্ধ।

সুকু তিব্বতী ঐতিহ্যে ইনি আচার্য নামান্তরে ভাণ্ডারী। তিব্বতী ভদ্রচন্দ্র, ভদ্রদত্ত ও ভদ্রাবীর্যীর নাম আছে। এঁদের কেউ ভাদে হওয়া সম্ভব। ভাদের 'সহজানন্দদৃষ্টি-গীতিকা'র তিব্বতী অনুবাদও আছে। সম্ভবত এটি চর্যাগীতি কিংবা চর্যাগীতি-কোষ। তারনাথ ভাদেকে জালন্ধরী ও কৃষ্ণাচার্য—দুই জনেরই শিষ্য বলেছেন। ভাদের চর্যাটিতে তান্ত্রিকতার ছাপ নেই।

১৪. জয়নন্দী বা জয়ানন্দ

শ জয়নন্দী বা জয়ানন্দ বাঙলাদেশের এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁর পদের ভাষা আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষার প্রাচীন রূপ তথা—প্রত্ন-মৈথিলী-উড়িয়া-বাঙলা-আসামী।

১৫. শান্তি পাদ

শ শান্তি পাদ বা রত্নাকর শান্তি ও শান্তিদেব অভিন্ন ব্যক্তি নন। চর্যাকার শান্তি পাদ বিক্রমশিলা বিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তাঁর শিষ্য। এগারো শতকের প্রথমে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর চর্যার ভাষা প্রাচীন মৈথিলী।

সু সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে শান্তিপাদ রত্নাকর শান্তির সংক্ষিপ্ত নাম। দশ শতকের শেষ ভাগে ও এগারো শতকের প্রথম ভাগে ইনি বর্তমান ছিলেন।

সুকু শান্তি দেবের সঙ্গে ভুসুকুর যোগ টানা চলে না। তবে চর্যাকর্তা শান্তির সঙ্গে হয়তো চলতে পারে। শান্তির চর্যাদুটোতে (১৫ ও ২৬) সহজসাধনার উল্লেখ নেই এবং পারিভাষিক শব্দও খুব কম। এ দিক থেকে শান্তিকে প্রাচীনতর পদ-কর্তা বলতে হয়। নাড় পাদের উদ্ধৃত একটি চর্যাপদে শান্তির ভনিতা ও ভুসুকুর উল্লেখ রয়েছে। এই শান্তি নিশ্চয়ই ভুসুকুর শিষ্য অথবা ভক্ত। নাড় পাদের গ্রন্থের লিপিকাল ১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দ, এটিই শান্তির জীবৎকালের নিম্নতম সীমা। চর্যাগীতি ও চর্যাপদের শান্তি অভিন্ন কিনা বলা চলে না। চর্যা দুটির ভনিতা দৃষ্টে মনে হয় (খে ও খি বিভক্তি অস্তি থেকে উৎপন্ন সুতরাং গৌরব সূচক) চর্যা দুটি শান্তির কোন ভক্ত শিষ্যের রচনা। তিব্বতী অনুবাদে শান্তি দেবের সহজগীতি এবং শান্তির 'সুখদুঃখ-পরিত্যাগ অদ্বয় দৃষ্টি' পাওয়া গেছে।

১৬. বীণা পাদ

শ বীণা পাদের জন্মস্থান গহুর। তিনি ক্ষত্রিয় এবং তাঁর গুরুর নাম বুদ্ধবাদ। তিনি নয় শতকের লোক। তাঁর পদের ভাষা বাঙলা।

রা বীণা পা দশ শতকের শেষ পাদে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ভাদে বা ভদ্র পার শিষ্য।

সুকু ভণিতা হিসেবে নির্দেশ করা যায় এমন কোন বীণা নাম চর্যাতে নেই। একটি সমাসবদ্ধ শব্দ আছে—'হেরুঅ বীণা'। তিব্বতী ঐতিহ্যে বীণা পাদ ছিলেন বীরয়ার বংশধর। এঁর রচিত গ্রন্থ 'বজ্রডাকিনী নিষ্পন্নক্রম'। তারনাথের বর্ণনা থেকে মনে হয় বীণা পাদ আর ডোম্বী হেরুক একই ব্যক্তি।

১৭. সরহ

শ রাহুল ভদ্র সরহ ভিন্ন ব্যক্তি। চর্যাকার সরহ ব্রাহ্মণ। এঁর জন্মস্থান রাজ্ঞীদেশ। কামরূপের রাজা রত্নপাল (১০০০-৩০ খ্রীঃ) এঁর শিষ্য। অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ'ও ইনিই রচনা করেন। এঁর জন্মস্থান রাজ্ঞীদেশ সম্ভবত উত্তর বঙ্গ-কামরূপ। ইনি এগারো শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। এঁর পদাবলীর ভাষা বঙ্গ-কামরূপী। সরহের 'দোহাকোষে'র তিনটে সংস্করণ প্রকাশিত করেছেন তিন বিদ্বান—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯২৮), ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচি (১৯৩৫) এবং ভদন্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৯৫৭)।

রা গোপাল-ধর্মপালের রাজত্বকালে সরহ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর নিম্নতম জীবৎ-কাল ৭৬০ খ্রীস্টাব্দ জন্মস্থান মগধের নালন্দা। তিনি বর্ণে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু ও সিদ্ধ তিনি বহু গ্রন্থেরও প্রণেতা, তাঁর 'কায়কোষ অমৃত' 'বজ্রগীতি' 'চিত্তকোষ', অজবজ্রগীতি', 'ডাকিনীগুহ্য বজ্রগীতি,' 'দোহাকোষোপদেশ গীতি 'দোহাকোষ', তত্ত্বোপদেশশিখর দোহাকোষ', 'ভাবনাফলদৃষ্টিচর্যাদোহাকোষ', 'বসন্ততিলক-দোহাকোষ' 'চর্যাগীতিদোহাকোষ', 'মহামুদ্রোপদেশদোহাকোষ,' ও 'সরহপাদ-গীতিকা'।

সু আট শতকের গোড়ার দিকে ৭০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সরহ বর্তমান ছিলেন। সরহ শবর পা র গুরু ছিলেন। সরহ পা ও রাহুলচন্দ্র সরহ অভিন্ন ব্যক্তি! ১১০১ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত সরহের দোহাকোষের পুথিতে প্রাপ্ত তথ্যের উৎস সরহের দোহাকোষ সংগ্রাহক দিবাকর চন্দ্রের উক্তি। সরহ কমলশীলের পূর্ববর্তী লোক। শান্ত রক্ষিতের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে কমলশীল লাসায় যান এবং ৭৯২-৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে চীনা পণ্ডিত হো সাঙের সঙ্গে তাঁর মহাযানমত সম্পর্কে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

সুকু সরহের চর্যাপদে যৌনতান্ত্রিক সাধনার ইঙ্গিত নেই। সরহ অনেকগুলি দোহা লিখেছিলেন অবহট্‌ঠে। সেগুলো তিনটে কোষে সংকলিত ছিল। তাঁর দোহা-কোষের প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১১০১ খ্রীস্টাব্দ। সে সময়ে সরহের

দোহা 'লোপোন্মুখ' হয়ে ছিল। দিবাকর চন্দ্র লুপ্তপ্রায় দোহাগুলো সংকলন করে রক্ষা করেছিলেন। দিবাকর লিখেছেন,

জোহি বিনটঠ পণটঠপউ সোহিঅ অথ বুত্ত।
সরহপাঅ—কিঅ দোহ-তিউ সো সংহিত এথ ॥

দিবাকর চন্দ্র ১১০১ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী অবশ্যই। অতএব সরহ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। এটিই সরহের জীবৎকালের নিম্নতম সীমা। তিব্বতী ঐতিহ্যে সরহ মহাযোগী, যোগীশ্বর, মহাশবর, মহাব্রাহ্মণ ও মহাচার্য। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'দোহাকোষ'(মহামুদ্রোপদেশক, উপদেশগীতি, দ্বাদশোপদেশ, মর্মোপদেশ, তত্ত্বোপদেশশিখর) 'চর্যাগীতি' (ভাবনাদৃষ্টিগীতিকা). 'কায়বাকচিতমনসিকায়'। সরহের সংস্কৃত রচনাও আছে এবং এতে প্রবীণতার পরিচয় প্রকট। তারনাথের মতে এক সরহ ছিলেন সবরী পার সঙ্গে অভিন্ন, আর এক সরহ ছিলেন আচার্য সরহ। সরহ পণ্ডিত এবং রাজ পুরোহিত। এঁর গুরু ছিলেন অনঙ্গবজ্র। 'দোহাকোষ' রচয়িতা তিল পা ও সরহ অভিন্ন হতে পারেন।

১৮. গুণ্ডরী পা

শ কর্দিয়ে-এর ক্যাটালগে মাত্র এঁর নাম মেলে। অন্য পরিচয় অজ্ঞাত। ভাষা বাঙলা।

রা দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৬-৩৯) ইনি বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৪০ খ্রীস্টাব্দ। জন্মস্থান ডীশুনগর। বর্ণে লোহার (কর্মকার) এবং সিদ্ধ। ইনি সরহের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য।

সুকু গুণ্ডরীর নাম তিব্বতী ঐতিহ্যে নেই। চর্যাগীতিতে যৌনতান্ত্রিক ক্রিয়ার ইঙ্গিত আছে। মনে হয় চর্যাকর্তা প্রাচীনদের মধ্যে পড়েন না। নামটিও ছদ্ম বলে বোধ হয়। গুণ্ড করিক বা গুড় করিক থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়।

১৯. চাটিল বা চাটিল্ল পা

শ চৌদ্দ শতকের জ্যোতিরেশ্বর ঠাকুর রচিত বর্ণরত্নাকরে চাটিলরূপে এঁর নাম মেলে। অন্য পরিচয় অজ্ঞাত। এঁর চর্যার ভাষা বাঙলা।

সুকু চাটিল নামটি হয়তো চট্টগ্রামবাসী অর্থে ব্যবহৃত। 'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই'—এই ধাম হয়তো চাটিলের শিষ্য—'ধর্মকর্ম' নয়।

২০. ঢেণ্টণ

শ জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকরে' 'চেন্ঢণ' রূপে এঁর নাম আছে। এঁর গীতির ভাষা বাঙলা।

রা ঢেন্টণ পা ও তন্তি পা সম্ভবত অভিন্ন। দেবপাল-বিগ্রহ পালের সময়ে ইনি বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের উর্ধ্বসীমা ৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ। জন্মস্থান অবন্তিনগর-উজ্জয়িনী, বর্ণে তাঁতী এবং সিদ্ধ। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'চতুর্যোগ ভাবনা'।

সুকু ঢেন্টণ পা নামীয় চর্যাটি কোন শিষ্য ভক্তের রচনা নিশ্চয়ই। এটি বিশুদ্ধ প্রহেলিকা। এতে কোন পারিভাষিক শব্দ নেই। চর্যাটির একটি আধুনিক রূপান্তর কবীরের ভনিতায় মিলেছে—

বলদ বিয়াওএ গাভী ভই
বাছুরি দুহাওএ দিন তিস সাঞ্ঝা।
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে।।

২১. তাড়ক

শ তাড়কের পরিচয় অজ্ঞাত, তাঁর চর্যার ভাষা বাঙলা।

সুকু তাড়কের সম্বন্ধে তিব্বতী ঐতিহ্যে কোন উল্লেখ নেই। তাড়ক ছদ্মনাম কিংবা উপাধি হওয়াই সম্ভব। তাড়ক শব্দের অর্থ—খুনী, ফাঁসুড়ে।

২২. কাহ্ন পা

শ কাহ্ন পার জন্মস্থান উড়িষ্যা। থাকতেন পাহাড়পুরস্থ সোমপুরী বিহারে। কাহ্ন পা—'দোহাকোষ' ও তেরোটি চর্যাপদ ছাড়াও 'শ্রীহেবজ্রপঞ্জিকাযোগ রত্নমালা'-র রচয়িতা। এই গ্রন্থের লিপিকাল ১২০০ খ্রীস্টাব্দ। লিপিকর কায়স্থ গয়াকর। লিপিকাল গোবিন্দ পাল দেবের রাজত্বের উনচল্লিশতম বছরের চৌদ্দই ভাদ্র। কাহ্ন পার গুরু জালন্ধরী পা। জালন্ধরীর গুরু ইন্দ্রভূতি। কাহ্ন পা গোপী চাঁদের (৭ শতকের শেষে) সমসাময়িক এবং ধর্মপালের (৭৭০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনারোহণ) নির্মিত সোমপুরী বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। কাজেই কাহ্ন পা আট শতকে বর্তমান ছিলেন।

রা কাহ্ন পা বা কৃষ্ণপাদ বা কৃষ্ণাচার্য পাদ বা কৃষ্ণবজ্রপাদ অভিন্ন ব্যক্তি। দেব পালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের উর্ধ্বতম সীমা ৮৪০ খ্রীস্টাব্দ। জন্মস্থান কর্নাট। বাস করেছেন বিহারে এবং বঙ্গদেশে (সোমপুরী বিহারে)। বর্ণে ব্রাহ্মণ এবং ভিক্ষু ও সিদ্ধ। রচিত গ্রন্থ—গীতিকা,' 'মহা-ঢুঁটন, বসন্ততিলক,' 'অসম্বন্ধদৃষ্টি,' 'বজ্রগীতি,' ও 'দোহাকোষ'।

সু কাহ্ন পার ওর্ফে কৃষ্ণাচার্যের জীবৎকাল নয় শতকের মধ্য ও শেষভাগ। Sa-skya-bka-Bum গ্রন্থানুসারে ইনি দেব পালের রাজত্বকালে (১৮০৬-৪৯ খ্রীঃ) পণ্ডিত ভিক্ষু নামে খ্যাত ছিলেন এবং ঐ সময়ে সোমপুরী পাহাড়ে বাস করতেন। দেবপাল নয় শতকের তৃতীয় পাদ অবধি রাজত্ব করেন।

সুকু কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্নি, কাহ্নিলা নামে চর্যাগীতিতে এঁর ভনিতা মেলে। একটিতে 'কাহ্নর নামান্তর পাই 'বিড়ুআ'। একটিতে গুরু জালন্ধরী পার উল্লেখ আছে। কাহ্ন কাপালিক, যোগী, নাঙ্গা বলে ভনিতায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন। নাথ সাধনার ঐতিহ্যে কাহ্ন পা জালন্ধরী বা হাড়ি পার শিষ্য। তিব্বতী ঐতিহ্যে কৃষ্ণপাদ যোগীশ্বর আচার্য ও মণ্ডলাচার্য। কৃষ্ণপাদের নামে যে সব রচনা আছে সেগুলো একজনের রচনা নয়—অন্তত দুইজন কাহ্নের অস্তিত্ব অনুমান করা চলে। একজন কাহ্ন জালন্ধরী পার শিষ্য, যার নামান্তর ছিল 'বিরুআ'। তিনি নাঙ্গা, কাপালিক যোগী এবং ডোমনী প্রেম বর্ণিত। এঁর রচনা ছয়টি—১০, ১১, ১৮, ১৯, ৩৬ ও ৪২। অপর কাহ্নের রচনায় জ্ঞানোপদেশই প্রবল। তাঁর রচনা সাতটি—৭, ১৯, ১২, ১৩, ২৪, ৪০ ও ৪৫। ভনিতায় কিন্তু দুই কবির কোন পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। এক কাহ্ন হেবজ্রতন্ত্রের টীকা 'যোগরত্নমালা' লিখেছিলেন। এই গ্রন্থের গোবিন্দপালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লিপীকৃত একটি পুথি পাওয়া গেছে। অতএব লিপিকাল ১২০০ খ্রীস্টাব্দ। এই কৃষ্ণাচার্যই যদি চর্যাকার হন, তা হলে তাঁর জীবৎকালের নিম্নতম সীমা বারো শতকের শেষার্ধে। তারনাথ এক কৃষ্ণাচার্যকে ডোম্বী হেরুকের এবং অন্য এক কৃষ্ণাচার্যকে অর্বাচীন ইন্দ্রভূতির শিষ্য বলেছেন। জালন্ধরীর শিষ্য ছিলেন বিরূপ কৃষ্ণাচার্য।

চর্যাকারদের পরিচিতি বিষয়ে আমরা গবেষক-বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্তগুলোই সঙ্কলিত করে দিলাম। আমাদের কোন মতামত নেই। কারণ আমাদের নিজেদের কোন মৌলিক গবেষণা নেই। ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের[১] মতে কেবল লুই, কুক্কুরী, গুণ্ডরী, ভুসুকু, কাহ্ন, সরহ, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জয়নন্দী ও ধামের ভনিতাই

১. The old Bengali Language and text, pp 10-11.

অকৃত্রিম বলে গ্রহণ করা চলে। অন্য ২৩টি পদের ভণিতায় পদকারেরা তাদের গুরুর নাম বসিয়েছেন বলেই তাঁর ধারণা। ডক্টর সুকুমার সেনও কোন কোন চর্যাকারের ভণিতার সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণ করেন। গুরুর নামে ভণিতা দেওয়া ছাড়াও কোন কোন চর্যাকার ছদ্মনামে ভণিতা দিয়েছেন বলে তাঁর বিশ্বাস।[১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন ও সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে মোটামুটিভাবে চর্যাগীতিগুলো আট শতকের মধ্যভাগ থেকে এগারো শতকের মধ্যে রচিত।

চর্যাগীতি রচয়িতাদের সবার বাড়ি বাঙলাদেশে ছিল না, সৌরাষ্ট্র-কর্ণাট-উড়িষ্যা-মগধেও ছিল কারো কারো জন্মস্থান। কেউ কেউ বাঙলাদেশে এসেছিলেন, কিছু দিন বাসও করেছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে অন্তত ছয়জনের রচনা বাঙলা নয়,—ক. আর্যদেবের ভাষা উড়িয়া, খ. কঙ্কণের ভাষা অপভ্রংশের ছাপযুক্ত, গ. মহীধরের ভাষা মৈথিলী, ঘ. জয়নন্দীর ভাষা আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনরূপ (এই ভাষা মৈথিলী, উড়িয়া, বাঙলা ও আসামীতে একরূপ)। ঙ. শান্তি পাদের ভাষা মৈথিলী, চ. সরহের ভাষা বঙ্গ-কামরূপী, - সরহের সময়ে প্রাচীন আসামী ও প্রাচীন বাঙলা একই রূপ ছিল।

১. চর্যাগীতি পদাবলী (৩য় সং. পৃ: ৫—২৫)।

চতুর্থ অধ্যায়

আদি কবি ও কাব্য [পনেরো শতক]

১

রাজকীয় প্রতিপোষণতত্ত্ব

যা আছে তা নয়, যা থাকা প্রত্যাশিত, যা শ্রেয় বা প্রেয়, যা প্রয়োজনীয়—তার স্বপ্ন দেখা, অন্যের মনে সে-স্বপ্ন জাগিয়ে দেয়াই শিল্পীর কাজ। এই তাৎপর্যে সাহিত্যাদি কলা একাধারে জীবন-স্বপ্নের উৎস, আধার, ফল ও প্রতিচ্ছবি। সুতরাং শিল্পকলা মাত্রই জীবনের স্বপ্ন ও জিজ্ঞাসার রূপায়ণ, জীবনের প্রয়োজনেরই প্রতিরূপ। সে-স্বপ্ন, জিজ্ঞাসা ও প্রয়োজন অবশ্য বহু ও বিচিত্র। তাই সাহিত্য-শিল্পের অবলম্বন ও বক্তব্য অশেষ।

প্রাণী মাত্রই জীবিকা-সন্ধানী। এবং সে সন্ধানে অল্পবিস্তর শ্রম আছেই। প্রাণি-জগতে মানুষই কেবল জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিদত্ত কায়িক শক্তিকে মনন প্রয়োগে সুকৌশলে বৃদ্ধি করেছে, মানুষের এই বর্ধিত শক্তির নাম হাতিয়ার। তাই হাতিয়ার প্রয়োগের নিপুণতাতেই প্রাণিজগতে মানুষের অনন্যতা। জীবিকা-সন্ধানী সহাতিয়ার মানুষই সব ভাব-কর্ম-আচরণের কর্তা, জীবিকা-নির্ভর জীবনে তাই সব চিন্তা-চেতনার উৎস জীবিকা-ভাবনা ও জীবিকা-অর্জন পদ্ধতি। কলার উদ্ভবতত্ত্বেও পাই এ তথ্য। গান থেকেই সাহিত্যের বিকাশ, শ্রমসাধ্য যৌথ কর্মের অনুষঙ্গ হিসেবেই গানের উৎপত্তি। তেমনি যাদু ও সর্বপ্রাণতত্ত্বে আস্থাবান মানুষের বাঞ্ছা সিদ্ধির অবলম্বন হিসেবে উদ্ভূত নৃত্য ও চিত্রকলা। এ ভাবে প্রয়োজনের কর্মের সঙ্গে আনন্দের ও সৌন্দর্যের যোগসাধন করে মানুষ শ্রমকে করেছে সুবহ এবং কর্মে পেয়েছে উৎসাহ। নৃত্য গীত বাদ্য ও চিত্র বা মূর্তি আজো তাই অনেক জাতির উপাসনার বা ধর্মাচারের অঙ্গ। আদিতে art and ritual ছিল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের। আজো আরণ্য মানবে এবং মূর্তি পূজকে তা সুলভ।

সভ্যতার তথা জীবিকা-পদ্ধতির উন্নয়নে শ্রম-বিভাগে সমাজ-কাঠামোর পরি-বর্তনের ফলে নাচ-গান-চিত্র-প্রতিমা আজ আর সভ্য মানুষের যাদুযোগে জীবিকা

অর্জনের অবলম্বন নয়। যাদের উপাসনার ও জীবিকাপদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে, তারাও অভ্যাস ও সৌন্দর্যবুদ্ধি বশে নাচ-গান-বাজনা-চিত্র ও ভাস্কর্যে আকর্ষণ হারায় নি। ব্যবহারিক প্রয়োজন নিরপেক্ষ বলেই তাদের কাছে এ সব এখন নিতান্তই নান্দনিক বিলাস, একান্তই সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রূপচেতনার প্রসূন ও আনন্দের অবলম্বন। যা ছিল বৈষয়িক প্রয়োজনজাত, তা-ই এখন মানস চাহিদায় উন্নীত। তাই সম্পর্ক হয়েছে দূরান্বিত, সম্বন্ধসূত্র হয়েছে অদৃশ্য। কিন্তু এ ধারণাও পূরো সত্য নয়। কেননা, আদি রূপকথা থেকে আজকের সাহিত্য-শিল্প অবধি সর্বত্রই দেখি ভাল-মন্দর দ্বন্দ্ব—সর্বত্রই ন্যায়নীতিবোধ জাগানোর—মহৎ ও সুন্দর জীবনের চেতনা দানের প্রয়াস লক্ষণীয়।

সভ্যতার একটা বিশেষ স্তরে শ্রমজীবী ও অবসরভোগী ধনী সমাজের সৃষ্টি হল, তখন থেকেই নাচ-গান-বাজনা-চিত্র-মূর্তি-সাহিত্যাদি কলা ব্যবহারিক জীবন-নিরপেক্ষ খেয়ালী মনের রূপ ও রস বিলাস বলে বিবেচিত। এই স্তরেই সাহিত্য-শিল্পাদি এবং চারু-কারু-দারু প্রভৃতি সর্বপ্রকার সুকুমার বা ললিতকলার চর্চা শাহ-সামন্তের সুখ ও আনন্দের উপকরণ হিসেবেই রচিত ও অনুশীলিত হত। গরীব শিল্পীরা তাদের অনুগ্রহ ও প্রতিপোষণ নির্ভর হলেন। শাহ-সামন্ত—শাসকরাই ছিল পোষক। তাই শিল্পীর তোয়াজ-স্তুতি-আনুগত্য ছিল তাদের প্রতি। মধ্যযুগ অবধি য়ুরোপেও তথা শিল্প-বিপ্লবের পূর্বাবধি দুনিয়ার সর্বত্রই সব সুকুমার কলার, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উৎসাহী সমঝদার ও কৃতী-কর্মীর প্রতিপোষক ছিল শাহ-সামন্ত ও শাসকরা। তারপর সামন্ত সমাজের সমাধির উপর যখন পুঁজিবাদী-বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠল, তখনই শাহ-সামন্ত প্রতিপোষণ-অনপেক্ষ শিল্প সাহিত্য তথা ললিতকলা হল গণমুখী। আগে সামন্তগোষ্ঠীর অনুগ্রহজীবী ছিল বলে রাজা-উজির-সদাগর নিয়েই রচিত হত রূপকথা-উপকথা-গান-গাথা-কাব্য। সামন্ত ছিল লক্ষ-কোটিতে একজন, বুর্জোয়া হল লক্ষ লক্ষ। তাই সাহিত্যে এবার এল ধনী মানী-পদস্থ মানুষ। ক্রমশ বিদ্যা, বিত্ত ও বেসাতি ক্ষেত্রে গণমানবও ঠাঁই পেল, তাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ল। তাই এবার গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে-লিখিয়ে আঁকিয়েরা গণমানবের জীবন-কথার রূপায়ণে হল উৎসাহী। কেননা, এ যুগে শিল্পী-সাহিত্যিকের খোর-পোষ আসে গণমানবের পকেট থেকে।

আগে ললিত বা সুকুমার কলার চর্চা ছিল দরবারী বিলাসের ও শোভার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই বুঝে না বুঝে, শোভাবর্ধনের জন্যে ঐশ্বর্যের দর্প ও দাপট দেখানোর জন্যে দরবারে গাইয়ে-আঁকিয়ে-নাচিয়ে-লিখিয়ে পুষতেন শাহ-সামন্তরা। তা'

আর কয়জনের ভাগ্যে জুটত। দেশভরে অন্য শিল্পী-সাহিত্যিকরা সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনাদর-অবহেলার মধ্যেও নিজেদের স্বল্প অবসর নিজেদের আন্তরিক ও স্পর্শপ্রবণ আবেগকে মুক্তি দেয়ার কাজে লাগিয়ে স্বস্তি ও আনন্দ পেত। সেকালে গণশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না—আজো নেই পৃথিবীর অনেক দেশেই—তাই শিল্পী-সাহিত্যিকের সংখ্যা ছিল নেহাত নগণ্য। তাঁদের কেউ কেউ প্রতিভাবলে জনবন্দিত ও প্রখ্যাত হতেন, অন্যেরা বুনো ফুলের মতো অস্থানে বৃথা রূপ রস-গন্ধ ছড়িয়ে বিস্মৃতির গর্ভে লোপ পেতেন।

আমাদের দেশেও প্রাচীনকাল থেকেই সম্রাট-সামন্ত সভায় কবি ও পণ্ডিত থাকতেন। রাজকীয় প্রতিপোষণে তাঁদের অনেকেই প্রতিভাবান না হয়েও প্রখ্যাত। বল্লাল সেন, লক্ষ্মণসেনের সভা আমরা কবি-পণ্ডিতে জমজমাট দেখি, পালদেরও সভাকবি-পণ্ডিতের সন্ধান মেলে।

তুর্কী আমলের শুরুতেই উমাপতিধরকে রাজ-প্রশস্তি রচনা করতে দেখি, 'শেখ শুভোদয়া'ও এক রকম নব বিজেতাদের পরোক্ষ তোয়াজ বলে ধরে নেয়া যায়। ইলিয়াসশাহী আমলের আগে বাঙলা ভাষায় লিখিত রচনা শুরু হয়নি বলে পনেরো শতকের আগে বাঙলা লিখিয়ে কোন সভা-কবির সন্ধান মেলে না। এ সময়ে দেশী সভা-পণ্ডিত বা দরবারে-সম্মানিত পণ্ডিতের নামও মেলে—যেমন, রূপসনাতন গোস্বামীর প্রপিতামহ পদ্মনাভ, রায় মুকুট প্রভৃতি আটটি উপাধি প্রাপ্ত বৃহস্পতি মিশ্র, বারবক শাহর সভা-পণ্ডিত মুকুন্দ ও নরহরি বিশারদ (বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা) এবং সার্বভৌমের ভাই বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন জালালউদ্দীন ফতেহ শাহর (ওর্ফে হোসেন শাহ্‌র) সভাপণ্ডিত এবং চৈতন্য-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন মিশ্রও 'রাজ-পণ্ডিত ছিলেন বলে চৈতন্য চরিত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহর্ (১৩৮৮—১৪০৯ খ্রীস্টাব্দে) আগে সভাকবি বা রাজ-পণ্ডিতের নাম হয় ঐতিহাসিকের ঔদাসীন্যে কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি অথবা তখনো বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী শাসক দেশী কবি-পণ্ডিতের কদর দানের গরজ বোধ করেন নি। যদিও হিন্দুর শাস্ত্রীয় ও বৈষয়িক আইনের আকর স্মৃতির বিধি-নিষেধ জানিয়ে দেয়ার জন্যে নিশ্চয়ই পণ্ডিতের সাহায্য আবশ্যিক ছিল। এতে বাঙলায় লেখা তখনো যে রেওয়াজে পরিণত হয় নি—আমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল ও সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। তবে রাজপণ্ডিত প্রশাসনিক কারণে তুর্কী শাসনের গোড়া থেকেই নিশ্চয়ই দরবারে ঠাঁই পেয়েছিলেন, ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে যেমন আলিম-পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়েছিল, তেমনি প্রয়োজনেই। কিন্তু প্রশাসনিক চাকুরে বলেই পণ্ডিতে কোন গুরুত্ব

দেয়া হয় নি, অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে তাঁদের নাম কোথাও লিপিবদ্ধ থাকলে, তা গবেষণা সূত্রে ভবিষ্যতে মিলতেও পারে।

যা হোক আমরা কয়েকজন রাজ-পণ্ডিতের নাম যেমন নানা সূত্রে পাচ্ছি, তেমনি দেশী মায়ের সন্তান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্‌র আমল থেকে কবির নামও পাচ্ছি। কবি শাহ মুহম্মদ সগীর সুলতানের 'আজ্ঞাক অধীন' বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন— এতে অনুমান করি তিনি নিতান্ত প্রজা ছিলেন না, হয় তো চাকুরেই ছিলেন। তারপর পাচ্ছি রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র (১৪৫৯-৭৬) প্রতিপোষণ প্রাপ্ত কৃত্তিবাস ও মালাধর বসুকে, শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্‌র (১৪৭৪-৮১) সময়ে জয়েনুদ্দীনকে, জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ্ ওর্ফে হোসেন শাহ্‌র আমলে (১৪৮১-৮৭) বিজয় গুপ্তকে, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) বিপ্রদাস পিপিলাই, যশোরাজ খান, কবি দামোদর (যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি। কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী। রাম-গোপাল দাস – সুখময়) কবিচন্দ্র মিশ্র [গৌরীমঙ্গল প্রণেতা], শ্রীখণ্ডের কবিশেখর বিদ্যাপতিকে—নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহর আমলেও (১৫১৯-৩১) এঁরা জীবিত থেকে 'নাসিরা শাহের' নামোল্লেখ করেছেন। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্‌র (১৫৩১-৩২) প্রতিপোষণ পান শ্রীধর কবিরাজ ও পদকার সৈয়দ আফজল। চট্টগ্রামের প্রশাসক লস্কর পরাগল ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁর প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী। আকবরের আমলে মাধবাচার্য, শাহজাহানের আমলে গদাধরদাস (১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে, জগন্নাথ মাহাত্ম্য) আওরঙ্গজেবের সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আমলে (১৬৬৫-১৭০৭) কৃষ্ণরাম দাস (১৬৭৬) প্রমুখ অনেকেই রাজভক্ত ছিলেন বা প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন। এমনি করে দৌলত উজির বাহরাম খান, দৌলত কাজি, আলাউল, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, মুহম্মদ মুকিম অবধি অনেকেই সুলতান-সামন্ত-শাসক-জমিদারের নাম করেছেন। এঁরা যে সবাই প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন তা নয়, গায়েনের দিক্ বন্দনার মতো সমকালের সুলতান-সম্রাটের নাম করাও কারো কারো কাছে একটা সৌজন্যমূলক রীতিমাত্র ছিল। যেমন, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবিচন্দ্র মিশ্র, মুকুন্দরাম, কৃষ্ণরাম দাস, দৌলত কাজী, আলাউল, ফকির গরীবুল্লাহ স্বাধীনভাবে কাব্য-চর্চা করেছেন, আর মুকুন্দরাম ছিলেন জমিদারের অনুগৃহীত, দৌলত কাজী-আলাউল-মর্দন পেয়েছিলেন রোসাঙ্গের বাঙালী মন্ত্রীর প্রতিপোষণ, বর্মীভাষী আরাকান রাজের নয়।

বিদেশী-বিভাষী সুলতান বাঙলা ভাষা কিংবা সাহিত্য-প্রীতি বশে কবির প্রতিপোষণ করেছিলেন বলে ভাববার কারণ নেই। কিন্তু তুর্কীশাসন পরোক্ষে বাঙলা

ভাষা-সাহিত্যের চর্চার সহায়ক হয়েছিল, কর্ণাট-দেশীয় (দ্রাবিড়) সেন রাজারা উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন, পালরাজত্ব ও বৌদ্ধবিলুপ্তির ফলে বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্মৃতি-শাসিত পুরো হিন্দু করার জন্যে তাঁরা নতুন করে প্রজাদের বর্ণে বিন্যস্ত করেন, উত্তরভারত থেকে ব্রাহ্মণ এনে ব্রাহ্মণ্য পূজা-পার্বণ-অনুষ্ঠান অত্যুৎসাহে চালু করেন। ফলে কায়স্থ-বৈদ্য ব্যতীত সংখ্যাগুরু শূদ্রাদি প্রজার লেখাপড়ার অধিকারও হরণ করেন, সে-সঙ্গে প্রাকৃত-অবহট্‌ঠকেও পরিহার করে শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃতকেই বিদ্যাচর্চা ও শাসনের বাহন করেন। অনুমান করা সম্ভব বৌদ্ধজ হিন্দুদের পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার আচার-অনুষ্ঠান নিঃশেষে বিলোপ করার জন্যে রাজশক্তির সচেতন প্রয়াস ছিল, তাই বোধ হয় অহিন্দু অর্থাৎ গীতাস্মৃতি বহির্ভূত কোন লৌকিক দেবতার —যাঁরা বৌদ্ধযুগেও তারা-মানসা-যক্ষ-চণ্ডী-ধর্মঠাকুর-ওলা-শীতলা বাসুলী রূপে পূজিতা হতেন,—প্রকাশ্যে পূজা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। বৌদ্ধপীড়নও ছিল, পরবর্তীকালে রচিত 'নিরঞ্জনের রুস্মা'য় তা সুপ্রকট। উড়িয়া-বাঙালী-মৈথিলী তান্ত্রিক মন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহযানী বৌদ্ধগ্রন্থের বাঙলাদেশে বিলুপ্তি এবং নেপালে-তিব্বতে তাঁদের সুলভতা থেকেও বোঝা যায় তুর্কীবিজয়ের ফলে নির্জিত গণমানব এ ক্ষেত্রে মুক্তির স্বাদ পেল বইকি। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রী-সমাজ ও সরকারের রোষদৃষ্টি ও শাসন মুক্ত হয়ে এখন থেকে তারা তাদের চিরলালিত প্রাচীন দেশী ও বৌদ্ধসংস্কার এবং লোকায়ত বিশ্বাস অনুসারে স্বাধীনভাবে দেবতার পূজা-পার্বণ ও অনুষ্ঠান করবার, মনের কথা মুখের বুলিতে প্রকাশ করবার, নিজেদের রীতি-নীতি ও বিশ্বাস-সংস্কার মেনে চলবার—বিদেশী-বিধর্মী রাজার ঔদাসীন্যের সুযোগে—পূর্ণ অধিকার ফিরে পেল, এমনকি সেন আমলে সমাজপতি-শাস্ত্রকারেরাও রাজশক্তির সমর্থন হারিয়ে এখন অসহায় অবস্থায় শূদ্রাদি নির্জিত কিন্তু সংখ্যাগুরু দলের মন যুগিয়ে তাদের সব অশাস্ত্রীয় কাজের সহযোগী হল। ধর্মঠাকুরের ব্রাহ্মণপূজারী, মাহাত্ম্য কথার ব্রাহ্মণ কবি, আদিনাথ চন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে শিবরূপে গ্রহণ, চণ্ডী-মনসা-শীতলা প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ্য দেবতা রূপে বরণ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-সাধকের নাথ-শৈব-বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলরূপে স্বীকৃতিপ্রাপ্তি প্রভৃতি অনেক কিছুই এর প্রমাণ। চৈতন্যের আবির্ভাব পূর্ব-কালেও বাঙালীর শাস্ত্রে বিগর্হিত অহিন্দু-আচরণের ও অনুষ্ঠানের বর্ণনায় তা-ই বৃন্দাবন দাস সক্ষোভে বলেন :

ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন
পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহু ধন।

বাসুলী পূজএ কেহো নানা উপচারে
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে।
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
এই সকল শুনিতে লোক আনন্দিত।
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল। (চৈঃ ভাঃ)

বিদেশী-বিধর্মী শাসন প্রবর্তিত না হলে ভারতের কোথাও ধর্মবিপ্লবের আবরণে সমাজ-বিপ্লব তথা নির্জিত গণমানবের শাস্ত্র-সমাজের শাসন-পীড়ন-মুক্তির আন্দোলন সম্ভব হত না। নির্বিঘ্নে যে রামানন্দ-কবীর-নানক-দাদূ-একলব্য-চৈতন্য দেবদ্বিজ বেদের বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন তা' এ বিদেশী-বিধর্মী শাসকের হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে ঔদাসীন্যেরই ফলে। নতুন ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে একটা ভাববিপ্লব ঘটেই। তা কোথাও মৃদু কোথাও বা প্রচণ্ড হয় মাত্র। কাজেই তুর্কী বিজয় কেবল সদ্ধর্মীদেরই মুক্তির আশ্বাস ছিল না, নির্জিত বাঙালীরও আত্মপ্রতিষ্ঠার ও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। এই তাৎপর্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে, 'পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল...এই দুই শতাব্দীতে (১৫-১৬ শতক) বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই (বাঙলার ইতিহাস)। এবং দীনেশচন্দ্র সেনের সেই বিখ্যাত উক্তি 'আমাদের বিশ্বাস মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল।' তাঁর একথা যথার্থ। এভাবে উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দেয়ার কৃত্রিম প্রয়াস সেন রাজত্বের অবসানের সাথে সাথেই ব্যর্থ হয়ে গেল। সর্বত্র লোকায়ত ধর্ম ও লোকসংস্কৃতি প্রীতি ও চর্চা প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠল। তারই ফল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব শাস্ত্র। তুর্কীরা ছিল বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী। শাসকগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। দেশী মানুষের সহযোগিতায় রাজ্য-শাসন করতে হয়—এই বুদ্ধি সব শাসকেরই থাকে। তাই তুর্কীরা গোড়া থেকেই দেশী পাইক (পদাতিক) ও দেশী রাজস্ব-কর্মচারী রাখত। সে রেওয়াজ মীরজাফরের আমলের দেওয়ান রায়-রায়ান মহারাজ নন্দকুমার অবধি চালু ছিল। আবার ঐ সহযোগিতার জন্যে সম্প্রীতির প্রয়োজন, পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ পরিচয় সূত্রেই সেই প্রীতির উদ্ভব হয়। পরস্পরের ধর্মমত, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ বিধি,

ও রীতি-নীতি-রুচি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও গুরুত্বচেতনা না থাকলে অজ্ঞতা-অসতর্কতা প্রসূত উক্তিতে ও আচরণে আঘাত হানা হয়—সদ্ভাব নষ্ট হয়। বামুনের উপবীত ও টিকি নিয়ে কৌতুকবশে তুর্কী-সোয়ারদের মস্কারা হিন্দুমনে কি প্রচণ্ড ক্ষোভ জাগিয়েছিল তার সাক্ষ্য রয়েছে কীর্তিলতায় ও চৈতন্যচরিত প্রভৃতিতে। এ কারণেই হিন্দুকে জানবার-বুঝবার জন্যে হিন্দুর জীবনচেতনা ও জগৎ-ভাবনার প্রতীক দুই অবতার কাহিনী—রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করান গৌড়সুলতান ও তাঁর প্রশাসকরা। লক্ষণীয় যে, গোড়ার দিকে রীতি-বিরুদ্ধ ও অশাস্ত্রীয় বলে কোন হিন্দুই অনুবাদ কার্যে এগিয়ে আসেনি, প্রায় আড়াইশ বছর পরে চাকুরে কায়স্থ মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীকে পাওয়া গেল। একজন দুঃসাহসী ব্রাহ্মণও জুটলেন তিনি কৃত্তিবাস। অতএব, ইংরেজরা যে প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৭৭০-এর পর থেকে হিন্দু ও মুসলিম আইনের অনুবাদে উদ্যোগী হয়েছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধিকৃত অঞ্চলের ভাষাগুলো শেখা-শেখানোর ব্যবস্থা করেছিল, অবিকল সে প্রয়োজন তুর্কী-শাসকদেরও ছিল। পণ্ডিতেরা হয়তো মৌখিক পাঁতিই দিতেন—পাপ ভয়ে বাঙলায় লিপিবদ্ধ করতেন না।

এ সূত্রে আর একটি তথ্যও উল্লেখ্য, সব শাসক-সাম্রাজ্যলিপ্সুর মতো তুর্কী-মুঘলেরাও শাসন-শোষণেই উৎসাহী ও নিষ্ঠ ছিল, স্বধর্ম প্রচারের কোন চেষ্টাই রাজশক্তি করেনি, যদিও মনে মনে নিশ্চয়ই স্বধর্মের প্রসার ও স্বধর্মীর বৃদ্ধি কামনা করত - স্বধর্মীর সমর্থন ও সহযোগিতার আশায়। ইংরেজেরাও ঔপনিবেশিক স্বার্থেই গুরুত্ব দিয়েছিল, তাই প্রজার অসন্তোষ ভয়ে মিশনারীদের প্রকাশ্য প্রচার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। ফলে ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সূফী-দরবেশ-আলিমের ব্যক্তিত্ব ও সদাচারের প্রভাবে। সরকার অর্থ-বিত্ত দিয়ে তাঁদের পরোক্ষে সাহায্য করেছে বটে, তবে প্রকাশ্যে ফরমান যোগে কোথাও প্রচারে সহায়তার আশ্বাস দেয়নি। রাজনীতিতে স্বার্থ ও সুবিধা ছাড়া অন্য বিবেচনা ঠাঁই পায় না।

বাঙলাদেশে ইসলাম প্রচারে ও তার প্রসারে যাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা হচ্ছেন গৌড়ের জালালউদ্দীন তাবরেজী, চট্টগ্রাম-বর্ধমান কালনার বদরউদ্দীন বদর-ই আলম, বিক্রমপুরের বাবা আদম, বদর আলম মাহিদী, মদনপুরের শাহ সুলতান রুমী, সোনার গাঁয়ের শেখ শরাফুদ্দীন তাওয়ামাহ, পাবনার শাহ দৌলা, সিলেটের শাহ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ, মঙ্গলকোটের শাহ মাহমুদ ওর্ফে শাহ রাহী, বগুড়ার সুলতান মাহী আসোয়ার, গৌড়ের আলাউল হক, তাঁর পুত্র নূরকুতবে আলম। এঁরা ছাড়াও পীর সফীউদ্দীন, জাফর খাঁ গাজী, খাঁ জাহান খাঁ গাজী, আনোয়ার

কুলি হালবী, ইসমাইল গাজী, রাজশাহীর মখদুম শাহ দোলা, ঢাকার শাহ আলী বাগদাদী প্রমুখ অনেক চাকুরে পীর-দরবেশ রয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যসমাজে হৃত-অধিকার বৌদ্ধজ নিম্নবর্ণের ও বিত্তের নিজিত জনগণই রাজশক্তির রক্ষণ-পোষণ প্রত্যাশায় ও মানবিক সাম্যের সমাজে স্বস্তিলোভে ইসলামের প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয় বলেই বিদ্বানদের অনুমান।

অতএব, তুর্কী বিজয়ের ফলেই জনগণ মাতৃভাষায় তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের, তাদের সুখ-দুঃখের, আনন্দ-যন্ত্রণার, সমস্যা-সম্পদের ও প্রাণের কথার অভিব্যক্তি স্বাধীনভাবে দিতে পারল। এর আগে বাঙলায় লেখ্য রচনা চালু ছিল না বলে তাদের গান, গাথা, ধামালী, পাঁচালী, রূপকথা ইতিকথা, ব্রতকথা, দেবকথা গায়েনের মুখে আনুষ্ঠানিক ভাবে উৎসবে-পার্বণে-মেলায়-বৈঠকে মৌখিক রচনা হিসেবে কথকতায় চালু করেছিল,—লিখিত পাচালীর শুরু সম্ভবত পনেরো শতক থেকেই। চৌদ্দ শতকে কিছু লিখিত হলেও তা হাতে আসেনি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আঙ্গিক দেখে মনে হয়, ওটিরও জড় ও কাঠামো ছিল কথকতায়। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যের উপকরণ ও বক্তব্য দশ শতকেরও আগেকার। এগুলো ঘরে সংসারে মুখে মুখে চালু ছিল। ষোল শতক থেকে কিছু কিছু লিখিতরূপ পায়, আবার ময়নামতী-মানিকচাঁদ-গোপীচাঁদ গাথা অলিখিত থেকে যায় আঠারো শতক অবধি। অবৌদ্ধদের অবহেলায় 'পালগীতি' লোপ পেয়েছে। লক্ষণীয় যে, বাঙলা রচনার শুরু লোকায়ত ধর্মকথা দিয়ে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নাথ সাহিত্য, দেবমঙ্গল কাব্য প্রভৃতি তার প্রমাণ।

২

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস সমস্যা

১৯১৬ সনে প্রকাশিত হবার পর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে আখ্যাত ও সুপরিচিত কাব্যটি বাঙলা সাহিত্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে সমাদর ও গুরুত্ব লাভ করেছিল। ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের এটি পুরো বা আংশিক অবশ্য পাঠ্য। পণ্ডিত গবেষক বা সমালোচকেরা ছাড়াও পঠন-পাঠন সূত্রে অধ্যাপকরাও এ গ্রন্থ বিষয়ে নানা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নে সমস্যায় পড়েন।

গোড়ার দিকে আলোচকদের নজর ছিল ভাষার দিকে আর বড়ু চণ্ডীদাসের কাল ও পরিচয় নিরূপণের দিকে। বিতর্ক মোটামুটি এ ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। তারপর ক্রমে তা' সর্বাত্মক হয়ে উঠে। এখন গ্রন্থনাম, কবি, লিপিকাল, রচনা-

কাল ও রচনার স্থান, রচিত বিষয়, রচনার অকৃত্রিমতা, আঙ্গিক প্রভৃতি কোনটাই প্রশ্নাতীত নয়, কোন বিষয়েই বিদ্বানরা আর এক মত নন। গত ষাট বছর ধরে বহু বিদ্বান নানা দিক দিয়ে বিভিন্নভাবে অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সবগুলোর উল্লেখ ও আলোচনা পাঁচশ' পৃষ্ঠার বইয়েও ধরবে না। তাই আমরা সাম্প্রতিক কালের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও আবিষ্কারগুলোকেই এখানে আমাদের বক্তব্যের অবলম্বন করব।

১৯০৯ সনে বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বিষ্ণুপুরের এক গাঁয়ে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রবংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়াল ঘরে অযত্নে রক্ষিত এ পুথি উদ্ধার করেন। পুথিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। গোড়ার দুটো পাতা এবং শেষ পাতাটি নেই। অবশ্য মধ্যে মধ্যেও কিছু পাতা নেই। শেষ পাতার পরেও অলিখিত কিছু পত্র ছিল। প্রথম দুই পাতায় দেবস্তুতি, কবির আত্ম-পরিচয় ও গ্রন্থনাম প্রত্যাশিত ছিল এবং শেষ পত্রে সাধারণত রচনার পুষ্পিকা তথা সমাপ্তি কাল ও লিপিকাল থাকে। বিদ্বানদের বোধ-বুদ্ধির ও জ্ঞান অনু-শীলনের সুবিধে হবে বলেই যেন ঐ তিনটি প্রয়োজনীয় পত্র লোপ পেয়েছে।

গ্রন্থনাম-প্রসঙ্গ

আবিষ্কারক-সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ গ্রন্থের বিষয়ানুগ নাম দিয়েছেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এ নাম এতকাল মেনে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দ্রোহ দেখা দিয়েছে।

রূপগোস্বামী তাঁর 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থে কীর্তনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এরূপ —নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনং। নাম রূপ ও গুণাদি সরবে উচ্চারণ করাই কীর্তন। ভক্তির সঙ্গে নাম, গুণ ও লীলা কীর্তনই বৈষ্ণবচর্যা। বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থের উদ্দেশ্য সভক্তি কীর্তন নয়। বড়ু চণ্ডীদাস যেভাবে গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তাতে মনে হয় কৃষ্ণকে লোকচক্ষে হেয় করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি শাক্ত ছিলেন, যুগ-প্রভাবে হয়তো বৈষ্ণব বিদ্বেষীও। কৃষ্ণের প্রতি সীমাহীন অশ্রদ্ধা নিয়ে যে এ গ্রন্থ রচিত তা' গ্রন্থের সর্বত্র প্রকট। তাই ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার বলেন—"কীর্তন শব্দের একটি অর্থ হইতেছে কীর্তি, খ্যাতি বা যশবিষয়ক স্তুতিজ্ঞান। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের চরিত্র যতদূর সম্ভব, মসীলিপ্ত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে প্রেমের কোন সম্বন্ধই নাই; সে শুধু আত্মতৃপ্তি চায়, সে নায়িকাকে শুধু গালাগালিই করে না, ফৌজদারী

মোকর্দমার আসামীর মত সে মায়ের বকুনি খাইয়া নায়িকার নামে দুরপনেয় কুৎসা ঘোষণা করে, তাহার মনে দয়া নাই, মায়া নাই, সে বহুবার নায়িকাকে উপভোগ করিয়াও শুধু তাহার দোষ ত্রুটিই শেষ পর্যন্ত মনে রাখে এবং সেই জন্যে তাহাকে পরিত্যাগ করে।... বসন্ত রঞ্জন বাবুর আবিষ্কৃত খণ্ডিত পুথির নাম রাধাকৃষ্ণের ধামালী বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়।" তাঁর গণনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বারো বার ধামালীর উল্লেখও রয়েছে—[প্রথম সংস্করণে পৃঃ ৩৫, ৫১, ৫২, ৮৯, ৯৬, ১০৮, ১১১, ১২৯, ১৫২, ২২১, ২৮৩ ও ৩৫৭।] এই ধামালী নিছক রঙ্গ পরিহাস নয়—সঙ্গমকামনা, নষ্টামী, নাগরালী।[১]

কবি কালিদাস রায়ও বলেন, "বলপ্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ [গালি], বর্বরোচিত আচরণের সমাবেশে আলঙ্কারিক বিচারে এই কাব্যে [শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে] রসাভাস ঘটিয়াছে"।[২] গোপাল হালদারও বলেছেন—"কিন্তু তাঁর শ্রীকৃষ্ণ যতই আপনার দেবত্বের বড়াই করুক সে ধূর্ত এক গ্রাম্য লম্পট ছাড়া আর কিছুই নয়।...একটু স্থূল হলেও তারা [রাধা-কৃষ্ণ-বড়াই] রক্তমাংসে গড়া মানুষেরই প্রতি-নিধি। জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক নয়।"[৩] কাজেই বর্তমান নামে আপত্তি অসঙ্গত নয়। বিমান বিহারী মজুমদার এ গ্রন্থের নাম 'রাধাকৃষ্ণের ধামালী' হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।[৪]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিটি পাওয়া গিয়েছিল শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রবংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। পুথির সঙ্গে একটি টুকরো কাগজে একটি রসিদ ছিল। তাতে লেখাছিল:

> শ্রীনারায়ণায় নম (?) শ্রীশ্রীআচার্য প্রভু। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ব্বের ৯৫ পচানব্বই পত্র হইতে এক সত দশ পত্র পর্যন্ত-একুনে ১৬ শোল পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্রীমহারাজা-হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন—সন ১০৮৯ (?) তাং আস্বী(?)ন সন ১০৮৯ (?) তাং অগ্রহায়নে শুংকৃষ্ণপঞ্চানন কৃষ্ণ সন্দর্ব। ১৬ পত্র দাখিল হইল।"
>
> [ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের পাঠ]

১. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২৩৩-৩৫।
২. প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১২।
৩. বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড, বাঙলাদেশ সং), পৃঃ ৫২ ৫৩।
৪. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২৩৪।২৮২।

এটি মল্লাব্দ হলে ১০৮৯+৬৯৫=১৭৮৪ খ্রীঃ।

আর বঙ্গাব্দ হলে ১০৮৯+৫৯৩=১৬৮২ খ্রীঃ।

পড়বার জন্যে, পাঠ মেলাবার জন্যে কিংবা প্রতিলিপি তৈরীর জন্যে রাজগ্রন্থাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামের পুথি নেয়া হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে।

এ রসিদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি সম্পর্কিত নয়। এ বিষয়ে ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে আচার্য প্রভু হচ্ছেন শ্রীনিবাস আচার্য, ইনি বিষ্ণুপুর রাজ হাম্বীর ও তাঁর পুত্র ধাড়ি হাম্বীরের গুরু ছিলেন। আচার্য শ্রীনিবাস বৈষ্ণবীয় বিধিমার্গের প্রচারক এবং বৃন্দাবনের গোস্বামী রচিত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচারক। রসিদোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণসন্দভ' জীব গোস্বামী রচিত ষড়সন্দর্ভের অন্যতম।[১] কাজেই রসিদসূত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দভ' বলে যে অনুমান করেছিলেন[২] তা' যথার্থ হয়নি।

তবে বিষয়ানুসারে যদি কাব্যের নতুন নাম রাখতেই হয়, তা হলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চেয়ে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'[৩] বা 'রাধা-কৃষ্ণের ধামালী' নামই হবে বাঞ্ছনীয়। কেবল ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নন, ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ গ্রন্থকে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দভ' নামে আখ্যাত করতে আগ্রহী।[৪]

কবির নাম

কবির নাম নিয়েও নানা বিতর্ক চলেছে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৪০৩টি ভণিতা মেলে। এর মধ্যে ২৮৯টিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ১০৭টিতে, শুধু 'চণ্ডীদাস' এবং সাতটিতে 'অনন্ত' বা 'আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস' রয়েছে। বড়ু ও বাসুলীর কোনটাই নেই তেমন ভণিতা রয়েছে পাঁচটি মাত্র। ১ম সংস্করণের 'ভুতি কৈল চণ্ডীদাস গাএ' (পৃঃ ২৩৬), 'তোলহ রাধাকে বড়ায়ি গাইল চণ্ডীদাসে (৩৮৭), 'জিআঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে (৩৮৬), 'তথাঁ কাহ্নাঞি (বসে) গাইল চণ্ডীদাসে (৩০৭), 'আনি দেহ

১. (ক) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, পৃঃ ১৩৬-৩৯।
(খ) বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ১।৩ সং, পূর্বার্ধ পৃঃ ৪৩২-৩৩।
২. (ক) বাঙলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ), পৃঃ ৪০।
(খ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬০ সন, পৃঃ ৩৩।
৩. আমরা আগেই এ নাম অন্যত্র স্বীকার করেছি, বিচিত চিন্তা, বাঙলা সাহিত্যের খসড়াচিত্র।
৪. (ক) বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ডক্টর অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।
(খ) বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড ৩য় সং), ২৮৭ পৃঃ ১২৬।

এবে কাহ্নাঞি গাইল চণ্ডীদাসে' (৩৭৪)। ছন্দের প্রয়োজনেই বড়ু বা বাসলী যোগ করা যায়নি। যেমন—ছন্দের প্রয়োজনেই কবি স্বনাম 'অনন্ত' বসিয়েছেন অন্য সাতটি ভণিতায়।[১] ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার এসব পদের প্রাসঙ্গিকতা ও পূর্ববর্তী পদগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিও ব্যাখ্যা করেছেন! কাজেই সুকুমার সেন প্রমুখের মতো এ পদগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করার কারণ নেই।

৭টি অনন্ত ও আনন্ত ভণিতা এরূপ:

১. আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ (পৃ: ৫৬)

২. অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল (পৃ: ৬১)

৩. গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে (পৃ: ৬২)

৪. অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল (পৃ: ২১৩)

৫. আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে (পৃ: ৩২৪)

৬. গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে। (পৃ: ৩৪১)

৭. অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে। (পৃ: ৩৪১)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে "কবির প্রকৃত নাম 'অনন্ত'। তাঁহার কৌলিক উপাধি বড়ু। চণ্ডীদাস তাঁহার দীক্ষা গ্রহণান্তর গুরুদত্ত নাম। তাঁহার কি জাতি ছিল—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়।"[২] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সম্পাদকও বলেন পশ্চিম রাঢ়ে গোয়ালা, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির মধ্যেও বড়ু পদবী প্রচলিত। সুকুমার সেনেরও এই মত।[৩] তিনি এমনও অনুমান করেন যে নীচ জাতির নারীর সঙ্গে প্রেম করে সমাজে পতিত হয়ে কবি বটু বা বড়ু হয়েছেন।[৪] তাঁর সর্বশেষ মত—'বটু' 'দেউলে'র সেবাপূজার কোন ভারপ্রাপ্ত সেবক।[৫]

চণ্ডীদাস সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করেছেন। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থই কেবল সংস্কৃত জানত। চণ্ডীদাস বাসলীর 'গণ' বা সেবক; কাজেই ব্রাহ্মণ হওয়ারই কথা। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন 'কায়স্থ' মনে করাই অধিকতর সঙ্গত। কেননা গ্রন্থকার

১. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ: ২৩৫-৩৮।

২. বাঙলা সাহিত্যের কথা (১৩৭৪ সন সং), পৃ: ২৬, ৪৭।

৩. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ ৩য় সং), পৃ: ১৩৪।

৪. ঐ, পৃ: ১৩৬।

৫. প্রবন্ধ বিচিত্রা (৪র্থ সং)।

কোন স্থানে নিজেকে দ্বিজ বলেন নাই।[১] অবশ্য শ্লোকগুলো পরবর্তী কোন পণ্ডিত পাঠকের সংযোজনও হতে পারে। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও বলেন, "কবির প্রকৃত নাম অনন্ত—'চণ্ডীদাস' তাঁর উপাধি মাত্র।"[২] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে "বাসুলীর গ-ণ (সমূহ, পরিচয় সমূহ) ছিল, কবি সে গণের এক বড়ু ছিলেন।[৩] ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, "সংস্কৃত বটু হইতে বড়ু শব্দের উৎপত্তি·· ভাগবতে (১২/৩/৩৩) আছে যে কলিতে 'অব্রতাবটবোহ শৌচাঃ' অর্থাৎ বটুরা, ব্রহ্মচারীরা ব্রতবিহীন ও শৌচবিহীন হইবেন।"[৪] অতএব 'বটু' মানে ব্রহ্মচারী।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন কবি 'বড়ু শ্রোত্রীয়' ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে নিজেকে বড়ু চণ্ডীদাস বলেছেন।[৫] আমরা বাসলী মন্দিরের 'সেবক' অর্থেই পদ-পরিচায়ক 'বড়ু' ব্যবহৃত বলে ধরে নিলাম।

বাসলী

কবির ভণিতায় 'বাসলী বন্দী' 'বাসলীগণ', 'বাসলী গতি', 'বাসলী আয়ী', বাসলী বরে, 'বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ।' প্রভৃতির মাধ্যমে বাসলী ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এ বাসলী, বাশলী, বাশুলী কে ?—সম্প্রতি সবাই বাশলী বা বাশুলী চণ্ডীর অপর নাম বলেই মেনে নিয়েছেন। কেননা পদ্মলোচনের বাসলী-মাহাত্ম্যে, কিংবা বাসলীমঙ্গলে চণ্ডীমাহাত্ম্যই বর্ণিত। এমনকি ছাতনার বাসুলী মূর্তিও দ্বিভুজা চণ্ডীই। ধর্মপূজা বিধানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাপ্ত বাশুলীর ধ্যানমন্ত্রটিও মূলত চণ্ডীর। তবে তন্ত্রযানী-বজ্রযানী বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে তারা ব্রজেশ্বরী, বিশালাক্ষী বৎসলা বা বাসলী যে বৌদ্ধজ দেবতা ব্রাহ্মণ্য সমাজে চণ্ডীনামের আবরণে আত্মরক্ষা করেননি তা' নিশ্চিত রূপে বলা যাবে না। ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্তই নেপালে বৎসলা দেবীর সন্ধান পেয়েছিলেন। বজ্রেশ্বরী কিংবা বৎসলা ঐতিহ্য-বিস্মৃতির ও উচ্চারণ বিকৃতির ফলে বাসলী এবং পরে বাশুলী হতে বাধা নেই। আর বিশালাক্ষীই যে বাসলী তা তো স্বীকৃত।[৬] আঠারো শতক থেকেই 'বিশালাক্ষী' সম্ভবত 'বিষাল

---

১. বাঙলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ২৭।
২. বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পৃঃ ৫৬।
৩. পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪২ খণ্ড ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২৫।
৪. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২৬৩।
৫. বাংলা সাহিত্যের পরিচয় সময়, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৬ উদ্ধৃত।
৬. পুথি পরিচয়, পঞ্চানন মণ্ডল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১।

আঁখি'-র সংস্কৃত রূপে বৌদ্ধ যুগের তারা-মনসাই হয়তো চণ্ডী বা সরস্বতীর আব-রণে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মরক্ষা করেছেন। ধর্মপূজারীদের মতে বাসলী কখনো চামুণ্ডা, কখনো মনসা সহচরী, কখনো বা যোগিনী।[১] সুতরাং চণ্ডীদাস সেবিত বাসলী যে তখন চণ্ডীরূপিণী তাতে সংশয় নেই, তাই ভণিতায় মূর্তির ডাকনাম বাসলী হলেও, মূলত চণ্ডীদেবী বলেই তিনি চণ্ডীদাস। বিশেষত বড়াই রাধাকে চণ্ডীপূজার কথা বলেওছে, অবশ্য যোগের ও যৌগিক ধ্যানের কথাও আছে, হরগৌরীও আছেন। নিদ্রালি মন্ত্রেরও প্রয়োগ আছে। যেমন—'বড় যত্ন করিআ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ।/তবেঁ তার পাইবে দরশনে (পৃঃ ৩৮১)। রাধার বচন শুনি মহামুনি/বাসলী বন্দিলা যোগ ধ্যানে/(পৃঃ ৩৭৬) বাঁশী পাইল হরগৌরী বরে/(পৃঃ ৩১৪) নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আহ্মি (পৃঃ ৩১০) যোগিনী রূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ (পৃঃ ৩১৮)। এতে মনে হয় চণ্ডীদাস যোগতন্ত্রে আস্থাবান শাক্তই ছিলেন। তবে ভক্ত বৎসলা দেবী হিসেবেই বৌদ্ধ বৎসলা দেবী চণ্ডীদেবীতে পরিণত হয়েছেন—এ সন্দেহ নেপালী সূত্রে নয় শুধু, চণ্ডীদাসের তান্ত্রিক সহজ সাধনার তত্ত্বজ্ঞান থেকেও দৃঢ় হয়।

কাহিনী মূল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীমূল যে লোকায়ত ও লৌকিক তাতে সন্দেহ নেই। তাই অপৌরাণিক উৎস প্রথমেই দেখতে পাই। 'ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে' নারায়ণের এক গাছি চুল থেকে কংসাসুরের বিনাশের জন্যে কৃষ্ণ অংশ-অবতার রূপে নর জন্ম গ্রহণ করেন। বলরামের উদ্ভব সাদা চুল থেকে। এখানে কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্যে রাধা লক্ষ্মীর অবতার। পিতামাতার নাম সাগর ও পদুমা। কাহ্নাঞির সম্ভোগর কারণে/লক্ষ্মীক বুলিলোঁ দেবগণে/আল রাধা পৃথিবীতে কর আবতারে/তে কারণে পদুমা উদরে উপজিলা সাগরের ঘরে (পৃঃ ৬)। রাধা কৃষ্ণের মামী-ভাগ্নে সম্পর্কও লৌকিক সূত্রে পাওয়া। অবশ্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আইহণ যশোদার সহোদর বলে উল্লেখিত।

রাধা-কৃষ্ণলীলায়ও কবি হর-গৌরী, যোগ, ধ্যান ও তান্ত্রিক সহজসিদ্ধির মাহাত্ম্য প্রচারে উৎসাহী। এখানে রাধারই অপর নাম চন্দ্রাবলী/অহোনিশি যোগ ধেআই/মন পবন গগনে রহাই/মুল কমলে কয়িলে মধু পান/এবে পাইএা আহ্ম ব্রহ্ম জ্ঞান/ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না সন্ধি/মন পবন তাও কৈল বন্দী/দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট/এবেঁ চড়িলোঁ

১. পুথি পরিচয়, ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল, ৩য় খণ্ড, ভূমিকা পাদটীকা পৃঃ ১৬।

যো সে যোগবাট। কাজেই কাহিনীমূল ও কাহিনী নিতান্ত কাব্যবস্তু হিসেবেই পাচ্ছি; বৈষ্ণবভক্তি-প্রসূত লীলা স্মরণ নয়। সুখময় মুখোপাধ্যায় ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছেন যে, বাঁকুড়া জেলার কাঁঠালি পাড়া গাঁয়ে এখনো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ঢঙে 'কৃষ্ণ যাত্রা' অনুষ্ঠিত হয় এবং তার প্রধান চরিত্র রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই।[১]

কবি পরিচিতি

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' অতি মূলবান কয়েকটি অনন্যতা আবিষ্কার করেছেন:[২]

১. ক. বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় কোনও স্থানে 'দ্বিজচণ্ডীদাস বা 'দীন' চণ্ডীদাস নেই।

খ. সর্বত্র 'গাএ' বা 'গাইল' আছে, কোথাও ভণে, 'কহে' (বাসলী আদেশে ভণে) প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নেই।

গ. ভণিতা কখনো উপান্ত চরণে হয় না।

২. রাধার পিতা-মাতার নাম সাগর ও পদুমা।

৩. রাধার কোন শাশুড়ী, ননদ বা সখীর নাম নেই।

৪. বড়ায়ি ভিন্ন কোন সখীকে সম্বোধনও করেন নি।

৫. এখানে 'চন্দ্রাবলী' রাধার নামান্তর, প্রতিনায়িকা নন।

৬. বড়ু চণ্ডীদাস সর্বত্র প্রেম অর্থে 'নেহ' বা নেহা' ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল চার স্থলে 'পিরীতি' শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তার অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ।

৭. 'বড়ু চণ্ডীদাস কুত্রাপি শ্রীমতি রাধিকার বিশেষণ বিনোদিনী এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'শ্যাম' ব্যবহার করেন নাই।

৮. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধিকা গোয়ালিনী মাত্র, রাজকন্যা নন'।

৯. 'বড়ু চণ্ডীদাসের নিকট ব্রজবুলি অপরিচিত।'

১০. 'বড়ু চণ্ডীদাসে সখীকে সম্বোধন করে কোন পদ রচিত নাই।' [এ সঙ্গে দান, নৌকা ও যমুনা খণ্ডে ১৯ বার রাধা-কৃষ্ণের মামী-ভাগনে সম্পর্কের দোহাইও উল্লেখ্য]

১. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পৃঃ ৮৯।

১১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাইরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নেই। বড়ু চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত কবিতা হিসেবে পদাবলী রচনা করেন নি।[১]

১২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষার ব্যাকরণে এমন কতকগুলি প্রাচীনত্বের লক্ষণ আছে, যাহা মধ্যযুগের কোন কাব্যে পাওয়া যায় না। এই বিশেষত্বের মধ্যে উত্তম পুরুষের এক বচন ও বহু বচনের দুই পৃথক রূপ, যেমন এক বচনে মোএঁ (মোঞ্ঁ মোঞেঁ), চলোঁ, চলিলোঁ, চলিবেঁ, চলিতোঁ। বহুবচনে আহ্মে (আহ্মি), চলি (চলিএ), চলিল, চলিব, চলিত। উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞায় 'ইউ' প্রত্যয়, যথা করিউ। স্ত্রীলিঙ্গ কর্তার অকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালে স্ত্রী প্রত্যয়, যেমন রাহী, গেলী, বাড়ায়ি চলিলী। ইহাতে দের, দিগকে, দিগের এবং করণ কারকে 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ নাই।'

১৩. 'বাশুলী আদেশে কহে' এরূপ ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাস ব্যবহার করেন নাই।'[২]

১৪. 'বৃষভানু সুতা' ব্যবহারও বড়ুর নয়।[২]

এ ভাষার সঙ্গে উড়িয়ার কিছু মিল[৩] এবং আসামী ভাষার সাদৃশ্য[৪] আছে। ডক্টর সুকুমার সেন সম্প্রতি এ ভাষা বাঁকুড়া-ধলভূম-মানভূমের বুলির প্রভাবজ বলে এবং বাঙলা প্রত্যয় যোগে আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার দেখে এ ভাষার প্রাচীনত্বে গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁর মতে :

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়েকটি আরবী-ফারসী শব্দ আছে...এমন দুইটি শব্দ আছে (মজুরী ও মজুরিয়া) যাহা ফারসী শব্দে বাঙলা প্রত্যয় যোগে গঠিত।

২. 'এই গ্রন্থের অনেক পদের শেষ অক্ষরে অল্পপ্রাণ ও 'হ'-কার মিলিয়া মহা-প্রাণে পরিণত হইয়াছে। যেমন লইবেহে > লইভেঁ, তোহ্মাকোহো > তোহ্মাখো। এই ব্যবহার (?) আধুনিক কালে বাঁকুড়া-মালভূম-ধলভূম অঞ্চলের ভাষায় লক্ষণীয়, উড়িয়া ভাষাতেও আছে।'

৩. 'মহাপ্রাণ নাসিক্যের ব্যবহার সর্বত্র প্রাচীন প্রয়োগ অনুযায়ী নয়...অস্থানে নাসিক্য স্বরধ্বনির অযথা প্রাচুর্য প্রাচীনত্বের চিহ্ন মোটেও নয়। বাঁকুড়া-মানভূম-ধলভূমের ভাষার ইহা একটি প্রধান গুণ।'

৪. 'রহিলছে' ('ফুটিলছে'ও) প্রাচীনতার দ্যোতক। তবে এর মতো "মানভূম অঞ্চলের উপভাষায় 'রলছে, গেলছে, হলছে রীতিমত পাওয়া যায়।"

---

১. ক. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৩ ও ১৩৬০ সন।
   খ. বাঙলা সাহিত্যের কথা, মধ্যযুগ : পৃঃ ৪১।
২. ক. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০ সন।
   খ. বাঙলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ) পৃঃ ৪৩।
৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১) পূর্বার্ধ ৩য় সং, সুকুমার সেন, পৃঃ ১৩১।
৪. বাণীকান্ত কাকতি, সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়।

৫. এই ভাষায় "সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হইতেছে স্বরসঙ্গতিময় এখুনি, চুরিনী ইত্যাদি।"[১]

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারেরও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' প্রাচীনতা সম্বন্ধে তিনটি আপত্তি: ক. যমুনার পরিবর্তে ভাগীরথীর উল্লেখ, 'আছে' ক্রিয়া পদের ব্যবহার এবং খ. বিরহ খণ্ডের 'ভাবগত অসংলগ্নতা আর গ. 'বিরহ' অংশ বিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধ বয়সে রচিত[২] বলেই তাঁর ধারণা। অন্যেরাও কৃষ্ণের 'শ্রীনিবাস' নামের বহু ব্যবহার, বিষ্ণুলোককে বিষ্ণুপুর বলা, নন্দ বা যশোদানন্দনকে রঘুনন্দন বলার মধ্যে চৈতন্যোত্তর যুগের প্রভাব ও নিদর্শন দেখেন।

ডক্টর সুকুমার সেন সম্প্রতি যা বলেছেন, আপাতত তাতে যুক্তি আছে মনে হলেও বাঁকুড়া-মানভূম-ধলভূম অঞ্চলের ভাষার 'পাঁচশ' বছর আগের লিখিত রূপের সঙ্গে যদি বুলির ঐক্য থেকেই থাকে তা' হলে বুলিতেই প্রাচীন রহিলছে> রলছে, গয়িলছে>গেলছে, হইলছে>হলছে হয়েছে বলে মেনে নেওয়া সঙ্গত। তেরো শতকে তুর্কীর দখলে এল যে-দেশ, সে দেশে শাসকের দরবারী, প্রশাসনিক কিংবা ব্যবহারিক কিছু শব্দ দেড়শ'-দুশ' বছরে আমাদের হাটে-ঘাটে, মাঠে-বাটে নিত্য ব্যবহারের মধ্যে আসা আশ্চর্য কি? কেবল বাণিজ্য করতে এসেই পর্তুগীজরা কত য়ুরোপীয় শব্দই আমাদের ভাষায় রেখে গেছে, এই বাঙলা দেশেই ইংরেজ প্রত্যক্ষভাবে রাজত্ব করেছে ১৭৭০ সনের পরে! উনিশ শতকের গোড়াতেই অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই অসংখ্য ইংরেজী শব্দ লোক ব্যবহারে এসেছে। কাজেই 'মজুরী' ও 'মজুরিয়া'র বাঙলা প্রত্যয় যুক্ত ব্যবহার দেখেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে অর্বাচীন বলা চলে না।

ভাষার বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণ বাক্‌যন্ত্রের গঠনানুযায়ী সন্ধি-সমাসে যেমন পরিবর্তিত হয়, শারীরিক অসামর্থ্য, অজ্ঞতা ও আবহাওয়ার প্রভাবেও তেমনি স্থানে ও কালে উচ্চারণ বিকৃত বা বিবর্তিত হয়। বৈদিক ভাষার বিভিন্ন স্থানিক ও কালিক বিবর্তন ধারায় তা' স্পষ্ট। কাজেই কোথাও যদি বুলির প্রভাবে কিংবা বিভিন্ন স্থানের ও কালের লিপিকরের নিজের উচ্চারণের প্রভাব অনুলিপিতে পড়ে, তাতে কবির আবির্ভাব কাল বদলায় না। গায়েন ও লিপিকর পরম্পরায় তাই একই গ্রন্থে প্রাচীন ও অর্বাচীন বিভক্তিযুক্ত পদ মেলে—দেন্ত>দেউ, গেলান্ত>গেলা, করিবাক>করিতেঁ, জায়িবাক>জায়িতেঁ প্রভৃতি। আবার একই শব্দের বানানেও বিভিন্ন রূপ মেলে। কাজেই এ কালের এখুনি, আগুয়াল, গাঁথুনি, বাগুলী, বাঁশুরি, আদুরী প্রভৃতি স্বরসঙ্গতিমূলক বিবর্তন উচ্চারণসৌকর্যের জন্যে অজ্ঞ মানুষের বুলিতে

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১/ পূর্বার্ধ/৪ সং), পৃঃ ১৩৫-৩৭।
২. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য।

হয়তো প্রাচীন কালে ছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আমরা লিখিত রূপে পাচ্ছি এ-ই যা'। একই কারণে নাসিক্য উচ্চারণের গ্রহণ-বর্জন হতে পারে। পূর্ব বঙ্গের ভাষায় নাসিক্য প্রায় থাকেই না। পূর্ববঙ্গে মহাপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ শব্দের নানা স্থানে অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ হয়ে গেছে। কুমিল্লা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে খায় নাই, করে নাই প্রভৃতি খাইছে না, করছে না রূপে ব্যবহৃত। এগুলো হচ্ছে প্রাচীন রূপের বিকৃত অনুবর্তন।

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার নিজেই ভণিতাদি পরীক্ষা করে বলেছেন যে 'রাধার বিরহ'-ও বড়ু চণ্ডীদাসেরই রচনা, খণ্ডের উল্লেখ নেই বলে এটিকে বিচ্ছিন্ন রচনা ভাবা চলে না। 'বিরহ' তো নায়ক বিহীন একতরফা বিলাপ। তাই খণ্ড বলা হয়নি। কারণ রাধা-কৃষ্ণ প্রেম বা কাম, বিরহ বা বিচ্ছেদ ছাড়া সমাপ্ত হতে পারে না। সদ্য অনুরাগিণী রাধাকে ছেড়ে বীতরাগ কৃষ্ণ যদি দূরে সরে থাকে, তা' হলে বিচ্ছেদের কান্না ছাড়া রাধার আর কি থাকে। তাই 'বিরহ' বর্ণনায় কাব্য বা গীতিনাট্য সমাপ্ত। এটি পরবর্তী রচনা নয়। ভাগীরথী, আছে, শ্রীনিবাস, বিষ্ণুপুর, রঘুনন্দন প্রভৃতি লিপিকর প্রমাদপ্রসূত বলেই আমাদের বিশ্বাস।

কাব্যের স্বরূপ

এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি তাতে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, কাহিনী, ভাব ও ভাষা কোনটাই চৈতন্যোত্তর যুগের রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক রচনার মতো নয়। এতে বৈষ্ণব তত্ত্ব নেই, প্রেম নেই, চৈতন্যোত্তর যুগের ভাষাও নেই—'অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আসে' (পৃঃ ৭৪, ১০৩, ১২৭, ১৮৫, ১৯১)। এটি লোকগীতি-নাট্য ভিত্তিক রচনা—বড় জোর 'রতি সম্ভোগ কাব্য'। কথকতা ভিত্তিক কাঠামো রয়েছে বলেই এতে মাত্র কয়েক দিনের কয়েকটি ঘটনাই বিবৃত। মহাকাব্যের আঙ্গিক থাকলেও এতে কাহিনীগত বিস্তৃতি নেই। কথকতা ভিত্তিক রচনা বলেই এ কাব্যে কালগত ও স্থানগত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে। কবি সম্ভবত নিজেও গায়ক ছিলেন। তাই সর্বত্র 'গায়' 'গাইল' আছে, কোথাও 'কহে' বা 'ভণে' নেই। অজ্ঞ অসর্তক গায়েন না হলে, লিখিত রচনায় কবির হাতে অকুস্থানগত মারাত্মক অসঙ্গতি থাকত না। ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় 'তাম্বুল' থেকে 'ছত্র' খণ্ডে এবং শেষার্ধে এ অসঙ্গতি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। একাহিনী কথকতারই অবলম্বন ছিল। বহুল চর্চার ফলে বহু মন ও মুখের পরিচর্যায় এর গীতিনাট্যরূপ সুষ্ঠু ও রসঘন হয়ে উঠেছিল। ছত্রখণ্ড অবধি রাধা বারো বছর বয়স্ক বালিকা, স্থানে কালেও কিছুটা অসঙ্গতি রয়েছে। মনে হয় এগারো থেকে চৌদ্দ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে রাধা তিন

বছরের কাল পরিসরে যমুনা খণ্ডে যুবতী। কিন্তু এ তিন বছরে ঋতু আছে সুখ্যাত বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। অথচ কাব্যের ঘটনাগুলো কয়েক দিনের মাত্র। প্রতিভাবান শাক্ত কবি বড়ু চণ্ডীদাস এ বিভ্রান্তি সত্ত্বেও ভাবে ভাষায় ও রসে মাধুরী মণ্ডিত করে লিখিত রূপ দিয়েছেন গাথাটিকে। এবং সাধারণ পাঠকের কাছে এ নাট্য সুবিন্যস্ত বলেই মনে হয়। এটি যে গায়েনের কথন ভিত্তিক রচনা তার বড় প্রমাণ রয়ে গেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্বাঙ্গে : ঘটনার ও উক্তির পৌনঃপুনিকতা, অশ্লীল গ্রাম্য ঝগড়া ও গালাগাল, অনবধানতা জাত তথ্যগত অসঙ্গতি, রাধার, বড়াইর কিংবা কৃষ্ণের পূর্ব ঘটনার ও উক্তির ঘনঘন বিস্মৃতি কিংবা নিঃসংকোচ মিথ্যা ভাষণ, রাধার বয়সগত অসঙ্গতি, রাধার দৈ বেচা, রাধার কৃষ্ণের সঙ্গে নন্দের ঘরে লালিত হওয়া (পৃঃ ৫০), অথচ সে সঙ্গে বড়াইর মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের নব পরিচয় প্রভৃতি মৌখিক রচনার সাক্ষ্য। বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন কিনা, শ্লোকগুলো তাঁর রচনা কিনা বলা যাবে না। বলেছি, শ্লোকগুলি পরবর্তী যোজনা বা প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। তবে চণ্ডীদাস যে সৃজনশীল কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। তাঁর রুচি ও রসবোধ গায়েনসুলভ এতো স্থূল ও কামসর্বস্ব হওয়ার অন্য কোন কারণ ছিল না—লোকরঞ্জক যৌনতা সর্বস্ব লোকগীতি ভিত্তিক বলেই এবং নিজেও গায়েন ছিলেন বলেই কাব্যে অলঙ্কারশাস্ত্র সম্মত রসবিন্যাস তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যৌনতা-দুষ্ট উক্তির পৌনঃপুনিকতার মূলে রয়েছে গ্রাম্য লোকের মনোরঞ্জন প্রয়াস। তাম্বুল খণ্ডে (১ম সং পৃঃ ২৮) এ কাব্যের বর্ণিতব্য বিষয়সার বা সূচীও রয়েছে। প্রেম নয়—লম্পট সুলভ ছলা কলার আশ্রয়ে রাধা-সম্ভোগই কৃষ্ণের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ কাব্যে কোন নীতি আদর্শ বা প্রতিপাদ্য বিষয় নেই। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মন্তব্যে আমাদের ধারণার পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে "কাব্যখানি গ্রাম্য শ্রোতার জন্যে, কৃষ্ণ বা রাধা তাহার উপাস্য নহে। দ্বিতীয়ত কবি বৈষ্ণব নহেন...সে যুগে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবল ছিল, কবি অনন্ত বড়ু এ ভেদ বুদ্ধি প্রসূত কৃষ্ণের চরিত্র বিকৃত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন কিনা বলা যায় না। কবির কৃষ্ণ কামুক, কপট, মিথ্যাবাদী অতিশয় দাম্ভিক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ।"[১]

অসঙ্গতির নমুনা

অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, ছত্রখণ্ড অবধি রাধা বারো বছর বয়স্কা বালিকা। স্থান কালেও রয়েছে অসঙ্গতি। কাব্যে রাধার বয়স এগারো থেকে

১. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২৫৪।

স্থানে স্থানে চৌদ্দ। তিন বছরের সময় পরিসরে রাধা যুবতী। তিন বছরের কাল পরিসরে ঋতু আছে মুখ্যত তিনটি—বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা। রাধার বয়সের হিসেবে ঘটনা তিন বছরের হলেও কাব্যের ঘটনাগুলো কয়েকদিনের মাত্র। স্থানের কালের এবং রাধার, কৃষ্ণের ও বড়াইর উক্তির মধ্যেও অসামঞ্জস্য-অসঙ্গতি প্রচুর। যেমন—

বয়সে অসঙ্গতি

১, এগার বরিষে কাহ্নাঞি বার নাহি পুরে (পৃঃ ৩৫,৪৫ ৫৮)
এগার বরিষ মোর তের নাহি পুরে। (পৃঃ ৭০)
২. দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর (পৃঃ ৯৬)
এহি মথুরা নগরে যাঁও বারহ বৎসর (পৃঃ ১২৬)

কথার অসঙ্গতি

১. হেন মতে নিতি নিতি মথুরা নগরে
দধি দুধ বিকিনিআঁ রাধা আইসে ঘরে (পৃঃ ২৯)
২. ঘরত বাহির নহুঁ বড়ায়ি গো।
স্বামীর বড়ই দুলালী। (পৃঃ ৬২)

তথ্যগত অসঙ্গতি

এক ঠাঁই বাঢ়িআহোঁ নান্দের ঘরে।
চণ্ডাল কানাঞি এবে বল করে ॥

ক. দান দেয় (পৃঃ ৫১), খ দান দিতে হয় না (পৃঃ ৩৬, ৫৯) দান গ্রহণ করলে কংস শাস্তি দেবে - এ কথা রাধা আঠারো বার বলেছে (পৃঃ ৩৯, ৪২, ১২৫, ১২৬), গ. রাধা বালিকা বলে সম্ভোগের অযোগ্য—এ কথা রয়েছে তেরো বার (পৃঃ ৪৬, ৪৫, ৪৬…১৫৯, ২৮১) ঘ. অথচ দান, নৌকা, বৃন্দাবন, যমুনা ও বাণখণ্ডে রতিভোগের কথা রয়েছে (পৃঃ ৩৮, ৯৪, ১০৫, ১১২) এবং স্পষ্টত আছে পাঁচ বার (পৃঃ ১৩৩-৩৫, ১৬২, ২২৯-৩০ ২৫৫, ২২৯,) কিন্তু সম্ভোগের মুহূর্তে প্রতিবারই বলছে তার কৌমার্য এখনো রয়েছে, কেউ লঙ্ঘন করেনি, চ. রূপ যৌবনের কথা বলেছে চারবার (পৃঃ ৫২,৭৮, ৮৮, ১০০), ছ. মুখ-চোখ-নাক-স্তন-নিতম্ব ও জংঘার বর্ণনা একই ভাষায় পুনঃপুনঃ মেলে (পৃঃ ৩৪, ৪৮, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৬৮, ৬৯, ১৩২) জ. ঝগড়া ও অশ্লীল গালাগাল মেলে অন্তত দশ বার (পৃঃ ৫১,৮৩, ৯০,

১৩২, ১৫০, ১৮৩, ৩১৯, ৩২২, ৩৭১) এবং 'অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে'—কৃষ্ণ স্পষ্টত ঘোষণা করেছে। ট. রাধা-কৃষ্ণের এ লীলা রাধার এগারো বছর বয়সে শুরু এবং চৌদ্দ বছর বয়সে শেষ (পৃ: ২৭৭)।

নন্দনশাস্ত্রীয় ত্রুটি

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নন্দনতত্ত্ব যে লঙ্ঘিত হয়েছে কালিদাস রায়ও তা' স্বীকার করেছেন: "সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, এইরূপভাবে কামের চরিতার্থতায় রসসৃষ্টি হয় না। প্রকৃত রতিভাবকেই রসে উত্তীর্ণ করা চলে, এইভাবের মধ্যে একজনের এইরূপ আন্তরিক বিরাগ বা বিমুখতা থাকিলে আদি রসের কাব্যও হয় না।"[১] তাই একাব্য মহাকাব্য, গীতিকাব্য, গীতিনাট্য নয়—এ নিছক ধামালীর পরিশীলিত রূপ। রাধা-সম্ভোগই এর একমাত্র উদ্দেশ্য, কোন নীতি আদর্শ বা প্রতিপাদ্য তত্ত্ব নেই এ কাব্যে। অতএব নির্লক্ষ্য কামচর্চার এই কাব্য কোন মতেই চৈতন্য-আস্বাদিত কাব্য হতে পারে না, তা যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রমুখ অনেকেই স্বীকার করেছেন। এজন্যেই এর জনপ্রিয়তাজাত প্রচারও চৈতন্যো-ত্তর যুগে বন্ধ হয়ে যায়। এটি স্পষ্টত রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ববিরোধী রচনা। তবে কাব্যকলা বোঝানোর জন্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সনাতন গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণবতোষিণী' তে (১৫৫৪ -৫৫ খ্রী:) "শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারশ্চজ্ঞেয়া,"—উক্তিতে এই বড়ু চণ্ডীদাসকেই যে উল্লেখ করেছেন, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করা অসঙ্গত। এজন্যে 'সাহিত্যদর্পণ' রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজের খুল্লপিতামহ ও দান-নৌকাখণ্ড প্রণেতা চৌদ্দশতকের চণ্ডীদাসের সন্ধান আপাত যৌক্তিক হলেও নিরর্থক।[২]

পুথির লিপিকাল

রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সবাই বলেন, পুথিতে তিনজন লিপিকরের হস্তাক্ষর রয়েছে:

১. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন ছাঁদের লিপির কাল ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবত খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হয়েছিল।[৩]

১. প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১২।
২. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ: ২৮৩।
৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা।

২. যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে—"পুথিটি ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে লিখিত, বরং পরে, পূর্বে নয়।'[১]

৩. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৪৬৭ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত এক বিষ্ণু পুরাণের পুথির লিপির তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি প্রাচীনতর বলে মনে করতেন। তাঁর মতে ১৪৬৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল।[২]

৪. রাধা গোবিন্দ বসাক ১৪৫০—১৫০০ খ্রীস্টাব্দ বলে বিশ্বাস করেন।[৩]

৫. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতম লিপি সম্ভবত ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের।[৪]

৬. সুকুমার সেন আগে মনে করতেন, পুথিটি ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে লিখিত। সম্প্রতি বলেন: "কালি অত্যন্ত জলো এবং কাগজ অত্যন্ত অর্বাচীন; পাতলা এবং প্রায় যেন কলে তৈরী। আমার সুনিশ্চিত অভিমত যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের দিকে লেখা হইয়াছিল।"[৫] "পুথির কালি ও কাগজ দেখিয়া বোঝা যায় যে, পুথির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ।[৬]... "কাগজ পাতলা মাড়ের তৈয়ারি, ঠিক্ যেন মিলের কাগজ। এরকম কাগজে লেখা পুথি বা দলিল অষ্টাদশ শতকের আগে দেখি নাই। উনবিংশ শতাব্দে যথেষ্ট দেখিয়াছি। কালিতেও প্রাচীন পুথির কালির মত গাঢ় উজ্জ্বলতার চিহ্ন মাত্র নেই। আমার নিশ্চিত অভিমত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধ।— শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরোনো ছাঁদের মতো অক্ষর অষ্টাদশ শতাব্দের পুথিতে অনেক দেখিয়াছি।[৭]" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে প্রথম প্রকাশক সম্পাদক রাধিকা নাথ দত্ত ১৪০৫ শকে বা ১৪৮৩-৮৪ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত পুথি মণ্ডের তুলট কাগজে লেখা বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই মণ্ডের হলেই অর্বাচীন হয় না।

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা: ১৩৪২ সন।
২. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়-এ উদ্ধৃত।
৩. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা: ১৩৪২ সন।
৪. বাংলা সাহিত্যের কথা: ১ম খণ্ড, মধ্যযুগ পৃ: ৪৯।
৫. বিচিত্র সাহিত্য: ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃ: ২১।
৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ৫ম সং, পৃ: ২১।
৭. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৩য় সং, পৃ: ১২৯-৩০।

৭. সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন : "পুথির ২১৭ ও ২২২ পত্রে দুই ছাঁদেরই লিপি আছে। আর এ পুথির সমস্ত পাতাই এক রকমের ও এক সময়ের। — পুথি অত প্রাচীন নয়।[১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির মধ্যে যে রশিদ মিলেছে, তার সন ১০৮৯, তারিখ যথাক্রমে ২৬ আশ্বিন ও ২১ অগ্রহায়ণ। এ যদি বঙ্গাব্দ হয় তা হলে ১৬৮২ এবং মল্লাব্দ হলে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ হয়। সুকুমার সেন মল্লাব্দ বলেন, কিন্তু অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গাব্দ বলে দাবী করেন।

তুলোট কাগজের গুণগত রূপ দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও কালগত রূপ দুর্লক্ষ্য। বহু ব্যবহৃত পুথির পাতার রঙ এবং স্বল্প বা অব্যবহৃত বাঁধা পুথির রঙে পার্থক্য ঘটে। স্থানিক আবহাওয়ার গুণেও আয়ু ও রঙের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আর লিপিকাল সম্বন্ধে বিচারও কখনো নির্ভুল হয় না, হবে না। কারণ, ছাপাখানা চালু হওয়ার আগে কোন লিপির কোন নির্দিষ্ট আকার ছিল না। আদর্শ লিপির অভাবে স্থান-কাল ও ব্যক্তিভেদে লিপির আকৃতি ভিন্ন হত। শিক্ষক ভেদে ছাত্র ভেদে লিপির আকার ভেদ অবশ্যই হত। এ যুগে আমরা ছাপা আদর্শ হরফ দেখে শিখি, কিন্তু আমাদের অসামর্থ্য, ঔদাসীন্য কিংবা সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা অথবা দ্রুত লিখন প্রয়াস, অপদর্শন প্রভৃতির জন্যে কোন দুজন আধুনিক শিক্ষিত মানুষের লেখা তথা হরফের আকৃতি অভিন্ন নয়। এ কালেই যদি এমন অবস্থা, তা হলে আদর্শ লিপিবিহীন শিক্ষক ও ছাত্র নির্ভর লিপি একই স্থানে ও কালে বিচিত্র হওয়া স্বাভাবিক। স্থান ও কাল ভেদে তো হতই। কালিও উপকরণ ভেদে ও মাত্রা ভেদে পানসে ও গাঢ় হত। আমাদের অভিজ্ঞতায় সতেরো শতকের পুথিতেও সহজ পাঠ্য হরফ মেলে আবার উনিশ শতকের পুথির লিপিও জটিল ও দুষ্পাঠ্য হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম খোন্দকারের 'দুল্লামজলিস', ও জায়েনুদ্দীনের 'রসুল বিজয়'-এর এবং কালিদাস নন্দী নামের পেশাদার লিপিকরের লেখা অত্যন্ত জটিল। 'দুল্লামজলিস-এর কাগজ মাড় দেওয়া শক্ত; লিপি আপাত সুন্দর কিন্তু গঠনে যুগদুর্লভ, তাই প্রাচীন বলে মনে হয়। অথচ গ্রন্থের রচনাকাল আঠারো শতকের প্রথম পাদ, কালিদাস নন্দী উনিশ শতকের প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন।

রচনাকাল

প্রাপ্ত রশিদই সতেরো বা আঠারো শতকের। পুথি এর আগের। লিপিকরের বানান ও নামঘটিত প্রমাদের সাক্ষ্যে বোঝা যায়, বহু অনুলিপি পরম্পরার প্রসূন এ লিপি।

১. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পৃঃ ৫৮, ৫৯।

মণীন্দ্র মোহন বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দুখানি 'তালের' পুথিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ১০টি পদ দেখতে পান, তার একটি পুথির লিপিকাল ১২২৭ সাল বা ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ, অপরটি প্রাচীনতর বলে কথিত। তাতে পদের ভাষারূপ অনেক পরিবর্তিত।[১] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বক্তব্য বিষয়ও অপৌরাণিক ও লোকায়ত এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব বিরোধী। কাজেই রচনা চৈতন্যোত্তর যুগের হতেই পারে না। বৈষ্ণব মত প্রচারের সমকালেও একই কারণে হওয়া সম্ভব নয়। খোল-করতাল যোগে চৈতন্যদেব কৃষ্ণকীর্তন শুরু করেন বটে, চৈতন্যভাগবতে সেই তাৎপর্যেই চৈতন্যনিত্যানন্দকে 'সংকীর্তনৈকপিতবৌ' বলা হয়েছে। এতে খোল-করতাল কিংবা 'কীর্তন' তাঁর উদ্ভাবিত বোঝায় না। ইরানের সাধক জালাল উদ্দীন রুমী তেরো শতকে 'সামা' (নৃত্য যোগে কীর্তন) হালকা, দারা (আসর করে যিকর্ ও অঙ্গ দোলান) প্রবর্তন করেন। পঞ্চাশোধর্ব বছর পরেরকার কবি মুকুন্দরাম ইতিহাস বিরল সে যুগে যদি বলেই থাকেন যে, চৈতন্যদেব 'কীর্তন সিজ্জন কৈল খোল-করতাল'—তাতে নিঃসংশয় হওয়া সঙ্গত হয় না। বিশেষত ঐ চরণ যদি এভাবে পাওয়া যায় 'কীর্তন সিজ্জন কৈল খোল করতালে'— তাহলে কেবল কীর্তন প্রবর্তনের কৃতিত্বই চৈতন্যদেবের প্রাপ্য হয়—বাদ্যযন্ত্র নয়। তা ছাড়া দুটো বাদ্য কি চৈতন্যদেবের নির্দেশে তৈরী হয়েছিল? কে বা কারা তৈরী করেছিলেন? করতালে সৃষ্ট ধ্বনিরই উৎপাদক যন্ত্র করতাল তৈরী হয়। হাততালি সৃষ্ট ধ্বনি নিশ্চয়ই সুপ্রাচীন। মৃদঙ্গই বা অর্বাচীন কেন? কাজেই এসব তথ্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার খুব মিল বলে ডক্টর সুকুমার সেন স্বীকারই করেছেন,[২] আর বাণীকান্ত কাকতি অসমীয়া ভাষার প্রাচীনরূপ বিধৃত বলে দাবী করেছেন।[৩] তেরো শতক অবধি উড়িয়া-বাঙলা-আসামী এবং ষোল শতক অবধি আসামী-বাঙলা অভিন্ন ভাষা ছিল বলে ডক্টর সুনীতি কুমার ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্বীকার করেন। যোগেশ বিদ্যানিধিও ভাষায় প্রাচীনতার ছাপ স্বীকার করেছেন এবং ভাষার প্রাচীন ও অর্বাচীন রূপের মধ্যে দুশো আড়াইশ বছরের ব্যবধানও মেনে নিয়েছেন। আর তা' ২০০,২৫০ বছর ধরে লিপিকর পরম্পরায় শোধিত বা গীত হওয়ারই যে ফল তাও অনুমান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুরাতন শব্দ ও বিভিন্ন প্রত্যয় লক্ষ্য করিলে কবিকে (১৩৫০ খ্রীঃ অপেক্ষা) আরো পুরাতন মনে হয়। কিন্তু কবির দেশ স্মরণ করিলে উক্ত কাল অসম্ভব হয় না।"[৪] সুনীতি কুমার

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত: ১।৩ সং. পৃঃ ২৯০, ৩০৪।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: পূর্বার্ধ ৩ সং, পৃঃ ১৩১।

৩. প্রাঃ ক. পঃ সঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৩।

৪. সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩৪২ সন।

চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতো ডক্টর শহীদুল্লাহও বলেন: "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি বড়ু চণ্ডীদাসের সমসাময়িক নহে, ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক অন্য পুথি ছিল।"[১] ডক্টর সুকুমার সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাগ-তালের সূত্রেপ্রাপ্ত 'গীত অভিনয় সংকেতের নির্দেশক দণ্ডক, লগনী, চিত্রক লগনী, দণ্ডক লগনী, প্রকীর্ণক লগনী, বিচিত্র, লগনী দণ্ডক, প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী, বিচিত্র, চিত্রা, বিচিত্রা, লগনী প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলোর সঙ্গে চৌদ্দ শতকে রচিত জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' নামের অভিনয় শাস্ত্রগ্রন্থের পরিভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। ঐ পরিভাষা বাঙলার অন্য গ্রন্থে মেলেনি, গ্রন্থটি প্রাচীন না হলে অভিনয় কলার নিদর্শন ধৃত থাকত না। 'বড়াই' চরিত্রেও সুকুমার সেন 'বর্ণরত্নাকরে' বর্ণিত 'কুট্টনী' চরিত্রের অনুসৃতি আবিষ্কার করেছেন।[২]

ডক্টর শহীদুল্লাহ ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র পদের অনুবাদ আবিষ্কার করেছেন। শহীদুল্লাহর মতে এর সংখ্যা পাঁচ:

গীত গোবিন্দ	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
ক. বহতি মলয় সমীরে	এবেঁ মলয় পবন ধীরে বহে
খ. রতি সুখ সারে	তোর রতি আশোআশেঁ
গ. বদসি কিঞ্চিদপি	যদি কিছু বোল
ঘ. স্তন বিনিহিতমপিহারং	স্তনের উপর হারে
ঙ. নিন্দতি চন্দনমিন্দু কিরণম	নিন্দএ চান্দ-চন্দন।

বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন তিনটি পুরো পদ (১ম সং ১১৯, ২০২, ২৩৫)। উক্ত (ক, খ) এবং 'চড়িলা কালীয় নাগ শীরে/গরুড় বাহন মহাবীরে' (পৃঃ ২৩৫)—পদ তিনটে এবং বারোটি পদাংশ (১ম সং পৃঃ ৪৮, ৫৫, ৬২, ৭২, ১৫৪, ২১৮, ২২৫, ২৩৩, ৩৪৮, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯)—স্তনের উপর হারে/ক্ষেণে সজল নয়নে/দেখি পল্লব শয়নে/ইত্যাদি জয়দেব থেকে নেয়া।

বিমানবিহারী মজুমদার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বিদ্যাপতির গভীর প্রভাব এবং তার পদের ব্যাপক অনুকৃতি আবিষ্কার করেছেন। এমনকি 'জনি' শব্দের ব্যবহার পর্যন্ত।[৩] কিন্তু এখানে আমাদের বক্তব্য এই—প্রাচীন সংস্কৃত উপমাদি অলঙ্কার

১. বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ৫২।
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: ৩য় সং, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৩০—৩১।
৩. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২৭০—৭১।

প্রায়ই বাঁধা নিয়মে আবর্তিত হত। প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ হয়ে তা' লোক সাহিত্যে এবং মধ্য ভারতীয় সাহিত্যেও সংক্রমিত ও অনুকৃত হয়েছে, ফলে যে-কোন রচনায় অধিকাংশ উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষাদিতে ঐক্য ও অভিন্নতা দেখা যায়। বিক্ষুব্ধ মানুষ মাত্রই কোন না কোন সময়ে বলে—'ধরণী দ্বিধা হও' 'মেদিনী বিদার হও পশিঅঁ। লুকাঁও'—এটি বলতে লিখতে কেউ কারো অনুকরণ করেনা—এগুলো যেমন আমাদের ঘরোয়া বাগধারার অঙ্গ, তেমনি চোখ-কান-নাক-নখ-নাভি-ঠোঁট-কপাল-কপোল-কবরী-বাহু-স্তন-আঙুল-নিতম্ব প্রভৃতির উপমান উপমেয় সম্পর্কিত কিছু প্রাণী-পদার্থ রয়েছে. সেগুলো সর্বত্র মেলে, যেমন—চোখের সঙ্গে পদ্ম, পলাশ, কাজল, কিংবা হরিণ বা মাছের চোখের তুলনা (এ যুগে পটলের সঙ্গে) চিরকালীন, চুলের সঙ্গে মেঘের, নিশির তুলনা প্রসিদ্ধ। অধরের তুলনা বান্ধুলী ফুল, কানের তুলনা গৃধকর্ণ, নাকের তুলনা বাজের চঞ্চু, বেণীর তুলনা ভুজঙ্গ প্রভৃতি কোনটাই কোন বিশেষ কালের বা এলাকার ছিল না। কাজেই সবটাই বিদ্যাপতির অনুকৃতি নয়, অনেকটাই রীতির আনুগত্যজাত আকস্মিক সাদৃশ্য। প্রায় অভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক, ও আর্থিক প্রতিবেশে মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-প্রজ্ঞা-উপমা-রূপক-প্রবচনাদি আপ্তবাক্য ও বাকধারা অভিন্ন হয়, যেমন—'ভুখিত জনে কিয়ে দুই করে খায়।' 'অধর নব পল্লব (কোমল) মনোহর, দশন দালিম জ্যোতি।' কিংবা, 'সুন্দর বদন সিন্দুর বিন্দু' 'সামর চিকুর ভার', অথবা' পীন পয়োধর অপরূপসুন্দর বা বসন্তে' সাহর মজর ভ্রমর গুঞ্জর, কোকিল পঞ্চম গাব'—এগুলো কি বিদ্যাপতির উদ্ভাবন? এগুলো চিরকালীন ও সর্বজনীন দৃষ্টির ও অনুভূতির প্রসূন এবং সর্বত্র ব্যবহৃত। বাগভঙ্গিতে বিদ্যাপতির প্রভাব ও অনুকরণ স্বীকার করলে, এও মানতে হবে যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী গভীর মনোযোগের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ পাঠ করেছিলেন। তা-ই যদি হয়, তবে বিদ্যাপতির মতো রাধা-কৃষ্ণকে প্রেমিক-প্রেমিকারূপে দাঁড় না করিয়ে রাধা-কৃষ্ণকে কেবলই লাম্পট্য দুষ্ট কামুক-কামিনী রূপে চিত্রিত করলেন কেন, তারও সদুত্তর পাওয়া দরকার। নইলে এ প্রভাব ও অনুকৃতি তত্ত্ব গ্রহণীয় হতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আরবী-ফার্সী জাত অন্তত আটটি শব্দ আছে—কামান, খরমুজা, বাকী, মজুর, মজুরিয়া, গুলাল, লেম্বু ও অফার।

ডক্টর শহীদুল্লাহ বড়ু চণ্ডীদাসের জীবৎকাল—১৩৭৫ থেকে ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মনে করেন।[১] এবং তাঁর 'বিদ্যাপতি শতকে' বড়ু চণ্ডীদাসের আনুমানিক কাল ১৩৭০-১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দ নিরূপণ করেছিলেন। ডক্টর সুকুমার সেন 'শ্রীকৃষ্ণ-

১. বা. সা. ক. (মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৮।

কীর্তনের পুথি প্রাচীন নয় তবে ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ আছে এবং কাব্যটির শিল্প অবশ্যই প্রাচীন' প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাঠামো প্রাচীন, বস্তুও পুরাতন এবং উড়িয়ার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার খুব মিল আছে'[১] স্বীকার করেও বলেছেন ১৬০০ শতকই রচনা কাল। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মতে "ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই বা তাহার কিছু পরে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা-কৃষ্ণ ধামালী রচিত হয়।'[২] সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, চৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করেননি, করলে এই 'কাব্যকে ভক্ত বৈষ্ণবরা মাথায় করে রাখতেন...শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এমনভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত না'।[৩] তাঁর মতে 'পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বড়ু চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন'।[৪]

আমরা সাম্প্রতিক সব মত যথাসম্ভব তুলে ধরলাম। কিন্তু আমাদের ধারণা দৃষ্টি ভেদে ও তথ্যের গুরুত্ব চেতনা ভেদে সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হয়েছে। এ জটিল তর্ক শেষ হবার নয়। তবু নিশ্চিত প্রমাণে পনেরো শতকের কবি কৃত্তিবাস-মালাধর-বসু-শাহ্ মুহম্মদ সগীর-বিজয়গুপ্ত-বিপ্রদাস প্রভৃতির ভাষা থেকে প্রাচীনতর ভাষার নিদর্শন, জয়দেবের বিশেষ প্রভাব (আঙ্গিক ও বাণীগত), বৈষ্ণব প্রভাবমুক্ত লোকায়ত অপৌরাণিক কাহিনী, স্থূলতা, আদিরস সর্বস্বতা, উক্তি ও ঘটনার পৌন-পুনিকতা, স্থানে স্থানে উক্তির ও ঘটনার উল্লেখে পূর্বাপর অসামঞ্জস্য, নায়ক চরিত্রের গুণাভাব, কথকতা সুলভ ঘটনা ও পদবিন্যাস, লোক নৃত্যনাট্যের আঙ্গিক এবং পদাবলী সংকলন গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাসের বিক্ষিপ্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ পদের অভাব, একাধিক পুথির অপ্রাপ্যতা প্রভৃতি দেখে আমাদের মনে হচেছ বৈষ্ণবতত্ত্ব বিরোধী এ-গ্রন্থ নিশ্চিতই চৈতন্য-পূর্ব কালের এবং আনুমানিক ১৪২৫ সনের আগে রচিত—জয়দেবের পরে, কৃত্তিবাস-মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই-এর আগে, এবং চৈতন্যদেব জন্মের পূর্বে। ডক্টর শহীদুল্লাহও পুথির লিপিকাল ১৫০৭ খ্রীস্টাব্দ অনুমান করে কাব্যরচনাকাল ১৪০০ খ্রীস্টাব্দ বলে ধারণা করেন।

বিষয়বিন্যাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' আদলে বিন্যস্ত। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' আঙ্গিক সংজ্ঞায় মহাকাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও সে সংজ্ঞায় মহাকাব্য। তেরো

১. বা. সা. ই. ১।পৃ।৩ সন, পৃঃ ১৩০—১৩২।
২. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ১৮২।
৩. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, ৬৭।
৪. ঐ, পৃ, ৬৬।

খণ্ডে এই গ্রন্থ বিন্যস্ত। 'গীতগোবিন্দ' সর্গে বিভক্ত, প্রতি সর্গে শিরোনাম ও সমাপ্তি সূচক কথা আছে। যেমন প্রথম সর্গের শিরোনাম—'সামোদদামোদর' এবং সমাপ্তি 'ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যে সামোদদামোদরো নাম প্রথম সর্গঃ'। তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' শিরোনাম 'জন্ম খন্ড এবং শেষে 'ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং' রয়েছে। জন্ম, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভার, ছত্র, বৃন্দাবন, কালীয় দমন, বস্ত্র, হার, বাণ, বংশী ও রাধার বিরহ—এই কয়টি খন্ডে কাব্যটি বিন্যস্ত। কাব্যে চরিত্র মাত্র তিনটি বড়াই, রাধা ও কৃষ্ণ। সমগ্র রচনা ৪১৫ টি পদে (কবিতায়) বিভক্ত। প্রতি পদশীর্ষে রাগতাল এবং কোথাও কোথাও অভিনয় পদ্ধতির সংকেতও রয়েছে, যেমন—মালবরাগঃ। রূপকং। বিচিত্র লগনী। দন্ডকঃ।[১] সর্গশীর্ষে রয়েছে ১২৩টি শ্লোক।

কাব্য স্বরূপ

প্রাকৃত জন মনোরঞ্জক শৃঙ্গার রসের ও গ্রাম্য পরিবেশে গ্রাম্য ধামালীর আধিক্য এ-কাব্যকে প্রাকৃত জনের বিশেষ উপভোগ্য করেছিল। তিনটি চরিত্রই জীবন্ত ও স্বাভাবিক। তার মধ্যে রাধা চরিত্র অনন্য। যৌন চেতনাহীন এগারো বছরের বালিকার উদ্ভিন্ন যৌবনা কামিনী হওয়ার ইতিকথা বহু ত্রুটি সত্ত্বেও কবি সুকৌশলে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছেন। রাধার মন-মেজাজের ক্রম-বিকাশ চিত্রিত করাই যেন কবির মৌল উদ্দেশ্য ছিল। তিন বছরের সময়ের পরিসরে নাবালিকা 'বড়র বহুরী বড়র ঝিয়ারী' স্বামী গর্বিতা, দর্পিতা নারী রাধিকা ক্রমে ঘৃণা-লজ্জা-ভয়-বিরাগ ত্যাগ করে পূর্ণযৌবনা সম্ভোগলিপ্সু নারী হয়ে উঠল এবং দয়িতের অবহেলায় কামতৃষ্ণা কাতরা নারীর যন্ত্রণার করুণ দীর্ঘ কান্না দিয়ে গ্রন্থ সমাপ্ত। এই রাধা কামাসক্তা ও সম্ভোগ লিপ্সু, এই কৃষ্ণ লম্পট, কপট, নির্মম, দায়িত্বহীন, নির্লজ্জ, সপ্রতিভ কিশোর। এখানে কথা ও আচরণ স্থূল ও অশ্লীল। মিথ্যা বলতে তিন চরিত্রই পটু ও নিঃসংকোচ। ধূর্ততায় কৃষ্ণ যদিও অতুল্য, বড়াই বা রাধাও কম নয়। পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের অপরিস্ফুত জড় রয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। দান, নৌকা ও বংশী খণ্ডই রসে ও কবিত্বে শ্রেষ্ঠ; প্রমথ নাথ বিশীর মন্তব্য ঈষৎ পালটে বলা চলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-কৃষ্ণের যেখানে শেষ, পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের সেখানে আরম্ভ।' পদাবলীর রাধা গোড়া থেকেই কৃষ্ণানুরাগিণী উপযাচিকা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা প্রথমে বীতরাগ পরে ব্যাকুলা-অনুরাগিনী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বুনো ফুল, তার বুনো রূপ, বুনো গন্ধ, রস গ্রাম্য যৌনতাদুষ্ট, সে ভোগ্য। আর

১ম সং, পৃঃ ২০০।

পদাবলীর রাধা সযত্নে লালিতা ফুল, তার রূপ রস-গন্ধ নগুরে ও সূক্ষ্ম এবং পরিস্রুত, যে প্রেম উপভোগ্য, তাতে তত্ত্ব আছে, চেতনার মাধুর্য আছে, অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার চমক আছে, পৌরাণিক প্রসঙ্গের ইঙ্গিত আছে। এ কাব্যে গীতিরস, কাব্যিক লাবণ্য, নাট্যগুণ, সংলাপে সৌন্দর্য রয়েছে, নৃত্যনাট্য হিসেবেও রসোত্তীর্ণ তো নিশ্চয়ই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পেয়েছে, বৈষয়িক ব্যবহারিক জীবনের রীতি নীতিও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কুম্ভারের পণী, তেলি-তেলিনীর ঘরে ঘরে করুআ (সরিষার) তেল ফেরী, কাকের রব, তিথি-নক্ষত্রে, শূন্য কলসী, শিয়াল, নারীদের বাজারে বেচাকেনায় অংশ গ্রহণ, শুভাশুভর সংস্কার, হাঁচি, ঝিঁজি, উর্ঝট, নদীতে নগ্ন হয়ে স্নান প্রথা, বাজার কর, ঘাট কর, ভিক্ষাজীবী যোগী-যোগিনীর খর্পর, চণ্ডী পূজা, তীর্থস্থান, মন্ত্র তন্ত্র, সহজিয়া কায়সাধন মা-বাপ তুলে গালাগাল প্রভৃতি, তাম্বুল-কর্পুর যোগে প্রণয় প্রস্তাব, গাঁয়ের কুটনীর মাধ্যমে প্রণয় নিবেদন, ধনগর্ব, বংশগৌরব ইত্যাদি সব কিছুই মেলে। গ্রামে গ্রামে সবাদ্য নাচগান কথকতাই ছিল চিত্তবিনোদনের ও লোক শিক্ষার অবলম্বন। এ কাব্যে কবির কোন বিশেষ প্রতিপাদ্য নৈতিকতত্ত্ব ছিল না বটে, কিন্তু আজকের সমাজ-সচেতন পাঠক এর মধ্যে একটা ফলিতার্থ পেতে পারে। রাধারা হচ্ছে সেই অভাবগ্রস্ত সরল গণ মানব, দরিদ্র বলে যাদেরকে লাভ-লোভের মরীচিকার ফাঁদে ফেলা সহজ হয়। কুটনীরা হচ্ছে কনের ঘরে মাসী আর বরের ঘরে পিসী। এই কুটনীরূপ টাউটরাই শোষক-শাসকের হয়ে গণমানুষের হিতকামীর ভূমিকা গ্রহণ করে, আর এদের মাধ্যমেই কৃষ্ণরূপী শঠ-কপট শাসক-শোষক গণদরদী লোকসেবকের ছদ্ম আবরণে শাসন-শোষণের নামে দুর্বল মানুষের যথাসর্বস্ব লুটে। অসহায় বলেই রাধারা কৃষ্ণনির্ভর, কৃষ্ণের কাছেই শোষণের জন্য ধর্না দেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা প্রকৃতির সন্তান—বুনো ফুল, তার বুনো ও স্বভাব-সুন্দর রূপ, তার রস আদি ও অকৃত্রিম, তার স্বভাব তার লাবণ্য অপরিস্রুত ও অবিকৃত। পদাবলীর রাধা সংস্কৃতি ও মানসোৎকর্ষের প্রসূন।

চণ্ডীদাস নামের কবি পাঁচজন

১. বড়ু চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস কোন বিক্ষিপ্ত পদ রচনা করেননি তা' আমরা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের ফলে নিঃসংশয়ে জানতে পাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা সাগর

কন্যা, আর বাসুলী আদেশে যে দ্বিজ চণ্ডীদাস পদরচনা করেছেন, তাতে আমরা কহে, ভণে, বিনোদিনী রাধা, বৃকভানু রাজ নন্দিনী, উপান্ত চরণে ভণিতা প্রভৃতি পাই, যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয়নি, বড়ু কখনো দ্বিজ বলে কিংবা উপান্ত চরণে ভণিতা দেননি, কাজেই পদাবলীর বাশুলী আদিষ্ট 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস ভিন্ন ব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি আকস্মিকভাবে তো তার মত, রীতি ও পরিচয় বদলাতে পারেন না বিক্ষিপ্ত পদে।

অতএব এ ধরনের পদে কিংবা সহজিয়া পদে কোথাও 'বড়ু' ব্যবহৃত হলেও বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলে গ্রাহ্য হওয়া অযৌক্তিক। এগুলি স্পষ্টত জাল রচনা।[১] বড়ু চণ্ডীদাস ছাতনার কবি। কেননা ছাতনার বাসুলী চণ্ডী। আর নানুরের বাসুলী সরস্বতী।

২. চণ্ডীদাস

'চৈতন্যচরিতামৃত' সূত্রে জানতে পাই চৈতন্যদেব জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বিদ্যাপতির পদ, রামানন্দের নাট্যগীতি ও বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' শুনতেন, আস্বাদন করতেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' চারবার একথার উল্লেখ আছে:

১. বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত। (১/১৩)

২. চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ। (২/২)

৩. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ। (২/১০)

৪. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ। (৩/১৭)

কৃষ্ণলীলার কবি হিসেবে জয়ানন্দও চণ্ডীদাসের বন্দনা করেছেন:

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণচরিত তারা করিল প্রকাশ।

লক্ষণীয় ইনি সর্বত্র শুধু 'চণ্ডীদাস'-দ্বিজ, দীন, বড়ু, বা আদি নন। এই বিশ্লেষণ বিহীন চণ্ডীদাসের পদই চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন। তিনি নিশ্চয়ই জনপ্রিয়

১. বাংলা সাহিত্যের কথা—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃঃ ৪১-৪৭।

ও প্রসিদ্ধ পদ সমূহের রচয়িতা। বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, "বিশেষণ হীন একজন 'চণ্ডীদাস' ছিলেন বলিয়াই পরবর্ত্তীকালে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস প্রভৃতি চণ্ডীদাসকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা এই বিশেষণ হীন চণ্ডীদাসকে আদি ও অকৃত্রিম চণ্ডীদাস বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। তাঁহার ভনিতার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া এবং ভাব ও ভাষা বিচার করিয়া আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থে ১১২টি পদ নির্বাচন করিয়াছি।"[১] চণ্ডীদাসের রচিত অকৃত্রিম পদগুলো বেছে নেওয়া সহজ নয়। চৈতন্য-চরিতামৃতধৃত পদাংশ 'হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোর' (২/৩) কিংবা 'নীল অতসী' ফুলের উল্লেখ সম্বলিত পদ চণ্ডীদাসের বলে মেনে নেওয়া যায় বলে কারো কারো বিশ্বাস।[২] এঁর আনুমানিক জীবৎকাল ১৪৫০-১৫০০ খ্রীস্টাব্দ। এঁর বন্দনা করেছেন জয়ানন্দ, রাধামোহন ঠাকুর, (পদামৃতসমুদ্র), নরহরি চক্রবর্তী ও বৈষ্ণব দাস।

১. জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণচরিত তারা করিল প্রকাশ। --জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল

২. চণ্ডীদাস চরণ/চিন্তামণি গণ/শিরে করি ভূষণ
—গোবিন্দদাস কবিরাজ, পদ,

৩. বিদ্যাপতিঃ চণ্ডিদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
—রাধামোহন ঠাকুর, পদামৃত সমুদ্র

৪. জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গণে
-নরহরি চক্রবর্তী,-পদ,-ভক্তিরত্নাকর।

৫. জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর অখিল ভুবনে অনুপাম।
—বৈষ্ণবদাস, পদকল্পতরু।

৩. দীন চণ্ডীদাস

দীন চণ্ডীদাসের একখানা আখ্যান কাব্য এবং তার খণ্ডাংশ 'কপালী মিলন পালা'র পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়ায়, এখন দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করেন না। মণীন্দ্রমোহন বসু 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' দীর্ঘ ভূমিকা যোগে প্রকাশিত

১. বা. শ. প. সা. পৃঃ ২৩১-৩২।

২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পৃঃ ৬৮।

করেছেন। সবাই মোটামুটি স্বীকার করেছেন যে দীন চণ্ডীদাসের রচনা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তাঁর আখ্যান কাব্যে মাত্র সাতটি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা মিলেছে,— আর 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতা মিলেছে ৮৮টি। এতে মনে হয় লিপিকর প্রমাদে 'দীন' ঐ সাতটি ভণিতায় 'দ্বিজ' হয়েছে। অনবধানতা বশে 'দীন'কে 'দ্বিজ' লেখা স্বাভাবিক। কাজেই 'দীন চণ্ডীদাস' এক স্বতন্ত্র কবি। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন: "এখন হইতে কম বেশী দুই শত বৎসরের মধ্যেই দীন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বীকার করিতে হয়।"[১] সুখময় মুখোপাধ্যায়ও এ মত সমর্থন করেন। তাঁর যুক্তি গুলো এই:

১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাকুঁড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত 'কপালী-মিলন' পুথিতে এক জায়গায় 'সন ১০৯৫ সাল' দেখেছিলেন। এটিকে ঐ অঞ্চলের মল্লাব্দ ধরে (১৭৮৯-৯০ খ্রীস্টাব্দ) এবং ঐটিকে লিপিকালের পরিবর্তে রচনাকাল ধরে ঐ তারিখ-কেই তিনি চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কালের নিম্নতম সীমা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

২. "সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সব পদ-সংকলন গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে 'চণ্ডীদাসে'র বহুপদ থাকলেও একটি পদেও দীন ভণিতা মেলে না।

৩. "দীন চণ্ডীদাসের আখ্যান কাব্যের এবং পদ সমষ্টির বহু পুথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে 'চণ্ডীদাস' সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ পদগুলির একটিও পাওয়া যায়নি।[২] অতএব দীন চণ্ডীদাস আঠারো শতকের শেষ পাদের কবি। বসন্তরঞ্জন রায় প্রমুখ হয়তো পুথি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে এঁরই 'কৃষ্ণলীলা' গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা শুনতেন।

৪. দ্বিজ চণ্ডীদাস

এই দ্বিজ চণ্ডীদাস বাসলীর সেবক। হয়তো নান্নুরের সরস্বতী দেবী বাশুলীরই সেবক। এই বাশুলী বিশালাক্ষি[৩]। তাই তিনি বাসলীর আদেশে, কৃপায়, সহায়, 'কহে, ভণে' ক্রিয়াপদ যোগে এবং 'বৃষভানুনন্দিনী', বিনোদিনী' রাধার পদ রচনা করেছেন। সতেরো শতকে রচিত মুকুন্দরাম গোস্বামীর সহজিয়াগ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে' এই দ্বিজ চণ্ডীদাসেরই উল্লেখ রয়েছে: তারাখ্যরজকী-সঙ্গী চণ্ডীদাসো দ্বিজোত্তম:' এই সাধন সঙ্গিনী রজকী তারার কানুদাসের পদে পুরোনাম 'রামতারা'।

১. ভারতবর্ষ: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯, পৃ: ৫৮৪।
২. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পৃ: ৭৩-৭৫।
৩. পুথিপরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭১, বিশ্বভারতী।

তার থেকে চণ্ডীদাস-রজকিনী রাধী তত্ত্বের ও পদের উদ্ভব। এ কবি নিশ্চয়ই সহজিয়া বৈষ্ণব। এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে বহু আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার রয়েছে, যথা কারিগর (১৫৩, ৯৯২,) বনাল্যে, খুশি (১৯৮), দাগ (৩৯৪), দোকান (৬৪০), মহল (৬৩৭, ৬৪১ ৬৪৩), তকলবী (৬৪৪), বানাইয়া, দরিয়া (৮৮১), বিদায় (৯৩৩), বালিস, বদল (১৫১২)।[১] ইনি উপান্ত চরণে ভণিতা দেন। এঁর বন্দনা করেছেন সহজিয়া পদকার প্রসাদদাস, কানু দাস, নরহরি দাস (?) প্রভৃতি।

এই দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে আদৌ কোন কবি ছিলেন কি-না বলা যাবে না। বৌদ্ধ বিলুপ্তি কালে অনেক বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদীর ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁদের বৌদ্ধমত লালনে যত্নবান ছিলেন। বাঙলার বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদীর একটি অংশ চৈতন্যের বৈষ্ণবমত নামত স্বীকার করে। এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের সহজিয়া সম্প্রদায়ের যারা বৈষ্ণবমত গ্রহণ করে, তারাই 'বৈষ্ণব সহজিয়া' বা রাগাত্মিক সাধক নামে সাধারণ্যে পরিচিত। এরা যোগাতান্ত্রিক বজ্র-সহজযানী সাধক। এরা কায়া সাধক, দেহাত্ম-বাদী, বামাচারী ও গুহ্য সাধক। এদেরই অবৈষ্ণব দল 'বাউল' নামে আখ্যাত। এরা পরকীয়া প্রেম ও মিথুনাচারের মাধ্যমে নাদ-বিন্দু তথা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রভৃতি গুহ্য সাধন ও সিদ্ধির চর্যা পালন করে।

এই সহজিয়া বৈষ্ণবেরা নিজেদের মতের মর্যাদা, প্রচার ও প্রসার কামনায় তত্ত্বের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গত তিনশ বছর ধরে বহু অপকর্ম করেছে। জাল করতে তাদের জুড়ি নেই। এরাই চৈতন্যদেব-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাচার্য-বীরভদ্র-আউল চাঁদ-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রমুখের সাধন-সঙ্গিনীর নাম ধাম উদ্ভাবন করেছে, প্রেম বিলাসে চারটে বিলাস (পরিচ্ছেদ) যোগ করেছে এবং বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপ-সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রায় শেখর প্রভৃতিকে তাদের মতের নব রসিক বানিয়েছে, লোকগ্রাহ্য ও জনপ্রিয় করবার জন্যে বড়ু, দ্বিজ, দীন, আদি প্রভৃতি যোগে কিংবা শুধু চণ্ডীদাসের নামে সহজিয়া পদ রচনা করে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলন তত্ত্বও রটিয়েছে পদ রচনা করে। এদের উদ্দেশ্য আংশিক সিদ্ধ হয়েছে, কেননা বিদ্বানেরা সত্য-সত্যই বিভ্রান্ত। এসব জেনে বুঝেই হয়তো সতীশচন্দ্র রায় ও মণীন্দ্রমোহন বসু বড়ু ও দীন চণ্ডীদাস ছাড়া কোন তৃতীয় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না।

১. 'পদকল্পতরু' থেকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক উদ্ধৃত, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, মধ্যযুগ, পৃঃ ৬১-৬২।

মনে হয় নির্বর্ণ ও জনপ্রিয় করবার জন্যেই অনেকের উৎকৃষ্ট অসহজিয়া পদও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চালু করা হয়েছিল। তাই অনেক উঁচু মানের পদে আমরা শুধু 'চণ্ডীদাস' কিংবা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা দেখি।

আঠারো শতকে (১১৮২ সাল, তারিখ ৩ মাঘ, রবিবার অষ্টমী) ও উনিশ শতকে (১২১২ বঙ্গাব্দ—১৮০৫ খ্রীস্টাব্দ) লিপীকৃত দুখানি পুথিতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের কিছু পরিচয় মিলেছে। শিবরতন মিত্র আবিষ্কৃত ১২১২ বঙ্গাব্দে লিপীকৃত ও সদানন্দ সিন্ধু অনূদিত 'ভগদগীতায়' অনুবাদক সদানন্দ সিন্ধু আত্ম পরিচয় সূত্রে দ্বিজ চণ্ডীদাসের নাম বার বার উল্লেখ করেছেন। —''আছিল প্রপিতামহ দ্বিজ চণ্ডীদাস'[১] ইত্যাদি। বিশ্বভারতীর একটি পুথির পাতড়ায় কবি দ্বিজ চণ্ডীদাসের বন্দনা রয়েছে:

পূর্ব্বে গ্রামেতে ছিলা কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস
করিন্নাহার গ্রামেতে তাহার হইল নির্ঝাস।
তাহার পূজিৎ আছেন দেবি বিশালাক্ষি
সেই পাদ পদ্ম মোই করি থক্কি (থাকি)।[২]

[লিপিকাল ১১৮২ সাল]

এই পাতড়া মতে দ্বিজ চণ্ডীদাস বিশালাক্ষির পূজক, 'রমণী'র কৃপাপ্রাপ্ত পয়ার গ্রন্থ রচক এবং করিন্নাহার গ্রামে 'নির্যাস [মৃত্যু] প্রাপ্ত।[৩]

ডক্টর সুকুমার সেন-প্রাপ্ত 'চৈতন্যবন্দনা'র একটি পদে আছে:

জন্মিবেন আপনি হরি/শ্রীচৈতন্য নাম ধরি/
সঙ্গে লইয়া পারিষদ গণ
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস/সে চরণে মোর আশ/
সব ছাড়ি পশিল চরণে।'[৪]

—প্রথম উদ্ধৃতিতে কেবল কুলপরিচয় সূত্রেই প্রপিতামহের নাম এসেছে। ইনি প্রসিদ্ধ লোক কিংবা কবি ছিলেন কিনা বলার উপায় নেই। হয়তো স্থানীয়ভাবে তিনি খ্যাত ছিলেন। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের এইরূপ এক কুল পুরুষের

১. প্রবাসী: ১৩৪২, মাঘ, পৃঃ ৪৫৭-৫৮; উদ্ধৃত সুখময় মুখোপাধ্যায়।
২. (ক) পুথিপরিচয় ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১। (খ) পুথিপরিচয় ৩য় খণ্ড, পাদটীকা পৃঃ ১৫।
৩. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় থেকে উদ্ধৃত।
৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১/৩ পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৭৪।

নাম 'চণ্ডীদাস' দেখে সুকুমার সেন তাঁকেই বড়ু চণ্ডীদাস বলে দাবী করেন।[১] দ্বিতীয় উদ্ধৃতি সূত্রে বোঝা যাচ্ছে আঠারো শতকেও কবিখ্যাতি সম্পন্ন একজন দ্বিজ চণ্ডীদাস ছিলেন, কীর্নাহারে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বিশালাক্ষির (বাশুলীর) পূজক ছিলেন। অতএব আমরা মেনেই নিই যে সতেরো শতকের শেষ পাদে ও আঠারো শতকের গোড়ার দিকে একজন সহজিয়া বৈষ্ণব কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস ছিলেন। অথবা সহজিয়ারা নাম-ধাম ঠিক করে ঐ নামে এক কবি দাঁড় করিয়েছিলেন। সুখময় মুখোপাধ্যায়ও এমনি ধারণা পোষণ করেন: 'সহজিয়ারা যেমন প্রাচীন কালের বিখ্যাত সাধক ও কবিদের নিজের দলে টানবার চেষ্টা করেছে, তেমনি নিজেরাই 'সহজিয়া' পদ ও 'নিবন্ধ' রচনা করে তা' প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারদের নামে চালিয়েছে। 'চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত সহজিয়া পদগুলি আসলে এই রকম সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকদেরই রচনা। ঠিক এই ভাবে সহজিয়ারা বিদ্যাপতি, নরোত্তম দাস, নরহরি সরকার, লোচন দাস, রায় শেখর প্রভৃতি ভণিতা দিয়ে বহুপদ রচনা করেছে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নরোত্তম দাসের নামে অসংখ্য সহজিয়া নিবন্ধ রচনা করেছে—যেগুলি কিছুতেই ঐ নামের মূল গ্রন্থকারদের লেখা হতে পারেনা।[২]

তরণী রমণ বা তরুণী রমণ নামের এক কবি আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। তাঁর 'সহজ সাধনাতত্ত্ব' নামে একটি ছোট গ্রন্থ আছে। তাতে চণ্ডীদাস-রামীর প্রেম কাহিনীও রয়েছে। তাঁর ভণিতায় একটি পদ যখন 'পদকল্পতরুতে' আছে, তখন তাঁকে আঠারো শতকের কবি বলে স্বীকার করতে হয়, (অবশ্য পদটি যদি পরবর্তী প্রক্ষেপ না হয়, অথবা গায়েনের অনবধানতায় ভণিতায় তাঁর নাম যুক্ত না হয়ে থাকে।) এঁরও উপাধি বা কবিনাম ছিল 'চণ্ডীদাস'। 'রত্নাসার' নামের এক সহজিয়া পুথিতে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সংখ্যা ১১১১, পত্র ১৮৭) মণীন্দ্রমোহন বসু এই চরণদ্বয় পেয়েছেন:

'ইহা জানি চণ্ডীদাস তরণি রমণ
গীত ছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন'—

এবং এর পরে—'পিরীত বলিয়া/তিনটি আখর/বিদিত ভুবন মাঝে'—পদের ভণিতায় দেখেছেন—তরণী রমণ/করে নিবেদন/মরিলে না যায় ছাড়া।' এই পদ এবং 'তিনটি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১/১, পৃ: ১৭২-৭৪।
২. 'প্রাচীন কবিদের সময় ও পরিচয়', পৃ: ৮০-৮১।

আখরে না জানি কি আছে'—পদটি ঈষৎ রূপান্তরে চণ্ডীদাসের নামেও চলে। সহজিয়া গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে' তরণী রমণের ৪৫টি পদ সংকলিত রয়েছে। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার একটি মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছেন—"চণ্ডীদাস নামটি শুধু যে বহুলোক ধারণ করতেন তাহা নহে, উহা অনেকটা উপাধির মতন ব্যবহৃত হইত, যেমন হয়...প্রধান মহান্তের 'শঙ্করাচার্য' নাম।...সহজিয়ারা তাঁহাকে (চণ্ডীদাসকে) নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিয়া 'আদি চণ্ডীদাস' ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন...চণ্ডীদাস নামটি যে সহজিয়া সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পঞ্চাশ বছর পূর্বে, নবদ্বীপের বনচারির ডাঙ্গায় এক চণ্ডীদাস ও রজকিনী দেখিতে পাইতাম।...ঐ চণ্ডীদাস পদ রচনাও করিতেন। আমরা চারি আনা দিয়া তাহার পদের বইও কিনিয়াছিলাম। এখন অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার 'বাঙলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে এই চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১]

অতএব আমাদের বাশুলী পূজক দ্বিজ চণ্ডীদাস সহজিয়াদের বানানো দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে আমাদের যে সন্দেহ তা দৃঢ়তর হল।

৫. চট্টগ্রামের দ্বিজ চণ্ডীদাস

এক দ্বিজ চণ্ডীদাসের 'কলঙ্ক ভঞ্জন' নামের এক পুথি চট্টগ্রামে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আবিষ্কার করেছিলেন। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী এই পুথির অনুলিপি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' (১৩৪০ সনে) প্রকাশিতও করেছেন। এই পুথির লিপিকাল ১১৮২ মঘীসন বা ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ। ইনি মনে হয় আঠারো শতকের শেষার্ধের চট্টগ্রামবাসী কবি। পুথির দুটো ভণিতা এরূপ :

১. চণ্ডীদাসে বোলে সার কৃষ্ণগতি সভাকার।'
২. 'রাধকৃষ্ণ পানে চাহি চণ্ডীদাস বোলে।'

এই দীর্ঘ ও জটিল আলোচনার পর আমরা এই প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছি যে, লোকায়ত কৃষ্ণযাত্রার তথা গীতিনাট্যের রচয়িতা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ১৪২৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' রচনা করেন। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসই সর্বপ্রাচীন চণ্ডীদাস।

---

১. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'র ভূমিকা (পৃঃ ৩৩-৩৫) থেকে উদ্ধৃত।

দ্বিতীয় চণ্ডীদাসও চৈতন্য-পূর্ব কালের বা তাঁর জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। এঁর শুধু 'চণ্ডীদাসের' পদই চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন। এঁর আনুমানিক জীবন কাল ১৪৫০-১৫০০ খ্রীস্টাব্দ।

দীন চণ্ডীদাসই তৃতীয় চণ্ডীদাস। ইনি কৃষ্ণলীলার আখ্যান কাব্য তথা পালাগান প্রণেতা। ইনি আঠারো শতকের শেষার্ধের বা শেষ পাদের কবি।

পদকার 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' সহজিয়াদের জালকবি। এঁর কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না।

রাধার 'কলঙ্কভঞ্জন' প্রণেতা চট্টগ্রামের দ্বিজ চণ্ডীদাসও আঠারো শতকের শেষ পাদের কবি, তবে তিনি পদকার বা প্রসিদ্ধ কবি নন।

শেষোক্ত জনকে বাদ দিলে আমরা তিনজন চণ্ডীদাস পাই—অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। এঁরা তিনজনই রাঢ় অঞ্চলের লোক। খগেন্দ্রনাথ মিত্রেরও এই মত ছিল।[১] কোন কোন নামের স্থানিক ও কালিক জনপ্রিয়তা থাকে—দুনিয়ার সব সমাজেই তা' দেখা যায়। চণ্ডীদেবীর প্রসার ক্ষেত্র রাঢ় অঞ্চলেও তাই মধ্যযুগে চণ্ডীদাস নামের আধিক্য ছিল। আর ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদারের পরিবেশিত তথ্যানুসারে সহজিয়া সাধকদের মধ্যেও ঐ নাম বহুল প্রচলিত। নামের ঐ স্থানিক ও কালিক জনপ্রিয়তার জন্যে আমরা পশ্চিম বঙ্গে একই নামের একাধিক পদকার পাই। যেমন—অনন্ত, কৃষ্ণ, গোকুল, গোপাল, গোবিন্দ, নরহরি, মুরারি, মাধব, রঘু, শ্যাম, হরি হরে প্রভৃতি।

চণ্ডীদাস—পদাবলী আস্বাদনে আমরা চণ্ডীদাস-সমস্যার কথা মনে রাখব না, আমরা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়া পদকার ছদ্ম চণ্ডীদাসকে বাদ দিয়ে চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় প্রাপ্ত লোকপ্রিয় ও প্রখ্যাত পদাবলীর ভিত্তিতে আমাদের আনন্দিত আবেগ প্রকাশ করব।

জনপ্রিয় পদাবলীর চণ্ডীদাস প্রাণের কথা আবেগ-সুন্দর সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষা নিরাবরণ, নিরাভরণ ও অনাড়ম্বর। উপমাদি অলঙ্কারের ছটা নেই, শব্দাড়ম্বরের ঘটা নেই, অনুভবের আন্তরিকতা, গভীরতা ও ব্যাপকতাই তাঁর পদকে ললিত মধুর করে তুলেছে, করেছে চিরমানবের অভিব্যক্ত অনুভবের আকর। চণ্ডীদাস অনুরাগের ও বিরহের কবি—'কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা! এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে, না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে।' পাওয়ার আকুলতা, না পাওয়ার বেদনা, পেয়ে হারানোর আশঙ্কা ও বিচ্ছেদের

---

১. বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা, মদনমোহন কুমার, ৪র্থ সং।

ক্রন্দন রাধা নামের তরুণীকে সারাটা জীবন কি যন্ত্রণা-মধুর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আশ্বাস-নৈরাশ্যের মধ্যে রেখেছিল, তারই স্বতোসিদ্ধ ও সর্বজনীন চিত্র মেলে চণ্ডীদাসের পদে। তাঁর এক একটি পদ যেন প্রমূর্ত অনুরাগ ও উৎকণ্ঠা, ক্রন্দন ও শঙ্কা, ত্যাগ ও তিতীক্ষা এবং অনন্ত বিরহ। নিম্নের সব পদ যে একজনের এবং যে কোন্ চণ্ডীদাসের রচনা তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। তবে যে সব পদ চণ্ডীদাসকে লোকপ্রিয় করেছে, সেগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল। চণ্ডীদাসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ পদের প্রথম চরণ :

o সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
o না যাইও যমুনার জলে
o সখা হে ও ধনি কে কহ বাটে
o কাঞ্চন বরণী কে বটে সে ধনি
o সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
o ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
o আ লো রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
o এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে
o একে কুলবতী ধনি
o মগন করিয়া গেল সে চলিয়া
o চম্পক বরণী বয়সে তরুণী
o বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে
o নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
o সই কে বলে পিরীতি ভাল
o একে কাল হৈল মোর
o কানড় কুসুম করে
o যখন নাগর পিরীতি করিলা
o তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই
o কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান
o যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায়
o এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
o এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি
o সই কেমনে ধরিব হিয়া
o হেদে রে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস
o ছুঁওনা ছুঁওনা বঁধু ঐখানে থাক
o আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল
o সখিক বচন শুনি রাই বিনোদিনী,
o শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
o সখি কহবি কানুর পা-য়
o তুমি কহিও নিঠুর আগে
o বহুদিন পরে বধুঁয়া এলে
o সই জানি কুদিন সুদিন ভেল
o বধুঁ কি আর বলিব আমি
o বধুঁ তুমি সে আমার প্রাণ
o শুন শুন হে রসিক রায়
o শুনহে চিকন কালা

৬

বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য-চর্চা

॥ ১ ॥

সাত শতকের আরবে ইসলামের অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকর ঘটনা। এক অসামান্য পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও তাঁর মুখনিঃসৃত ঐশ্বরিক বাণীর সম্মোহনে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-বিক্ষত যাযাবর ও অর্ধ যাযাবর জনগোষ্ঠী আকস্মিক ভাবে আষাঢ়ের প্রকৃতির মতো উষর ভূমে দুর্মর প্রাণশক্তি পেয়ে জেগে উঠল। চরম অবজ্ঞায় যে-উষর ভূমে মিশর–বেবিলোন-পারস্য-গ্রীস-রোমের সাম্রাজ্যবাদীরা কখনো পদার্পণ করেনি, যে জনগোষ্ঠীর সভ্যতা-সংস্কৃতি সভ্যজগতের স্বীকৃতি পায়নি; যাদের দারিদ্র্য ছিল চিরন্তন, সেদেশের মানুষ নিরক্ষর এক পুরুষের নেতৃত্বে সংহত হয়ে, বাহুবলে, মনোবলে ও নৈতিক চেতনাবলে ঋদ্ধ হয়ে জগজ্জয়ী শক্তিরূপে আত্মবিকাশের ও আত্মবিস্তারের সুমহান দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। ইসলামের বাণী প্রচারে, বাণিজ্য প্রসারে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে ছিল তাদের সমান আগ্রহ। এই আগ্রহকে ছাপিয়ে উঠেছিল তাদের জ্ঞানস্পৃহা ও সৃজনোদ্যম। উত্তর আফ্রিকা থেকে গোবী-ককেসাস এবং স্পেন থেকে ভারত-ইন্দোনেশিয়া অবধি তাদের ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক আত্ম-বিস্তার তাদের ধনলিপ্সা ও জ্ঞানতৃষ্ণা দুই-ই মিটিয়ে ছিল। মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি বলতে যা' বোঝায়, তার সামান্য অংশই ইসলামের উদ্ভব ক্ষেত্র আরবের। অবশিষ্ট সবটাই ইরানী মিশরী ও মধ্য-এশীয় মনীষার ফসল। আরবী ধর্ম মতের অঙ্গীকার, আরবী হরফ ও আরবী ভাষার মাধ্যমে তা' অভিব্যক্ত বলেই, সাধারণের চোখে সবটাই ইসলামী ও আরবী। আরবী ভাষা ও বর্ণমালা যে আরব বহির্ভূত অঞ্চলে চালু হল তা' ইসলাম প্রীতির প্রসূন নয়, আব্বাসীয় আমল অবধি অবিচ্ছিন্ন আরব শাসনের ফল। বিজিত জাতির উপর বিজেতার ধর্ম-বর্ণ-ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার রীতি সাম্রাজ্যবাদের যমজ। কাজেই এ নতুন কিছু নয়।

আদি মধ্যযুগের সেই অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার জগতে কার্ডোভায় কায়রোয় বাগদাদে সমরখন্দে বোখারায় বসে ভাবুক জ্ঞানী মনীষীরা বিভিন্ন বিষয়ে হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন। অধিকাংশ কালে নষ্ট হওয়ার পরেও আজো যে-সব আরবী-ফারসী পুথি অবিলুপ্ত ও বিলুপ্ত পুথির যে-সব নাম জানা যায়, তাদের সংখ্যাও

বিপুল। কাগজবিরল ছাপাখানা বিহীন যুগে মানুষের এই প্রয়াসই সাক্ষ্য দেয় তাদের জ্ঞান-পিপাসা ও সৃষ্টিশীলতা ছিল কত প্রবল। ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা, পদার্থ বিদ্যা, গণিত, ভূগোল, চিকিৎসা শাস্ত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি বিষয়ে তাদের অধ্যবসায়, সাধনা-নিষ্ঠা এবং কোন কোন শাখায় উৎকর্ষ বিস্ময়কর। শোনা যায়, নয় শতকের ঐতিহাসিক তাবারী সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লিখে একশ পঞ্চাশ খণ্ডে এক বিরাটকায় ইতিহাস রচনা করেছিলেন। বারো শতকের লেখক দামাস্কবাসী এবনে আসাকি আশি খণ্ডে এবং বাগদাদবাসী অপর একজন একশ' খণ্ডে সাহিত্যামোদীদের বিবরণ রচনার মতো নিষ্ফল কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আদি মধ্যযুগের দামাস্কে বাগদাদে সাধারণের সাহিত্য প্রীতি প্রাবচনিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

কিন্তু ভারতের মাটিতে এমন অধ্যবসায়ী জ্ঞানী-মনীষী কবি-লিখিয়ে মুসলিমের জন্ম ক্বচিৎ হয়েছে। আমীর খুসরু থেকে গালিব অবধি কবির কিংবা ফিরিস্তা থেকে সিহাবুদ্দিন তালিস অবধি ঐতিহাসিকের কেউ দেশজ মুসলিম সন্তান নন। অন্যক্ষেত্রেও তা-ই। মাহমুদ গাওয়ান প্রভৃতি দু'চারজন ব্যতীত ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তথা রাজপদে বা আমীর পদে কোন দেশজ মুসলিমকে সুদীর্ঘ আটশ' বছরের মধ্যে দেখা যায়নি। এর কয়েকটি কারণ অনুমান করা চলে। এক ভারতে ইসলাম প্রচারক দরবেশরা অতিমাত্রায় অধ্যাত্মবাদী ছিলেন বলে কোরআন-সুন্নার যে-সব বাণী আরবদের পার্থিব জীবনে ও কর্মে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেসব বাণী এদেশে গুরুত্বসহকারে উচ্চারিত হয়নি. দুই, তুর্কী-মুঘল বিজেতারা এখানে পরাক্রান্ত রাজশক্তি হিসেবে এসেছে, আরবদের মতো নবলব্ধ বিশ্বাস-চেতনায় দৃপ্ত হয়ে আত্মপ্রত্যয়ী মুযাহিদ বেশে আসেনি, তাই তুর্কী-মুঘলেরা দেশজ মুসলিমের সংখ্যা ও সমর্থন কাজে লাগালেও, তাদের কাছে ঘেষতে দেয়নি মুঘল আমলের শেষদিন অবধি, যেমন দেয়নি ইংরেজেরা দেশী খ্রীস্টানদের। ইরান ও মধ্য এশিয়ার মুসলমান এসেছে এবং আনা হয়েছে ভাড়াটে সৈনিক ও কর্মচারী হিসেবে—এবং দেশী মুসলিম সিপাই উঁচু পদে নিয়োগ পায়নি। অবস্থা অবিকল ইংরেজ আমলের মতো ছিল বলে মনে হয়। খ্রীস্টানসংখ্যা বৃদ্ধির আগ্রহ থাকলেও ইংরেজরা দেশী খ্রীস্টানকে স্বজাতি বা স্বসমাজী বলে স্বীকার করেনি। রাজনীতির নিয়মে হিন্দু ও মুসলিমরা উঁচুপদ পেয়েছিল; কিন্তু খ্রীস্টান বলে কেউ উঁচুপদ পাইনি, শাসকের অংশ বিলেতী লোকেই পেয়েছে। তিন, এমনও হতে পারে যে দেশজ মুসলিমদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের ও উচ্চ বিত্তের মানুষ বিরল ছিল। বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে হাজার বছরের অবজ্ঞেয় জীবন জীবিকা নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষদের উচ্চাভিলাষ, আত্ম-বিশ্বাস,

সাহস ও শক্তি বিলুপ্ত করেছিল। তাদের মধ্যে শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না। তাই সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রে তাদের কোন উল্লেখ্য কৃতি নেই। এদের কেউ কেউ মুন্সী-মোল্লা-কাজী-খোন্দকার-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-গোমস্তা-উকিল হয়েই কৃতার্থ হয়েছে। তাই গোটা ভারতে দেশী মুসলিমরা ইসলামী প্রেরণার প্রসাদ কিংবা সাম্রাজ্যিক শোষণজাত সম্পদ অথবা স্বাধীনতার গৌরব থেকে বঞ্চিত থেকেছে চিরকাল।

মুসলিমরা ইতিহাসপ্রিয় বলে সুনাম আছে। কিন্তু বাঙলাদেশের দুর্ভাগ্য তেরো শতক থেকে ষোল শতক অবধি বাঙলায় বসে কেউ বাঙলাদেশের রাজনীতিক ইতিহাস রচনা করেনি। মুঘল আমলে কেবল বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হতে দেখি। তাও সর্বশেষ ইতিহাসে (রিয়াজুসসালাতিন ১৭৮৮ খ্রীঃ) ছাড়া কোন-টাতেই বাঙলার ধারাবাহিক ইতিহাস মেলে না। আশ্চর্য স্বাধীন সুলতানী আমলের দুশ' বছরের মধ্যে ইলিয়াস শাহী ও মাহমুদ শাহী রাজত্বের স্বর্ণ যুগেও কোন একটি ইতিবৃত্ত রচিত হয়নি। মুঘল-পূর্ব যুগের বলে কথিত অধুনালুপ্ত (তওয়া-রীখ-ই বাঙ্গালা) ও পাণ্ডুয়ার পাণ্ডুলিপির (হ্যামিলটন-বুকানন উল্লেখিত) খবর জানা আছে বটে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের বর্ণিত কাল-পরিসর কিংবা রচনাকাল অজ্ঞাত। এর কারণ হয়তো এই নদী-হাওর আকীর্ণ বৃষ্টিবহুল ও আর্দ্র আবহাও-য়ার এই বাঙলাদেশে—অবজ্ঞায় যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'দোজখপুর আজ নিয়ামত পুর', রোজগারের লোভে যারা এসেছে, তারা কেউ এখানে দীর্ঘদিন বাস করেনি। ধন-লিপ্সা ও অস্বস্তি তাদের মন-মেজাজ হয়তো আচ্ছন্ন করে রাখত। তুর্কী আমলে এদেশে যে বিদেশী বেশী আসেনি, তার পরোক্ষ প্রমাণ মেলে রাজকার্যে-ব্যবসায়িক কর্মে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য ও হিন্দু 'পাইক' বাহিনীর অস্তিত্বে। মুঘল আমলের মতো হয়তো উচ্চ শিক্ষিত ও বিদ্বান রাজপুরুষেরও অভাব ছিল এখানে। তাই এখানে বিদ্যাচর্চার তেমন কোন দরবারী ও নাগরিক পরিবেশ গড়ে উঠেনি। তাছাড়া প্রশাসনিক ভাষা ফারসীও ছিল শাসক-শাসিতের পক্ষে বিদেশী বিভাষা। আত্ম প্রকাশের পক্ষে ভাষাগত বাধা তুচ্ছ নয়। নইলে সুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যোৎসাহী যে ছিলেন না তা নয়, প্রশাসনিক প্রয়োজনে ও বিদ্যানুরাগ বশে তাঁরাও দরবারে হিন্দু কবি-পণ্ডিত পুষতেন, মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞও রাখতেন। কাজেই ফারসীভাষী কবি-মনীষী ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-লিখিয়ে থাকলে তাঁদেরও সমাদৃত ঠাঁই হত দরবারে। আর দেশজ মুসলিমের অধিকাংশই যে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধের সন্তান' তা আজকাল কেউ অস্বীকার করেনা। তাদের মধ্যে কখনো লেখা পড়ার ঐতিহ্য ও রেওয়াজ যে ছিল না তার প্রমাণ সে শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানে

এখনো বিদ্যমান। আর বিদেশীর প্রবাসী-মনে স্থানীয় মাটি ও মানুষের মায়া কখনো জাগেনি বলে তারা ইরান ও মধ্য এশিয়ার অনুকৃত সংস্কৃতি নিয়েই ছিল তুষ্ট ও গর্বিত। উর্দু ভাষার উদ্ভবের পূর্ব-মুহূর্ত অবধি এদের মন ছিল অস্বস্থ ও অস্থির, চেতনা ছিল বহির্মুখী। আবদুর রহমান, মালিক মুহম্মদ জায়সী, কুতবন, উসমান, মিয়া সাধনরা দেশী ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন বটে, কিন্তু ভাব-চিন্তা পুরোনো অধ্যাত্মবাদীর। দেশজ মুসলিমদের সমস্যাও তাই। দেশের ঐতিহ্য অস্বীকার করতে হচ্ছে; আদর্শিক ঐতিহ্যও অনায়ত্ত। একটি পরিত্যাজ্য; অপরটা অপ্রাপ্য। কাজেই তারা নিঃস্ব ও নিষ্ক্রিয়। বহির্মুখী দৃষ্টির উদ্ভবের অন্য এক গভীর কারণও ছিল।

আমরা দেখেছি মদিনা থেকে মুলতান অবধি ইসলামের প্রসার ছিল অবাধ, জনগণ ইসলামে দীক্ষিত; অমুসলিম প্রতিবেশীর অভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা প্রবল হতে পারেনি। ফলে পূর্ব-পুরুষের ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি পরিহার বা অস্বীকার করার গরজ বোধ করেনি তারা। কিন্তু উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে ইসলাম আর অবাধ গতিতে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে প্রসার লাভ করেনি। ইসলাম বাধা পেল পাঞ্জাবে। ভারতে ইসলামের মোকাবেলায় ও প্রভাবে স্বাধিকার বঞ্চিত অস্পৃশ্যদের মনে যে চেতনা ও দ্রোহ জাগে, তার ফলে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ভক্তিবাদ ও সন্তধর্মের উদ্ভব হয়। এতে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ভাঙল বটে, কিন্তু ইসলামের প্রসারও রুদ্ধ হল। অতএব ভারতে দেশজ মুসলিমরা ও শাসক গোষ্ঠীরা ছিল নগণ্য সংখ্যালঘু। Minority Complex আত্মরক্ষণ বৃত্তির প্রেরণায় সংকীর্ণতা, বর্জনশীলতা ও স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির জন্ম দেয়। বহিরাগত ও দীক্ষিত মুসলিমের সংখ্যাল্পতাও এদেশের মাটি ও মানুষকে পরভাবার প্রেরণা দিয়েছে, এক্ষেত্রে স্বধর্মী পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য-সংস্কৃতিই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায়।

কাজেই ঐতিহ্যবিরহী দেশজ মুসলিমরা রইল দরবারী সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আর এদের মধ্যে যারা সাক্ষর মুন্সী-মোল্লা-কাজী-খোন্দকার-মৌলবী-মুয়াজ্জীন-গোমস্তা-মুৎসুদ্দী-উকিল তারাই পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য ও মানস প্রভাবে 'সূফী' নামের দেশী যোগ-তন্ত্র-ভিত্তিক কায়া সাধনে ও দেহাত্মবাদে আশ্বস্ত বোধ করে। এদের মধ্যে সৃজনশীলতা ছিল না কখনো, তাই মুসলিম রচিত বাঙলা সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব অনুবাদ কিংবা অনুকরণ মাত্র। এবং এদের রচনায় লোকায়ত বিশ্বাস ও লোক-সংস্কৃতির প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। তাই নিরক্ষর গ্রামবাসীই এ সাহিত্যের শ্রোতা, সাক্ষর গ্রামবাসী এর পড়ুয়া ও গাইয়ে।

দেশজ মুসলমানেরা বাঙলা সাহিত্যের চর্চা শুরু করেছে প্রায় হিন্দুদের সমকালেই। তার কারণ তারা বাঙালী এবং ঐ ভাষা ব্যতীত তাদের অন্য কোন ভাষা জানা

ছিল না। দীক্ষিত দেশজ সংখ্যালঘু মুসলমানরা নববৃত বিদেশী শাস্ত্র ও সংস্কৃতি আশ্রয় করে স্বাতন্ত্র্যলাভের আত্যন্তিক আগ্রহে সংখ্যাগুরু প্রতিবেশীর জ্ঞাতিত্ব ও পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য যে পরিমাণে সচেতনভাবে পরিহারে সচেষ্ট হয়, ঠিক সেই অনুপাতেই নিজেদেরকে আরব-ইরানী-তুর্কী-মুঘলদের জ্ঞাতি বলে ভাবতে আগ্রহী হয়। এতে তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীরও প্রয়োজনবুদ্ধি প্রসূত প্রশ্রয় এবং উস্কানি ছিল। স্বধর্মীর জাতীয়তাবোধের নিশ্চিত আশ্রয় ও প্রচ্ছায়া সংখ্যালঘুর স্বতন্ত্রসত্তার নিরাপত্তার জন্যেই তেমন অবস্থায় একান্ত কাম্য হয়ে উঠে। বাঙালী মুসলমানে এ প্রয়োজনবুদ্ধি এখনো প্রবল। দীক্ষা গ্রহণের মুহূর্তে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল ইসলামী আচারে আচরণে, রীতি-রেওয়াজে যথাসাধ্য নিষ্ঠ হওয়া এবং পূর্ব পুরুষদের তথা প্রতিবেশী 'কাফেরে'র সব কিছু ভোলার ও বর্জন করার জন্যে ঐকান্তিক চেষ্টা করা। নইলে গোড়ার দিকের নগণ্য সংখ্যক দীক্ষিত মুসলিমের স্বধর্ম নিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হত। আমরা আঠারো-উনিশ শতকে দেশী খ্রীস্টানদের এমনি প্রয়াস প্রত্যক্ষ করেছি। তারও আগে পর্তুগীজদের হাতে দীক্ষিত বাঙালীদের তেমনি উগ্র স্বাতন্ত্র্য চেতনার সাক্ষ্যও দুর্লভ নয়। কোন শাস্ত্র অঙ্গীকার করলে প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, পোষাকে পার্বণে তা প্রকটিত হয়-ই। কাজেই নিরক্ষর নির্বিত্ত ও অপাংক্তেয় শ্রেণীর হলেও তাদের স্বাতন্ত্র্য চেতনা দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছিল এবং অক্ষমের স্বাতন্ত্র্য চেতনা—আত্মোন্নয়নে নয়—বর্জনশীলতায় থাকে সীমিত। বাঙলা সাহিত্য চর্চায় এদের সেই বর্জনশীল মনই কাজ করেছে। আগেই বলেছি এরা সৃজনশীল ছিল না, অনুবাদ-অনুকরণই ছিল অবলম্বন। বন্ধ্যা মনের এ-নীতিই স্বাভাবিক। যেমন অক্ষম মুসলিমের স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি Red Cross-কে Red Crescent বানিয়েছে। তুর্কী বিজয়ে আশ্বস্ত ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রপতির হুমকি মুক্ত সংখ্যাগুরু হিন্দু-জনগণ তাদের লোকায়ত বিশ্বাস ও লৌকিকদেবতার মাহাত্ম্য কথা উৎসবে-পার্বণে-আসরে, নাচ-গান-বাজনা সহযোগে অত্যুৎসাহে প্রচার করতে থাকে।

নবদীক্ষিত মুসলমানরা মানবিক রসতৃষ্ণা ছাড়াও একটা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াল। যে-দেবতায় আস্থা হারিয়ে তারা ইসলাম বরণ করেছে, সে দেবকাহিনী শোনাতে নৈতিক-শাস্ত্রিক বাধার অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিও ক্রিয়াশীল ছিল। ধর্মমতও রাজনৈতিক মতের মতো দলীয় আনুগত্য, পরদল বিদ্বেষ ও পরনীতিতে অনাস্থা দাবী করে। বিদলীয় লোকমাত্রই পর, শত্রু ও সন্দেহভাজন। কাজেই হিন্দুর নৃত্য-গীত-বাদ্যের আসরে তার উপস্থিতি আত্মরক্ষার ও আত্মসম্মানের পক্ষে ক্ষতিকর। অথচ রস-পিপাসা তারও আছে। এদিকে আবার ধর্ম কথার যথেচ্ছ প্রয়োগ ও ব্যবহার পাপ-জনক। শাস্ত্রকারেরা জীবিকা সম্পৃক্ত শ্রেণীস্বার্থেই এক্ষেত্রে অধিকার ভেদ ও

ব্যবহার ভেদ সীমিত করে দিয়েছেন। শাস্ত্রের লিখিত তর্জমা করা পাপ, অন্যায়। যদিও মৌখিক তর্জমা চিরকাল চালু ছিল। কাজেই হিন্দুর মতো ধর্মকথার আসর করতে সাহস পেলনা তারা (যদিও কৃষ্ণ কথকতার আদলে মিলাদের-মহফিলের উদ্ভব হয়েছে পরে,—হরির লুটের অনুকরণে মিষ্টি বিতরণও মিলাদের অপরিহার্য অঙ্গ]। কাজেই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে হিন্দুর জলসা বর্জনের এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যের মানবিক চাহিদা পূরণের উপায় স্বরূপ ধর্ম নিরপেক্ষ মানব রসাশ্রিত বিষয় নিয়ে আনন্দের আয়োজন করল তারা। সে বিষয় হল রূপকথা-প্রণয় কথা। অবশ্য পরে 'রামায়ণ-মহাভারত-পঞ্চতন্ত্রে'র কাহিনীর আদলে আলেফ লায়লা, শাহনামা ও ইসলামের উন্মেষ-যুগের নামসার বীরদের কাল্পনিক প্রেম ও বীরত্বগাথা অবলম্বন করে তারাও আসর জমিয়েছে। আগেই বলেছি, এতে মৌলিকতা সামান্যই ছিল। এমনকি আঠারো শতকের দিকে চৈতন্য-অপহরণের অনুকরণে ইমাম চুরির কাহিনীও রচিত হয়েছে (হাসান-হোসেন অপহরণ), জন্মাষ্টমী কাহিনীর অনুকরণে জন্ম মুহূর্তে মুহম্মদ হত্যার ষড়যন্ত্রও কল্পিত হয়েছে।

তবু নবদীক্ষিতের সতর্কতা ও সচেতনতা যখন কাল প্রবাহে বিলুপ্ত হল, তাদের সংখ্যাও গাঁয়ে গাঁয়ে বৃদ্ধি পেল এবং minority complex-ও তীব্রতা হারাল, তখন মুসলিমরা হিন্দুর আসরে দেব-ধর্ম কথা, পুরাণ প্রসঙ্গ, রামায়ণ কথা ও মহাভারত কাহিনী প্রভৃতি শুনেছে এবং পড়েওছে:

"কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি।
হিন্দু-মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা কেহ ন সোঙরে।
গ্রহশত রস যুগে অব্দ গোঞাইল
দেশী ভাষে এহি কথা কেহ ন কহিল।"

—(নবীবংশ সৈয়দ সুলতান)

তারই নিদর্শন মেলে মুসলিম রচিত সাহিত্যে, প্রযুক্ত উপমায়, উৎপেক্ষায় ও প্রাসঙ্গিক বর্ণনায়।

মধ্য যুগের মুসলিমরচিত সাহিত্যের অধিকাংশ মিলেছে চট্টগ্রামে। মোটা-মুটিভাবে দ্বিতীয়শতক থেকে চট্টগ্রাম প্রায়ই হরিকেল কিংবা আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। ফলে বাঙলাদেশের এই প্রত্যন্ত অঞ্চল ছিল স্বভাষী ও স্বধর্মীর বৃহত্তর এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন। বিদেশী বিভাষী বিধর্মী আরাকানী শাসনে তাদের জাতিসত্তার

স্বাতন্ত্র্য রক্ষার গরজেই তাদের ভাষা-সাহিত্য ও শাস্ত্র-সংস্কৃতির পরিচর্যার ও অনুশীলনের দায়িত্ব তারা সচেতন ভাবেই গ্রহণ করে। বিরুদ্ধ পরিবেশে যে-কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বা সমাজের মধ্যে আমরা এমনি স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও তজ্জাত রক্ষণশীলতা, ঐতিহ্যানুসরণের প্রবণতা ও স্বভাষা-সাহিত্য, শাস্ত্র ও সংস্কৃতির অনুশীলনে প্রযত্ন দেখতে পাই। একই সময়ে ভারতের অন্যত্র মুসলিমরা ফারসীতে এবং বিশেষ করে ফারসীর মিশ্রণে গড়ে তোলা ও ফারসী হরফে লেখা দাখিনী ও উত্তর ভারতীয় উর্দূ ভাষায় সাহিত্য, শাস্ত্র ও সংস্কৃতি চর্চা করে। কিন্তু বিধর্মী শাসনে চট্টগ্রামবাসীর কিংবা ত্রিপুরারাজ্যভুক্ত কুমিল্লা-নোয়াখালীবাসীর সে-সুযোগ ছিল না। তাই তারা স্বস্ব দেশীভাষার মাধ্যমে আত্মরক্ষায় ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়। এই জন্যে চট্টগ্রাম বিভাগে ও রোসাঙ্গে মুসলিমরচিত বাঙলা সাহিত্যের বহুল চর্চা দেখতে পাই।

॥ ২ ॥

বাঙলা প্রণয়োপাখ্যানের উৎস

মুসলমানেরাই যে এদেশে মানবিক-রসাশ্রিত সাহিত্যধারার প্রবর্তন করেন, এ তথ্য এখন আর কারুর কাছেই নতুন নয়। পূর্বোক্ত কারণ ছাড়াও এটি হচ্ছে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের পরিচয় একই সূত্রে ও একই সময়ে ঘটলেও প্রভাবের তারতম্য ঘটেছে বিস্তর। অপেক্ষাকৃত সংস্কারভারমুক্ত একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি স্বীকরণে সহায়তা করেছে প্রচুর, কিন্তু সংস্কার-পঙ্গু হিন্দুর পক্ষে ছয়শ' বছরেও তা সম্ভব হয়ে উঠে নি। তাই মুসলমানেরা যখন আধুনিক সংজ্ঞার 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' সৃষ্টি করেছিল, তখনও হিন্দুরা দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহ ত্যাগ করতে পারেনি। চর্যাকার থেকে কবিওয়ালা অবধি হিন্দুর হাতে দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক ধর্মীয় প্রচার সাহিত্যই পেয়েছি। ধর্মভাব জাগানো এর লক্ষ্য—সাহিত্যশিল্প এর আনুষঙ্গিক রূপ এবং সাহিত্য-রস এর আকস্মিক ফল। অপর দিকে মুসলমানদের হাতে বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট ও পুষ্ট হতে থাকে।

মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিক রস বা মানবতা। একালে 'মানবতা' বলতে যা বোঝায়, এ কিন্তু তা নয়। এ মানবতা 'মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা'ই নির্দেশ করে। অর্থাৎ বিস্ময়-চঞ্চল কল্পচারী মানুষের প্রকৃতি, নিসর্গ ও মানস সৃষ্ট দেব-দানব সম্বন্ধীয় আদিম কৌতূহল চোখে-দেখা মানব-

মুখী হয়ে উঠে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে ওরাও রইল, মানুষকেও জিজ্ঞাসার বিষয় করে নিল। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, লৌকিক ও অলৌকিক, স্বপ্ন ও কল্পনা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের কোন সীমারেখা স্বীকৃত নয় এ লোকে। নদী-নগরী, গিরি-মরু-কান্তার, আকাশ-মাটি-সাগর ও স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে দেব-মানব রক্ষঃ-যক্ষের সমবায়ে গড়ে উঠেছে এ জগৎ। বাহুবল, মনোবল আর বিলাস-বাঞ্ছাই সে জীবনের আদর্শ। সংগ্রামশীলতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সে-জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এক কথায়, সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে প্রকটিত।

সংস্কৃতেতর ভারতিক ভাষায় প্রথম বিশুদ্ধ সাহিত্যিক শালীন রচনা হচ্ছে আবদুর রহমানের 'সংনেহয়-রাসয়' বা 'সন্দেশ রাসক'। এটি হচ্ছে একটি দূত-কাব্য এবং বারো শতকে অপভ্রংশে বা অবহট্‌ঠে রচিত। মূলতানবাসী কবি আবদুর রহমান তাঁতী মীর হোসেনের সন্তান।[১] অতএব দেশজ মুসলমান।

অপভ্রষ্টে বা অবহট্‌ঠে রচিত দ্বিতীয় কাব্যের নাম 'পহুরিয়ার রাসউ' বা 'পৃথ্বী-রাজ রাসক'। এর রচয়িতা চন্দ বলিদ্দ বা চন্দ বরদাই। জনপ্রিয়তার ফলে ভাষা ক্রমে আধা-হিন্দিতে রূপান্তরিত হওয়ায়, এটি কালে আদি হিন্দি কাব্য রূপে প্রখ্যাত হয়।[২] এ দুটোই 'দিওয়ান' জাতের কাব্য। আনন্দ ধর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ মিশ্রিত কাব্য 'মাধাবানল-কামকন্দলা'ও এখানে উল্লেখ্য।

এদিকে দাক্ষিণাত্যে তেলেগু ভাষাতে দণ্ডীর সংস্কৃত 'দশ কুমার চরিত'-এর তেরো শতকে কৃত একটি পদ্যানুবাদ পাওয়া গেছে।[৩] পাঞ্জাবী লৌকিক ভাষায় রচিত গানের আদি নিদর্শন মিলেছে শিখ গুরু অর্জুনের আদিগ্রন্থে। এ অধ্যাত্ম সঙ্গীত রচনা করেছেন নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মুর্শিদ, সাধক কবি শেখ ফরীদুদ্দীন শকরগঞ্জ (মৃ: ১২৬৭ খ্রী:)।[৪] হিন্দি ভাষায় প্রথম কবি লোদী-দরবারের আমীর খুসরু (১২৫৪-১৩২৫ খ্রী:)। ইনি হিন্দিতে কবিতা, গান ও প্রহেলিকা রচনা করেছেন।

১. ক. বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ : সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা : পৃ: ১।
   খ. ইসলামি বাংলা সাহিত্য : ডক্টর সুকুমার সেন : পঃ ২।
২. ক. বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : ডক্টর আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ : সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা : পৃ: ১।
   খ. ইসলামি বাংলা সাহিত্য : ডক্টর সুকুমার সেন : পৃ: ২।
৩. ক. বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বকাওলী, পৃ: ১।
৪. History and Culture of the Indian people : Vol. v, p 377.

কবি দামোর 'লক্ষ্মণ সেন পদ্মাবতী কথা' রচনার কাল নিয়ে মতভেদ আছে। রচনা শুরুর কাল কারুর মতে ১৫২৬ সংবৎ তথা ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ, আবার কেউ কেউ মনে করেছেন ১৫৭০ সংবৎ বা ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দ।[১] এটি উপাখ্যান। শাহ ফিরোজ তুঘলকের আমলে মালিক নাসিরের আদেশে লোকগাথা ভিত্তি করে হিন্দি-মস্‌নবী 'চান্দাইন' রচনা করেন কবি মোল্লা দাউদ। রচনা সন ৭৮১ হিজরী বা ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ।

এটি সূফী কবির তত্ত্বরসাত্মক মরমী গাথা।[২] কিন্তু মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ'ও হয়তো দাউদের মসনবীর পরেরকার রচনা নয়। এ অনুমানের সমর্থন মিলেছে ৯১১ হিজরী বা ১৫০৬ খ্রীস্টাব্দে লেখা মানের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তিতে।[৩]

অনুলিপিই যখন ১৫০৬ খ্রীস্টাব্দের, তখন মূল রচনার তারিখ নিঃসংশয় অনু-মানে বিশ-পঁচিশ বছর পিছিয়ে দেয়া যায়। পনেরো শতকের প্রথমার্ধের সিদ্ধি মরমী কবি সাধন আর 'মৈনাসৎ'-এর কবি মিয়া সাধন অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে কর-বার কারণ নেই। সাধন পূর্ব-উত্তর ভারতের কবি, এবং ভাষা ঠেঠ-হিন্দি (ভোজ-পুরী-অবধী ?)। সাধন ভগৎ যদি এ কাব্যের রচয়িতা হতেন, তা'হলে সিদ্ধি কবির হিন্দি বিশুদ্ধতর হত। অবশ্য 'মৈনাসৎ'ও অধ্যাত্মরূপক কাব্য। লোর চান্দা-ইনের অপর কবি সয়ফুল মূলুক বদিউজ্জামাল (১৬২৫ খ্রীঃ) ও তুতিনামা (১৬৪০) রচয়িতা গাওয়াসি, ইনি গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লাহ কুতুব শাহর দরবারে ছিলেন।

লোর-চন্দ্রানী উপাখ্যানের পরে রচিত হয় অধ্যাত্মরূপকাশ্রিত আখ্যায়িকা 'মৃগাবতী'। গৌড়-সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আশ্রিত জৌনপুরের শর্কী সুলতান হোসেন শাহর সভা-কবি কুতবন ৯০৯ হিজরী বা ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে এটি রচনা করেন :

নউ সউ নব জব সংবত অহী।
[জব] মোহর্‌রম চান্দ উজিয়ারী
য়হ কবি কহী পূরী সংয়ারী

১. ইসলামি বাংলা সাহিত্য : পৃঃ ৪।

২. বাংলা রোমাণ্টিক কাব্যের হিন্দি অবধী পটভূমি : মমতাজুর রহমান তরফদার : বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা : পৃঃ ৭-১৫।

৩. বাংলা রোমাণ্টিক কাব্যের হিন্দী অবধী পটভূমি : পৃঃ ১৪-১৫।

গাহা দোহা অবেল অরজ
সোরঠা চৌপহু কই সরজ
সাস্তর অখির বহুতই আয়ে
অউ দেসী চুনি চুনি কছুলায়ে।

[সুকুমার সেনের পাঠ : ইসলামি বাঙলা সাহিত্য]

অতএব, এটিও লোককাহিনী ভিত্তিক. আঠারো-বিশ শতকের কোন কোন বাঙলা উপাখ্যানে মৃগাবতীর অনুসরণ আছে। উনিশ শতকের কবি মুহম্মদ মুকিম মৃগাবতী বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু এ কাব্য আজও পাওয়া যায়নি।

এর পরে লোকসাহিত্যের জনপ্রিয় পুরোনো উপাখ্যান নিয়ে রূপকাশ্রিত 'মাধবানল কামকন্দলা' কাব্য রচনা করেন গণপতি (১৫২৭ খ্রীঃ)। কুতবন প্রভাবিত জায়সীর 'পদুমাবৎ' রচিত হয় ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে। 'পদুমাবৎ' রূপকাশ্রিত হলেও অতি উৎকৃষ্ট কাব্য।

অতএব, সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশেতর ভারতিক আর্য ভাষায় পনেরো শতকের আগে রচিত ধর্মনিরপেক্ষ উপাখ্যান একটিও নেই। পনেরো শতকের শেষার্ধের রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় মাত্র একটি। সেটি মোল্লা দাউদের মরমী গাথা চান্দাইন (১৪৮০ খ্রীঃ) ; এবং এ-সময়কার বলে অনুমান করা যায় আরো দুটো : দামোর 'লক্ষ্মণ সেন পদ্মাবতী কথা' (১৫৪৯ খ্রীঃ ?) এবং মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ' (১৫৭০-৮০ খ্রীঃ ?) আর সাধারণভাবে তেরো শতকের আগেকার রচনার কোন নিদর্শনই বাঙলায় ছাড়া [শেখ শুভোদয়ায়] অপর কোন আধুনিক ভারতিক আর্য ভাষায় মেলেনি। সে দিক দিয়ে দেখলে চর্যাগীতি যেমন দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে অর্বাচীনতম অবহট্‌ঠ ভাষার আদি নমুনা, তেমনি শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীঃ) ইউসুফ জোলায়খাই আদি প্রণয়োপাখ্যান। কেন না, কবি দাউদের 'চান্দাইন' অধ্যাত্মতত্ত্বরসাশ্রিত মসনবী কাব্য আর দামো ও সাধনের কাব্যের রচনা কাল অনিশ্চিত। নতুন কোন তথ্য-প্রমাণ না মেলা অবধি আমাদের এ মতই পোষণ করতে হবে। চর্যাগীত যেমন ভারতিক ভাষা-জগতে সন্ধি যুগের স্মারক স্তম্ভ, তেমনি 'ইউসুফ জোলায়খা'ও রোমান্টিক সাহিত্যের গৌরব মিনার।

ভারতে তুর্কী মুঘল অধিকার যেমন ইরানী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এরূপে বাঙালীরা ইরানী ও হিন্দি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এবং ঐ দু'টোর আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়েছে।

বাঙালী মুসলমান রচিত সাহিত্য মূলত অনুবাদ সাহিত্য। ফারসী-হিন্দি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে রোমান্টিক সাহিত্য এবং আরবী-ফারসী থেকে অনূদিত হয়েছে ধর্ম ও যুদ্ধবিষয়কগ্রন্থ। অনুবাদ বলতে আধুনিক সংজ্ঞায় যা বোঝায়, সবক্ষেত্রে ঠিক তা' ছিল না। অনুবাদ ছিল তিন প্রকারের : কায়িক, ছায়িক ও ভাবিক অর্থাৎ আক্ষরিক, স্বাধীন অনুসৃতি ও ভাবালম্বন।

ফারসী প্রণয়োপাখ্যানগুলো (কোন কোন হিন্দি আখ্যায়িকাও) প্রধানত সুফীতত্ত্বের রূপকাশ্রিত হলেও বাঙলায় তর্জমা হয়েছে লৌকিক প্রণয়োপাখ্যানরূপেই। তত্ত্বকথাকে এভাবে রস-কথায় রূপান্তরের প্রবণতার মধ্যে জীবনবাদী বাঙালী মানসের স্বরূপ ধরা পড়েছে। চর্যা-বাউল-বৈষ্ণব-মুর্শিদী প্রভৃতি অধ্যাত্মগীতির উদ্ভবক্ষেত্র বাঙলায় এ মানবিক রসপ্রীতি লক্ষণীয় ও বিশেষ অর্থপূর্ণ।

সে-যুগের হিসেবে বাঙলা রোমান্টিক সাহিত্য পরিমাণে প্রচুর, যদিও বৈশিষ্ট্যে বিচিত্র নয়। চৌদ্দ শতকের শেষ দশকে যার শুরু, বটতলার বদৌলতে আজ অবধি তার ইতি ঘটেনি। অধিকাংশ রোমান্স উনিশ-বিশ শতকে দোভাষী রীতিতে রচিত এবং রূপে-রসে নিতান্তই তুচ্ছ, আর ভাবে ও ভঙ্গীতেও বৈশিষ্ট্যহীন। বিশেষ করে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত লোকের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার পর ওসব রচনার আর কোন সাহিত্যিক মূল্যই নেই এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক মূল্যও নগণ্য। তাই আমরা ওগুলো বাদ দিয়ে আঠারো শতক অবধি রচিত ও জ্ঞাত রোমান্সগুলোর নাম করছি।

চৌদ্দ শতকের শেষ দশকে কিংবা পনেরো শতকের প্রথম দশকে রচিত হয় শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলায়খা'। ষোল শতকে পাচ্ছি দৌলত উজীর বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু', মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী', শাহ বারিদ খানের 'বিদ্যা সুন্দর'। সতেরো শতকের উপাখ্যান হচ্ছে : দোনা গাজীর 'সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জামাল', কাজী দৌলতের 'সতীময়না লোর চন্দ্রানী', আলাউলের 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল', 'সপ্তপয়কর', 'রতন-কলিকা-আনন্দ-বর্মা', মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী', আবদুল হাকিমের 'লালমতী সয়ফুল মুলুক', 'ইউসুফ জোলেখা', নওয়াজিশ খানের 'গুলে বকাউলী' পরাগুলের 'শাহপরীর কেচছা', মঙ্গল চাঁদের 'শাহ জালাল-মধুমালা' (এতে মঙ্গল-কাব্যের মর্মগত অনুকৃতি আছে), সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের 'জেবল মুলুক-সামারোখ', শরীফ শাহর 'লালমতী সয়ফুল মুলুক' আর আঠারো শতকে রচিত হয়েছে খলিলের 'চন্দ্রমুখী', মুহম্মদ আবদুল করিম খোন্দকারের 'তমিম আনসারী', রফিউদ্দিনের 'জেবলমুলুক সামারোখ', শাকের মাহমুদের 'মধুমালা-

মনোহর', নুর মুহম্মদের 'মধুমালা', রামজয়ের 'শশিচন্দ্রের পুঁথি', দ্বিজপশুপতির 'চন্দ্রাবলী' গরীবুল্লাহর 'ইউসুফ-জোলেখা', 'সোনাভান', সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী', 'জৈগুনের কেচ্ছা', মুহম্মদ আলী রাজার 'তমিমগোলাল চৈতুন্ন সিলাল', 'মিশরী জামাল', মুহম্মদ আলীর 'শাহ পরী-মলিক জাদা', 'হাসান বানু', আবদুর রজ্জাকের 'সয়ফুল মুলুক লালবানু', শমশের আলীর 'রেজওয়ান শাহ', মুহম্মদ জীবনের 'বানু হোসেন বাহরাম গোর', 'কামরূপ কালাকাম' প্রভৃতি।

৪

শাহ মুহম্মদ সগীর

শাহ মুহম্মদ সগীরকে [সগিরী ভণিতাও মেলে প্রাপ্ত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিতে] আমরা আজ অবধি প্রাপ্ত প্রাচীনতম বাঙলা কাব্যের কবি বলে বিশ্বাস করি। এ বিশ্বাস ভিত্তিহীন নয়। একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিতে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রাজপ্রশস্তির নিম্নলিখিত অংশটুকু পেয়েছিলেন, পাণ্ডুলিপি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। যে-কেউ এখনো দেখতে পারেন, পাণ্ডুলিপি রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত রয়েছে।

পয়ার ছন্দ

তিরতিএ পরনাম করোঁ রাজ্যক ইশ্বর
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর।
রাজরাজ্যেস্বর মৈদ্ধে ধাম্মিক পণ্ডিত
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত।
মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম্ম অবতার
মহা নরপতি গেছ্ পিরথিম্বীর সার।
ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ
পুত্র সিস্য হস্তে তিহঁ মাগে পরাজএ।
মোহাজন বাক্য ইহ পুরণ করিআ
লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িআ।
করুনা হীদএ রাজা পুণ্যবন্ততর
সবগুনে অসীম অতুল্য মনুহর।

পুন্নিমার চান্দ জেহ্ন বচন সোন্দর
মধুর মধুর বানী কহন্ত সোসর।
রমনী বল্লভ নির্প রসে অনুপমা
কনে বা কহিতে পারে সেগুন মহিমা।
জিনিলা নৃপতি সব করিআ সমর
জএ বাদ্য দুন্দুমি বাহন্ত উঞ্চসর।
ভক্ত বৎসল নির্প বিপক্ষ বিনাস
পরজা পালন করে জেহ্ন হাবিলাস।
জাবত জীবন মুঞি দেখিলুঁ ছি কাম
তাত ভক্তি বিনা 'ধিক নাহি আর ধাম।
মোহাম্মদ ছগীর তান আজ্ঞাক অধীন
তাহান আছুক জস ভুবন এ তিন।

১. একটি সংস্কৃত আপ্তবাক্যের অনুবাদ আছে এখানে 'সর্বত্র জয়ম ইচ্ছতে, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম'। আমরা জানি, গৌড় সুলতান সিকান্দর শাহর বিদ্রোহী পুত্র ছিলেন গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীঃ)। সোনারগাঁয়ে পিতা-পুত্রের যুদ্ধে পিতা নিহত হন। ফলে সোনারগাঁও কেন্দ্রী বঙ্গালের (বঙ্গ) এবং গৌড়ের অধীশ্বর হন আজম শাহ। কবি জনপ্রিয় আপ্তবাক্যের সাহায্যে বিদ্রোহী ও পিতৃহন্তা পুত্রের কলঙ্ক তোয়াজের ভাষায় যোগ্যপুত্রের সুকৃতি রূপে বর্ণনা করেছেন। শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমিন (মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৭১, পৃঃ ৬৫৪-৫৭) মনে করেন এই 'গেছ' আফগান সুলতান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ ১৫৫৬-৬০ খ্রীঃ। এঁর পিতা শামসুদ্দীন মুহম্মদ গাজী আদিল শাহ শুরের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। তিনিই পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে হৃতরাজ্য ও হৃতগৌরব পিতার যোগ্য ও কীর্তিমান পুত্ররূপে কীর্তিত হয়েছেন। কিন্তু নানা কারণে এ মত গ্রহণীয় নয়।

২. সব শাহ-সামন্তই চিরকাল নারী-বিলাসী। রমণীবল্লভ বলে উল্লেখের বিশেষ কারণ হচ্ছে, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর সরব, গুল ও লালা নামের তিনজন প্রিয় বেগম ছিলেন, যাঁরা তাঁর পূর্ব নির্দেশ মতো মৃত্যুর পর তাঁর শব স্নান করিয়ে কাফন পরিয়েছিলেন।

৩. 'বঙ্গাল' ও 'গৌড়'—শাসন কেন্দ্র হিসেবে পৃথকভাবে নির্দেশ করার মধ্যেও ১৩২২ খ্রীস্টাব্দ পরবর্তী এবং ১৪১০ খ্রীস্টাব্দ পূর্বকাল অন্তত আফগান

(১৫৩৮ খ্রীঃ) বা মুঘল বিজয় (১৫৭৫ খ্রীঃ) পূর্বকালই নির্দেশ করছে। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্র মৃত্যুও ঘটে সোনারগাঁয়।

৪. 'আল্লাহ্' অর্থে 'ধর্ম' শব্দের কাব্যে বহুল ব্যবহার প্রাচীনতার তথা বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবের পরিচায়ক, পরে মুসলিম রচনায় নিরঞ্জন এবং আরো পরে (কর্তার) 'করতার' ব্যবহৃত হয়েছে। ষোল শতকে কেবল দৌলত উজির 'ধর্ম' ব্যবহার করেছেন।

৫. নবী বা শাস্ত্র-সংপৃক্ত মুসলিম-ইতিকথার বাঙলা ভাষায় রূপায়নে-পাপভীতি ষোল শতক অবধিই মুসলিম কবির মনে প্রবল ছিল (পূর্ব অধ্যায়ে ভাষাবিদ্বেষ দ্রষ্টব্য)।

৬. এ কাব্য যে জামীর 'ইউসুফ জোলায়খা' কাব্যের অনুবাদ নয়—কিংবা ছায়া অবলম্বনে অথবা অনুকরণে রচিত নয়, তা কাহিনীর শেষাংশে ভারতীয় রাজ্যকন্যার সঙ্গে ইবনে আমিনের বিবাহ বর্ণনায় নয় কেবল, গোটা কাব্যেই নানা প্রসঙ্গে দেশী পরিবেশ বর্ণনা ও মৌলিক উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের মধ্যেই সুপ্রকট। কবি কিতাব-কোরআন দেখে কাব্য রচনা করেছেন বলে যখন স্বীকারই করেছেন, তখন জামীর কাব্যই আদর্শ হলে জামীর নাম নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। জোসেফের কাহিনী Old Testament-এ বিস্তৃতভাবে (১৪ অধ্যায়ে) বর্ণিত রয়েছে, বাইবেল ও কোরআনের মৌল কাহিনীতে তুচ্ছ কিছু পার্থক্য আছে মাত্র। বাইবেলেও জোলেখার নাম নেই, প্যাটিফারার স্ত্রী বলেই উল্লেখিত। কোরআনেও জোলায়খার নাম নেই এবং 'আজিজের স্ত্রী' 'সেই নারী' বলে ঘৃণার সঙ্গেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনে মোট ৯৭টি আয়াতে কাহিনীর মূল কাঠামো মেলে, কিন্তু এ কাহিনী মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে অন্যূন তিন হাজার সাতশ' বছর ধরে উত্তর আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে আবাল্যশ্রুত লোকপ্রিয় ঘরোয়া কিস্সায় পরিণতি পায়। ইসলামের প্রসারে, সুফীমতের জনপ্রিয়তায় ও দরবারী ভাষা হিসেবে ফারসীর বহুল প্রসারে লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, ও 'ইউসুফ-জোলেখা' কাহিনী সুফীর জীবাত্মা-পরমাত্মার তথা আল্লাহ্-বান্দার সম্পর্কের রূপক ও প্রতীক কাহিনী হিসেবে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই মুখে মুখে স্ফীত কলেবর ও চালু কিস্সা অবলম্বনে কাব্য রচনা এমন দুরূহ কর্ম নয়, উল্লেখ্য যে এ শতকেও জার্মান সাহিত্যিক টমাস মান 'জোসেফ এ্যাণ্ড হিজ ব্রাদারস' নামে বিপুলকায় উপন্যাস রচনা করেছেন—যা, এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বিশেষত কিস্সার কয়েকটি মূল-ঘটনা সর্বত্র অবিকৃত রয়েছে—যেমন জ্যাকোব-নবীর দুই পত্নীর গর্ভজাত (এগারো আর দুই) তেরো সন্তানের মধ্যে

জোসেফের প্রতি পিতার আত্যন্তিক স্নেহ, ঈর্ষু বৈমাত্রেয় ভাইদের তাঁকে হত্যার চেষ্টা, পরে কূপে পাতন, রক্তমাখা জামা নিয়ে পিতাকে প্রদর্শন, সওদাগর কর্তৃক কূপ থেকে ইউসুফের উদ্ধার, মিসরে চড়া দামে তাঁর বিক্রয়, আজিজ মিসির পত্নীর রূপতৃষ্ণা ও অসম্মত ইউসুফের নির্যাতন, পৃষ্ঠাংশে ছিন্ন জামাই সত্য ঘটনার নির্দেশক, ইউসুফের অতুল্য কায়াকান্তি ও নরনারীদের অভিভূতি, লেবু কাটতে আঙুল কর্তন, রাজার স্বপ্ন দর্শন ও ইউসুফ কর্তৃক স্বপ্ন ব্যাখ্যা, ভাবী দুর্ভিক্ষের জন্যে খাদ্য মৌজুদ-করণ প্রভৃতি সর্বত্র অভিন্ন। কাজেই গল্পের মূল কাঠামো জানার জন্যে কোন কাব্য-কেতাব দেখার প্রয়োজন ছিল না। এই গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ কোরআনে ও ফেরদৌসীর রচনায় মেলে। এ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সৈয়দ সুলতানও বলেন:

'শুনিছ এ সব পরস্তাব সর্বজনে
পদবন্ধে মুঞি না কহিনুঁ তেকারণে।' (নবীবংশ)

কবি স্বয়ং তাঁর গ্রন্থোপত্তির বিবরণ দিয়েছেন ও তাঁর অবলম্বিত আকর গ্রন্থের উল্লেখও করেছেন—কিতাব কোরান মধ্যে দেখিনুঁ বিশেষ/ইছুফ জলিখা কথা অমিয় অশেষ/কহিব কিতাব চাহি সুধারস পূরি।- এখানে 'কিতাব' কোরান মাঝে দেখিনুঁ এবং 'কিতাব চাহি'-ও লক্ষণীয়। অর্থাৎ ভাব বা ছায়াবলম্বন—অনুবাদ নয়।

৭. শাহ মুহম্মদ সগীর যে রাজকর্মচারী ছিলেন এবং রাজদরবারের আদব-কায়দা সম্বন্ধে যে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল তাও কাব্যসূত্রে প্রমাণিত [রাজদর্শনের কায়দা দ্রষ্টব্য]।

৮. কাব্যের ভাষায়ও কিছু কিছু প্রাচীন রূপ মেলে। উদ্ধৃতাংশেও কিছু মিলবে।

৯. সতেরো শতকের কবি রাজ্জাকনন্দন আবদুল হাকিম জামীর অনুসরণে ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচনা করেছেন, আঠারো শতকে করেছেন মঙ্গল কাব্যের আদলে ফকির গরীবুল্লাহ্ এঁদের তিন কাব্যে পার্থক্য সুপ্রকট। এ সব নানা কারণে আমরা শাহ মুহম্মদ সগীরকে প্রাপ্ত প্রাচীনতম কাব্যের রচয়িতা বলে বিশ্বাস করি।

১০. ১০৭৪ মঘী বা ১৭১২ সনে লিপীকৃত পুথির কোন কোন ভণিতায় সগিরি মেলে। শাহ মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ ভণিতাও রয়েছে। শাহ মুহম্মদ সগীর-এর মূল নাম হয়তো মোহাম্মদ, কোন 'সগীর' পীরের শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে হয়তো নামের সঙ্গে রিযবী, নকবী, ওসমানী, খালেদী, সোহরওয়ার্দী, চিশ্তি, নিযামী প্রভৃতির মতো 'সগীরী' যুক্ত করেছেন। অথবা উক্ত পাণ্ডুলিপিতে সগীর লিপিকর প্রমাদে 'সগিরী' হয়েছে। কবির ব্যক্তিগত কোন পরিচয় গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায় নি। তবে তাঁর শাহ উপাধি থেকে মনে হয় তিনি পীর-পরিবারে জন্মেছিলেন এবং হয়তো নিজেও 'পীর' ছিলেন। সগীরের কাব্যে বর্ণিত বিষয়সূচী নিম্নরূপ—

কাব্যে বর্ণিত বিষয়সূচী: ১. আল্লাহ ও রসুল স্তুতি ২. মাতাপিতা ও গুরু বন্দনা ৩. রাজ বন্দনা ৪. গ্রন্থোৎপত্তি ৫. তৈমুস রাজার কন্যা জোলেখার জন্মবৃত্তান্ত ৬. জোলেখার রূপ ৭. জোলেখার আভরণ ৮. জোলেখার প্রথম স্বপ্ন ৯. জোলেখার প্রেমোন্মেষ ১০. জোলেখার দ্বিতীয় স্বপ্ন ১১. জোলেখার প্রেমাভিব্যক্তি ১২. জোলেখার স্বপ্নাবির্ভূত পুরুষের অনুধ্যান ১৩. জোলেখার বিরহবিকার ১৪. জোলেখার তৃতীয় স্বপ্ন ১৫. জোলেখার স্বপ্নের বাস্তবায়ন মানসে স্বয়ম্বরের আয়োজন ১৬. তৈমুসরাজ কর্তৃক মিশরে দূত প্রেরণ ১৭. জোলেখা ও আজিজ মিসিরের সাক্ষাৎ ১৮. জোলেখার বিড়ম্বিত জীবনের শুরু ১৯. জোলেখার আক্ষেপ ২০. জোলেখার প্রার্থনা ২১. জোলেখার বিলাপ ২২. জোলেখার আকাশবাণী শ্রবণ ২৩. জোলেখা ও আজিজ মিসিরের বিবাহ ২৪. বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা ২৫. জোলেখার নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা ২৬. জোলেখার যন্ত্রণাক্লিষ্ট বারবাসী ২৭. ইউসুফের জন্ম ২৮. আম্বা প্রাপ্তি ২৯. ইউসুফের স্বপ্ন দর্শন ৩০. ভাইদের সঙ্গে বনে গমন ৩১. ভাইদের দ্বারা নির্যাতিত ও কূপে নিক্ষিপ্ত ইউসুফ ৩২. ইয়াকুব নবীর পুত্রশোক ৩৩. মনিরু সাধুর হাতে ইউসুফের উদ্ধার ৩৪. আজিজ মিসিরের কাছে ইউসুফকে বিক্রয়ের আয়োজন ৩৫. জোলেখার মূর্ছা ৩৬. ধাত্রীর প্রতি জোলেখার নিবেদন ৩৭. ইউসুফকে জোলেখা কর্তৃক ক্রয় ৩৮. ইউসুফ দর্শনে বারেহা সাধু কন্যার তত্ত্বজ্ঞান লাভ ৩৯. জোলেখা কর্তৃক ইউসুফকে বশ করবার ব্যর্থ প্রয়াস ৪০. ইউসুফে কামভাব দানে ধাত্রীর প্রয়াস ৪১. ইউসুফে কাম উদ্রিক্ত করাবার জন্যে জোলেখার টঙ্গী-সজ্জা ৪২. সপ্তখণ্ড টঙ্গীতে ইউসুফকে আনয়ন ৪৩. সপ্তখণ্ড টঙ্গীতে জোলেখার আর্তি প্রকাশ ৪৪. ইউসুফের নিকট জোলেখার যৌবন নিবেদন ও সম্ভোগে আহ্বান ৪৫. প্রত্যাখ্যাতা জোলেখার প্রতিহিংসা ৪৬. তিন মাসের শিশুর সাক্ষ্যে জোলেখার কলঙ্ক প্রচার ৪৭. কলঙ্ক স্খালনে জোলেখার ব্যর্থ প্রয়াস ৪৮. জোলেখা কর্তৃক কারারুদ্ধ ইউসুফের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ৪৯. জোলেখার অনুশোচনা ৫০. ইউসুফ সন্দর্শনে জোলেখার কারাগারে গমন ৫১. ইউসুফ কর্তৃক রাজার স্বপ্ন ব্যাখ্যা ৫২. ইউসুফের কারামুক্তি ৫৩. ইউসুফের আজিজ মিসির পদ লাভ ৫৪. ইউসুফের রাজত্বকালে জোলেখার যৌবনাবসান, বার্ধক্য ও অন্ধত্ব ৫৫. জোলেখার যৌবন প্রাপ্তি, ইউসুফের সঙ্গে বিবাহ ও বাসর ৫৬. জোলেখার দুইপুত্র লাভ ৫৭. মিসরে দুর্ভিক্ষ ৫৮. ধান ক্রয়ের জন্যে কেনান থেকে ইউসুফের ভাইদের মিসরে আগমন ৫৯. স্বদেশ প্রত্যা-বর্তন ও ইবনে আমীনকে নিয়ে পুনরাগমন ৬০. সহোদর ইবনে আমীনের সঙ্গে ইউসুফের পুনর্মিলন ও অতীত কাহিনী শ্রবণ ৬১. চুরির অপবাদে ইবনে আমীনকে মিসরে ধরে রাখা ৬২. পিতা ইয়াকুবের মিসর আগমন ও পিতা-পুত্রের মিলন

৬৩. ইউসুফের পুত্রদ্বয়ের বিবাহ ও রাজ্যভোগ ৬৪. ইউসুফের দিগ্বিজয় ও রাজশ্বের পদ লাভ ৬৫. ইউসুফের মৃগয়া যাত্রা এবং মধুপুররাজ শাহবাল-কন্যা বিধুপ্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ ৬৬. গন্ধর্বরাজ শাহবাল প্রাসাদে ইবনে আমীন কর্তৃক বিধুপ্রভা দর্শন ৬৭. বিধুপ্রভার সঙ্গে ইবনে আমীনের বিবাহ ৬৮. ইউসুফের মিশরাগমন ৬৯. মধুপুরে ইবনে আমীন ও আত্মীয়দর্শনে সস্ত্রীক মিশর গমন ৭০. মধুপুরে ইবনে আমীনের রাজা হয়ে স্থায়ীভাবে বাস।

ধর্মপ্রচারই নবীর প্রধান দায়িত্ব—এ চেতনাবশেই সগীর ধর্মপ্রচারার্থ ইউসুফের দিগ্বিজয় কাহিনী যোজনা করেছেন, আবার কাব্যোপযোগী রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি একটি রূপকথা দিয়ে কাব্য সমাপ্ত করেছেন। এ রূপকথার উপক্রম হিসেবে কবি অবতারণা করেছেন দিগ্বিজয়ী রাজা ইউসুফের মৃগয়া বিলাসের। মৃগয়া কালে ইউসুফ দেখলেন এক দ্রুতগামী আশ্চর্য পশুকে। তারই পিছু নিয়ে পৌঁছিলেন গভীর অরণ্যে এক সরোবর তীরে। সেখানে মন্দিরে পূজো দিতে এসেছিল মধুপুরের গন্ধর্ব রাজ শাহবালের কন্যা বিধুপ্রভা। তার কণ্ঠের সঙ্গীতসুরে আকৃষ্ট হয়ে ইউসুফ গেলেন তার সন্ধানে। পরিচয় হল উভয়ের। বিধুপ্রভা জানাল যে স্বপ্নে সে এক নবী পুত্রের প্রতি আসক্তা হয়েছে। ইউসুফ তাকে ইবনে আমীনের কথা বলে আশ্বস্ত করলেন। তারপর বিধুপ্রভার পোষা শুকের দৌত্যে ও ইউসুফের আহ্বানে ইবনে আমীন এল শাহবাল প্রাসাদে। সেও জানাল যে স্বপ্নে এক গন্ধর্ব রাজকন্যা প্রেমবাণে তার হৃদয় বিদ্ধ করেছে অনেক আগেই। কাজেই মহাড়ম্বরে স্বয়ংবরা হল বিধুপ্রভা। আমীন এমনি করে পেল রাজকন্যা ও রাজ্য। কেননা শাহবাল ছিলেন অপুত্রক।

ইউসুফের অনন্য সততা, সংযম, প্রজ্ঞা, তিতিক্ষা ও ক্ষমা এবং রূপবাঞ্ছার শিকার প্রবৃত্তিপরবশ জোলেখার প্রথমে সম্ভোগ স্পৃহা ও পরে কৃচ্ছ্রসাধনা এবং পরিণামে প্রেমিক নারীর কষিত কাঞ্চনের উজ্জ্বল্যে ও অকৃত্রিমতায়, পদ্মের পবিত্রতায় এবং গোলাপের রূপে ও গন্ধে উদ্ভাসন এ কাব্যকে শাস্ত্রগ্রন্থের মহিমা দান করেছে। কবির লক্ষ্যও ছিল তা ই। সেজন্যেই কবি গোড়াতেই বলেছেন—

কহিব কিতাব চাহি সুধারস পূরি
শুনহ ভক্তজন শ্রুতিঘট ভরি।
একচিত্তে শুনে যে এসব পরস্তাব
পুণ্য বাড়ে দুঃখ হরে যশ কীর্তি লাভ।

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ ফিরদৌসী, জামী ও সগীরের কাব্যে কাহিনীগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন।[১]

১. শৈশবাবস্থায় ইউসুফ ফুফুর গৃহে পালিত হন—এ ঘটনা ফিরদৌসী ও জামীর কাব্যে আছে, সগীরের কাব্যে নেই।

২. ইউসুফ সম্পর্কে ইয়াকুব নবীর স্বপ্নের কথা ফিরদৌসীর কাব্যে আছে, জামী ও সগীরের কাব্যে নেই।

৩. ফিরদৌসী লিখেছেন ইউসুফ পরপর তিন বছর তিনবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জামী ও সগীর তার একবার স্বপ্নের কথা বলেছেন।

৪. মায়ের কবর দেখে ইউসুফের ক্রন্দন, বণিকের তিরস্কার, কাফেলার ব্যাতাহতের কথা ফিরদৌসীর কাব্যে আছে, জামী ও সগীরের কাব্যে নেই।

৫. জোলেখার জন্ম বৃত্তান্ত, স্বপ্ন বৃত্তান্ত, আজিজের সহিত তাঁর বিবাহ বৃত্তান্ত ইত্যাদির বর্ণনা জামী ও সগীরের কাব্যে আছে, ফিরদৌসী এর কিছুই উল্লেখ করেন নি।

৬. ইউসুফের দাসরূপে নিলামে বিক্রয় স্থলে এক তকাল সূতা নিয়ে খরিদের আশায় এক বৃদ্ধার উপস্থিত হওয়ার কথা জামী ও সগীরের কাব্যে আছে, ফিরদৌসীর কাব্যে নেই।

৭. এক শ্রেষ্ঠী কন্যার প্রণয়াসক্তি এবং ইউসুফের উপদেশে বিরত হওয়া ও তত্ত্বধর্মে দীক্ষা গ্রহণের কথা জামী ও সগীর বর্ণনা করেছেন। ফিরদৌসীর কাব্যে এরূপ ঘটনা নাই।

৮. জনৈক বেদুইনের সাহায্যে পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণের কথা ফিরদৌসীর কাব্যে আছে। কিন্তু জামী ও সগীর তা উল্লেখ করেন নি।

৯. জোলেখার গর্ভে ইউসুফের দুই পুত্র লাভের কথা কেবল সগীরের কাব্যে আছে।

ইবিন আমিন এবং বিধুপ্রভার প্রণয়-পরিণয় বৃত্তান্ত সগীরের নিজস্ব কল্পনা, ফারসী কাব্যে তা নেই।

১. বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, পৃঃ ১৭৪-৭৫।

।। কাব্য পরিচিতি ।।

ধর্মোপদেশ দানই ছিল এ কাব্য রচনার মূলে :

'কহিব কিতাব চাহি সুধারসপুরি,
শুনহ ভকতজন শ্রুতিবট ভরি।...
পোথার বৃত্তান্ত যেবা চিত্ত দিয়া শুনে।
তাক কৃপা করে বহু প্রভু নিরঞ্জনে।।...
একচিত্তে শুনে যে এই সব পরস্তাব।
পুণ্য বাড়ে দুঃখ হরে যশ কৃতি লাভ।...

এতৎসত্ত্বেও কবি শুধু ধর্মপ্রাণ ছিলেন না, তাঁর মধ্যে একটি অতি কোমল কবিপ্রাণও ছিল—এ বিরাট কাব্যের নানাস্থানে তার সাক্ষ্য মিলে। করুণরস সৃষ্টিতে কবি সিদ্ধহস্ত।

স্বামীরূপে আজিজ মিসিরের প্রাসাদে দুঃখিনী জোলেখার উদভ্রান্ত অবস্থা বর্ণনায় কবি কিরূপ কারুণ্য সৃষ্টি করেছেন দেখুন :

গগনে তারক দেখি চাহে একমন।
তার সংগে কাহিনী কহয় সর্বক্ষণ।।
তুমি সব ভ্রমিতে আছহ রাত্রদিন।
তোমা অবিদিত নাহি ভুবন এ তিন।।
দুস্কের কাহিনী কহি গোঞায় রজনী।
বিশেষ তাপিত মন বিরহ আগুনি।।
চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ।
অরুণ উদয় হৈলে হয় আনমন।।
প্রভাতে পাখালে মুখ নয়নের জলে।
রুদিত বদন তান প্রতি উষাকালে।।

ইউসুফের ভাইরা বনের মধ্যে ইউসুফকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রহার করছে, এই বর্ণনাটিও হৃদয়বিদারক :

কোহ্ন ভাই করাঘাত অঙ্গেতে মারিল।
কেহো দুষ্ট বাণী বুলি কর্ণ মোচড়িল।।
কেহো মারিলেন্ত ঠেলা মারিয়া চাপর।
একে একে কাড়ি লৈল গায়ের কাপড়।।

কেঁহো ভাই ক্রোদ্ধ হই মারে অনুরাগে।
আর ভাই নিকটে যায়ন্ত দয়াভাগে ॥
সেহো ভাই ঠেলা দিয়া ফেলে এক পাশ।
আর ভাই কাছে গেল হইয়া হতাশ ॥
সেহো ভাই নিদয়া হৃদয় হৈয়া মারে।
আর ভাই নিকটে যায়ন্ত বস্ত্র আড়ে ॥
কোহ্ন ভাই মায়া নাই সবে মারে বেড়ি।
কান্দিতে লাগিলা তবে বাপ অনুসারি ॥

উত্তেজনা বিরহিত পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার এমন জীবন্ত ছবি কৃচিৎ মেলে।

ইউসুফের মৃত্যু সংবাদে এয়াকুব নবী শোকাকুল হয়ে যে বিলাপ করেছেন তা'ও কারুণ্যের নির্ঝর :

ইউসুফ একসর প্রাণের দোসর
চন্দ্রমুখ অবতার।
হেন পুত্রমুখ ন দেখি মন দুখ
ত্রিভুবন রূপসার ॥
বিনে পুত্র পিয়া বিদরয় হিয়া
কাতে কৈমু এহি কথা।
সর্বপ্রাণ মোর পুত্র গেল দূর
হৃদয় অন্তরে ব্যথা ॥
নয়ন পোতলি গেলেক নিকলি
আঁখি থাকি হৈলুঁ অন্ধ
গেল মোর বুদ্ধি নাহি কোন সুদ্ধি।
মোকে দিয়া গেল বন্ধ ॥ ...
মোর কর্মদোষ বিধি কৈল রোষ
কোন পাপ মোর বাধা।
যাই ভিন্ন দেশ ব্রহ্মচারী বেশ
পূরিতে মনের সাধা ॥
ঘরে ঘরে যাই পুত্র যথা পাই
পুত্র হেন ভিক্ষা মাগোঁ।
কোন ধর্ম শিক্ষা পুত্র দিব ভিক্ষা
তান পদগত লাগোঁ ॥

বুদ্ধদেব যে পুত্রশোকে উন্মত্ত লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁর কথা স্মর্তব্য। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে শোকপ্রকাশক অনেক কবিতা আছে। কিন্তু অল্প কথায় এমন মর্মভেদী বিলাপ বিরল।

কোমল হৃদয় কবি নায়িকা জোলেখার ব্যথায় এতই অভিভূত যে জোলেখার অন্যায় প্রার্থনাও তাঁর তুলিতে করুণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে:

মুই শুষ্ক শস্য তুমি জলদ নিপুণ।
বুন্দেক পড়িলে জল না হৈবেক ঊণ॥
যাচক তুলনা আমি তুমি দাতাজন।
ভক্ষ্যদান দিলে কভু ন টুটিব ধন॥
তুমি সুধাকর আমি তৃষ্ণায় বিকল।
আমা অল্প দিলে তোমা ন টুটিব জল॥
তুমি মহা কল্পতরু ফলিত নির্মল।
আমা এক ফল দিলে ন হৈব নিষ্ফল॥

চিরদুঃখিনী বিরহিণী জোলেখার আর একটি বেদনার অভিব্যক্তি:

নিশি উজাগর আঁখি ঝামর বদন।
পবনের সঙ্গে বাত কহে অনুক্ষণ॥
শুনরে পবন মোর দুঃখের কাহিনী।
দণ্ডেক বরিখ মোর দীঘল যামিনী॥
মোর পিয় স্থানে গিয়া কহরে সম্বাদ।
কেমন সহাস্য তান দাসী সঙ্গে বাদ॥
মলয়া সমীর মোর শমন সমান।
এ চান্দ চন্দন দেহ দহএ নিদান॥
সঘন গহন ঘন বিদ্যুৎ চমাকত।
নয়নে বহএ নীর চিত্ত বিচলিত।
কুসুম সুগন্ধি যত আগর চন্দন।
আতপে তাপিত তনু দহএ মদন॥

রূপ বর্ণনায়ও আমাদের প্রাচীনতম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর কারো চেয়ে কম রূপজ্ঞতার ও রসজ্ঞতার পরিচয় দেননি:

নানা কুসুমিত জ্যোতি দেখি চমকিত মতি
ঘন মধ্যে নক্ষত্র প্রকাশ॥

নয়ন খঞ্জন তুল   অঞ্জনে রঞ্জিত মূল
চঞ্চল চকোর সমুদিত
নিসিখে নির্ম্মল বাণ   কটাক্ষেতে সুসন্ধান
বিরহিণী পানা সচকিত।
শিষেত সিন্দূর ভাসে   যেন রবি পরকাশে
মুখচন্দ্র জ্যোতি সমুদিত
শ্রবণে গুম্ফিত মুক্তি   রতন কুণ্ডল জ্যোতি
তারা প্রভা জিনিয়া বিদিত।

অথবা-

ভুরু কাম চাপ জিনি লোচন কুরঙ্গ।
টাক্ষ বিষিখ বিখ নিমেখ তরঙ্গ ।।
কাজলে উঝল জুতি সর্বগুণজিৎ।
চমক ফরকে যেন চঞ্চল চরিত ।।
যুগল নয়ন জুতি চন্দ্র খর্বরূপ।
জগত জিনিয়া আঁখি তাহান আনোপ ।।
আঁখি জুতি বিভূতি সলিল রূপসিন্ধু।
তার মর্ম মধ্যেত মজিল শত ইন্দু ।।
কিবা চারু সচকিত চঞ্চল চকোর।
কিবা মধ্যে মধুকর সুধা রসে ভোর।
শ্রবণ গৃধিনী জিনি অতি সুললিত।
রত্নমণি কুন্তল দুলিত সুশোভিত ।।
উঞ্চল নাসিকা দণ্ড তিল ফুল জিত।
পরিমল পারিজাত গন্ধ আমোদিত ।।
পারিজাত কুসুম কোমল দেহকান্তি।
বিমল উঝল মুখ চন্দ্রে করে ভ্রান্তি।
বিদ্যুত উঝল দন্ত মুকুতা সঞ্চার।
কুচযুগ মধুপূর্ণ কাঞ্চন কটোর ।।
মধ্য দেশ সরু অতি সিংহজিৎ।
করীকুম্ভ নিতম্ব গুরুয়া গরবিত ।।   ইত্যাদি

প্রকৃতি বর্ণনায়ও কবির কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। কবির বর্ণিত জোলেখার বারমাসীতে বাঙলার ষড়ঋতুর আবর্তনে যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ঘটে তার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে : মাঘ থেকে শুরু—

মাঘ হৈল পরকাশ　　কানন কুসুম হাস
　　শুভছিরি পঞ্চমী প্রকাশ।
মউলিত পুষ্পবন　　মদন মোহন ঘন
　　তা দেখিয়া মোর মনোদাস ॥

বিকলিত আমজাম　　ভ্রমর ভ্রময় কাম
　　সৌরভ ধাবন্তি চতুর্দিস।
মলয়া সমীর ধীর　　হৃদয় অন্তরে পীড়
　　বিরহিণীজন অহর্নিশ ॥

ফাগুনে চৌগুণ রিত　　নানা পুষ্প বিকশিত
　　যুবজন ফাগু বিভূষিত।
পূরিত সকল অঙ্গ　　আগর চন্দন রঙ্গ
　　খেলএ আনন্দ হই চিত ॥

নবীন পল্লব শেষ　　সুরঙ্গ দুর্লভ দেশ
　　তরুলতা নবরঙ্গ হাস।
যুবক যুবতীগণ　　নানা বস্ত্র বিভূষণ
　　আভরণ বিচিত্র বিলাস ॥

চৈত্র হৈল সুললিত　　নানা পুষ্প বিকশিত
　　চম্পক চামেলি জুতি জাতি।
ভ্রমর ভ্রমরি জোর　　কেলি কলা রসে ভোর
　　গুঞ্জরে মঞ্জরী পরি রঙ্গে।

তা হেরি চঞ্চল মতি　　কাম বিহারিত গতি
　　কামিনী ব্যাকুল মন সঙ্গে ॥

বৈশাখ সময় দেশ　　রবির কিরণ বেশ
　　নিদাঘ দহএ নিরন্তরে।
আম জাম সুফলিত　　তরু সব সুনমিত
　　দুলিত নমিত ফল ভরে ॥

অলিকুল কলরব কেলি কলারস ভব
পক্ষি সব রবএ মধুর।
দক্ষিণ মলয়া বাত হৃদএ অনঙ্গ ঘাত
তা হেরি ধাবএ মন দূর ।।...
আষাঢ় আইল ঘন সঘন তিমির বন
নিশিদিন নাহিক প্রকাশ
বরিখয় অনিবার ধরণী পূরিত ধার
জীবজন্তু অধিক উল্লাস ।।
বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছটা চৌদিকে অম্বর ঘটা
মোর মন ভয় চমকিত।
নানা পক্ষি করে রব মঙ্গল পঞ্চমি সব
সুললিত মধুর সংগীত ।।
শ্রাবণ আইল রিত মেঘছত্র চতুর্ভিত
নির্ভর বরিষে জলধার।
নির্মল শীতল জল সতত বিরহানল
বিশেষ দহএ দেহা মোর ।।
চাতক পিয়ার পিউ পক্ষিরবে দহে জিউ
শিখি সুখে গিরিগর্ভে নাদ ।।
দাদুরির রোল ঘোর ভাবেতে হৈলুঁ ভোর
শুনিতে গুনিতে পরমাদ ।। ......
আশ্বিন যে পরবেশ বরিষা হইল শেষ
ক্ষেণে ঘোর ক্ষেণেকে বিদ্যুৎ।
কেতকী বকুল ফুল তাহাতে ভ্রমরা রোল
তা দেখি ধরাইতে নাহি চিত ।।
খণ্ড খণ্ড মেঘগণ শশোদর সনে রণ
ডুবকি উঠএ ঘনজিত।
তাহার নির্মল নিশি সুধা বিস্তারিত হাসি
তা দেখিয়া মন বিচলিত ।। ......
আঘ্রাণ আইল রিত নব শালি সমুদিত
সুগন্ধি সৌরভ যায় দুর।

সারি শুক করে রোল   নানা বর্ণ ধান্য ফুল
  বিকশিত সব ক্ষিতিপুর ॥
ঘরে ঘরে ধান্যরাশি   নরপশুগণ হাসি
  গগণ রুচিত পরকাশ।
রাজা প্রজা উল্লাসিত   প্রবাস বঞ্চিত রিত
  মোর লক্ষ্যে যেন বনবাস ॥ ......
মুঞি বড় হতভাগী   অহনিশি রহোঁ জাগি
  প্রভু মোর নিদয়া হৃদয়।
মোহাম্মদে কহে দুখি   অবশ্য হইবা সুখী
  নিশি শেষে রবির উদয়।

লক্ষণীয় এই যে, কবি মিশরদেশের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বাঙলা দেশের চিত্রই অঙ্কিত করেছেন। রাজ্ঞী জোলেখা আর মিশর দেশ দু-ই কবির ধ্যানের চক্ষে বাঙলার বিরহিণী বধূ আর বাঙলা দেশ রূপেই প্রতিভাত হয়েছে।

সুতরাং আমাদের কবি শুধু বেদনার কবি নন। হৃদয়ের ব্যথা শুধু তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেননি বহিশ্চক্ষু দিয়ে দুনিয়ার রূপও দেখেছেন, নারীর রূপ-ঐশ্বর্যও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর ভাষা প্রাচীন, কিন্তু মার্জিত। বর্ণনার একটা স্বচ্ছন্দগতি আছে। তাঁর বিরাট কাব্যে কোথাও কষ্ট কল্পনা বা জড়তার আভাস নেই। তিনি মহাকাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল গীতিপ্রবণ, তাই গ্রন্থের সর্বত্র আন্তরিকতার মাধুর্য ফুটে উঠেছে।

কবি শাহ্ সগীরের নিবাস কোথায় ছিল আমরা জানি না। গ্রন্থে কবির জন্মভূমির কোন উল্লেখ নেই। হয়তো ভবিষ্যতে কোন সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হলে তার সন্ধান মিলবে। আপাততঃ আমরা দেখছি গ্রন্থের তিনখানা প্রতিলিপি চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত এবং একখানা ত্রিপুরা থেকে সংগৃহীত। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে অনুবাদের কোন ছাপ নেই। তার কাব্যে সর্বত্র দেশী রীতিনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার বসন-ভূষণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎসব পার্বণ-অনুষ্ঠানাদি বর্ণিত ও চিত্রিত। তাঁর কাব্যে আল্লাহ বা স্রষ্টা অর্থে 'ধর্ম' বহুল ব্যবহৃত হয়েছে, এও প্রাচীনতার তথা বৌদ্ধ প্রভাবের নিশ্চিত নিদর্শন। কাব্যখানির আবিষ্কর্তা আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।

বন্দনা : ১ করিম সত্তার পরবাদিগর দেবতা মনুষ্যরূপ সৃজিলা জগত/আপনার ইচ্ছায়ে যেই করে ধর্ম/বৃদ্ধজ্ঞান মহাধ্যান তদন্তরে যথ।

অন্যত্র : ব্রহ্মা/নিরঞ্জন/ঈশ্বর/ধর্ম/পুরুষ পুরান এমন কি 'ধর্মরাজ'ও (১২) ব্যবহৃত :

২ দেবধর্ম আরাধি বহুল পুণ্য ফলে।
৩ ধর্মরূপ বিদিত স্বরূপ নর হৈল।
৪ ধর্মকে স্মরিয়া কন্যা হৈলা দণ্ডবৎ।
৫ কুম্ভ 'পরে বলিলেন্ত ধর্ম অনুমতি।
৬ ধর্ম উদ্দেশিয়া সাক্ষী করি চারিদিক
ধর্ম আজ্ঞা হৈলা তুহ্মি রাজ্য অধিকারী।
৭ ধর্মপদ স্মরি করে সত্বরে গমন।
৮ ধর্ম আজ্ঞা তোহ্মার পূরিব মনস্কাম।
৯ ধর্মপদে ইউসুফ মাগন্ত যেহি বর
ততক্ষণে সেহি বর পাইলা সত্বর।
১০ মনে মনে ধর্ম আরাধন।
১১ ধর্ম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ।
১২ বিনয় ভকতি করেঁা ধর্মরাজ পাএ।
১৩ তোহ্মা পুত্রকর্মে যে লিখিছে ধর্মে।
১৪ ধর্ম ভাবি রহ মন।
১৫ ধর্ম নাম লই কিরা করিল শপথ।
১৬ ধর্মের প্রসাদ আছে পূরিলেক আশ।
১৭ জালিয়ার বোলে স্মরি ধর্ম নিরঞ্জন।
১৮ কহিলেন দেবধর্মপদে আরাধন
ধর্ম স্মরি ইউসুফে মাগিলা এক বর।

সূফীতত্ত্ব :

১। নিরঞ্জন মকারেত প্রেমে সে মজিলা
এহি লক্ষ্যে যথ জীব সৃজন করিলা।

মাতাপিতা :

দ্বিতীএ প্রণাম করেঁা মা ও বাপ পাএ।
যা'ন দয়া হন্তে জন্ম হৈল বসুধাএ।
পিপিড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত
কোল দিলা বুক দিয়া জগতে বিদিত।..
ন খাই খাওয়াএ পিতা ন পরি পরাএ।

ওস্তাদ :

ওস্তাদে প্রণাম করো পিতা হন্তে বাড়
দ্বিতীয় জনম দিলা জিহঁ সে আহ্মার।

বাঙলা রচনায় পাপভীতি :

ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ
দূষির সকল তাক ইহ ন জুয়াএ।
গুনিয়া দেখিলুঁ আহ্মি ইহ ভয় মিছা
ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাঁচা।

উপমা : ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কামদেব, বলি, কর্ণ, অপ্সরী, মদন, মুনি, পদ্ম, ডমরু, রামকদলী, শরৎচন্দ্র, সফরী, চাতক, দাদুরী, ইত্যাদি।

আসবাব : পালঙ্ক, কনক জড়িত পাট, কটোরা, সন্দুক, উয়ারী, উচ্চবন্ত টঙ্গী, মন্দির (গৃহ), থালাবাটি ইত্যাদি।

: টোন হস্তে অলক্ষিতে ছুটে যেন বাণ।

সংস্কৃতি : তাম্বুর যোগাএ কেহো, বিচিত্র চামরে

: কেহো নৃত্য করে, কেহো বাহে কপিনাস

বসন : বহুল বিবিধ বাস/নাটি পাট শাড়ীলাস/চারিদিক অঙ্গ সুরচিত/

অলঙ্কার : হীরার হার, শ্রবণে রতনমণি, অঙ্গুরী, চিত্রিত বসন, জরোয়া নথ (মুক্তা ও কনকনির্মিত), তাড়, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, নেউর (নূপুর) বলয়া, সিন্দূর, মেহেন্দী, নেতপাট শয্যা, চন্দন, কুঙ্কুম, আগর, রত্নাভরণ।

: পাট পাটাম্বর নেত কনকমণ্ডিত।

আদি মানব সমাজ পৌত্তলিক :

: কেহ বোলে এহি (ইউসুফ) ব্রহ্মারূপ প্রজাপতি
তান পূজা কৈলে হৈব মুক্তি পদ গতি।

দাসী : সহস্রেক দাসী দিব চন্দ্রমুখ অভিনব
মণিমুক্তা অলঙ্কার পুর।

[দাসী কেবল কাজের জন্যে নয়—কামচর্চার জন্যেও]

তৈজসপত্র যৌতুক :

কনকের বাটাবাটি বহু ভাণ্ড ঘট ঘটি
সুবিচিত্র ঝাড়ু গাড়ু বর্গ

রতন প্রদীপ জ্যোতি সহস্র নক্ষত্র জিতি—
যেহেন উঝল মণি স্বর্গ।
ভাণ্ডারের ধন ভরি রতন কাঞ্চন পুরি
মণিময় আভরণ সাজ
মাণিক্য প্রবাল মোতি হীরামণি নানা ভাতি
মূল্য নাহি ভুবনের মাঝ।

রথসজ্জা-কন্যা যাত্রা :

দশ সহস্র রথ সজ্জা তাহার উপরে ধ্বজ
রথ 'পরে বিচিত্র মন্দির
পুরি মাঝে অন্তস্পট সুবর্ণ নির্মাণ ঘট
দ্বারে দ্বারে বসন প্রাচীর। (পর্দা)

আজিজ মিশির :

: কনক অম্বারী 'পরে চড়ি রত্নময়/সুবর্ণ মণ্ডিত ছত্র শিরের উপর।
: চারিদিক চামর দোলায় চমকিত।

বাদ্য : ১ দুন্দুভির শব্দে পূরিল দিগন্তর
ঢাক ঢোল দণ্ডি কাসি বাজত সুস্বর
২ সানাই বিগুল বাজে বাঁশি করতাল।
৩. কবিলাস পিপঞ্চিক মন্দিরা মৃদঙ্গ তবলা বাজে দুন্দুভি-নিশান।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে বিবিধ বিশাল বিধান।

শিবির :

১ তাম্বু তাজি আজিজ রহিলা সেই স্থান
নৃত্যগীত বাদ্য বাজে বিবিধ বিধান।
২ নৃত্যগীত আনন্দে নাচএ নৃত্য করে।
৩ এ ঝাম ঝাঝরি ধ্বনি বাজে ঝণৎকারে।
৪ নাচএ গাবএ ছন্দ মেলা।

পারিতোষিক [আজিজ মিশর] :

সম্ভান প্রসাদ দিলা পিরীতি বচনে।

সমাজনীতি :

তুহ্মি অকুমারী বালা জগত বিদিত।
বিবাহ সম্বন্ধ আগে (স্বামী) দেখা অনুচিত।

বরের বাহন :

চলিলেন আজিজ চৌদোলে আরোহণ।
ধ্বজ ছত্র পতাকা চলিল সারি সারি।

জোলেখার বিয়েতে আনুষ্ঠানিক আচার :

ব্রাহ্মণে পড়এ বেদ মন্ত্র উপচারি
কবিত্ব পড়এ ভাট পিঙ্গল বিচারি।
বহু গুণীগণ সঙ্গে রঙ্গ অভিলাষ
বিবাহ আনন্দ রঙ্গ মনেতে উল্লাস।

জন্মান্তর, অদৃষ্ট, নিয়তি :

১ তোর কর্মে লেখা আছে এ থেকে নিবন্ধ।
২ কর্মফল লিখিত তোহ্মার হেন জান।
৩ না জানোঁ কি আছে মোর কর্মেত লিখিত।
৪ বিবিধ নিবন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।
৫ দৈবের নিবন্ধ আছে কর্মের লিখিত।
৬ মোর শুভদশা আছে কর্মের লিখন।

অভ্যর্থনা পদ্ধতি :

১ অজিজের অন্তঃপুরে যথ নারীগণ
বাড়িয়া নিবারে আইল হরষিত মন।
ঘট-দীপ লৈয়া লোক হৈলা আগুয়ান
যুবক-যুবতী সবে ধরিল যোগান।
দোহান উপরে কৈলা পুষ্প বরিষণ
গুলাল চামেলী চম্পা সুবর্ণ গঠন।
রতন মণ্ডিত মালা কুসুম নির্মাণ
আজিজ জলিখা গলে করিল সন্ধান।

২ নারীরা : কেহ সিঞ্চে নানা পুষ্প সুবাসিত গন্ধ
কার হাতে দূর্বাধান্য নানান প্রবন্ধ।
নৃত্যগীত আনন্দিত স্তুতি পড়ে ভাট।

ফুল ও ফল :

আম, জাম নাগেশ্বর, লবঙ্গ গুলাল,
চম্পা, যুথী চামেলী গুলাল।

বালক ইউসুফের সজ্জা :

মাথেত পাগড়ী দিলা অঙ্গেতে ভূষণ (তুল : কৃষ্ণ)

অবতার : মনুষ্যমূরতি এহি দৈব অবতার।

রাহাজানি :

পন্থে বাটোয়ার সব আছে দুষ্টজন।

মুদ্রা :

১ তামার ঢেপুয়া লহ এই মূল্য তার (ইউসুফের)

২ বহুল সুবর্ণ মণি রতন প্রবাল
হীরা নীলা মাণিক্য মুকতা কসা লাল।
রত্ন মুকুতা প্রবাল হীরা চুনি মণি ধন।

বৈরাগী বেশ :

মণ্ডন করিলা শয্যা তরল বিরলে
পাটাম্বর তেজি মৃগ-চর্ম পরিধান
পালঙ্ক ছাড়িয়া ভূমি করিল শয়ান।
ঘৃত মধু এড়িয়া বনের শাক ভক্ষ ··· ···
নীলগঙ্গা তীরের ঘোফের মধ্যে বাস
সর্বক্ষণ সমাধি করএ মন উদাস।

দেবপূজা : যেন ইষ্ট দেবতা পূজয়ে নিতি নিতি।

নীতিশাস্ত্র : মহাদেবী যেন গুরু পত্নীর সমান
রাজপত্নী মাতৃতুল্য মোর অনুমান।

পক্ষী— কৈতর খঞ্জন পিক শুক-শারী শিখী
চকোয়া চাতক বর্ণ রাজহংস পাখী।

পান সুপারী :

কাহাক খাওয়ায় কেহো কর্পূর তাম্বুল।

মিষ্ট খাদ্য : কনক কটোরা ভরি মধুমিষ্ট সুখে
জলিখা তুলিয়া দেন্ত ইউসুফক মুখে।
ঘৃত মধু শর্করা বহুল দুগ্ধ দধি
সুধারসে পুরিত সন্দেশ নানা বিধি।

খোপা বন্ধএ কানড়ী খোপা লাস।

সজ্জা ও প্রসাধন :

শীষেত সিন্দূর, শ্রবণে গুম্ফিত মোতি রতন কুণ্ডল,
গীমাগত হীরাহার, বিরাজিত গজমোতি পাঁতি
কুস্তরী কুঙ্কুম বিন্দ, কপালে তিলক চন্দ,
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ, কেশর সুগন্ধি সঙ্গ।
কাঁচুলি মণ্ডিত হার, করেত কঙ্কণবর,
কনক মাণিক্য জ্যোতি সার।
বাহু দণ্ডে তাড় তারি, চুনিমণি বিচিত্র নির্মাণ
অঙ্গুরী মাণিক্য জুড়ি দশাঙ্গুলে ভরিপুরি, কটিত কিঙ্কিণী বাজে,
চরণে নূপুর বাজে, রঙ্গ বিচিত্র বাস
আগর চন্দর ফাগু সুবাসিত রঙ্গে।

নারী ও পুরুষ : অগ্নি ও তূলা, ঘৃত ও বহ্নি সদৃশ্য।
লোহা ও অগ্নি, জতু ও অগ্নি (লোহা যেন অগ্নি পাই
জতুক আকৃতি)

চুলনী : তার এক শিশু তিন মাসের সুন্দর
শয়ন করিয়া ছিল চুলনী উপর।

শয্যা : ইউসুফক দিলা যথ খাট, পাট পাটি
তুলি গাদি বসন ভূষণ বাটাবাটি।

যৌগিক সাধনা—ইউসুফ :

১ আপনার জ্ঞান ধ্যান সমাধি সংযোগ
সর্বক্ষণ এহি চিন্তা অল্প উপভোগ।
জ্ঞান ধ্যান বিনু তান আন নাহি মতি
ধর্ম কর্ম বেদ মন্ত্র পরমার্থ গতি।

২ সর্বলোকে বলে এহি দেব অবতার
মহাসাধু সিদ্ধারূপ প্রকৃতি তাহার।

ছড়িদার : এ যুগের অগ্রগামী Surgeant
আজিজ মিসির যদি আরোহণ গতি।
দুই পাশে ছড়িদার চলে রঙ্গমতি।

হিন্দুস্থানী দাম্পত্য ধারণা :

শুন হে ইসুফ তুমি হঅত তৎপর
জলিখা তোহ্মাক পত্নী জন্ম-জন্মান্তর।

পুতুল নাচ :

পোতলা নাচায় যেহ্ন সূতের সাত্তার
বাদিয়া আলোপে জেহ্ন সূত রাখি কর

বাদ্যযন্ত্র :

১ বিয়াল্লিশ বাদ্যের ধ্বনি বাজে সুললিতে...
২ যথ বাদ্য ভাণ্ড আছে সর্বরাজ্য দেশ
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে পূরিয়া বিশেষ।
ঢাক ঢোল দণ্ডী কাঁসী দুন্দুভি নিশান
মন্দির মাদল ভাল তবল বিষাণ।
দোসরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ বহুল
শঙ্খনাদ শিঙ্গা ভৈরী বাজএ তাম্বুল।
জয়তুর স্বরমণ্ডল যন্ত্রতন্ত্র পূর
নৃত্যগীতে নৃত্যকে নাচএ সেইপুর।
ঝনঝনি ঝাঁঝরি ঝুমুরি ঝনাকার
বাঁশী কাঁসী চৌরাশী বাজন অনিবার।
সানাই বিগুল বাজে ভেউর কর্ণাল
করতাল মন্দিরা বাজায়ে সুমঙ্গল।
বিপঞ্চী পিনাক বাজে অতি মৃদুস্বর
কপিলাস রুদ্র বাজায়ে নিরন্তর।

অলঙ্কার :

কাঞ্চন দোছড়ি মল,

বাহন : শিবিকা চৌদোল আরোহণ

বাদ্য ও বিবাহ মঙ্গল :

দুই রাজ বাদ্যবাজে জয় শঙ্খধ্বনি
বিবাহ মঙ্গল গাহে দেবের রমণী।

উৎসবে মঙ্গল গান :

১ সুরচিত মঙ্গলা গাহেন্ত
২ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া মঙ্গল গীত গাহে
৩ এহিমতে মঙ্গলা করিলা মহোচ্ছব।

৪ সুরূপী সুন্দরীগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ঘন
যেহু মোতি ভূমি বিস্তারিত।

বাসরে :

পুষ্পক পালঙ্কী 'পরে দুহু প্রেম রস ভরে
সুখ শয্যা বাস নিরন্তর।

টঙ্গী :

রচিলেন্ত এক টঙ্গী অন্তঃপুর খান
উঞ্চ দেবপুরী সম ফটিক নির্মাণ।
চন্দন আগর পাট শয্যা সুবলিত
স্তম্ভে স্তম্ভে রজত কাঞ্চন সুরচিত।
চিত্রকারী বিচিত্র অক্ষর চমকিত
কাঞ্চনে রচিত বর জ্যোতি প্রদীপিত।
মধ্যে মধ্যে পাটাম্বর গুপ্ত ওড় আড়
অতি মনোরম ভাতি মুকুতা সঞ্চার।
তার মাঝে মাণিক্য প্রবাল তারা জ্যোতি
দেবের বৈকুণ্ঠ কিবা অপরূপ ভাতি।

অন্য টঙ্গী—

একঘর আজিজে নির্মিছে মনোহর।
মণিরত্ন কাঞ্চন মন্দির পূর সাজ
বেড়া প্রতি কনক বিচিত্র চিত্র সার।
রক্তবর্ণ পাষাণ পূরিত বররাজ।

গর্ভকাল :

দশমাস দশ দিনে পুত্র উতপতি।

দুর্ভিক্ষে মানুষ বেচাকেনা :

ভক্ষ্য দিয়া আক্ষা পুত্র-পরিজন
দাস-দাসী করিয়া রাখহ প্রাণ-ধন।
মিশ্রির সকল লোক হৈল দাস-দাসী।

রাজদর্শনের কায়দা :

নবী বোলে দ্বারেত রহিবা আগুয়ান
অন্তঃপুরে প্রবেশিবা আজ্ঞা পরমাণ।

নৃপতির মুখ দেখি করিবা প্রণাম
সচকিত ন হেরিবা নতু ডান বাম।
আশীর্বাদ করিয়া রহিবা ধৈর্যমান
আজ্ঞা হৈলে বসিবা আঙ্গিজ বিদ্যমান।
পুছিলে সে কহিবা বচন রস্তবান
বিস্তারিত ন কহিবা অল্প সমাধান।
ন বৈসে বিমুখ হৈয়া নৃপতি গোচর
সময় বুঝিয়া যাইবা নিজ বাসা ঘর।
নৃপতিক প্রকৃতি বচন তত্ত্ব জানি
কার সঙ্গে ন কহিবা বেকত কাহিনী।

আসন :

বিচিত্র বসন আনি বিছাইলা সত্বর।
রাজ আজ্ঞাএ বসিলেন্ত দশ সহোদর।

আপ্যায়ণ :

ভৃঙ্গারের জল কোহ্ন সেবকে যোগাএ
চামর সমীর কেহো করে তান গাএ।
সুবর্ণের বাটা ভরি কর্পূর তাম্বুল
সুগন্ধি চন্দন আদি নানা বর্ণ ফুল।

সৈন্য :

ক্ষেত্রী সব অস্ত্রধারী কবচ ভূষিত
ধনুর্বাণ খর্গ চর্ম সন্ধান পূরিত। - - -
দশ সহস্র ছড়িদার সচেতন রাজে - - -
মণিময় কৃপাণ করেত সুশোভিত
চৌদ্দ অক্ষোহিণী সৈন্য করহ সাজন।

পিতা :

বাপবাক্য যেহ্ন মহাবেদ।
পিতৃপদে সেবা কৈলে স্বর্গলোক গতি।

বেশ্যা নর্ত্তকী—

যত নৃত্য বেশ্যা আছে সুরূপ সুঠান
সুললিত নৃত্যগীত কর সমাধান।

মুসলিম মানস :

আল্লার বাণী : কাফের সকল মারি করহ অধীন।
মহামন্ত্র কলিমা ন কহে যেই জন
তাহার উপরে কর অস্ত্র বরিষণ।
—কাফের মথিতে চলে মিশ্র অধিকারী।

নারীর অতিথি ও গুরুজন বরণ :

কার হাতে দূর্বাধান নানা পুষ্প পাতা - - -
নানা দ্রব্য সঙ্গে করি মঙ্গল বিধান - - -
সর্বতনু বসনে ঢাকিয়া আঁখিমুখ।

(ভৃঙ্গারের জলে)

বাপ পদ আপনে পাখালে নৃপমণি
জলিখা মস্তক কেশে উপস্কার কৈলা।

যোদ্ধৃবেশে রাজা :

সুসজ্জ করহ সৈন্য যথ অশ্ববর
সুবর্ণ কৃমিজি জিন চড়াঅ পাখর।
বিশুদ্ধ সুবর্ণ মণি বিরচিত রথ - - -
বিচিত্র কনক মণি কনক শোভিত।

মঙ্গলাচরণ : ভট্ট সবে স্তুতি পঠে জুড়ি দুই কর
স্বামী বরদাতা শিব
তবে কন্যা মহেশ পূজিয়া ততক্ষণ

ইবন আমিনের ভাবীপত্নী বিধুপ্রভা
অতিথি আইল জানি করিলা গমন। - - -

দৈববাণী :

এহিস্থানে তোল টঙ্গী ঘর সুরুচির
তার মধ্যে থাকি শিব পূজহ ভকতি
তবে সে পাইবা জান তুহ্মি নিজপতি।

কদমবুচি :

চরণ বন্দিল তান শির 'পরে ধরি।

বিধুপ্রভার স্বয়ংবর :

কনে সাজ : চিকুর কুচিত বেণী সিঁথি পাঁতি শোভা

অর্ধচন্দ্র আকৃতি মোহন তুল খোপা।
তিলক ভূষণ পত্রাবলী চারু সাজ
নক্ষত্র নিকর যেহ্ন শোভে দ্বিজরাজ।
তিলফুল জিনি নাসা মুকুতা মণ্ডিত।

কাব্যটি অপ্রকাশিত এবং রচনাকাল বিতর্কিত। কাব্যটি যে অনূদিত নয়—দেশী উপাদানে রচিত তা' প্রমাণের জন্যেই এই দীর্ঘ ও বিবিধ উদ্ধৃতি।

৫

অনুবাদ-সাহিত্য

কোন জাতির বা অঞ্চলের বুলি লেখ্যভাষার ও সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হতে হলে, তার ভিত্তি তৈরীর জন্যে উন্নতভাষা ও সাহিত্য থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। নিরক্ষর গৃহস্থমানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সর্বপ্রকার ভাব ও বস্তু বিনিময়ের জন্যে মাত্র কয়েকশ' শব্দই প্রয়োজন, ওগুলোও সব সময় ব্যবহৃত হয় না। নিস্তরঙ্গ দৈনিক জীবনে নিত্যকর্মে ও কথায় আরো কম শব্দ, হয়তো শতেক শব্দই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন অনুভব, চিন্তা তত্ত্ব বা নতুন বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করতে গেলে ঐ আটপৌরে শব্দাবলীর সীমিত অভিধায় তা বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। তাই বহু ব্যঞ্জনাময় নতুন শব্দ তৈরী বা ধার করতে হয়। ভাব বা বস্তু অনপেক্ষ শব্দ তৈরী করা যায় না, আবার স্থান-কাল-পাত্রের প্রয়োজন নিরপেক্ষ ভাব ও বস্তুর চেতনাও চিত্তলোকে জাগে না, তাছাড়া বুলিতে নতুন নতুন শব্দ তৈরীর বীজও মেলে না। অনুভব ও চিন্তা-চেতনাই নতুন শব্দ তৈরীর প্রয়োজন ও প্রেরণা যোগায়। অকারণে এ প্রেরণা আসে না।

এক একটা নতুন শব্দ এক একটা গাঢ়-আবেগে সৃষ্ট কবিতার মতোই গভীর ব্যঞ্জনাময় সৃষ্টি—এক একটি বাক্ প্রতিমা। চাঁদকে যেমন হিমাংশু, সুধাংশু, সুধাকর, কিংবা হিতাংশু বলি তখন ঐ দৃশ্যবস্তু চাঁদ আমাদের অনুভবে অন্য গুণে-রূপে ও লাবণ্যে প্রতিভাত হয়। এই চাঁদ এক বিশেষ মানস সম্ভূত। বুলিতে এই মানস-সৃষ্টি দুর্লভ। তাই বুলিকে লেখ্য ভাষার তথা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত করার সহজ উপায় হচ্ছে অনুবাদ। অন্যভাষা থেকে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি

জ্ঞান-মননের বিভিন্ন বিষয় অনুবাদ করতে হলে সে বিষয়ক ভাব-চিন্তা-বস্তুর প্রতিশব্দ তৈরী করা অনেক সময় সহজ হয়, তৈরী সম্ভব না হলে মূল ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করতে হয়, এভাবেই সভ্য জাতির ভাষা-সাহিত্য মাত্রই গ্রহণে-সৃজনে ঋদ্ধ হয়েছে। এ ঋণে লজ্জা নেই। একই প্রয়োজনে আমরা আমাদের বুলির রূপ পরিহার করে আবার নতুন করে শব্দ গ্রহণ করেছি। যেমন 'তু লো ডোম্বী, হঁউ কপালী' অথবা 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে —বুলির এ ভাষা পরিহার করে তুমি, ডোমনী, আমি, বাজায়, কালিন্দী, নদী প্রভৃতি পুনঃ গ্রহণ করেছি। প্রাত্যহিক জীবনে চিরকাল 'মা ভাত দাও' পুনরাবৃত্ত হবে, কিন্তু উচচ ও বিচিত্র তাৎপর্যে কখনো জননী, কখনো প্রসবিনী বলতে হয়। আবার অরুণ, তপন, মার্তণ্ড, রবি, সূর্য একই তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনা বহন করে না। তাই সাহিত্যে দর্শনে ভাব বা বস্তু বাচক শব্দের বহু প্রতিশব্দের প্রয়োজন। অনুবাদ কার্যে হাত দিলে গরজে পড়ে চিন্তাভাবনা করে ব্যঞ্জনা-জ্ঞাপক শব্দ তৈরী করা যায়, অথবা ঋণও গ্রহণ করা যায় প্রতিবেশী ভাষা থেকে।

তেমনি উচচ, মহৎ ও নতুন ভাব-চিন্তা-চেতনা-তত্ত্ব প্রভৃতি নিজের ভাষা-সাহিত্যে না থাকলে অন্যভাষার সাহিত্য-দর্শন-তত্ত্ব ও লিপিবদ্ধ জ্ঞান অনুবাদের মাধ্যমে নিজের ভাষায় গ্রহণ করলে উক্ত ভাব-চিন্তা-তত্ত্ব-জ্ঞানের একটা ভিত্তি, কাঠামো বা বুনিয়াদ তৈরী করা যায় যে জ্ঞান বা অনুভব আমাদের দেশে পাঁচশ' বছর পরেও হয়তো লভ্য হত না, তা আমরা অনুবাদের মাধ্যমে এখনই পেতে পারি, যেমন—বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলো, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তাগুলো, বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো, সমাজতত্ত্বগুলো—মানব চিন্তার শ্রেষ্ঠ-অতুল্য-অমূল্য সম্পদগুলো এভাবে আয়ত্তে আসে। সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে গঠন যুগে উন্নত ভাষা থেকে সাহিত্য অনুবাদ করলে ভাব, ভাষা, ছন্দ-আঙ্গিক-অলঙ্কার প্রভৃতির একটি বুনিয়াদ তৈরী সহজ হয়. আমাদের আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার আঙ্গিক ও ভাব-চিন্তার বুনিয়াদ যেমন প্রতীচ্য সাহিত্যের ঋণে তৈরী হয়েছে এবং বিকাশ লাভ করেছে ঐ আদলেই।

চৌদ্দ পনেরো শতকে আমাদের লেখ্য সাহিত্যও তেমনি সংস্কৃত-অবহট্‌ঠ থেকে ভাব, ভাষা ও ছন্দ গ্রহণ করেছে, পুরাণাদি থেকে নিয়েছে বর্ণিত বিষয় ও বর্ণনা-ভঙ্গি এবং রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-প্রণয়োপাখ্যান-ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত-ফারসী-আরবী-হিন্দি-আওধী থেকে অনূদিত হয়েছে আমাদের ভাষায়। এভাবেই আমাদের লিখিত বা শিষ্ট বাঙলা ভাষাসাহিত্যের বুনিয়াদ নির্মিত হয়েছিল।

আদর্শ অনুবাদকের একটা বিশেষ যোগ্যতা অপরিহার্য। ভাষান্তর করতে হলে উভয় ভাষার গতি-প্রকৃতি, বাকভঙ্গি ও বাক্‌বিধির বিষয়ে অনুবাদকের বিশেষ

ব্যুৎপত্তির দরকার, তাহলেই ভাষান্তর নিখুঁত ও শিল্পগুণান্বিত হয়। তাই ভাষাবিদ কবি ছাড়া অন্য কেউ কাব্যের সুষ্ঠু অনুবাদে সমর্থ হয় না। তেমনি দার্শনিক ব্যতীত দর্শন, বিজ্ঞানী ব্যতীত বিজ্ঞান, স্থপতি ব্যতীত স্থাপত্য বিষয় অনুবাদ করলে তা কখনো যথার্থ হয় না। মধ্যযুগে অনেক অ-কবিও অনুবাদ কর্মে উৎসাহী ছিলেন। তাই অনুবাদ কখনো মূলানুগ হয়নি, বিষয়ে হলে ব্যঞ্জনায় হয়নি, ব্যঞ্জনায় হলে ছন্দে হয়নি—এমন নানা ত্রুটি দেখা যায়। তাছাড়া এঁরা নিজেদের সামর্থ্য রুচিবুদ্ধি ও প্রয়োজন অনুসারে মূলের পাঠ গ্রহণ-বর্জনের ও সংক্ষেপনের এবং ইচেছমত সংযোজনের স্বাধীনতা নিজেদের হাতেই রাখতেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবশ্য ক্ষতিকর নয়, কিন্তু দর্শন-ইতিহাস চিকিৎসা-ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞান তথ্য ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটি মারাত্মক পন্থা। মধ্যযুগের অনুবাদে তাও হয়েছে। এজন্যে মধ্যযুগের বাঙলা ভাষায় কোন তথাকথিত অনুবাদই নির্ভরযোগ্য নয়। সবগুলোই কিছু কায়িক, কিছু ছায়িক, কিছু ভাবিক অনুবাদ এবং কিছু স্বাধীন রচনা—তা কবির, গায়কের, পাঠকের কিংবা লিপিকরেরও হতে পারে।

সংস্কৃত থেকে যা অনূদিত হয়েছে, তা মুখ্যত বিভিন্ন পুরাণ-বর্ণিত কাহিনী। রামায়ণ-মহাভারত দুটোই দুই অবতারের কাহিনী, রাম ও কৃষ্ণ দুজনেই দুই কাব্যের নায়ক। পুরাণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে দেবতা, ঋষি, এবং তাদের সংপৃক্ত দৈত্য-দানু-অসুর-গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-মানুষ-পশু-পাখি প্রভৃতির নানা অলৌকিক, অসম্ভব, অবাস্তব কিন্তু নীতিশিক্ষা ও তত্ত্বতাৎপর্যপূর্ণ নানা কাহিনী। স্বীকৃত পুরাণ আঠারোটি—অর্ধ-স্বীকৃত অর্বাচীন উপপুরাণও আঠারোটি। সবগুলোর মূল্য-মর্যাদা ও গুরুত্ব সমান নয়, আবার ইষ্ট দেবতাভেদেও পুরাণগুলোর সাম্প্রদায়িক গুরুত্ব-লঘুত্ব রয়েছে।

পুরাণগুলোর নাম—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, (শ্রীমৎ ও দেবী) ভাগবত, নারদীয়, লিঙ্গ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

উপপুরাণ হচেছ,—আদি, নরসিংহ, বায়ু, শিব, ধর্ম, দুর্বাসা, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশন, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, দেব, পরাশর, মারীচি ও ভাস্করপুরাণ।

পুরাণে-উপপুরাণে কয়েকটি নাম-সাদৃশ্যও লক্ষণীয়, এবং আঠারো নামের তালিকায়ও পার্থক্য দুর্লক্ষ্য নয়।

ভারততত্ত্ববিদ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, আর্যেরা ঋক বেদের কিছু অংশ যখন রচিত হয়েছে তখনই ভারতে প্রবেশ করেন ইরান এলাকা থেকে। এবং

ঋকবেদের বাকি অংশ এ দেশেই রচিত। এই ঋকই গানে-মন্ত্রে-বিধানে বিন্যস্ত হয়ে তিন নামে তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে—ঋক, সাম ও যজু। পরাক্রান্ত আর্যেরা শাসক রূপেই উত্তর ভারতে সিন্ধু-গঙ্গার তীরাঞ্চলে আর্যাবর্ত-ব্রহ্মাবর্ত প্রভৃতি এলাকায় বাস করে। দেশী জনসংখ্যার তুলনায় তারা ছিল নগণ্য।

সে জন্যেই শাসক হয়েও সংখ্যাগুরু দেশী মানুষের শাস্ত্র, সমাজ, জীবিকা, আচার-পদ্ধতি উৎসব-পার্বণ বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতির প্রভাব বাঁচিয়ে বেশী দিন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেনি তারা। কোন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীই পারে না, পরবর্তী কালের শক-হূন-কুষাণ স্কিথিয়ান-তুর্কী-মুঘল কেউ পারেনি, এমন কি মাতৃভাষাও তাদের ভুলতে হয়েছিল। শাসকেরা কোন কোন বিষয়ে উন্নত ও সভ্যতর থাকে, অধিকন্তু শাসকের ধন-দর্প-দাপটের ঔজ্জ্বল্যও থাকে। শাসিতেরা হীনমন্যতা বশে এমনিতেই শাসক শ্রেণীর অনুকরণ করে নির্বিচারে। কাজেই শাসিতরা শাসকদের কিছুটা প্রভাবে পড়ে। যদি শাসিতরা সংস্কৃতি-সভ্যতায় উন্নততর হয়, তাহলে গ্রীস-শাসক রোমানদের মতো, ইরান-শাসক আরবদের মতো, শাসকের উপর শাসিতের প্রভাব কেবল সংখ্যাগুরু বলে নয়, উৎকর্ষের জন্যেও বিশেষভাবে পড়ে। ভারতেও উভয় কারণেই আর্যদের উপর দেশী প্রভাব গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল, আর্যেরা কেবল ভাষাটাই দেশী লোকের উপর চাপাতে পেরেছিল আর রাখতে পেরেছিল যজ্ঞাদি দু'চারটি বৈদিক আচার মাত্র। অন্যসব ক্ষেত্রে তারা অচিরে দেশী ধর্ম-দর্শন-জীবিকাপদ্ধতি ও সে সম্পর্কিত বিশ্বাস-সংস্কার আচার-অনুষ্ঠান সব গ্রহণ করে, এভাবে সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, মন্দির উপাসনা, ধ্যান, নারী, পশু-পাখি, বৃক্ষ ও প্রতিমা পূজা, অবতারবাদে ও জন্মান্তরবাদে আস্থা প্রভৃতি গ্রহণ করে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, বৈদিক পুষণ, নাসত্য, মরুৎ, বরুণ, রুদ্র, ঊষা, পর্জন্য প্রভৃতি দেশী দেবতার চাপে বিস্মৃতির আড়ালে অবহেলিত হলেন, এবং দেশী দেবতা শিব-উমা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, ব্রহ্মা-সরস্বতী প্রভৃতি বহু নারী-পুরুষ—প্রবাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা আসর জেঁকে বসলেন, কূর্ম-বরাহ-মৎস্য থেকে রাম-কৃষ্ণ অবধি সবাই দেশী অবতার। তাই রাম নবদূর্বাদল শ্যাম, কৃষ্ণ নবঘনশ্যাম, আদ্য প্রকৃতি বা শক্তিও শ্যামা, শিব, উমা, বসুদেব, চণ্ডী প্রভৃতি নামও দেশী ভাষায়। এঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছে বৈদিক আর্যধর্মের এক সমন্বিত দেব-দ্বিজ-বেদ প্রধান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। পুরাণ-কাহিনী এই ব্রাহ্মণ্যবাদীর শাস্ত্র ও সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনার প্রসূন। বস্তুত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্থিতি, বিকাশ ও প্রসার ঐ পুরাণ তত্ত্ব ভিত্তিক। তাদের ঐহিক পারত্রিক জীবন-চিন্তা ও জগৎ-ভাবনা এই পুরাণ চেতনারই নামান্তর। ও সব পুরাণে সাধারণত

সৃষ্টিতত্ত্ব (সর্গ) প্রলয়তত্ত্ব ও পুনঃসৃষ্টি (প্রতিসর্গ), দেবজন্ম, মন্বন্তর [সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি] ও রাজকাহিনী বর্ণিত থাকে—অসংখ্য গল্পের, তত্ত্বের ও নীতি কথার সমষ্টি এগুলো। এ সব পুরাণ জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার যুগে (আঃ খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক থেকে) রচিত হতে থাকে। তখন থেকেই পুরাণের কলেবর ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনিভাবে সতেরে-আঠারো শতক অবধি পুরাণে বর্ণিত বিষয় পল্লবিত ও সংযোজিত হতে থাকে। ফলে কোন্ পুরাণের কোন্ অংশ প্রাচীন , কোন্ অংশ অর্বাচীন, কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত কোন পুরাণ অর্বাচীন তা নিরূপণ করা অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য ও গবেষণাসাধ্য কর্ম।

উপনিষৎ বা বেদান্ত নিয়েও এই একই সমস্যা, বেদান্তও আড়াই হাজার বছর ধরে (সতেরো শতক অবধি) রচিত ও সংযোজিত হয়ে এসেছে। এগারটি উপনিষৎ প্রাচীন বলে স্বীকৃত। অন্যগুলো অর্বাচীন ও প্রক্ষিপ্ত রচনা সম্বলিত বলে অবহেলিত। ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ার পর এবং য়ুরোপীয় বিদ্বানদের আলোচনাভুক্ত হওয়ার পর এসব গ্রন্থে প্রক্ষেপ বন্ধ হয়ে গেছে। সংস্কৃতে রচিত বলে এগুলো সর্বভারতীয় প্রচার লাভ করেছিল এবং জাতীয় শাস্ত্র-সম্পদ-মনীষার নিদর্শন রূপে মান্য হয়ে রয়েছে।

বলেছি জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার যুগে পুরাণ ও উপনিষৎ রচনার শুরু। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও শাস্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করা এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজকে সংহত ও অখণ্ড রাখার জন্যে নানা কাহিনী ও উপকাহিনীর মাধ্যমে ধর্মের তত্ত্ব, মহিমা ও মাহাত্ম্য লোকমনে বদ্ধমূল করাই ছিল উদ্দেশ্য। বস্তুত সে উদ্দেশ্য অষ্টম দশম শতকের মধ্যে পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছিল, ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ মত বিলুপ্ত হল এবং জৈন মতও নগণ্য সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমিত হয়ে গেল।

জৈন-বৌদ্ধমতের প্রচার-প্রসার কালে ব্রাহ্মণ্য সমাজে যেমন সংকট দেখা দিয়েছিল তুর্কীবিজয়ের পরে বাঙলাদেশেও সাংখ্যগুরু বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্য সমাজে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার আচার-অনুষ্ঠানের প্রবণতায় তেমনি লোকায়ত দেবতা ও শাস্ত্র শ্রুতিস্মৃতি-গীতা শাসিত সমাজ-মন আচ্ছন্ন ও বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। শাস্ত্রী ও সমাজপতিরা তখন আত্মরক্ষা করল ঐ প্রাচীন উপায়েই অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনী ও ঔপনিষদিক তত্ত্বের আওতাভুক্ত করে নিল ঐ লোকায়ত দেবতা ও শাস্ত্রকে। পৌরাণিক দেব-তার আভিজাত্য প্রাপ্ত লৌকিক দেবতা ও ব্রাহ্মণ্যতত্ত্বমিশ্রিত লোকায়ত বিশ্বাস —দুটোই স্বাতন্ত্র্য হারাল, ফলে গণমানবের দেব-দ্বিজ দ্রোহী থাকার সব কারণও

অপসৃত হল। এবারও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজের জয় হল। তাই আমরা মধ্যযুগের লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য-পাঁচালীতে পৌরাণিক দেবখণ্ড অপরিহার্য রূপে পাই। মনসা শীতলা ষষ্ঠীচণ্ডী মীননাথ গোরক্ষনাথ বাসুলী সবাই এখন পৌরাণিক দেবতা। অনূদিত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতও এমনি করে ব্রাত্য বাঙালী হিন্দুকে ধীরে ধীরে শ্রুতি স্মৃতি-গীতা নিয়ন্ত্রিত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, আচার ও সমাজনিষ্ঠ করে তুলল এবং ষোল শতকের চৈতন্য-বিপ্লবকেও সনাতন ব্রাহ্মণ্য সমাজ এভাবে প্রতিহত করে স্বধর্মে সুস্থির থাকতে পেরেছিল। ইসলামের প্রসারও আবার পরোক্ষে রোধ করল চৈতন্যের প্রেমধর্মই। তাতেও ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙন বন্ধ হল। তা যথাস্থানে আলোচিত হবে। এভাবে রামমোহনী ও খ্রীস্টানী হামলা প্রতিহত করে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজ কালে কালে বিপজ্জয় ও মৃত্যুঞ্জয় রূপে প্রমাণ করে সগৌরবে টিকে রয়েছে। সংখ্যাগুরুর লোকধর্মের সঙ্গে আপোসের ফলেই ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র বাঙলায় মিশ্র বা সমন্বিত রূপ নিল এবং গড়ে উঠল পঞ্চোপাসক হিন্দুসমাজ।

৬

জাতীয় মহাকাব্য

রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর জাতীয় মহাকাব্য (National Epic)। দুটোই মুখ্যত অবতার কাহিনী। রামায়ণের নায়ক অবতার রাম এবং মহাভারতের নায়ক অবতার কৃষ্ণ। এঁরা চান্দ-সূর্যের মতোই হিন্দু মাত্রেরই সামষ্টিক ও ব্যক্তিক সম্পদ—প্রত্যেকেরই আত্মীয়। প্রত্যেকেরই মর্ম-মূলে এঁদের স্থিতি। হিন্দুর জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনাও রাম-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে অভিব্যক্ত। হিন্দুর জীবন-দর্শনের সর্বাত্মক প্রতিফলন ঘটেছে রামায়ণে ও মহাভারতে। তাই এই দুই মহাকাব্য একাধারে হিন্দুর জীবনচেতনার প্রসূন ও উৎস। এই যুগে জাতীয় পতাকা যেমন জাতির সত্তা, স্বাধীনতা, গৌরব-গর্ব, ঐতিহ্য, আশা-আশ্বাস, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম, নীতি-আদর্শ, সংহতি ও রাষ্ট্রিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও নিরাপত্তাবোধের প্রতীক, জাতীয় সঙ্গীত যেমন যৌথ-জীবনে ঐক্য ও ঐকতানের প্রতিভূ, জাতীয় মহাকাব্য তেমনি জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের মতো সংহতি ও একাত্মতার প্রতীক। চাঁদ-সূর্যের মতোই সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনযাত্রার প্রসাদদাতা। অতএব, যে কাব্যে জাতির সর্বজনীন অনুভূতির প্রকাশ অর্থাৎ জাতীয় সমস্যা ও সম্পদ, আনন্দ ও বেদনা, নীতি ও আদর্শ, বীরত্ব ও মহত্ব, বৈষয়িক ও আত্মিক জীবন-ভাবনা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বিধি ও ব্যবস্থা প্রভৃতি নায়কের চরিত্রে ও কর্মে অভিব্যক্ত হয় এবং নায়কের সুখ-

দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা, আশা-নিরাশা মান-যশ-প্রত্যাশা, জয়-পরাজয় শ্রেয়-প্রেয় প্রভৃতি সবকিছু পারিবারিক লাভ-ক্ষতির মতো জাতিভুক্ত সবারই ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের অঙ্গীভূত বলে অনুভূত হয়—সে কাব্যই জাতীয় মহাকাব্য। রামায়ণ-মহাভারত হিন্দুর তেমন জাতীয় মহাকাব্য—তাদের চিন্তা চেতনার ও প্রেরণা-প্রয়োজনবুদ্ধির উৎস। তাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অদৃশ্য নিয়ন্তা।

জাতীয় মহাকাব্য একদিনে এক হাতে সৃষ্ট হয় না। জাতীয় জীবনের বিবর্তন ধারায় তা বহুকালের অযত্ন লালনে, ক্রমে ক্রমে বহু মনের স্পর্শে, বহু অনুভবের বৈচিত্র্যে, বহু জনের আবেগের লাবণ্যে, বহু জনের ভাব-চিন্তা-কল্পনার প্রসাদে, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে, বহু জনের জ্ঞানের সম্পদে ও প্রজ্ঞার আলোকে, বহু দ্বেষ দ্বন্দ্ব অসূয়া-রিরংসা জাত ক্ষয়-ক্ষতির আঘাতে, শাসন-শোষণ পেষণ-পীড়নের যন্ত্রণায়, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-মৈত্রী-করুণা, দান-দয়া প্রভৃতির ঐশ্বর্যে একটি জাতীয় মহাকাব্য গড়ে উঠে। একাব্য কোন ব্যক্তি বিশেষের রচিত নয়—গোটা জাতির মানস-সম্ভূত (Epic of Growth)। যিনি একত্রিত করে গ্রথিত করলেন তিনি স্রষ্টা নন—সংকলক মাত্র। 'বাল্মীকি-ব্যাসের কৃতিত্ব ও গৌরব ঐ সংকলক রূপেই।

জাতীয় মহাকাব্য মাত্রই জাতির গৌরব ও গর্বের প্রতীক। জাতীয় মহাকাব্যই জাতির অতীত ভাব-চিন্তা-কর্ম-জ্ঞান-মনীষা-আচরণের স্মারক ও সাক্ষ্য। কাজেই, জাতীয় মহাকাব্য পাঠে, সেই জাতির বর্তমান মন-মনন-স্বভাব সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা করা বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে সম্ভব। যুগান্তরে জীবন-জীবিকা পদ্ধতির রূপান্তর ও উৎকর্ষের ফলে জাতীয় মন-মেজাজেও কিছুটা পরিবর্তন আসে। এভাবে নীতি-বোধে ও আদর্শচেতনায় এবং জীবন-বাসনায়ও পরিবর্তন ঘটে। তাই রামায়ণ-মহাভারত কাহিনীতেও স্থানিক ও কালিক রূপান্তর ঘটেছে অনেক। রামায়ণই আবার অধ্যাত্ম বা বাশিষ্ঠ রামায়ণে রূপ নিয়েছে, মহাভারতও জৈমিনিভারতে, ভাগবতে ও পুরাণে প্রসারিত হয়েছে। মধ্যযুগের নব্য-ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত বা অনূদিত রামায়ণ-মহাভারতেও গ্রহণ-বর্জন ও সংযোজনের অবাধ আগ্রহ দেখেছি, আধুনিক কালে বাঙলায় মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীতে-ঘটনায় ও চরিত্রে যুগোপযোগী নতুন তাৎপর্য দান করেছেন। দুনিয়ার সব সাহিত্যেই পুরোনো উপাদান এমনি নতুন তাৎপর্যে ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন সাহিত্য এ-ভাবেই টিকে থাকে ও যুগোপযোগী অর্থবহ হয়ে সার্থক হয়। রামায়ণে-মহাভারতে বিধৃত জীবন-চেতনা ও জগৎভাবনা কিংবা ন্যায়বোধ ও নীতিজ্ঞানের সবটা যৌক্তিক বলে মনে হবে না। কালান্তরে ও স্থানান্তরে ন্যায়-নীতি-আদর্শবোধ বদলায়।

বাল্মীকির রামায়ণে যে কাহিনী মেলে, তার সবটা বাল্মীকির রচিত আদি গ্রন্থে ছিল না, পরে গায়েন-পাঠক-লিপিকরেরা কাহিনী পল্লবিত ও কাব্যের কলেবর স্ফীত করেছে। সে-যুগে ছাপাখানা ছিল না বলে কোন ভাল গ্রন্থের প্রচারও দ্রুত হতে পারত না। অনুলিপি প্রতিলিপি পরম্পরায় গ্রন্থ চালু থাকত। শিক্ষিতের সংখ্যা কম ছিল, বিপুলায়তন গ্রন্থের প্রতিলিপিকরণ সময় ও শ্রমসাপেক্ষ ছিল, তাই রচকের অঞ্চলের সীমা পার হতে গ্রন্থের সময় লাগত। কারো পুথি অন্যের দেখার এবং রচকের স্বহস্ত লিখিত পুথির সঙ্গে মেলানোর কোন উপায় ছিল না বলে গায়েন-লিপিকর কিংবা পুথির বিদ্বান মালিক নিজের খেয়াল-খুশী-রুচি ও গরজ মতো পুথির পাঠ ও ঘটনা ইচ্ছে মতো গ্রহণ-বর্জন ও সংযোজন অবাধে করতে পারত। তাই প্রাচীন রচনামাত্রই প্রক্ষেপ, বিকৃতি, রূপান্তর ও পল্লবায়ন দোষে দুষ্ট। রচয়িতার মূল রচনার অকৃত্রিম ভাষা, ভঙ্গি, ভাব ও কাহিনী কোথায় কতটুকু আছে তা আজ আর জানবার উপায় নেই।

বাল্মীকির রামায়ণ নাকি পঞ্চকাণ্ডে রচিত, প্রথম (আদি) ও শেষ কাণ্ড (উত্তর) স্থান-কালের প্রয়োজনে পরে অন্যের দ্বারা রচিত ও সংযোজিত। তাই মূলাংশের বক্তব্য ও ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে ঐ দুই কাণ্ডের মিল নেই। কিন্তু বাল্মীকির রচনা বলে স্বীকৃত পাঁচ কাণ্ডেরও সবটা যে ভাবে ভাষায় ও ঘটনায় বাল্মীকির রচনা তা নিশ্চয় করে বলা যাবে না। এখানেও মনুষ্য স্বভাবজ বিকৃতি-রূপান্তর নিশ্চয়ই ঘটেছে।

ভারতবর্ষে রাম কথা প্রাগৈতিহাসিক। এ কাহিনীর জড় কোন গোত্র বা গোষ্ঠী জীবনের সমস্যা-উদ্ভূত। সভ্যতার উন্মেষ যুগে গোত্র বা গোষ্ঠীপতির শাসনে-নিয়ন্ত্রণে চলত এক একটি গোত্র বা গোষ্ঠী। সে কওম-সমাজে বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবনে যৌথজীবিকাকর্মের তাগিদে দলভুক্ত জনগণের মধ্যে ঐক্য-সদ্ভাব-সংহতি রক্ষার প্রয়োজনে কতগুলো অলঙ্ঘ্য নিয়ম-নীতি-রীতি-পদ্ধতি ও আচার-আচরণ বিধি মেনে চলা ছিল আবশ্যিক। গোত্র বা গোষ্ঠীপতি কিংবা দলের সরদারের উপর ছিল সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শাসন রাখার দায়িত্ব। অন্যেরা ছিল স্বতন্ত্রসত্তাহীন পুতুল বা যন্ত্রবৎ হুকুম-হুমকির পাত্র। ব্যক্তি সত্তার বিকাশের তথা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের কোন সুযোগ ঘটত না। জীবনযাত্রা তাদের ছিল অনেকটা গড্ডালিকার মতো। নিরুদ্রব প্রাত্যহিক জীবন এ-ভাবেই কাটত। ব্যক্তিসত্তার সামর্থ্যের, শৌর্যের, বুদ্ধির, কৌশলের পরিচয় দেবার ও পাবার সুযোগ ঘটত কেবল দুর্যোগ-দুর্দিনে যখন কোন প্রাকৃতিক বিপদ ঘটত কিংবা ভিন্ন গোষ্ঠী-গোত্রের আক্রমণ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলত। তখন দলের সাহসী-শক্তিমান রণনিপুণ কিংবা কূট-কুশল-প্রজ্ঞাবান

ব্যক্তি স্ব স্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে দলের শ্রদ্ধা অর্জন করত। গোষ্ঠীর বিপদে উদ্ধারকর্তা রূপে তাদের কৃতি পরিকীর্তিত হত এবং তা ক্রমে কীর্তি ও ঐতিহ্যরূপে শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমে চালু থাকত।

ঐ বাস্তব ঘটনার কাল যতই দূর-সুদূর অতীতে সরে যেত কাহিনীও বহু মনের স্পর্শে বহু মুখের উচ্চারণে রূপে-রসে-কল্পনায়-ভাবে-ভঙ্গিতে ও ঘটনার প্রসারে পল্লবিত ও অসামান্য হয়ে উঠত। এবং কৃতী পুরুষেরা কীর্তিমান অনন্য পুরুষ রূপে গান-গাথা-ইতিকথার নায়ক হয়ে উঠত। আজো রাজস্থানী গোষ্ঠীপতির এমনি বীরত্ব-মহত্ব কথা উৎসবে-পার্বণে-আসরে-অনুষ্ঠানে সগৌরবে ও সগর্বে গীত হয়, প্রাচীন আরবেও এমনি গোত্রবীরদের প্রশস্তিগান রচিত ও গীত হত উৎসবে-মেলায় ও রণাঙ্গনে, শাহ্-সামন্ত-সভায়ও এমনি কীর্তিগাথা রচনার ও গাইবার জন্যে কবি, ভাট, রায়বার (দূত) ও কথক রাখা হত। এমনি দু'একটি গাথা প্রতিভাবান কবির মানসের ও আবেগের লালন পেয়ে সার্থক কাব্য-নাটক রূপে গোটা জাতির সম্পদে ও ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। ইলিয়াড-ওডিসি-আলেফলায়লা-শাহনামা-রামায়ণ-মহাভারত এমনিভাবে অবিনশ্বর মানব-উত্তরাধিকারের গৌরব অর্জন করেছে। হাতিয়ার বিরল আদিম যুগে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে বাহুবল ও সাহসই ছিল নিরাপত্তার প্রধান অবলম্বন। ঐ সাহস ও বীরত্বের উৎস ছিল স্বজন-রক্ষার প্রেরণা ও দায়িত্ববোধ। তাই আদি কাব্য-নাটকে শৌর্য-বীর্য-পরার্থপরতার দানই ছিল মুখ্য এবং নীতি-আদর্শ নিষ্ঠাই ছিল প্রতিপাদ্য বিষয়।

রামায়ণ-মহাভারতও আদিতে কোন গোষ্ঠীর রূপকথা রূপে চালু হয়েছিল, পরে তা ব্যাস-বাল্মীকির প্রতিভার পরিচর্যা পেয়ে সর্বভারতীয় জাতীয় মহাকাব্যের অবিসংবাদিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে আদি-চেতনার রেশ রয়ে গেছে— দুটো কাব্যই যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য বংশের রাজকীর্তির ধারক।

আড়াই হাজার বছর আগেই 'রামকথা' তিনটে ভিন্ন ধরনের কাহিনী রূপে ভারতবর্ষে চালু ছিল। একটি বাল্মীকির কাব্যে বিধৃত ধারা, একটি বৌদ্ধ 'দশরথ' জাতকের ধারা এবং অপরটি দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কাহিনীর ধারা। এতেই বোঝা যায় এ কাহিনী অন্তত তিনহাজার বছর পূর্বে উদ্ভূত।

দশরথ জাতক (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ শতকে রচিত) মতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা একই মায়ের সন্তান, ভরত অন্য মায়ের পুত্র। বারাণসীরাজ দশরথের কাছে ছয় বছর বয়স্ক পুত্র ভারতকে রাজা করার জন্যে ভরতমাতা বরানুযায়ী আবদার করলে, রাম লক্ষ্মণ ও সীতার জীবন নাশের আশঙ্কা করে দশরথ তাঁদের হিমালয় প্রান্তে বার

বছর বনে বাস করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে দশ বছর অতিক্রান্ত হলে দশরথের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বর্তমানে ভরতকে সিংহাসনে বসাতে অমাত্যরা অস্বীকৃত হলে ভরত রামকে ফিরিয়ে আনার জন্যে বনে গমন করেন। রাম পিতৃ আদেশ অনুযায়ী আরো দু বছর বনে বাস করতে চাইলেন, তাই রামের পাদুকা ও লক্ষ্মণ সীতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে 'পাদুকা'কে প্রতীক করে ভরত রামের পক্ষ হয়ে দু'বছর রাজ্য শাসন করেন। তারপর রাম ফিরে এসে ভগ্নী সীতাকে বিয়ে করে রাজত্ব করতে থাকেন। এখানে কিষ্কিন্ধ্যা বা লঙ্কা কাণ্ড নেই।

দাক্ষিণাত্যে চালু রাম-রাবণ কাহিনীতে রাবণই নায়ক। ইনি পরম ধার্মিক। গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁর গভীর আলোচনা হয়, তিনি ধার্মিক বৌদ্ধ। হেমচন্দ্রের জৈন রামায়ণেও (১২ শতকে রচিত) রাবণই নায়ক। দাক্ষিণাত্যের কাহিনীতে রাবণ লঙ্কাবতার। গ্রন্থনামও লঙ্কাবতার সূত্র। এটি সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ। সম্ভবত খ্রীস্টীয় ১ম-২য় শতকে রচিত।

দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী বৌদ্ধ 'দশরথ জাতক' কাহিনী বৌদ্ধ সমাজে কোন গুরুত্ব পায়নি, তাই পল্লবিত হয়ে কাব্য-কাহিনীরূপে গড়ে উঠেনি। দাক্ষিণাত্যে অনার্য সমাজে উত্তরাপথের আর্যবীর রাম অন্তত কাব্যে প্রতিষ্ঠা পাননি, সেখানে রাবণই তাই জাতীয় বীর ও আদর্শ মানুষ। রাম ভক্ত বানরেরা জ্ঞাতিদ্রোহী হলেও কাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে।

উত্তর ভারতে 'রাম' আদর্শ আর্যপুরুষের প্রতীক। বাল্মীকি সুপরিকল্পিতভাবে এই প্রাচীন গল্প-ভিত্তিক একটি জীবনদর্শন, সমাজনীতি ও ধর্মদর্শন রূপায়িত করতে চেয়েছেন। তাঁর কাব্যে তাই আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ ভাই, আদর্শ মাতা, আদর্শ শাসক ও শাসন প্রণালী, আদর্শ বিচারক ও আদর্শ বীর, আদর্শ ভৃত্য, আদর্শ অনুচর-সহচর ও আদর্শ শত্রুর বাস্তব দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়াস প্রকট।

এক কথায় রামায়ণে আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বাত্মক বিকাশ-প্রকাশের রূপ বিধৃত রয়েছে। কাব্যের উপক্রমে কবির এই উদ্দেশ্যও সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। নারদের কাছে বাল্মীকি সর্বগুণ সম্পন্ন কোন জীবিত আদর্শ মানুষের সন্ধান চাইলেন "অধুনা পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান, বীর্যবান, ধার্মিক কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সচ্চরিত্র? কে সর্ব প্রাণীর হিতসাধন করেন? কে বিদ্বান এবং কে সন্ধিবিগ্রহ কার্যে পটু এবং প্রিয়দর্শন? কোন ব্যক্তি ধৈর্যশীল ও অতিশয় কান্তিমান? কে রোষ এবং অসূয়াকে জয় করেছেন? যুদ্ধ কালে কাকে ক্রুদ্ধ দেখলে দেবতারা ভীত হন?" রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নারদের উত্তর ছিল— "এই সর্বগুণাধার অযোধ্যার রঘুপতি রাম।" এমন

উদ্দেশ্যমূলক মহৎ রচনার নায়ক অবতার না হলে চলে না, তাই রামই নায়ক। আদর্শ আর্য-জীবন প্রতীক এই নায়ক কিন্তু গৌরাঙ্গ আর্য নন, ইনি আর্যপূর্বকালের নবদূর্বাদল শ্যাম মানুষ। ইনি বাহুবলে হরধনু 'ভঙ্গ' করেন অর্থাৎ কিরাতীয় নিষাদীয় মৃগয়া ও পশুজীবী যাযাবর জীবন পরিহার করেন ও 'সীতা' আবিষ্কার করে কৃষিজীবীর স্থায়ী আবাসিক জীবন ও সমাজ গড়ে তোলেন, কৃষিজীবী রামের পাদস্পর্শে দাক্ষিণাত্যে 'অহল্যা' বসুমতী প্রাণ পেয়ে জেগে উঠে ফুলে ফলে ফসলে। কাজেই আদি স্তরে জীবিকা বিবর্তনে জীবনের রূপান্তর ও উৎকর্ষের ইঙ্গিতও বহন করে এই কাহিনী। যদিও আর্যায়ণের ফলে ঐ কাহিনী তাৎপর্য-ভ্রষ্ট ও তুচ্ছ হয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনচিত্র রূপেই কেবল গৃহীত হয়েছে। এই আর্যীকৃত রামায়ণ কাহিনী আদর্শ আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিভূ নায়কের গৌরবগাথা রূপে পরিকল্পিত হলেও এতে তিনটে পৃথক কাহিনীতে তিনটে চিরন্তন জীবন-সত্য উদঘাটিত হয়েছে। রামায়ণে তিনটে শিথিল গ্রন্থি ঘরোয়া কাহিনী রয়েছে, তিনটের মধ্যে যোগসূত্র কেবল নায়ক রাম। প্রত্যেকটিই উপন্যাসের আদলে বিন্যস্ত। এ যুগেও টমাস মানের Joseph and his brothers-এর মতো রামায়ণ কাহিনী দিয়ে যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনা করা সম্ভব।

ঈর্ষা ও অসূয়াবহ্নি সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরামের সংসার কিভাবে মুহূর্তে ভস্মীভূত করে দিতে পারে, নিস্তরঙ্গ ঘরোয়া জীবনে বৈর ঝঞ্ঝা কিভাবে গৃহগত জীবন তরঙ্গসংকুল করে তুলল—তার যন্ত্রণা-বিধুর চিত্র রয়েছে অযোধ্যা কাণ্ডে।

আবার গৃহবিবাদ বা প্রাসাদষড়যন্ত্র কালে বিজাতির সাহায্য নিয়ে আপাত সাফল্য অর্জন করলেও পরিণামে পরাধীনতার শিকলই যে বরণ করতে হয়, ধন-জন জান-প্রাণ দিয়েও সেই কৃতজ্ঞতা-ঋণ ও আনুগত্যের দায় যে ঘোচে না, তা' সুগ্রীব ও বানর গোষ্ঠীর কাহিনীতে স্বতোস্ফুট। রামায়ণ 'বানর ও রাক্ষস-রূপী দক্ষিণ ভারতীয় অনার্যদের উপর নররূপী উত্তর ভারতীয় আর্যদের প্রভুত্ব-বিস্তারের কাহিনীকাব্যও বটে।

আর 'পাপ যে বাপকেও ছাড়ে না'—সভ্য জগতে নারীর মর্যাদা হানি যে যে কোন অন্যায় কর্মের চাইতেও গুরুতর এবং সমাজ-স্বাস্থ্যের পক্ষে এইটে যে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ—আত্মবিনাশই কেবল প্রায়শ্চিত্ত এবং জ্ঞাতিদ্রোহিতায় ও পরানুগ্রহে প্রাপ্তির পরিণাম যে অনুগ্রহজীবিতা তা' লঙ্কাকাণ্ডে সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। অবশ্য আর্য-কীর্তির সগর্ব বিঘোষক আর্যকবি বাল্মীকি আধুনিক মার্কিনীদের মতোই এ দিকে দৃষ্টি দেননি, কেবল নির্বাসিত নায়ক কূটকৌশলে ব্রিটিশের মতো বিনাক্ষতিতে দুটো

রাজ্য জয় করে যে জাতিকে কৃতার্থ করেছেন, তাতেই উল্লসিত। কিন্তু সুগ্রীব ও বিভীষণ দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে অনুগত সামন্তের নিরাপত্তাই কেবল পেল। তার জন্য ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে খোয়াতে হয়েছে কত। রামায়ণ-জানা ভারতীয় রাজান্যবর্গ এ তত্ত্ব কোনদিন উপলব্ধি করতে পারেনি, কোন লিপ্সুই পারে না।

৭

কৃত্তিবাস

প্রায় শতেক বছর ধরে কৃত্তিবাস-সমস্যার মীমাংসা-প্রয়াস কেবল বিতর্কই বাড়িয়েছে। এতে তথ্য-তত্ত্বের জটিলতা যত না ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল আলোচক-গবেষকের মানস-প্রবণতার প্রভাব। তাই প্রমাণের চাইতে কখনো কখনো অনুমান গুরুত্ব পেয়েছে বেশী। ১৮৯৬ সন থেকে হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি আবিষ্কৃত ও দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বিধৃত কৃত্তিবাসের 'আত্মবিবরণীই' ছিল এই বিতর্কের ভিত্তি। পরে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে) 'ভারতবর্ষ'-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সংগৃহীত আত্মবিবরণীটি প্রকাশিত করেন ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী। বাঙলার সব প্রখ্যাত গবেষক ও ঐতিহাসিক নানা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল নির্ধারণের ও তাঁকে দর্শনদাতা 'গৌড়েশ্বর'কে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউ কারো সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নারাজ। তাই আজো সমাধান-প্রয়াস ও বিতর্ক চলছে—নতুন কোন পাথুরে প্রমাণ না মিললে—প্রয়াস ও বিতর্ক চলতে থাকবে।

উভয় আত্মবিবরণীর পাঠ যথাক্রমে ১৫২ ও ১৮২ ছত্র সম্বলিত। কৃত্তিবাস অনেক কথাই বলেছেন, কেবল আমাদের প্রয়োজনীয় সন-তারিখটাই উল্লেখ করেননি। মধ্যযুগের আলাউল প্রভৃতি অনেক কবিই আমাদের জন্যে ধাঁধা সৃষ্টি করে গেছেন। এই একটি কথা থাকলে আর কিছু না জানা গেলেও চলত; আর ঐ একটি তথ্য নেই বলে যা আছে তা বিতর্কের উৎস হওয়া ছাড়া সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য বিশেষ সিদ্ধ করে না।

আমরা এখানে ডক্টর ভট্টশালী প্রকাশিত আত্মবিবরণীটি উদ্ধৃত করছি:

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজ।
তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥

দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগ ভুঞ্জিলেক সংসারের সার ।।
বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল হইল অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর ।।
শুভ ভোগ কর‍্যা বিহরয় গঙ্গাকুলে।
বসত করিতে স্থান ব্রাহ্মণ খুজ্যা বুলে ।।
গঙ্গাতীরে দাণ্ডায়্যা ব্রাহ্মণ চতুর্দ্দিগে চাই
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথাই ।।
পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
ব্রাহ্মণের মুখে শুনি কুঃকুরের ধ্বনি ।।
কুঃকুরের ধ্বনি শুনি ওঝা চারিদিকে চাহে।
আকাশ বানী হয়্যা তথা গোসাঞি যে রহে ।।
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চতে থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা।
গ্রামরত্ন ফুলিয়া যে জগতে বাখানি।
দক্ষিণ পশ্চিমে চাপ্যা বহেন গঙ্গা সোনি ।।
ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাহার বসতি।
ধনে ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়ায় সন্ততি।
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হইল তাহার আলয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাহার তনয় ।।
জ্ঞানেতে কুলেতে শীলে মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হইল তার সংসারে বিদিত ।।
জেষ্ঠ পুত্র হইল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ।।
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ঠাকুরাল ধর্ম্মচর্চিত গুণে মহাজ্ঞানী ।।
মদন আলাপে ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস আছেন শাস্ত্রে অবগতি ।।
সুস্থির ভাগ্যবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ।।
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞির প্রসাদে।

মুরারির পুত্র সব বাড়এ সম্পদে ॥
মাতা পতিব্রতায় যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হইল এক যে ভগিনী ॥
সংসার আনন্দ লয়্যা হৈল কৃত্তিবাস ॥
ভাই মৃত্যুঞ্জয় ষড়রাত্রি উপবাস ॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্বলোকে ঘুসি।
শ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হইল সতাই উদর ॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী ॥
ছয় ভাই উপজিল সংসার গুণশালী ॥
আপনার জন্মরস কহিব যে পাছে।
মুখটিবংশের কথা আর কহিতে আছে।
সূর্য পণ্ডিতের পুত্র নামে বিভাকর।
সর্বত্র জিনিঞা পণ্ডিত বাপের সোসর।
সূর্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক রয় যাহার দুয়ার ॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদ ঘোড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া।
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বড়ই সুন্দর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর ॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘুষএ সংসার।
মুখটি বংশের পদা শাস্ত্র অনুসার।
ব্রাহ্মণে সজ্জনে শিখে যাহার আচার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মন্বজ্য গুনে।
মুখটি বংশের কথা কত কব জনে জনে ॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্মিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
শুভক্ষনে গর্ভে থাকি পড়িলাম ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা মাতা আমা কৈল কোলে ॥

দক্ষিণ যাইতে নাম রাখিল কৃত্তিবাস।
কৃত্তিবাস বলিয়া নাম করিল প্রকাশ।।
এগার নীবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেলা পড়িতে গেল্যাম উত্তরদেশ।।
বৃহস্পতি বারের উষা পোহাইলে শুক্রবার।
বারান্ত উত্তরে গেল্যাম বড় গঙ্গাপার।।
তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা পাইলাম আমি বিদ্যার প্রচার।।
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার কলেবর।
নানা ছন্দে নানা ভাষা বিদ্যার প্রসার।।
আকাশবাণী হইল সাক্ষাৎ সরস্বতী।
তাহার প্রসাদে কণ্ঠে বৈসেন ভারতী।।
বিদ্যা সাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন।
গুরুকে দক্ষিনা দিয়া ঘরেক গমন।।
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার প্রসন।।
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু মহা উর্দ্ধাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি হইল বিদ্যার উদ্ধার।।
গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে।।
সাত শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর।
সিংহময় রাজা আমি করিলাম গোচর।।
সপ্তঘটী বেলা যখন দিয়ানে পড়ে কাঠি।
শ্রীঘ্র ধ্যায়া আইল দূত হাথে সুবর্ণ লাঠি।।
কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ।।
নয় বৃহন্দ গেল্যাম রাজার দুয়ার।
সোনা রূপার ঘর দেখি মনে চমৎকার।।
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বস্যা আছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ।।
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।

পাত্র মিত্রে বস্যা রাজা পরিহাসে মন ।।
গন্ধব্ব´ রায় বসি আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিহোঁ গৌরব আপার।।
তিনপাত্র দাণ্ডাইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা করে পরিহাসে।।
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরুণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী।।
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর।।
রাজা সত্যখান যেন দেব অবতার।
তখন আমার চিত্তে লাগে চমৎকার।।
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দণ্ডায়্যাছে রাজার সমুখে।।
চারিদিকে নাটগীত সর্ব্বলোকে হাসে।
চারিদিকে ধাওয়া ধাই রাজার আওয়াসে।।
আঙ্গিনায় পাতিয়াছে রাজা মাজুরি।
পথির উপর পাতিয়াছে পাট নেত তুলি।।
পাটের চান্দয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর।।
দণ্ডাইলাম গিয়া আমি রাজার বিদ্যমান।
নিকট যাইতে রাজা মোরে দিলা হাথ সান।।
রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচচস্বর।
রাজার নিকট আমি চলিলাম সত্বর।।
রাজার ঠাঞি দণ্ডাইলাম হাথ চারি আন্তর।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর।।
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার কলেবর।
সরস্বতী প্রসাদে আমার মুখে শ্লোক স্বরে।।
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িয়ে সভায়।
শ্লোক শুন্যা গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়।।
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িয়া রসাল।
খুসি হইআ মহারাজা দিল পুষ্পমাল।।

কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিলা পাটের পাছাড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে গোসাঞি করিলে সম্মান॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্র মিত্র সভে বলে শুন দ্বিজরাজে॥
যত খুজ তত দিতে পারে মহারাজে॥
যথা যথা যাই আমি গৌরব মাত্র সার।
কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার॥
আকৃতি প্রকৃতি আমি যত অস্থিতি।
পাট পাছড়া পাইনু আমি চন্দনে ভূসিতি॥
ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাঞি লই।
যথা যথা যাই আমি গৌরব যে চাহী॥
যত মহা পণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইনু রাজার দুয়ার।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধ্যায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
লোকে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিত মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মাএর আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥
সাত কাণ্ডের কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে হইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
মহারাজার আজ্ঞায় বাল্মীকি মহামুনি
রামায়ণ কবিত্ব তিহোঁ করিলা আপুনি॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি করয়া যত দেবগণ।
বাল্মীকির মুখে সবে শুনেন রামায়ণ॥

পৃথিবী জিনিতে সবে চড়ে ইন্দ্রের কান্ধে।
দিগদিগান্তর জিনিতে কেহো সেতু বান্ধে।।
কোন রাজা জিএ ষাটী হাজার বৎসর।
কোন রাজা মরণ জিনে সিদ্ধে কলেবর।।
রঘু বংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচিল বাল্মীকি মুনির বরে।।
চতুর্দ্দিকে ভাগ জানি ফুলিয়া নগরী।
দক্ষিণ পশ্চিম চেপ্যা বহে গঙ্গাসুরেশ্বরী।।
মুখটী বংশ ওঝা সংসারবিদিত।
তথি উপজিল এই কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।
বাপ বনমালী ওঝা মানিকী উদরে।
জনম লইল ওঝা ছয় সহোদরে।।
সরস সুন্দর হইল বাণী বিলাস।
ফুলিয়া সমাজে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।
মুনি মধ্যে বন্দিব বাল্মীকি মহামুনি।
তপের প্রভাবে তিহো ত্রিভুবন জিনি।।
তাহার কবিত্ব শুন রামায়ণ কথা।
ভারতী বন্দিয়া তবে গায়্যা দিল পোথা।।
সরস ভাষে গায় হাতে তাল ধরি।
ভারতীর প্রসাদে কেহো দোষ দিতে নারি।।
মুনির বাক্য শুনিতে কেহ না করিহ হেলা।
ইহাতে অমৃত আছে কত রসকলা।
পোথার ভিতর কবিত্ব ছিল কেহো নাঞি বুঝে।
কৃত্তিবাসের কবিত্ব সৰ্ব্বলোক পুজে।।
আদি কাণ্ড গাইলেন শ্রীরাম চরিত।
লোক বুঝাইতে কৈলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।

এবার এ যাবৎ যে সব যুক্তি ও প্রমাণ গুরুত্ব পেয়েছে বা গ্রাহ্য হয়েছে অথবা গুরুত্ব পাবার যোগ্য, সেগুলো তুলে ধরছি:

১. রাজা গণেশ (১৪১৭-১৮) থেকে সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৬ খ্রীঃ) অবধি গণেশ, মহেন্দ্র, জালাল উদ্দীন (যদু), নাসিরুদ্দীন,

মাহমুদ শাহ, কিংবা রুকন উদ্দীন বারবক শাহ কৃত্তিবাস-উক্ত গৌড়েশ্বর হবেন। কৃত্তিবাস দেশী হিন্দু কবি, হিন্দুর জন্যেই লিখেছেন কাব্য। আত্মপরিচিতির লক্ষ্য সমকালের স্থানীয় হিন্দু সমাজ। কাজেই দেশী হিন্দু অমাত্যের নামগুলোই তিনি পাঠক-শ্রোতার জ্ঞাতার্থে উল্লেখ্য মনে করেছেন; সে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক নেই তেমন বিধর্মী বিদেশী অমাত্যের নাম করা অনর্থক হত, ঐ সব মুসলিম নাম তিনি মনেও রাখতে পারতেন না, যাঁদের তিনি নাম করেছেন তাঁদের হয়তো তিনি চিনতেন বা পরে দরবারে কারো কাছ থেকে কৌতূহল বশে শুনে নিয়েছিলেন। সমকালের স্ব-শ্রেণীর ও স্ব-সমাজের মানুষকে জানা-চেনার আগ্রহই স্বাভাবিক। কাজেই এক্ষেত্রে হিন্দু রাজা খোঁজার দরকার নেই। এঁদের আগের বা পরের কোন গৌড়েশ্বর এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য নন।

২. কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বরের দরবার হিন্দু অমাত্যে পূর্ণ, কাজেই এই গৌড়েশ্বর সম্ভবত হিন্দু। সমকালীন রাজার নামোল্লেখ বাহুল্যবোধে কৃত্তিবাস করেননি। শাসক-প্রশাসকের ব্যক্তিগত নাম আমরাও করি না।

৩. কৃত্তিবাস-উল্লেখিত কেদার রায়, নারায়ণ, মুকুন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি কয়েক-জনের দরবার সংশ্লিষ্ট থাকার ও পনেরো শতকের শেষার্ধে জীবিত থাকার পরোক্ষ প্রমাণ মেলে। যেমন মৈথিলস্মার্ত বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দণ্ডবিবেক' গ্রন্থ ও মল্লা তাকিয়ার 'বয়াজ' সূত্রে কেদার রায়ের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাঁকে রুকন-উদ্দীন বারবক শাহর মিথিলাস্থ প্রতিনিধি বা নায়েব বলে সনাক্ত করা সম্ভব। চূড়া-মণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়' সূত্রে জানা যায় হোসেন শাহর অন্তরঙ্গ (বৈদ্য) মুকুন্দ ও তাঁর পিতা নারায়ণ দাস রাজবৈদ্য ছিলেন—

'রাজবৈদ্য নারায়ণ দাস মোর বাপ'।

এবং কুলজী গ্রন্থ সূত্রে কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিং-মুরারি বংশীয় অনেকের উল্লেখ মেলে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে সুষেণ পণ্ডিত ও কৃত্তিবাসের নাম মেলে।

৪. কৃত্তিবাসের দীর্ঘ আত্মপরিচয় আসরে গায়েন ও শ্রোতার পক্ষে অবান্তর ছিল বলে গায়েন বা লিপিকর ৮-১০ ছত্রে কৃত্তিবাসের পিতামাতার নাম, গ্রাম ও তাঁর কবিত্ব পাণ্ডিত্য ও ভাই-বোনের সংখ্যা নির্দেশ করেই 'কবি পরিচয়' সেরেছেন। এ-ই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। মানুষ কবিতে নয়, কাব্যরসেই আগ্রহী। কিন্তু ঐ সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে মোটামুটি ঐক্য রয়েছে। কাজেই আত্মবিবরণীটি বহুলাংশে অর্থাৎ শেষের কিছু সন্দেহজনক চরণ ব্যতীত অকৃত্রিম।—'সাত কাণ্ডের কথা হয় দেবের সৃজিত। লোক বুঝাইতে হইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত' থেকে শেষ চরণ অবধি

অংশটির সঙ্গে পূর্বাংশের রচনাগত, ভাবগত এবং প্রসঙ্গগত সঙ্গতি কম, এটি জনগণের নামে কোন আদি গায়েনের সংযোজন। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে জনগণের জবানীতে কৃত্তিবাসের আত্মপ্রশস্তি।

৫. কৃত্তিবাসের পূর্ব পুরুষ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারসিংহ (নর সিংহ, নৃসিংহ) বেদানুজ মহারাজের পুত্র নন, কেননা কুলজীসূত্রে নারসিংহের পিতার নাম শিয়ো বা শিব। বেদানুজ মহারাজা (স্বাধীন যদি হন) বলে কারো নাম খড়্গ বা চন্দ্র আমলে পূর্ববঙ্গে মেলে না। যদি ইনি সামন্ত বা ভূস্বামী হন, তা হলে অবশ্য অন্য কথা। আর বেদানুজকে দনুজ করলেও কোন দিশা মিলবে না। ১২৮০ খ্রীস্টাব্দের দিকের দনুজ মাধব, চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন কিংবা দনুজমর্দনদেব গণেশকে নারসিংহের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। কারণ সব সূত্রেই প্রমাণিত হয়েছে যে নারসিংহ-গর্ভেশ্বর-মুরারি-বনমালী-কৃত্তিবাস—এই বংশ লতিকা যথার্থ। এবং মুরারির সাত পুত্রের কেউ কেউ এবং তাঁদের কোন কোন পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র নানা ক্ষেত্রে কৃতী ও প্রসিদ্ধ ছিলেন বলে কুলজী ও অন্যান্য গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়। এমনকি আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরও ঐ ফুলিয়ার নৃসিংহের বংশধর। এঁদের বংশানুক্রম ধরে হিসেব করলে উক্ত সামন্ত দনুজ-ত্রয়কে নারসিংহের সমকালের মহারাজা বলা যাবে না।

৬. অন্য কোন প্রমাণ ছাড়াই একটি মাত্র যুক্তি দিয়ে বলা যায়, রামায়ণ বাঙলায় তর্জমার মতো অশাস্ত্রীয় কর্মে পনেরো শতকে কোন হিন্দুই কৃত্তিবাসকে প্রকাশ্যে প্রবর্তনা দিতে পারেন না। মুখে তর্জমা করা কিংবা গাওয়া এক কথা আর লিপিবদ্ধ করে আচণ্ডালের আয়ত্তে দেওয়া ভিন্ন কথা। শাস্ত্রের লিখিত তর্জমার ব্যাপারে দুনিয়ার সব শাস্ত্রীই চিরকাল বাধা দিয়েছেন। ভারতে তো কথাই নাই—যেখানে নগণ্য সংখ্যক উচ্চবর্ণের পুরুষ ছাড়া কারো শুনবারই অধিকার ছিল না। কাজেই 'দনুজ' মুসলিম মর্দনে ব্রতী রাজা গণেশ কৃত্তিবাসকে এমন পাপ কর্মে প্রবর্তনা দিতে পারেন না, যদি দেন, তাহলে রৌরব নরকের সেই পাঁতির মূল্য কি?

৭. ষোল শতকের কবি জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্য মঙ্গলের উপক্রমে প্রসঙ্গক্রমে কৃত্তিবাসের নামোল্লেখ করেছেন: "রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি/পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি।" অবৈষ্ণব-দ্বেষী জয়ানন্দ (খুড়াজ্যোঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্পভক্তি) যখন অবৈষ্ণব কৃত্তিবাসের নাম করেছেন, তখন বুঝতে হবে কৃত্তিবাস দূর অতীতের মৃতব্যক্তি।

৮. ইব্রাহিম কাইয়ুম ফারুকী তাঁর 'শফরনামা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সুলতান বারবক শাহ ঘোড়া উপহার দানে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বিদ্যুৎসাহী সুশাসকও

ছিলেন। ইব্রাহিম কাইয়ুম ফারুকী, মালাধর বসু ও রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রকে, তিনি প্রতিপোষণ ও খেতাব দান করেছিলেন। 'পদচন্দ্রিকা' গ্রন্থে বৃহস্পতি মিশ্র বলেছেন যে তিনি বারবক শাহ থেকে 'রায়মুকুট' উপাধি ও ঘোড়া উপহার পেয়েছিলেন।

৯. কৃত্তিবাস উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রের বিভিন্ন গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর শেষ গুরু দিবাকরের কাছেই পাঠ সমাপন করেন। তবে এক গুরু সম্বন্ধে বলেছেন যে,—"ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন/হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যার প্রসন।" দিবাকর ছাড়াও তিনি হয়তো 'ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি চ্যবন' সম বৃহস্পতি মিশ্রের কাছেও পড়েছেন। জন্মস্থান রাঢ়ে হলেও দরবারাশ্রিত বৃহস্পতি মিশ্র গৌড়ে থাকতেন। তাঁর উদ্দেশেই হয়তো গায়েন বন্দনা করেছেন—'রাঢ়া মধ্যে বন্দিনু আচার্য চূড়ামণি/যাঁর ঠাঁই কৃত্তিবাস পড়িলা আপনি।"

১০. কৃত্তিবাস স্বেচ্ছায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন, গৌড়েশ্বরের দরবারে উপস্থিত হবার আগেই তিনি কবিতা রচনা করতেন, তাই তিনি বলেছেন—'যথা যথা যাই আমি গৌরব যে চাহি/যত যত মহাপণ্ডিত আছএ সংসারে/আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে।' কিন্তু গৌড়েশ্বরের কাছে তিনি স্বরচিত নানা রসের যে সপ্ত-শ্লোক নানাছন্দে উচ্চারণ করে কবিত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন—সে শ্লোকগুলি কি সংস্কৃতে না বাঙলায় রচিত? শ্লোক বললেই কি সংস্কৃত বুঝতে হবে? তা-ই যদি হয়, সংস্কৃত ভাষায় কবিত্বের পরিচয় দিয়ে বাঙলায় পয়ার ও লাচাড়ি লিখবার প্রবর্তনা পাবেন কেন? তাছাড়া "বাপ মাএর আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ/বাল্মীকির প্রসাদে রচে রামায়ণ গান।"—এতে গুরুর আজ্ঞা আবিষ্কার করতে হলে ছত্রটির পুরো মানে ধরতে হবে—'মা-বাপের সম্মতি নিয়ে গুরুর আজ্ঞায়' রচনা করেছেন—কিন্তু এ অর্থ কষ্ট-কল্পনা জাত, বরং সহজ মানে এই পিতামাতার আশীর্বাদ ও গুরুর শুভেচ্ছার বলে বাল্মীকির প্রসাদে রামায়ণ গান রচনা করেন কৃত্তিবাস। তাছাড়া ঐটি প্রশংসা-কারী লোকদের জবানীতে উক্ত। সেই কারণেও এটিতে কারো আদেশ নির্দেশ আবিষ্কার করা চলে না। আগেই বলেছি পনেরো শতকের কোন নিষ্ঠশাস্ত্রী বা হিন্দুর পক্ষে রামায়ণ রচনায় উৎসাহ দেওয়া অসম্ভব। অতএব—

বাপমাএর আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্ত কাণ্ড গান।

(হারাধন দত্তের পুঁথির পাঠ)

কিংবা—

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ। (ক-ধ পদান্ত মিল নেই)

এই পাঠ গায়েন-লিপিকরের সংযোজন।

কাজেই আমাদের ধারণা কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীর প্রথমাংশ ১৫০ চরণ অবধি অকৃত্রিম। তবে গায়েন-লিপিকরের হাতে কিছু শব্দের রূপান্তর হতে পারে। এখানে তাঁর যেসব জ্ঞাতি পরিজনের উল্লেখ রয়েছে তাঁদের অনেকেই নানা ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের অনেকের নাম ও ব্যক্তিত্ব 'মহাবংশাবলী' ও অন্যান্য কুলজী গ্রন্থে সমর্থিত। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীর বিবৃতির সঙ্গেও কৃত্তিবাসের উক্তির সাদৃশ্য রয়েছে। গায়েন প্রদত্ত কবি পরিচিতিতেও রয়েছে কবির মা-বাপ-ভাই-বোনের নাম। কৃত্তিবাস যে বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গুরুর কাছে বিদ্যাভ্যাস করে ছিলেন, তাও গায়েন প্রদত্ত কবির সংক্ষিপ্ততম পরিচিতির মধ্যেও উল্লিখিত রয়েছে।[১]

অবতার কাহিনী রামায়ণের মতো পবিত্র গ্রন্থ বাঙলায় তর্জমা করার মতো অশাস্ত্রীয় পাপ কর্মে কোন হিন্দুই পনেরো শতকে প্রবর্তনা দিতে পারে না। কাজেই কৃত্তিবাস কোন সুলতানের দরবারে সংবর্ধিত হয়েছিলেন—হিন্দু রাজার সভায় নয়। তাছাড়া 'নয় বৃহন্দের মালিক কখনো সামন্ত হতে পারেনা। এবং সামন্তও শাহ-সুলতান রাজা-মহারাজা হতে পারেন। কিন্তু গৌড়েশ্বর হতে পারেন না। এই সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহ বলেই মনে হয়। দেশী হিন্দু কবি কৃত্তিবাস হিন্দুর জন্যই কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর আত্ম-পরিচিতির লক্ষ্যও সমকালের ও স্বস্থানের হিন্দু সমাজ। কাজেই দম্ভপ্রবণ সম্মান-গর্বিত কবি তাঁদের জ্ঞাতার্থেই দেশী হিন্দু অমাত্যদের নামোল্লেখ করেছেন—যাঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক নেই সেই বিদেশী বিধর্মী অমাত্যদের সম্বন্ধে দেশী হিন্দুর কৌতূহল থাকার কথা নয়, কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন কবি তাই কেবল হিন্দু অমাত্যদের নামোল্লেখ করেছেন। অহিন্দুর বা বিদেশী হিন্দুর নামও কৃত্তিবাস হয়তো মনেও রাখতে পারতেন না, পূর্বে দেখা বা শোনা না থাকলে ঐসব হিন্দু অমাত্যের নাম ও পরিচয় জানা কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না, সবার সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকা কিংবা সবাইকে তাঁর পক্ষে চেনাও সম্ভব ছিল না। মনে হয় তিনি দরবারের কোন কর্মচারীর কাছ থেকে পরে উপস্থিত অমাত্যদের নাম জেনে নিয়েছিলেন, তাঁর কাব্যের উপক্রম রচনার সময়ে - তাঁর

১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১২৫-৩১।

রাজসংবর্ধনা প্রাপ্তির সাক্ষী স্বরূপ ঐসব অমাত্যাদের নামোল্লেখ করে তিনি পাঠক শ্রোতার কাছে তাঁর মর্যাদাবৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। কবি কৃত্তিবাসের দম্ভোক্তি ও আত্ম-শ্লাঘা কাব্যে লক্ষণীয়। লোকের জবানীতে আত্মপ্রশস্তি রচনার মতো অশোভন কাজেও তিনি লজ্জাবোধ করেন নি। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী এত দীর্ঘ যে তা শুনাবার-শুনবার ধৈর্য গায়েন বা শ্রোতা কারো থাকার কথা নয়, গায়েন-পাঠক-শ্রোতা কবিতে নয়, কাব্যরস বা গীতিরসেই আগ্রহী। তাই গায়েনরা ৮/১০ ছত্রে (অন্যান্য পুথিতে যেমন পাওয়া যায়) কবির মা-বাপ ও নাম-নিবাসের পরিচয় দিয়ে পালা শুরু করত। এরূপে চার শতাব্দের অবহেলায় কৃত্তিবাসের 'আত্মপরিচয়' অংশ বিরল ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কৃত্তিবাসই প্রথম ব্রাহ্মণ যিনি পাপভয় পরিহার করে বাঙলায় রামায়ণ গান রচনে-কথনে অগ্রসর হয়েছিলেন। হয়তো লোকনিন্দা ও সমাজচ্যুতির আশঙ্কা দূর করার জন্যে তিনি রাজসম্মানের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন :

গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।
যত যত মহা পণ্ডিত আছএ সংসারে
আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে।

কৃত্তিবাস স্বেচ্ছায় রামায়ণ রচনায় হাত দিয়েছিলেন গৌড়দরবারে উপস্থিত হবার আগেই। তাঁর উক্তি মতে তিনি কবিরূপে স্বীকৃতিও লাভ করেছিলেন—যত যত মহা পণ্ডিত আছএ সংসারে/আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে।' কবিত্ব গৌরব ছাড়া তিনি অন্য 'ইনাম' চান না বলেই দরবারে ঘোষণা করেন। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ রাজা থেকে তিনি পুষ্পমালা, পাটের পাছড়া (রেশমী চাদর) এবং মাথায় চন্দন প্রলিপ্তি পেয়েই তুষ্ট। কোন দান গ্রহণে তাঁর অনীহা। কৃত্তি-বাসের স্বমুখে দম্ভোক্তি অশোভন হলেও তিনি যে মেধাবী, বহু বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন উচ্চাভিলাষী এবং কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পাঠে আগ্রহ না থাকলে এগারো বছরের বালক নির্বান্ধব বিদেশ বরেন্দ্রে স্বেচ্ছায় যেত না। আর জোর করে মা-বাপ এতো ছোট বালককে যানবাহন-বিরল সে-যুগে কিছুতেই পাঠাতে পারতেন না। বরেন্দ্রেও এই জিজ্ঞাসু-নিষ্ঠ বিদ্যার্থী নানা স্থানে, নানা গুরুর কাছে স্বেচ্ছায় নানা বিদ্যা শিক্ষা করে-ছেন। কৃত্তিবাস মুক্তবুদ্ধি ও দুঃসাহসী যুবক ছিলেন। তাই ব্রাহ্মণপণ্ডিত হয়েও রামায়ণ রচনার মতো দেশাচার বিরুদ্ধ অশাস্ত্রীয় অপকর্মে সগর্বে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রাজদরবারে অনাহূতভাবে উপস্থিত হয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের

এই আগ্রহ তাঁর উচ্চাভিলাষ, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, ও সপ্রতিভ স্বভাবের পরিচায়ক। লক্ষণীয় যে লৌকিক দেবতার প্রভাব ও প্রসার রোধ করে গণমানবকে সনাতন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অনুগত রাখার একটা সচেতন চেষ্টাও ছিল দরবার-ঘেঁষা শিক্ষিত উচ্চবিত্তের কায়স্থ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে।

তিনি কারো আদেশে-নির্দেশে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হননি—এ বিষয়ে প্রশংসা-মুখর লোকের জবানীতে তাঁর নিজের উক্তি এই—

বাপ মাএর আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান।

এর সহজ ও একমাত্র অর্থ এই—বাপ-মায়ের আশীর্বাদে ও গুরুর শুভেচ্ছা বলে আদি কবি বাল্মীকির প্রসাদে কৃত্তিবাস রামায়ণ গান রচনা করেন। এখানে 'রচে' ক্রিয়াপদে গুরুত্ব দিয়ে গৌড় দরবারে উপস্থিতির পূর্ব থেকেই কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেছেন—ধারণা করা অসঙ্গত। কারণ গোটা আত্মপরিচয়টি রচিত হয়েছে কাব্যের উপক্রম হিসেবে এবং গৌড়দরবারের সেই দুর্লভ সম্মান প্রাপ্তির কথা স্মৃতি থেকেই রচনাকালে বিবৃত। এ ক্রিয়াপদে 'ঐতিহাসিক বর্তমান' কাল ব্যবহৃত মাত্র। কবির 'আত্মকথা' অংশ পাঠে মনে হয়, কবি শিক্ষাপর্ব সমাপনের অনতিকাল পরেই গৌড়েশ্বরের দরবারে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন, এমনো হতে পারে যে শেষ গুরুর কাছে মঙ্গলবারে বিদায় নিয়েই হয়তো তিনি রাজধানী গৌড় যাত্রা করেছিলেন এবং গৌড় থেকে বাড়ি ফিরে রামায়ণ রচনা শুরু করেন—তাঁর আদর্শ-কবি বাল্মীকি যেমন বেদনা ও করুণা সঞ্জাত শ্লোক উচ্চারণ করেই—সুপ্ত শক্তির সন্ধান পেয়ে তাকে কাজে লাগানোর জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই ব্যাকুল বাসনার প্রসূন ঐ অমর কাব্য, তেমনি রাজদরবারে প্রশংসিত হয়ে আত্ম-প্রত্যয়ে ঋদ্ধ কৃত্তিবাসও আপন প্রতিভা চিরকালের জন্যে প্রমূর্ত করে রাখবার বাসনায় অচিরে লেখনী ধারণ করেছিলেন। কৃত্তিবাস রামায়ণের শুধু প্রথম কবি নন, সর্বপ্রধান কবিও। গত পাঁচশ' বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত কৃত্তিবাসের মতো এমন সর্বজনশ্রুত সর্বজনপ্রিয় কবি বাঙলাদেশে কেউ আবির্ভূত হননি। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী পড়েই তাঁর 'পুরস্কার' কবিতা রচনা করেছিলেন। আত্মবিরবণীর দরবার দৃশ্য ও কবির বক্তব্য পুরস্কার কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরস্কার কবিতায় রাজার নাম মহেন্দ্র।

আত্মপরিচয় সূত্রে কৃত্তিবাস তাঁর জন্ম তারিখ উল্লেখ করেছেন: "আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূণ্য মাঘ মাস"-এ তাঁর জন্ম হয়, অর্থাৎ মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমী

তিথিতে রবিবারে তাঁর জন্ম। কিন্তু দিন-মাসের উল্লেখ থাকলেও কোন্ বছরে তাঁর জন্ম তার উল্লেখ নেই ; তাই সমস্যা।

সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মাঘমাসের রোববারে শ্রীপঞ্চমীতিথি পনেরো শতকের কোন্ কোন্ বছরে ছিল, তা কানুপিল্লাই-এর গণনারীতি অবলম্বন নির্ণয় করে কৃত্তিবাসের জন্ম সন বের করেছেন। আমরা তাঁর নিরূপিত সন তারিখ সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি, তাই তাঁর বক্তব্য ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি :

"কৃত্তিবাসের জীবনের একাদশ বর্ষের শেষ দিন ছিল বৃহস্পতিবার এবং দ্বাদশ বর্ষের প্রথম দিন ছিল শুক্রবার :

এগার নীবড়ে যখন বারতে প্রবেশ
হেন বেলা পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ।
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার।

কৃত্তিবাসের জন্ম হয়েছিল মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী (অর্থাৎ শুক্লাপঞ্চমী) তিথিতে রবিবারে—ধরা যাক 'ক' সালে। তা হলে বাংলা রীতি অনুযায়ী 'ক'+১১ সালের মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে তিনি এগার বছর পূর্ণ করে (এগার নীবড়ে) বার বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন এবং ঐ সালের ('ক'+১১) ঐ তিথি পড়েছিল শুক্রবারে। এই যোগাযোগ খুব সচরাচর ঘটে না। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (কৃত্তিবাস রুকনউদ্দীন বারবক শাহের সভায় গেলে, যে সময়ে কৃত্তিবাসের জন্ম গ্রহণ করার কথা) এই যোগাযোগ সত্যই ঘটেছিল ১৪৪৩ ও ১৪৫৪ খ্রীস্টাব্দের ক্ষেত্রে। স্বামী কানুপিল্লাইয়ের Indian Ephemeries (Vol. V, p. 88 এবং P. 110) থেকে দেখছি যে ১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দে মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী (শুক্লাপঞ্চমী) তিথি পড়েছিল রবিবারে—৬ই জানুযারী তারিখে এবং তার এগার বছর পরে ১৪৫৪ খ্রীস্টাব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি পড়েছিল শুক্রবারে—৪ঠা জানুয়ারী তারিখে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে, কৃত্তিবাস ১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, ১৪৫৪ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা জানুয়ারী তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য উত্তর বঙ্গের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং ১৪৬৫ থেকে ১৪৭৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে তিনি রুকনউদ্দীন বারবক শাহের সভায় গিয়ে গৌড়েশ্বরের কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন।" [প্রাঃ কঃ পঃ সময় পৃঃ ১৬৭-৬৮]

১৪৭০ সনের পরে যদি কৃত্তিবাস রুকনউদ্দীন বারবক শাহের সভায় গিয়ে থাকেন এবং তার পরেই যদি গ্রন্থ রচনা শুরু করেন তা হলে গুণরাজ খান মালাধর

বসু ও কৃত্তিবাস প্রায় সম সময়েই গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন এবং মালাধর বসু ১৪৮০-৮১ সনে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। কৃত্তিবাসের বিপুলায়তন গ্রন্থ ১৪৮০ সনের আগে কিংবা পরে সমাপ্ত হয়েছিল তা জানবার উপায় নেই। তবে মালাধর বসু রাজকর্মচারী (ছত্রী) ছিলেন, তাঁর অবসর কম থাকার কথা। কৃত্তিবাস হয়তো চাকুরীজীবী ছিলেন না—কাজেই তাঁর কাব্য রচনায় দীর্ঘকাল নাও লাগতে পারে—অবশ্য এ ধরনের অনুমানের কোন সার্থকতা নেই। এ গ্রন্থেও কৃত্তিবাস কর্তৃক রামায়ণ বাঙলায় তর্জমা করে দেওয়ার কারণ স্বরূপ গায়েন বলেছেন :

"সাত কাণ্ডের কথা হয় দেবের স্বজিত
লোক বুঝাইতে হৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।"

কিংবা—

"আদি কাণ্ড গাইলেন শ্রীরাম চরিত
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।"

কৃত্তিবাসের কবিত্ব-পাণ্ডিত্য ও কাব্যগুণ আলোচনা নিরর্থক। তার কারণ ডক্টর সুকুমার সেনের মতে এরূপ :

"কৃত্তিবাস গাহিবার জন্য কাব্য লিখিয়াছিলেন, পড়িবার জন্য নহে। 'গুণশালী' কথাটির যদি কৃত্তিবাসের বিশেষণরূপে কোন সার্থকতা থাকে তবে বুঝিব তিনিও রামায়ণ গাহিতেন। রামায়ণ রচনা ও গান বরাবর ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি ছিল ও আছে।

"কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলরূপ খুঁজিবার চেষ্টা হইয়াছে। হীরেন্দ্র নাথ দত্ত করিয়াছেন, নলিনীকান্ত ভট্টশালীও করিয়াছেন। কিন্তু কেহই মূলে পেঁছাইতে পারেন নাই। কাব্যের জনপ্রিয়তার এ বড় কঠিন মূল্য। গায়কের পর গায়ক ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পাঠ বদলাইয়া চলিয়াছিলেন। সেই অনুসারে পুথিও বদলাইতে ছিল। সে পুথি অনেক কবি-গায়কের রচনায় স্ফীত। কৃত্তিবাসের প্রাচীন পুথিতেও দ্বিজ মধুকণ্ঠ, প্রসাদ দাস ইত্যাদি অনেকের ভণিতা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া অদ্ভুতাচার্য প্রভৃতি পরবর্তী রামায়ণ-কাব্য লেখকের রচনাও ঢুকিয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কৃত্তিবাসের কাব্যের যে-সব পুথি আমরা পাইয়াছি তাহাতে ভণিতা ছাড়া আর কিছু খাঁটি (অর্থাৎ মূল রচনা) অব্যাপন্ন রহিয়া যায় নাই।" (বাঃ সাঃ ইঃ ১ম/পূর্বার্ধ/৩সং পৃঃ ১১৭)

এই মন্তব্য মুদ্রণযন্ত্রপূর্বযুগের জনপ্রিয় গ্রন্থ মাত্রেরই ক্ষেত্রে কম বেশী প্রযোজ্য।

৮

মালাধর বসু

লোক বোঝানোর জন্যে, কিংবা শিক্ষার্থীকে শেখানোর জন্যে দুনিয়ার সব শাস্ত্র কথারই মৌখিক ব্যাখ্যা, অনুবাদ, তথা ভাষান্তর প্রয়োজন ছিল, এবং তা করাও হত। কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করা পাপকর্ম বলে বিবেচিত হত। সেই যে আপ্তবাক্যে আছে— 'বদং শত মা লিখ।' এও হচ্ছে সে বৃত্তান্ত। 'শাস্ত্র' কিংবা 'মন্ত্র' অনুবাদ করলে তার মর্তবা থাকে না। শাস্ত্র যত দুর্বোধ্য ও অবোধ্য থাকে, তার প্রতি অনুগতদের শ্রদ্ধাও সে পরিমাণে বেশী জন্মায়। স্বদেশে অনেক প্রবর্তিত ধর্ম যে পরবর্তী কালে স্থায়ীভাবে টেকেনি তা হয়তো ঐ শাস্ত্র সুবোধ্য ছিল বলেই। কথার মূল্য কি বলা হয়েছে তার উপর নয়—কে বলছে—কার মুখানিঃসৃত তার উপরই নির্ভর করে। কেউ যখন কোন নতুন মত প্রচার করেন, তখন সে মতটা নিখুঁত বলে নয়, যিনি প্রচার করছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রভাবেই মানুষ তাঁর মত গ্রহণ করেন—ঐ অসামান্য ব্যক্তিত্ব ভাষা-ভঙ্গি, যুক্তি-বুদ্ধি-সাহস-ধৈর্য প্রভৃতির আকারে অভিব্যক্ত হয়, আর দেখা শোনা ও প্রচার-প্রশস্তির মাধ্যমে সেই ব্যক্তিত্ব ও মত চারদিকে প্রভাব বিস্তার করে। শাস্ত্র কথাকে যে মানুষ অলঙ্ঘ্য মনে করে, তা ভাল বা যুক্তিসঙ্গত কথা বলে নয়,— বক্তায় ও বক্তব্যে যে মহিমা-মাহাত্ম্য আরোপিত রয়েছে তার সংস্কারগত স্বীকৃতি বশেই। ঐ প্রবর্তক বা নেতা যদি কোন কারণে শ্রদ্ধা হারান, তাহলে তাঁর মতবাদও তাৎপর্য হারিয়ে তুচ্ছ হয়ে যায়। এজন্যেই লৌকিক-অলৌকিক মহিমা-মাহাত্ম্যের আবরণে প্রবর্তক বা নেতাকে দেব-কল্প অনন্য-অতুল্য মহামানব করে দেশ-কাল-সমাজের উর্ধ্বে রাখতে হয়। যতদিন এবং যত জনের মধ্যে ঐ ভাবমূর্তি জিইয়ে রাখা যায়, মাত্র ততদিন এবং ততজনের মধ্যেই ঐ প্রবর্তক ও প্রবর্তিত মত টিকে থাকে। বিগত নেতা বা প্রবর্তক বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব হলে তাঁর বাণীও তাৎপর্য হারায়। এজন্যেই দুনিয়ার শাস্ত্রপতিরা শাস্ত্র ও শাস্ত্রকর্তাকে সযত্নে গণমানবের নাগালের ও বিচারের বাইরে রাখতে চান এবং কাণের ভেতর দিয়ে আবেগপুষ্ট মর্মে সঞ্চার করতে চান বাণী বা বাণীদাতার ভাব ও মূর্তি। দৃষ্টিগ্রাহ্য লিপিযোগে তা মননের যুক্তিবুদ্ধির ও আবেগ নিরপেক্ষ বিচারের বস্তু হয়ে পড়লে ঐ মহিমা-মাহাত্ম্য হয়তো ধোপে টিকবে না—এ আশঙ্কা বশেই গণবোধ্য ভাষায় শাস্ত্রকথা লিপিবদ্ধ করা ছিল

দুনিয়ার সর্বত্র অবৈধ। এ-দেশেও নারী, শূদ্র প্রভৃতি অনেকেরই শাস্ত্র শুনবারও অধিকার ছিল না। বিধর্মী বিভাষী বিজাতির শাসন যখন প্রবর্তিত হল—তখন শাস্ত্রী ও সমাজপতিদের হুকুম ও হুমকি রাজকীয় সমর্থনের অভাবে আগের মতো অনধিকারীদের প্রতি কার্যকর রইল না। তখন ঐ অসহায় শাস্ত্রী ও সমাজপতিদের পাঁতি উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত থাকতে হল। সে পাঁতি সবারই জানা :

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।'

লাভের লোভের মুখে শিথিল চরিত্রের মানুষ শাস্ত্রের দোহাই, পাপের ভয়, বিপদের শঙ্কা কিছুই গ্রাহ্য করে না। সেদিনও তেমন মানুষেরা আপাত লাভকেই শ্রেয় মনে করেছে। রাজশক্তির অনুগ্রহলোভী কিছু কায়স্থ ও অন্তত একজন ব্রাহ্মণ পাপ ভয় ও সমাজনিন্দা উপেক্ষা করে তথাকথিত অপকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সমাজ সেদিন শাস্তিদানের শক্তি হারালেও প্রতিরোধ মানসে তাদের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল— এবং সেই নিন্দা আঠারো শতক অবধি লঘু-গুরুভাবে চালু ছিল :

'কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁষে
এ তিন সর্বনেশে।'

—এমনিই হয়। মানুষ আপাত স্বার্থের বশ। যেখানে নিশ্চিত প্রাপ্তির প্রলোভন প্রবল সেখানে শরম-সংকোচ ও পাপ-নিন্দা-ভয়ের বাধা স্রোতে তৃণের মতো ভেসে যায়, উনিশ শতকে যাঁরাই বিলেত যাবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাই যেমন কালা পানি অতিক্রমণের পাপ এবং সমাজচ্যুতির ক্ষতি হাসি মুখে বরণ করেছেন।

উচ্চ বর্ণের ও বিত্তের লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল লেখাপড়া। তাদের রক্ষণশীলতা ও অসহযোগের ফলে দুশ' বছর ধরে হয়তো কিছুই লিখিত হয় নি। সবটাই হয়তো কথকতার মাধ্যমে চালু ছিল। অবশেষে যখন ফারসী ও বাঙলা বৈষয়িক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল, সংস্কৃতের কদর ইংরেজ আমলের ফারসীর মতো কমে গেল, তখন উচ্চ বর্ণের লোকগুলো বাঙলায় লিখবার প্রেরণা ও গরজ অনুভব করল। এভাবে মন স্থির করতে ও পরিবেশ সৃষ্টি হতে তাদের দুশ' বছর লেগে গেল। যদিও গণমানব দেবকথা-ব্রতকথার চর্চা তেরো শতকের গোড়া থেকেই মৌখিকভাবে তথা কথকতার আসরের মাধ্যমে শুরু করে দিয়েছিল।

পনেরো শতকের মালাধর বসু, কৃত্তিবাস ওঝা প্রমুখ উচচাভিলাষী রাজকৃপা ধন্য পুরুষ। পাপ ও নিন্দা মুক্তির লক্ষ্যে মালাধর বসু আত্মপক্ষ সমর্থনে চারটি যুক্তি দিয়েছেন :

ক. পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার
অতএব, পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার।

খ. ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া···।
গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার
শুনিয়া নিষ্পাপ হবে সকল সংসার।

গ. ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিক মতে।

ঘ. এবং ব্যাসের স্বপ্নাদেশ :
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস
তার আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।

এঁদের ধন-মান-যশ লিপ্সা যতই থাকুক, তবু এ তথ্যও অস্বীকার করা যাবে না যে তাঁরা সাহসী, যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত ছিলেন। নতুন সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ তাঁদের চিত্তলোক নতুন চেতনায় ও যুগসম্ভাবনায় উদ্ভাসিত করেছিল। তাই তাঁরা শাস্ত্র, সমাজ ও গোঁড়ামী উপেক্ষায় ছিলেন পথিকৃৎ—বলা চলে এ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন ছোট খাট রামমোহন-বিদ্যাসাগর। কেননা সেদিন তাঁরা ছিলেন শ্রেয়োবাদী, সংস্কারমুক্ত, স্বাধীন চিন্তার প্রতিভূ ও দ্রোহী—কালান্তরের আভাস তাঁরাই অনুভব করেছিলেন বলেই যুগান্তরের উদ্গাতা হলেন তাঁরাই। সবচেয়ে বড় কথা লোকায়ত ধর্ম-চেতনার প্রসারে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁরা অনুবাদ ও অনুস্মৃতির মাধ্যমে পৌরাণিক তথা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র চেতনা ও শাস্ত্রানুরক্তি লোকায়ত করে জনমনে সঞ্চারিত করে দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথ সহজ করে দিলেন। এমনও হতে পারে যে, স্বধর্ম রক্ষার ঐ মহৎ উদ্দেশ্যেই তাঁরা অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন যেমন—পরবর্তীকালে সৈয়দ সুলতান প্রভৃতিও করেছিলেন।

মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুবাদ করেন—ভণিতায় তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থকে তিন নামে অভিহিত করেছেন—গোবিন্দমঙ্গল, গোবিন্দবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়। শেষোক্ত নামটি ছাপা গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছে। হারাধন ভক্তিনিধি-সংগৃহীত ও চৌদ্দশ' পাঁচ শকাব্দে (১৪৮৩-৮৪ খ্রীঃ) লিপীকৃত অর্থাৎ গ্র

রচনার তিন বছরের মধ্যে অনুলিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটি আদর্শ করে আঠারো শ' একাশি খ্রীস্টাব্দে রাধিকানাথ দত্ত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে মালাধর বসুর অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই পুঁথিতে রচনা কালও মিলেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এই জীর্ণ পুঁথিটির কোথাও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এর পরে নানা স্থানে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বহু পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু রচনাকালটি আর কোন অখণ্ড পুঁথিতেও নেই। যে পুঁথিটি রাধিকানাথের আদর্শ ছিল তা চৌদ্দশ' পাঁচ শকাব্দে তথা মূল গ্রন্থ রচিত হওয়ার তিন বছরের মধ্যে লিপীকৃত। অতএব মূল পুঁথির মতই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ভাষা সর্বত্র এই তারিখ সমর্থন করে না। তাছাড়া এমন অমূল্য দুর্লভ পুঁথিটিও অযত্নে হারিয়ে গেল। তাই বিদ্বানদের মনে নানা জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ। কেউ কেউ প্রাপ্ত রচনা কালটির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রচনা-কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি রাধিকানাথ দত্তের আদর্শ পুঁথিতে ছিল, তার অকৃত্রিম-তার কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণ মিলেছে। কাজেই ঐ রচনা কাল সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা অসঙ্গত। রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি এই:

'তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন
চতুর্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপণ।'

১৩৯৫ শকে বা ১৪৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থ রচনার শুরু আর ১৪০২ শকে বা ১৪৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁর সময় লেগেছে ন্যূনাধিক আট বছর। ইতিমধ্যে গৌড়ে সুলতান পাই চারজন। ১৪৭৬ অবধি রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্, ১৪৭৪-৮০ অবধি শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্ ১৪৮০ সনে কিছু দিনের জন্যে সিকান্দর শাহ্ এবং ১৪৮১-৮৬ অবধি জালালউদ্দীন ফতে শাহ্ ওর্ফে হোসেন শাহ্। মালাধর বসু গৌড় দরবারে পদস্থ কর্মচারী (ছত্রী) ছিলেন। কর্মদক্ষতার জন্যে বা অন্যগুণে তিনি সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র প্রীতি-ভাজন হয়েছিলেন এবং তারই নিদর্শন হচ্ছে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ। এটি যে কবি হিসেবে কাব্য রচনার জন্যে পাননি, তা বোঝা যায় যখন কবি বলেন:

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।

লক্ষণীয় এতে কাব্য-কবিত্বের কোন ইঙ্গিত নেই। তাছাড়া কাব্য রচনা শুরু হয় রুকনউদ্দীনের জীবনের তথা রাজত্বের অবসান কালে। রাজাদেশে সভাকবি হিসেবে কাব্য রচনা করলে পরবর্তী রাজাদেরও প্রতিপোষকরূপে নামোল্লেখ থাকত। অতএব এটি দরবারের পদস্থ কর্মচারীর স্বাধীন কবিকৃতি। তবে শাস্ত্র ও

সমাজবিরোধী এ-কর্মে সুলতানের প্রশ্রয় ও উৎসাহ নিশ্চয়ই ছিল,—'আদেশ' যে অবশ্য ছিল না, তা কবির নিজের কথাতেই বোঝা যায়। কাব্য রচনার জন্যে তিনি ব্যাসের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন।

এবার রচনার কাল জ্ঞাপক শ্লোকটির যাথার্থ্য যাচাই করা যাক :

১. 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত তার প্রমাণ চৈতন্যদেব স্বয়ং এই গ্রন্থ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং গ্রন্থোক্ত 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' চরণটি মালাধর বসুর পুত্রের কাছে আবৃত্তি করে উচ্ছ্বসিত ভাষায় মালাধর বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন চৈতন্যদেব। এই বৃত্তান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

চৈতন্যদেব— "কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্ট ডুরি লইয়া।
গুণরাজ খান কৈলা শ্রীকৃষ্ণবিজয়
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ।
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর।
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন।" (মধ্য অধ্যায়—১৫)

চৈতন্যদেব এই কথা গুণরাজ খানের পুত্র সত্যরাজ খানের (রামানন্দের) কাছে বলেছিলেন ১৫১৩-১৭ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে নীলাচলে। জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে রামানন্দ ও সত্যরাজকে গুণরাজ ছত্রীর পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ বলেছেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র পুঁথিতে পূর্বোক্ত চরণটির পাঠ—"বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।" অতএব 'নন্দের নন্দন' বৈষ্ণব-তত্ত্বানুগ পরিবর্তন।

২. রাধিকানাথ প্রকাশিত সংস্করণে দুটো মূল্যবান ছত্র মেলে :

সত্যরাজ খান হয় হৃদয়-নন্দন
তারে আশীর্বাদ কর যত সাধুজন।

'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যমঙ্গল' সূত্রে আমরা জানি সত্যরাজ খান রামানন্দ বসু গুণরাজ খানের পুত্র :

কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ
ভাগ্যবান সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
কুলীন গ্রামবাসী রামানন্দ সত্যরাজ খান (চৈতন্যচরিতামৃত)

কুলীন গ্রামে চৈতন্যদেব উপস্থিত হলে

গুণরাজ ছত্রী তনয় মহাশয় নানা মহোৎসব করি—(চৈতন্যমঙ্গল)

অভ্যর্থনা করেছিলেন, এতে মনে হয় সত্যরাজ খানের নামই রামানন্দ বসু। কবিও একপুত্রের জন্যেই আশীর্বাদ কামনা করেছেন।

৩. কুলীন গ্রামের মন্দিরে বৃষমূর্তির গলদেশে উৎকীর্ণ শ্লোকে ঐ মূর্তি সত্যরাজ খান ১৪০৪ শকে বা ১৪৮২ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন বলে উল্লেখ রয়েছে :

শাকে বিশতি বেদে যে মণৌহি শিব সন্নিধৌ
খান শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোহয়ং ময়া বৃষঃ।

[নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ভূমিকা পৃ: ৯ সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক : প্রা. ক. প. স. পৃ: ১৫৯ উদ্ধৃত]

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' রামানন্দকে 'গুণরাজ ছত্রীতনয়' এবং রামগোপাল দাস তাঁর চৈতন্যতত্ত্বসার নিবন্ধে 'রামানন্দ সত্যরাজ হয় দুই ভ্রাতা'—বলে উল্লেখ করেছেন (প্রা. ক. প. স. পৃ ১৬০)। অতএব প্রাপ্ত রচনাকালটি অকৃত্রিম। তবে 'রামানন্দ আর সত্যরাজ খান' (চৈ: চ)-এতে মনে হয় রামানন্দ ও সত্যরাজ দুই ভাই। কেউ কেউ রামানন্দকে গুণরাজ খানের পৌত্র বলেও মানেন। সত্যরাজ ও রামানন্দ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লেখ সূত্রে অভিন্ন ব্যক্তি (একছত্র ছাড়া)। আবার বৈষ্ণব সমাজে ওঁরা যথাক্রমে মালাধরের পুত্র ও পৌত্র। এই রামানন্দ বসুই যদি পদকার হন তাহলে পিতা বা পিতামহের মতো তিনি সত্যরাজ খান ভণিতা ব্যবহার করেন নি। কুলজী গ্রন্থ সূত্রেও সত্যরাজ ও রামানন্দের সম্পর্ক কোথাও ভাইয়ের, আবার কোথাও বা পিতা-পুত্রের। কাজেই মীমাংসা অসম্ভব।

কাব্যোক্ত আত্মকথা ও অন্যান্য সূত্রে মালাধর বসুর পুরো পরিচয় নিম্নরূপ :

মালাধর বসু রাজকর্মচারী ছিলেন। পদের নাম 'ছত্রী'। রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ তাঁর কর্মদক্ষতা, বিশ্বস্ততা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি গুণে প্রীত হয়ে তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ

এবং মাতা ইন্দুমতী। আর পুত্র রামানন্দ বসু 'সত্যরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত। তিনি জাতিতে কায়স্থ, নিবাস কাটোয়ার নিকটবর্তী কুলীনগ্রাম। রামানন্দ ও সত্যরাজ হয় তাঁর দুই সন্তানের নাম, অথবা সত্যরাজ ও রামানন্দ অভিন্ন ব্যক্তির নাম ও উপাধি, কিংবা এঁরা পরস্পর পিতা-পুত্র অথবা পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র—তা নিশ্চয় করে বলা দুঃসাধ্য।

গুণরাজ খানের ভণিতায় 'ধর্ম-ইতিহাস' নামে এক পুঁথি পাওয়া গেছে। এটি বিষয়ে রামপাঁচালী। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'ও রামায়ণ কথা রয়েছে। এই অংশটি কোন গায়েন হয়তো কথকতার প্রয়োজনে কিছুটা পল্লবিত করেছিল এবং এভাবে হয়তো স্বতন্ত্র রচনার মর্যাদায় চালু হয়েছিল।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' সন-তারিখ যুক্ত আদি গ্রন্থ। এতে কৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে তিরোভাব অবধি বর্ণিত রয়েছে। এখানে কৃষ্ণ মুখ্যত ষড়ৈশ্বর্যবান। 'পয়ার-প্রবন্ধে' রচিত হলেও এটি সেকালের রেওয়াজ মতো গাইয়ের সবাদ্য গেয় কাব্য। তাই ছন্দ ও রাগরাগিণী নির্দেশিত হয়েছে। এ কাব্য ভাগবতের অনুবাদ বলে পরিচিত বটে, কিন্তু আসলে আক্ষরিক অনুবাদাংশ সামান্য ও সংক্ষিপ্ত। কবি নিজেও একে অনুবাদ বলেন নি :

ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে।

কাজেই বর্ণিত বিষয় সর্বত্র ভাগবত অনুগ নয়,—বিষ্ণুপুরাণ-হরিবংশের প্রভাবও আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মালাধর বসু চৈতন্য-পূর্ব কালের কবি। এ কাব্যে অরিন্দম অসুরবিনাশী কৃষ্ণের কাহিনীই বর্ণিত বিষয়। কাজেই তাঁর এ কাব্যে রাধা-কৃষ্ণ-গোপীলীলার বর্ণনা থাকার কথা নয়। রাধার নামই তো নেই ভাগবতে। দান-নৌকালীলাও ভাগবতে-বিষ্ণুপুরাণে-হরিবংশে নেই। কাজেই মানতেই হবে চৈতন্য সমকালে যখন শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও গীতগোবিন্দাদির মতো বৈষ্ণবদের শ্রদ্ধেয় পবিত্র গ্রন্থের মর্যাদায় উন্নীত হল, তখন বৈষ্ণব-পাঠক-কথক-গায়কেরা বৈষ্ণব-তত্ত্বরসের অংশগুলো সংযোজিত করেছে; তাই প্রচলিত সব পুঁথিতে ঐ সব অংশ নেই। কবি ষড়ৈশ্বর্যময় বিষ্ণুভক্ত, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতো লীলারসিক কৃষ্ণভক্ত নন—তাই এখানে আবেগের প্রবলতা নেই। ফলে কবিতাতেও তেমন লাবণ্য নেই। অবশ্য রাজসভাসদ কবি যখন ১২ স্কন্ধে রচিত ভাগবতের কেবল ১০ম-১১শ স্কন্ধই অনুবাদের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন, তখন তাঁর অন্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে রাজনীতির প্রভাবপুষ্ট কবিমনে শক্তি ও পৌরুষানুরাগও যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তা অস্বীকার করা

যায় না, বিশেষ করে প্রভু সুলতানদেরও ঐ অংশেই আগ্রহ থাকার কথা। বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদী বলে বাঙলাদেশে শৈব-শাক্ত মতই প্রবল ছিল, ভাগবতের পুরাণের এই অনুবাদ বিষ্ণুভক্তির সাহিত্যিক অনুপ্রবেশও সূচনা করল। উল্লেখ্য যে, হরিবংশ ষোল শতকের আগে বাঙলায় ছিল প্রায় অজ্ঞাত, অন্তত অনালোচিত। এ দিক দিয়েও মালাধর বসু পথিকৃৎ। মাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ পনেরো শতক থেকে এখানে বিষ্ণু ভক্তিবাদ প্রচারে নিরত ছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি, কাব্যের তথা সাহিত্যের অনুবাদ আক্ষরিক হত না, কবিগণ গ্রহণে-বর্জনে ও সংযোজনে স্বাধীন পথ অবলম্বন করতেন, কাজেই অনুবাদ মাত্রই ছিল কোথাও কায়িক, কোথাও ভাবিক, কোথাও ছায়িক, তথা আক্ষরিক, ভাবানুসরণ ও ছায়ানুকরণ,—এক কথায় অনুকরণ-অনুসরণের সাথে থাকত সংযোজন-বর্জন ও রূপান্তরের স্বাধীনতা, তাই মালাধর বসুর রচনায়ও বাঙলার প্রতিবেশ ও বাঙালীর জীবনযাত্রার পরোক্ষ চিত্র মেলে।

৯

ব্রতকথা, মঙ্গল, বিজয় ও পাঁচালী

॥ ১ ॥

লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকথা মঙ্গল গান নামে আখ্যাত এবং লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকথা সম্বলিত পাঁচালীগুলো মঙ্গল নামে পরিচিত। পরে অবশ্য মঙ্গল ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে চৈতন্য মঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল এমনকি আধুনিক গীতিকাব্যের সারদা-মঙ্গল নামকরণও হয়েছে। লৌকিক দেবতাকাহিনী সম্বলিত পাঁচালী আবার 'বিজয়' রূপেও আখ্যাত হয়েছে। এই 'বিজয়'-ও পরে ব্যাপক অর্থে দেবতা ও মহাপুরুষের মাহাত্ম্য পাঁচালী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, রসুল বিজয় প্রভৃতি। 'মঙ্গল' ও 'বিজয়' গোড়া থেকেই সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—বিপ্রদাসের পাঁচালীতে বিজয় ও মঙ্গল একই তাৎপর্যে ব্যবহৃত। ভণিতায় ইনি নয় বার 'বিজয়' ও তেরো বার 'মঙ্গল' ব্যবহার করেছেন। কবিচন্দ্র মিশ্র সাধারণভাবে গৌরী-মঙ্গল ব্যবহার করেছেন। অন্যেরাও কখনো মঙ্গল, কখনো বা বিজয় বলেছেন।

মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা উৎসবে-পার্বণে-অনুষ্ঠানে 'মঙ্গল' গাওয়ার উল্লেখ পাই। মঙ্গল গান যাগ-যজ্ঞেরও অঙ্গ ছিল। মধ্যযুগের মঙ্গলগান বাদ্য ও নৃত্যযোগে হত। তেল-সিন্দুর-কর্পূর-তাম্বুল দিয়ে সমবেত জনদের আপ্যায়িতও করা হত

এ-শুধু হর-গৌরীর বাড়িতেই নয়, মুহম্মদ কবিরের 'মধুমালতী' কাব্যেও মঙ্গলগানের অনুষ্ঠান দেখি এবং ফাতেমার বিয়ের সময়েও 'সহেলা গায়ন্ত সবে বিবাহমঙ্গল'। বিপ্রদাসে পাই—"বিধানে মঙ্গলে গীত গায় দিব্যাঙ্গনা।" বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে পাই—'আইয়ো আসিবে মঙ্গল গাইতে/তারা চাবে পান খাইতে/তৈল সিন্দূর পাইব কোথা।' তাই মনে হয় উৎসবে-পার্বণে কল্যাণ-কামনা লক্ষ্যে বাদ্য-নৃত্য-সহযোগে যে আনন্দ-গানের অনুষ্ঠান হত, আদিকালে তার সাধারণ নাম ছিল মঙ্গল। মঙ্গল-ঘট প্রতিষ্ঠা, আর মঙ্গল গীতের অনুষ্ঠান-- এদুটোর লক্ষ্য একই। পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক গানই হয়তো 'মঙ্গল' নামে অভিহিত হচ্ছিল এবং আরো পরে কথকতার জন্যে রচিত গায়েনদের গাওয়া দেব-মাহাত্ম্য পাঁচালীগুলোও মঙ্গল নামে পরিচিত হয়। ক্রমে পুণ্যার্জন লক্ষ্যে আনন্দ-উৎসব-পার্বণের আপাত প্রয়োজনে যে কোন দেবতা বিষয়ক গান বাজনা অনুষ্ঠানই 'মঙ্গল' নামে আখ্যাত হয় এবং তখন 'মঙ্গল' অভিধার প্রসারে এই 'মঙ্গলের' সংজ্ঞা পাই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনীতে': "যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়, যে গান মঙ্গল সুরে গাওয়া হয়, যে গান যাত্রা বা মেলায় গাওয়া হয় তা-ই মঙ্গল গান।" বিপ্রদাস পিপিলাই 'মনসা মঙ্গল' গীতকে মনসার 'ব্রত কথা' বলেও উল্লেখ করেছেন—'যে জন পদ্মার ব্রত গায়ে বা গাওয়ায়' তাহলে ব্রত কথা-ও মঙ্গলগান, এবং পাঞ্চালী বা পাঁচালী ছন্দে ও সুরে লেখা ও গাওয়া হয় বলে এই ব্রতকথা-মঙ্গলগান আবার পাঁচালী নামেও পরিচিত হয়। এ পাঞ্চালী বা পাঁচালী পঞ্চালিকা—পুত্তলিকা—পুতুল নাট্যনৃত্য থেকে উদ্ভূত বলে ডক্টর সুকুমার সেনের ধারণা (পৃঃ ১০৩, ১৩৮ বা. সা. ই, পূর্বার্ধ)। কিন্তু ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস দলিল যোগে প্রমাণ করেছেন যে 'পাঁচালী-'পঞ্চালক' শব্দজাত। অর্থ মূল গায়েনের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী-ভূমিকা, পৃঃ XVI) অতএব কল্যাণ কামনায় যে ব্রত গ্রহণ ও উদ্যাপন করা হয়, তৎসম্বন্ধীয় যে দেব প্রশস্তি কথা তা-ই ব্রতকথা এবং মঙ্গল লক্ষ্যে এই ব্রতকথা গীত হয় বলে এর অন্য নাম মঙ্গলগীতি, এবং পুত্তলিকা বা পঞ্চালিকার অভিনয় মাধ্যমে মঙ্গলগীতি বা প্রশস্তি ও প্রার্থনা নিবেদন করা হত বলে অথবা দোহার যোগে গীত হত বলে এর অন্য নাম পাঞ্চালী—পাঁচালী। আর সগীতি পুতুল নাচের বা সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তির একটা বিশেষ ছন্দ, সুর, তান, লয় আছে বলে-ই পাঁচালী ছন্দ বা পাঁচালী সুর নামে তা পরিচিত হল।

আবার সুকুমার সেনের মতে 'বিজয়' মানে 'জয়যাত্রা বা জয় কাহিনী। "কল্যাণের দিক দিয়া দেখিলে 'মঙ্গল' ভক্তির চোখে দেখিলে বিজয় (পৃঃ ১০৩,

বা. সা. ই.)। তবে বিজয় প্রতিষ্ঠা এবং যথার্থ 'যুদ্ধ জয়'—এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। জায়নুদ্দীনের 'রসুল বিজয়', কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডব বিজয়' প্রভৃতি যুদ্ধ জয়মূলক কাব্য। আবার শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মনসা বিজয়, গোরক্ষ বিজয়, শেখ চাঁদের রসুল বিজয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা বা মহিমা-মাহাত্ম্য স্বীকৃতি মূলক কাব্য। কাজেই দুটোতেই জয় বা সাফল্য রয়েইছে।

যাত্রা বা গমন অর্থে 'বিজয়'-এর ব্যবহার সুপ্রাচীন। যেমন দুর্গার কৈলাস 'বিজয়'। 'বিজয় করিলা যেন নন্দ ঘোষের বালা', 'বন বিজই রামকানু', 'নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়'। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি পার্বণেও আসর করে নৃত্যবাদ্য-গীতি-অভিনয় সহযোগে দেব বিষয়ক মঙ্গল গান গীত হত বলে এ-গুলো [লোকায়ত নামে] যাত্রা বা মেলার গান রূপেও অভিধা লাভ করে। ক্রম বিকাশের ধারায় কথকতা, নৃত্য-বাদ্য-গীতি-অভিনয় ও আসর বিন্যাসের পার্থক্য অনুযায়ী ব্রতকথা, মঙ্গলগান, যাত্রা, পাঞ্চালী প্রভৃতি রচনাভঙ্গিতে, আঙ্গিকে, নামে ও পরিবেশন পদ্ধতিতে পৃথক হয়ে যায়।

অতএব আদি গদ্যে ও ছড়ায় বর্ণিতব্য ব্রতকথা ক্রমে মঙ্গলগীতি, পাঞ্চালী ও যাত্রা নামে পৃথক পরিণতি লাভ করে। চরিতাখ্যান বা মাহাত্ম্যকথার লিখিত রূপ পাঁচালী বা মঙ্গলগীতি কখনো মঙ্গল নামে, কখনো পাঁচালী নামে এবং কখনো বা বিজয় নামে পরিচিত। তবে 'বিজয়' ও 'মঙ্গল' শেষাবধি দেবতা বা মহাপুরুষ সম্বন্ধীয় মাহাত্ম্য গীতিরূপে যোগরূঢ় হতে থাকে। আর যে কোন কাহিনী কাব্য সাধারণভাবে 'পাঁচালী' নামে নির্দেশিত হতে থাকে। মঙ্গল, বিজয় ও পাঁচালীর সঙ্গে 'কাব্য' যোগ করে মঙ্গলকাব্য, বিজয় কাব্য, পাঁচালী কাব্য বলার রীতি আধুনিক এবং অধ্যাপক-লিখিয়েরা এ রীতির প্রবর্তক ও প্রচারক।

আবার তাৎপর্য-বিস্মৃত লোকের কাছে মঙ্গলগান মঙ্গলবার সম্পৃক্ত। অনেকটা 'ধামা ধরা', 'ধামা চাপা' গোছের ব্যাপার। তাদের কাছে এক মঙ্গলবারে পালা শুরু হয়ে পরের মঙ্গলবার অবধি—আট দিন বা রাত্রি ব্যাপী গীত হয় বলে ঐ-সব পাঁচালীর অন্য নাম অষ্টমঙ্গলা পালা বা পাঁচালী। মঙ্গল করেন বলে চণ্ডীর নাম মঙ্গল চণ্ডী। মঙ্গলোদ্দেশ্যে বসান ঘটের নান মঙ্গলঘট। রাত জেগে গান করা হয় বলে মঙ্গল গানের আর এক নাম রয়নী [রজনী] বা 'জাগরণ'ও।

এক বিদ্বান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন—"হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটা বৌদ্ধ বাতিক ছিল, সব কিছুর মধ্যেই তিনি বৌদ্ধ প্রভাব দেখতেন।" আমরা তাঁর এমত সমর্থন করিনে। বাঙলাদেশের অধিকাংশ মানুষ হাজার বছর ধরে বৌদ্ধ

শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে লালিত। বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে বৌদ্ধজ হিন্দু-মুসলিম বাঙালী আজো সে-প্রভাব মনের গভীরে—মগ্ন-চৈতন্যে লালন করে। তার লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কারে, তার ঘরোয়া আচারে-আচরণে, তার লোকায়ত দেবতার পূজাপার্বণে আজো বৌদ্ধ শাস্ত্র-সমাজের অনেক কিছুই রয়ে গেছে প্রচ্ছন্নভাবে। এ গুলো আজো আমাদের সংস্কার-নৃষ্ট জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। বাঙালী হিন্দু যে ভারতীয় অন্য হিন্দুর মতো একক দেবতার উপাসক হতে পারল না—পঞ্চো উপাসক বলে খ্যাত হল,—বহু লৌকিক ও স্থানিক দেবতার পূজারী হল,—যোগে-তন্ত্রে আসক্ত রইল, তুক-তাক-দারু-টোনা-উচাটন-বশিকরণে ও ডাকিনী-যোগিনী কামরূপ-কামাক্ষায় আস্থা রাখে,—সেতো এক কালে বৌদ্ধ ছিল বলেই। এ গুলো সবই ছিল বৌদ্ধ যুগে। বৌদ্ধ আচার-সংস্কার বিমোচন মানসে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন শাসকদের ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক আচার-অনুষ্ঠান-পার্বণ-পদ্ধতি আক্ষরিক-ভাবে প্রয়োগের সুকঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে গণমানব অনেককাল রুদ্ধবাক ও প্রকাশ্যে নিষ্ক্রিয় ছিল। বিধর্মী তুর্কী শাসন কালে, হিন্দুর ধর্মের ক্ষেত্রে সরকারের ঔদাসীন্যরূপ প্রশ্রয়ে নিজিত কিন্তু সংখ্যাগুরু গণমানব শাস্ত্রপতি ও সমাজ-সরদারকে উপেক্ষা করার সাহস ও স্বাধীনতা পেল। তখন বৌদ্ধ যুগের যোগ-তান্ত্রিক ধারা, নিজেদের অবরুদ্ধ বিশ্বাস-সংস্কার আচার তথা জীবনভাবনা ও জগৎচেতনা নতুন করে উজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করল তারা। এর দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রসূন হচেছ সিদ্ধাদের ধারায় নতুন করে আদিনাথ তত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, তন্ত্র, গৃহী বজ্রযানীর দেবতা পূজা, ধর্ম পূজা, পরকীয়া কায়সাধন ও বামাচার বর্জিত দেহ সাধন চর্যার প্রাবল্য। ত্রি-শরণের অন্যতম 'ধর্ম' প্রমূর্ত রূপে, অবলোকিতেশ্বর বিষ্ণু রূপে, আদিনাথ শিবরূপে, প্রজ্ঞা-উপায় এবং বজ্রসত্ত্ব-বজ্রতারা শিব-শিবানী রূপে, সিদ্ধারা যোগী-সন্ন্যাসী রূপে, শ্যামতারা চণ্ডী-কালিকা রূপে এবং যক্ষ, মনসা (বিষহরী ও বিষালাক্ষী) রূপে গৃহীত হয়ে আর যোগ, ভোগ ও জড়বাদ প্রতীক যোগীপাল-ভোগীপাল মহিপাল গীত দিয়েই আমাদের বাঙালী জীবনের তেরো শতকের শুরু। ষোল শতকে যে এ গুলো প্রবলতর হয়েছিল, তার সাক্ষ্য বৃন্দাবন দাসের উক্তি :

ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন
পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহু ধন।

বাশুলী পূজএ কেহো নানা উপচারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে-।
যোগিপাল ভোগীপাল মহীপালগীত
ইহা শুনিবারে সব লোক আনন্দিত। (চৈঃ ভাঃ)

তর্কের খাতিরে চর্যাগীতিকে বাঙলায় রচিত বলে ধরলে তারপর 'দুশ' বছর ধরে যে তার প্রবহমানতার লিখিত নিদর্শন মেলে না, তার জন্যে দায়ী নিশ্চয়ই সংস্কৃতপ্রিয় উগ্রব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের বৌদ্ধঐতিহ্যদ্বেষণা ও দেশী ভাষা বিদ্বেষ। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ভাষা-বিদ্বেষী হওয়ার ফলে বৌদ্ধ বিলুপ্তিতে বৌদ্ধদের অভাবে বাঙলা রচনা বন্ধ হয়ে যায় বলে স্বীকার করতে হবে। বৌদ্ধজ হিন্দু সমাজে এ বাধাজাত সমস্যা ছিল বলেই ওরা সুযোগ পেয়ে গান-গাথা-ব্রতকথা-ইতিকথা-দেবকথা শ্রুতি-স্মৃতি মাধ্যমে চালু রেখে স্বস্থ হতে চেয়েছে, অবসর বিনোদনের জন্যে রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসী হয়নি। তাদের এ প্রয়াস অব্যাহত ভাবে সত্তেরো শতক অধিক চলেছে,—এ শতকেই তাদের প্রয়াস পূর্ণতা পায় এবং সংগ্রাম সফল হয়। মধ্যযুগের অমুসলিমের লিখিত ও অলিখিত রচনা মাত্রই লোকায়ত দেবসাহিত্য বা ধর্ম সাহিত্য। এই সব রচনায় বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রায় সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করেছে। জয়দেব বুদ্ধকে দশম অবতার বলে স্তুতি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও তাই মন-পবন-দশ দ্বার যোগ-কায়সাধন, বাণ প্রভৃতি পাই। ব্রাহ্মণ বিপ্রদাস পিপিলাই ও ক্ষেমানন্দ ধর্ম-নিরঞ্জনের বন্দনা করেছেন, বিজয়গুপ্ত কামরূপ-কামাক্ষার মন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনীকে মনসার মন্ত্র প্রয়োগের সহায়ক করেছেন। শাহ্ মোহাম্মদ সগীর, দৌলত উজির বাহরাম খান দেবধর্মের আরাধনার কথা বলেন, শেখ ফয়জুল্লাহ, পীর মীর সৈয়দ সুলতান, হাজী মোহাম্মদ, শেখ চাঁদ, আলী রজা প্রভৃতি অধ্যাত্ম সাধনার নামে বৌদ্ধ বজ্রসহজযান স্বীকার করেন। যোগ ও যোগী, তন্ত্র ও তান্ত্রিকের মহিমা বাঙলা সাহিত্যের কোথায় কীর্তিত হয়নি। বৌদ্ধ প্রভাব স্বীকার করেই, বিকৃত বৌদ্ধ তন্ত্র-মন্ত্র-বজ্র-সহজতত্ত্ব অঙ্গীকার করেই আমাদের জগৎ চেতনা ও জীবন ভাবনার শুরু ও বিকাশ। নাথ পন্থী সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল তাই আজো সুলভ। এই সব জীবনে ছিল বলেই সাহিত্যে অভিব্যক্তি পেয়েছে। কাজেই আমাদের বাঙালী মানসের, বহির্জীবনের এবং তত্ত্বচিন্তার ও সংস্কৃতির সন্ধান পেতে হলে বৌদ্ধ বাতিক বরং একটু বেশী করেই দরকার। আমাদের অকৃত্রিম পরিচয়, আমাদের মানস স্বরূপ ঐ তত্ত্বভাবনায় নিহিত।

উল্লেখ্য যে, মৌল বৌদ্ধতত্ত্ব আমাদের দেশে অবহেলিত, বৌদ্ধনামের আবরণে অষ্ট্রিক-মঙ্গোল চিন্তা-চেতন-চর্যা তন্ত্র-মন্ত্র-বজ্র-সহজ যান বা তত্ত্ব বাঙলাদেশে স্বতো বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে। আমাদের অধ্যাত্ম ও বিষয়ী চিন্তা-ভাবনার সাদৃশ্য বা স্বাজাত্য মেলে নেপালী-তিব্বতী চিন্তা-চেতনায়। কোল ভিল-সাঁওতাল-মুণ্ডা যেমন আমাদের নিকট জ্ঞাতি, তেমনি আমরা নেপালী-তিব্বতী-মঙ্গোলের রক্তে সম্পৃক্ত। তাই এই সম ও সহ ভাবাপন্নতা। সাংখ্য ও যোগ অষ্ট্রিকের দান, আর তন্ত্র বা মন্ত্র মঙ্গোল ভাবনার প্রসূন। অমৃতকুণ্ড, ডাকার্ণব, দোহাকোষ, চর্যাগীতি তাই হাজার বছর আগেকার বাঙালীর শাস্ত্র ও চর্যাগ্রন্থ। ডাক-ডাকিনী, যোগী-যোগিনীই আমাদের মুনি-ঋষি, সিদ্ধাই আমাদের গুরু। কায়াই আমাদের সাধ্য, সহজানন্দ বা বিরমানন্দই আমাদের লভ্য। আমাদের বিকাশপ্রসূন বোধিচিত্ত, আমাদের উপলব্ধ তত্ত্ব শূন্যতা। নাদ-বিন্দু আমাদের জ্ঞেয়, করুণাই আমাদের পন্থা, প্রজ্ঞা আমাদের পাথেয়।

আমাদের আদি মৌখিক ও লিখিত সাহিত্য লোকায়ত। ধর্মপূজাবিধান, ধর্মঠাকুর মাহাত্ম্যকথা, শূন্যপুরাণ, সিদ্ধাকাহিনী, গোরক্ষবিজয়, নাথগীতিকা প্রভৃতি অলিখিত বৌদ্ধ লোক-রচনার সঙ্গে পাই মনসা-শিব-চণ্ডী-শীতলা-ষষ্ঠী প্রভৃতি স্থানিক ও লৌকিক দেবতাকেন্দ্রী গণ-সাহিত্য। আস্তিক মানুষ মাত্রই অপৌরুষেয় শক্তিনির্ভর। তাছাড়া ধন-জন প্রাণের নিরাপত্তাকামী অজ্ঞ অসহায় অশিক্ষিত মানুষ দৈবনির্ভর না হয়েই পারে না। ইষ্টদেবতা বা উপাস্যের অসন্তোষভয়ে আস্তিক মানুষ আজো কৃতিগৌরব এককভাবে দাবী করতে অন্তরে ভয় পায়, 'অহম'কে সে নিমিত্ত মাত্র মনে করে,—আরো অগ্রসর হয়ে বলে — মানুষ যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র মাত্র, লীলাময়ের হাতের পুত্তলিকা মাত্র। কাজেই দৈবনির্ভরতা তার মর্মমূলে। এই দেব-কল্পনা আপেক্ষিক—তার জীবন-জীবিকার সহায়ক শক্তি হল মিত্র দেবতা আর প্রতিকূল শক্তির নাম অরি দেবতা, সে মিত্রকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে আর অপ্রতিরোধ্য প্রবল অরিকে করে তোয়াজ। কাজেই বাহ্যত অরি-মিত্র নির্বিশেষ শক্তিকেই তোয়াজ-স্তুতি-পূজা-মানতে বশ রাখবার নীতিই নির্বিঘ্ন জীবন-জীবিকার পক্ষে উত্তম পন্থা বলে মেনে নিয়েছে সে। এই লোভ ও ভীরুতা জাত আনুগত্য তথা দাসত্ব মানুষের মন-আত্মার স্বাধীন বিকাশের তথা ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা। বাঙালী সে বাধার শিকার। অথচ সে জীবনকে ভালোবাসে। মর্ত্যপ্রীতি তার মজ্জায়। নির্বিঘ্ন বাঁচার জন্যে সে কখনো আত্মশক্তির কিংবা আত্মিক শক্তির চর্চা করতে চায়নি। জীবনকে ভালোবাসে অথচ জীবনকে যথেচ্ছ উপভোগ করবার মতো আত্মপ্রত্যয় বা সামর্থ্য-সম্বল নেই, তেমন মানুষ পরজীবী না হয়ে পারে না। এমন মানুষের বেঁচে থাকার পন্থা দুটো—হয়

ভিক্ষা, নয়তো চুরি। ভিক্ষাপ্রবৃত্তি বশে সে দেবতার কাছে বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্তির জন্যে ধর্না দেয়, আর শ্রমকুণ্ঠ বলেই সে কর্মবিমুখ—খিড়কীদোর দিয়ে অনায়াসে পাবার বাসনায় সে ঝাড়-ফুক-দারু-টোনা-বাণ-উচাটন-তাবিজ-কবজ-মাদুলির আশ্রয় নেয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে। গুপ্তপথে কার্যসিদ্ধির এই প্রবৃত্তি চৌর্যবৃত্তির নামান্তর।

দুটোর কোনটাই যাদের পছন্দ হয়নি, তারা এ জগৎকে মায়া ও জীবনকে যন্ত্রণা বলে প্রচার করে আর্তনাদকে আত্মপ্রবোধে চাপা দিতে চেয়েছে তারাই দেহবাদী বৈরাগ্য বিলাসী। লক্ষ্মণ সেনের সভায় আমরা এই দৈব-নির্ভরতা পাইনে, তার কারণ তাঁরা গীতা-স্মৃতি-সংহিতা শাসিত সমাজ গঠনে নিরত ছিলেন। তাই তাঁদের সাহিত্য ছিল রোমান্টিক ষড় বা নব রসের-ভিয়ান দেয়া। তুর্কী-মুঘল আমলে শাস্ত্র-সমাজের শিথিল শাসনের সুযোগে আদি বাঙালী মন-মেজাজ পাথর চাপা দূর্বার মতো দুর্বার হয়ে উঠল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তারই ফল। এই সাহিত্যে পরজীবীর তোয়াজ-স্তুতি যেমন দেখি, তেমনি পরস্বাপহারীর ছল-চাতুরী-প্রতারণা-প্রবঞ্চনাও পাই, আর পাই বাউলে-বৈষ্ণবে সেই বৈরাগ্য—যা আত্মোন্নয়নের নামে আত্মহনন মাত্র। এই চরিত্রের মানুষ কখনো বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না,—তাই বাঙালীর রাজনৈতিক-ব্যবসায়িক অতীত লজ্জাকর—কলঙ্কজনক। আত্মপ্রত্যয় ও স্বনির্ভরতা ছিল না বলে আমাদের মধ্যে উদ্ভাবন-অবিষ্ক্রিয়া সুলভ নয়। আবিষ্কার-উদ্ভাবনের পূর্বশর্ত হচ্ছে পুরাতনে অস্বস্তি, প্রয়োজনবোধ, স্বীকৃত তত্ত্বে ও তথ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং জিজ্ঞাসা। আমাদের মনে এসব ক্ষেত্রে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও জিজ্ঞাসা ছিল না,—তাই আমাদের বিশ্বাস-সংস্কারের জগতে আবর্তন-অনুবর্তন ছিল, বিবর্তন ছিল না, লাটিমের মতো ঘুরেছি, এগোইনি। আমাদের মানসফসল তাই কেবল মৌসুমে-মৌসুমে আবর্তিত হয়েছে—হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করেছে, কিন্তু নতুন কিছু দেয়নি। য়ুরোপের আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও লোকগ্রাহ্য বলেই তা নির্বিচারে মেনে নেয়নি, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও জিজ্ঞাসার মন ও দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করেছে,—ফলে আমরা যা কিছু যোগ ও যাদু দিয়ে পেতে চাই, তার সবটাই ওরা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-শ্রম দিয়ে পেয়ে গেল। মন্ত্রযোগে আমরা ত্রিভুবনে ভোগের ও উপভোগের শক্তি ও সামগ্রী চেয়েছি—পাইনি।

য়ুরোপ আত্মবলে সব কব্জার মধ্যে আনতে চেয়েছে—সফল হয়েছে। যোগ-যাদু দিয়ে আমাদের দেশের মানুষ অমৃত ও আনন্দ চেয়েছে, পায়নি। মৃত্যু এড়ানো গেল না দেখে, বাঞ্ছা ছোট করে মোক্ষ চেয়েছে—পায়নি। তারপরে যন্ত্রণা-

ভীতি বশে স্বর্গ চেয়েছে—পায়নি, তারপরে মর্ত্যে ধন-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছে—তাও পায়নি। তবু যাগ-যোগ-মন্ত্র-তন্ত্র ছাড়ে না।

এই বৈচিত্র্যবিহীন আবর্তিত জীবনেও কিন্তু বিদ্যুতের মতো, স্ফুলিঙ্গের মতো একবার একটি মনে একটি গৃহে এককালে ও একস্থানে প্রত্যয়ী-আত্মা জেগেছিল, সকল বাঁধন তুচ্ছ করে, জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে প্রাণের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল, এমন আকাঙ্ক্ষা বিরলতায় অনন্য, এমন দ্রোহ অনুপম, এমন সাহস অতুল্য। এই একবার মাত্র, তার আগে বা পরে আর কখনো বাঙালী চরিত্রে তো নয়ই, বাঙালী চিত্তেও সাধ বা স্বপ্ন হিসেবেও আভাসিত হয়নি। আমি চাঁদ-বেহুলার কথা বলছি। তেত্রিশ কোটি দেবতার অনুগত বাঙালীর সন্তান চাঁদ বলে—আমি শিবের উপাসক, ঐ একজনকে ছাড়া অন্য কাউকে—নারী দেবতাকে পূজো করব না—'যেই হাতে পূজি আমি দেব শূলপাণি। সেই হাতে পূজব আমি চেঙমুড়ি কানি?—কখনো না, কোন অবস্থাতেই না, বরং মরব, তবু ঐ দেবীর পূজো করব না'। যেই কথা সেই কাজ। আবার মাঠে-বাটে ঘুরে বেড়ানো মেয়ে, নিতান্ত নিরক্ষর গেঁয়ো গেরস্থের মেয়ে—বিয়ে কি তা-ই বুঝবার বয়স ছিল না তার, সেই বালিকা সন্ধ্যায় বধূ হয়ে ঢুকল বাসরে, আর সকালে পাকা গিন্নির মতো যেন বলে—আমি মানিনা, আমার জীবন-যৌবন-দাম্পত্য ব্যর্থ করে দেবার অধিকার কারুর নেই, সৃষ্টিরও নেই, স্রষ্টারও নেই। আমি এ মৃত্যু স্বীকার করিনে। এ সদ্য বিধবার শোকোচ্ছ্বাস নয়, এ বিদ্রোহিণী অবুঝ বালিকার জেদের কথা নয়, এ এক সংকল্পে দৃঢ়া দৃপ্তা নারীর বিশ্বজগতের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ। তার পর লোভের ফাঁদ, বিপদের জাল অতি ধৈর্য, অধ্যবসায়, সাহস ও সঙ্কল্পের সঙ্গে অবিচলিত নিষ্ঠায় অতিক্রম করে সে জয়ী হল। মনসামঙ্গলের কাহিনী দেব-মানবের সংগ্রামের কাহিনী। সে-সংগ্রামে সন্ধি হয়েছে, মানবভাগ্য পরাজয়ের গ্লানি বহন করেনি। দেবতার মান-মর্যাদাও বজায় রয়েছে, আবার মনুষ্যত্বও হয়েছে মহিমান্বিত। চাঁদ আত্মসমর্পণ করেনি—সে হার মেনেছে এক বালিকার অতুল্য কৃচ্ছ্রসাধনা ও সিদ্ধির কাছে, প্রণাম জানিয়েছে ঐ বালিকার ধৈর্য-অধ্যবসায়-জেদ ও জয়কে—'বাম হস্তে পূজা আমি করিব তাহার।' এ কাহিনী, এ পরিণাম, এ দ্রোহ, এ চরিত্র সাহিত্যজগতে দুর্লভ। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে চাঁদ-বেহুলার অনন্য চরিত্র অবহেলিত—তবু এ মুহূর্তে মনে পড়ে কালিদাস রায়ের 'চন্দ্রধর' এবং মমতা ঘোষের 'বেহুলা' কবিতা। আর বিপিন বিহারী নন্দীর 'চন্দ্রধর' কাব্যটি। দাক্ষিণাত্যের অম্বরুর কাহিনীও ঐ স্ত্রী-দেবতা অস্বীকৃতির ইতিকথা। সেখানে এ দ্রোহ দেখা

দেয় নিজামেত্তে সম্প্রদায়ের মধ্যে। পরে চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সওদাগরেও এ দ্রোহ উপ্ত হয়েছিল কিন্তু তা বাড়েনি, অঙ্কুরেই হয়েছিল বিনষ্ট। মনসামঙ্গল মুখ্যত পূর্ববঙ্গের কাব্য, পূর্ববঙ্গের চাঁদ সর্বপ্রকার ক্ষতি-নির্যাতন ঝঞ্ঝাপীড়িত মহীরুহের মতো সহ্য করে উন্নতশির, আর পশ্চিমবঙ্গের ধনপতি অনুতপ্ত হৃদয়ে আনুগত্যে স্বস্তিকামী।

হুমায়ুন কবির তাঁর 'বাঙলার কাব্য' গ্রন্থে অনুমান করেছেন—এ দ্রোহ ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রভাবজ। এ অনুমান যথার্থ বলেই মনে হয়। নইলে বহু দেবতার উপাসক একজন হিন্দু নতুন একটা দেবতাকে ঠাঁই দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে কেন? তবে ধনপতির তুলনায় চাঁদের এই অনমনীয় দৃঢ়তার মূলে প্রতিবেশের আনুকূল্যও রয়েছে, নদীবহুল পূর্ববঙ্গে বর্ষার জলের উপরই তাদের জীবন—নদী শুধু কূল ভাঙে না, ক্ষণে ক্ষণে নৌকাও ডোবায়—তা ছাড়া ঝড়-বন্যা-খরা ও শ্বাপদ-সরীসৃপের সঙ্গে মোকাবেলা করেই তাদের বাঁচতে হয়। ঐ সংগ্রাম-কঠিন অভ্যস্ত জীবনে নতুন চিন্তা-চেতনার বীজ উপ্ত হবার অনুকূল আবহাওয়া পেয়েছিল—যা ঊষর রাঙামাটির জীবনে ছিল না।

বিদেশীর চিন্তা-চেতনার সঙ্গে পরিচয় মুহূর্তে লালিত চিন্তা-চেতনার নিস্তরঙ্গ প্রবাহে এমনি ঊর্মি জাগে—আকস্মিকতার অভিভূতি কেটে গেলে তা মন-সহা—গা-সহাও হয়ে উঠে, কিন্তু ঐ মৌহূর্তিক সংঘর্ষের স্ফুলিঙ্গ কখনো কখনো কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোনোকে ভস্মীভূত করে নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্র উর্বরা করে তোলে। এমনি নজির এদেশের ইতিহাসেও মেলে, আরবদের সিন্ধুবিজয়জাত ভাব-সংঘাতে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও ভাস্কর-মাধব-নিম্বার্ক-বল্লভের ভক্তিবাদের উন্মেষ-বিকাশ, তুর্কি বিজয়ের ফলে উত্তর ভারতে ও বঙ্গে সন্তধর্মের উদ্ভব, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্তে রামমোহনের চেতনায় নিরাকার ব্রাহ্মবাদের জন্ম। তুর্কী বিজয়ের ফলে ইসলামি-সংস্কৃতিও এদেশের চিন্তা-চেতনার জগতে বাসন্তী হাওয়া বয়ে আনে, সে হাওয়া জীবন-চেতনায় ও জগৎ-ভাবনায় ঢেউ জাগায়, মর্মমূলে নাড়া দেয়, মাতিয়ে তোলে—এর নাম ভাববিপ্লব—তাও চৈতন্যজীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ধর্মে সমাজে সংস্কৃতিতে কিংবা জীবন-যাত্রায় যুগান্তর আসে এভাবেই। বলেছি শ্রুতি-স্মৃতি-গীতা শাসিত সমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের লোকগুলো তুর্কী আমলে গণচাপে পড়ে ও লাভের লোভে লোকায়ত দেবতাদের উপেক্ষা করতে পারেনি বেশী দিন। কারণ ছিল দুটো—একটা হচ্ছে তারা সমাজে সংখ্যালঘু, রাজশক্তির সমর্থন নেই বলে এখন আর সেন আমলের মতো সমাজ স্বায়ত্তে রাখা সম্ভব ছিলনা, গণমতে তাদেরও সায় দিতে হচ্ছিল; অন্যটা হচ্ছে তখন নিম্নবর্ণের ও

নিম্নবিত্তের লোক রাজধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল। কাজেই গণমন যুগিয়ে বা গণমানবকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বধর্মীর সংহতি সাধন করে স্বধর্ম ও স্বসমাজ রক্ষা করা আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। তাই একদিকে যেমন নব্য ন্যায়-স্মৃতি-মেলবিন্যাস ও শাস্ত্র শোধন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি গণ-বিশ্বাস ও সংস্কারকে শ্রদ্ধা ও বরণ করে গণমানবকে তুষ্ট রাখতে হচ্ছিল। তাই ব্রাহ্মণেও লোকায়ত দেবতার স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠল—পুরাণগুলোতেও লোক-দেবতার মাহাত্ম্য-মহিমার বর্ণনা ঠাঁই পেল। তবু গোড়ার দিকে স্বশ্রেণীর কাছে একটা শরম-সংকোচ ও নিন্দা-ভয় ছিল। তা কাটিয়ে উঠবার জন্যেই দেবতার 'স্বপ্নাদেশ' তত্ত্বের উদ্ভাবন। পরে তা প্রথায় পরিণতি পায়। মঙ্গলকাব্যের কবি মাত্রই কীর্তিত দেবতার স্বপ্নাদিষ্ট। কাজেই নিরুপায় কবিকে স্তুতি রচনা করতেই হল, আবার নিন্দুকদের সর্বনাশের আশ্বাসও মিলে গেল দেবতার কাছ থেকেই। এমনি আট-ঘাট বেঁধেই কবিগণ লৌকিক দেবতাদের বৈদিক-পৌরাণিক আভিজাত্যের মর্যাদা দিয়ে লোকবন্দ্য ও সর্বজনীন দেবতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

আমাদের প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন পাঁচালী—অরিদেবতার মাহাত্ম্যকথা। এই অরিদেবতা হলেন মনসা। মনসা যে বৌদ্ধ পূজিত দেবতাও, তার আভাস আছে অন্যতর প্রাচীন পাঁচালী বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত 'মনসামঙ্গলে' বা মনসাবিজয়ে। এ গ্রন্থে শিব স্বয়ং ধর্ম (ঠাকুরের)-এর উপাসক। বল্লুকা নদীর তীরে অনাদিনাথ রূপে ধর্মের সাক্ষাৎ কামনায় বারো বছর কঠোর তপস্যা করেন শিব (অর্থাৎ আদিনাথ)। শিবের স্তবে তুষ্ট হয়ে ধর্ম যখন শিবকে দেখা দিতে তাঁর গৃহদ্বারে এলেন, তখন শিব ঘরে ছিলেন না, তাই শিবপত্নী গঙ্গাই ধর্মের দর্শন পেলেন, ধর্ম এসেছিলেন,—
"ধবল ছত্র ধরি শিরে/দণ্ড কমণ্ডলু করে/উলুকে করিয়া আরোহণ।"

ধর্মের ক্ষণিক দৃষ্টিতে গঙ্গার দেহবর্ণ ধবল হয়ে গেল। গঙ্গা—'বসিল ধবল ঘাটে হৈয়া শ্বেতকায়।' এই ধর্মই পরম ব্রহ্ম। 'গঙ্গারে পরমব্রহ্ম দিল দরশন।' উল্লেখ্য যে ধর্মঠাকুর (মূলে অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় সূর্য দেবতা হিসেবে) কুষ্ঠরোগেরও দেবতা। এখানে গঙ্গার সূর্যের শ্বেতবর্ণ প্রাপ্তির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ধর্মের অনুগৃহীত শিব ধর্মের নির্দেশে কালীদহে প্রত্যহ পদ্ম তুলতে যান, এখানেই একদিন মদন-পীড়িত শিবের বীর্য স্খলিত হয় 'পদ্মপাতায়'—তার থেকেই অবশেষে মনসার উৎপত্তি। শিবপত্নী গৌরীর ডোমনীর ছদ্মবেশ ধারণও ধর্মপূজারীদের ঐতিহ্যের ইঙ্গিত বহন করে। সোমাই পণ্ডিতও মৃত দুর্লভকে জীবন্ত দেখে ভয়ে বিস্ময়ে 'ধর্ম ধর্ম' ডাক ছেড়েছিল। মনোজ বলেই সম্ভবত এই অযোনিসম্ভবার নাম 'মনসা'। এই 'মনসা' মহাযানী দেবতা জাঙ্গুলী তারাও।

বিপ্রদাসও বলেন: "জাঁগিয়া জাগুলি নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।" এখানেও বজ্র-সহজযানী কায়াসাধন (বিন্দু ধারণ ও উর্ধ্বায়নের) তন্ত্রের বজ্র-কমল-সহস্রার ইঙ্গিত রয়েছে:

কেন ত্রিভুবননাথ আপনা বিস্মার
মন-পবনেতে জীব পরিচয় কর।...
অহর্নিশ খসে রস কিছু নাহি টুটে।
কোমল নবনী হেন বজ্র নাহি ফুটে।
দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট
আসুক পরম হংস চরুক নিবাট।
পুনরপি নিবর্তিয়া যাউক স্বস্থান
যথায় কমলে হংস করে মধুপান।

যে বিষ পান করে শিব মুমূর্ষু, তা কাম-বিষের প্রতীক। বাইবেল-উক্ত সাপও কামের প্রতীক। কাম-বিষকে অমৃতে পরিণত করাই বজ্র-সহজযানীদের গুহ্য-সাধনার লক্ষ্য। ডক্টর সুকুমার সেনও বলেছেন," ধর্মমঙ্গলের ঐতিহ্য আর মনসামঙ্গলের ঐতিহ্য এক মূল হইতে উদ্ভূত। সে মূল হইতে নাথপন্থীদের ঐতিহ্যও অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। (বা. সা. ই/৩/১/পূঃ পৃ: ২১০)

সত্যযুগ মধ্যেযুগ এক রচিলা বিষধর এক নিপায়া
গ্যান-বিহূনাঁ গণ গন্ধ্রপ অবধূ সবহি ডসি ডসি খায়া।
(গোরখবাণী-পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল, উদ্ধৃত বা. সা ই. পৃ: ২১০)

"সত্যযুগ মধ্যে প্রথম যুগ রচিত হইল। এক বিষধর নিষ্পন্ন হইল। হে অবধূত, জ্ঞানহীন দেখিয়া সব গন্ধর্বকে সে দংশন করিয়া করিয়া খাইল।" ডক্টর সুকুমার সেন আরো বলেন: 'মূলে মনসার কাহিনীও ধর্মঠাকুরের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত ছিল। আদ্যদেব ধর্মঠাকুরের 'মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ'—তাহা হইতেই আদ্যা দেবীর উদ্ভব। এই আদ্যাদেবীর নাম 'কেতকা'। মনসামঙ্গল কাহিনীতেও মনসার নামান্তর 'কেতকা'। নাথপন্থী যোগীরা তাঁহাদের পুরাতন ছড়ায় এই কাহিনীর জের টানিয়া আসিয়াছেন: 'মাতা হামারী মনসা বোলিয়ে। পিতা বোলিয়ে নিরঞ্জন নিরাকার।' (বা. সা. ই ৩ সং ১। পৃ: ২১৪)

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ 'সাপ'কে অবহেলা করতে পারেনি। সাপের দ্রুত সর্পিল গতি, জলে-স্থলে-ভূগর্ভে তার সহজ সঞ্চরণ, তার জীবনবিনাশী বিষ, তার বর্ণালী রূপ, তার ফণার সৌন্দর্য, তার দৈহিক শক্তি, তার আত্মগোপনের

কৌশল, তার ত্বক বদলানো, তার প্রজনন সামর্থ্য প্রভৃতি আদি মনুষ্য সমাজের সভয়-সশ্রদ্ধ সকৌতূহল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই সামীয় জগতে (Semetic world) সাপ ও সাপ-চরিত্র সম্বন্ধে পুরাণ কাহিনী গড়ে উঠেছে। বাইবেলে এই সাপই কাম ও প্রজনন প্রতীক। শয়তান এই সাপের ছদ্মবেশ ধরেই স্বর্গে প্রবেশ করেছিল এবং বিভ্রান্ত করেছিল ইভকে। নবী কাহিনীতেও দেখা যায় যাদুকরেরা লাঠিকে সাপ বানাতে পারত, মুসা আল্লাহ্‌র অভিজ্ঞান পান লাঠির সাপে রূপান্তর প্রতীকে। প্রাচীন মিসরে 'সাপ' ছিল রাজকীয় লাঞ্ছন, আর্যরা সাপকে (নাগকে) দৈত্য-দানুর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। টোটেম নামে 'নাগ' গোত্র ও 'নাগ পঞ্চমী' স্মর্তব্য। আমাদের দেশেও যোগতান্ত্রিক গুহ্যতত্ত্বে সাপ হচ্ছে কাম-বিষের প্রতীক - কুণ্ডলীকৃত সাপ কুণ্ডলিনী শক্তি—কোন কোন বৈরাগী-দরবেশ-সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এই সাপ-প্রতীক বাঁকা লতার লাঠি ধারণ করেন। এ দেশী পুরাণে সহস্রফণা সাপই (অনন্ত নাগ) পৃথিবী ধারণ করে রয়েছে—এর তাৎপর্য প্রজনন মাধ্যমেই পৃথিবীর সৃষ্টি বহমান রয়েছে। লিঙ্গপ্রতীকে প্রজননের তথা সৃষ্টির উৎস শিব তাই অহিভূষণ। দাক্ষিণাত্যে জীবন্ত সাপের পূজা হয়। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় সমাজে তথা ভাষায় হিংসা-ক্রোধ, প্রতিশোধ বিশ্বাসঘাতকতা, ছদ্মবেশ, কৃতঘ্নতা, পীড়ন-পেষণ, আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন প্রভৃতির উপমা হয়ে রয়েছে সাপ। অমোঘ মৃত্যুর প্রতীক সাপকে কেউ অস্বীকার অবহেলা করতে পারেনি। কেউ মন্ত্রে, কেউ পূজায়, কেউবা বাহু বলে, কেউ ভৈষজে সাপকে বশ করতে চেয়েছে প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনে। উষ্ণদেশে 'সাপ' সর্বক্ষণের শঙ্কার কারণ, তাই ওঝা (উপাধ্যায়) ও সাপুড়ে বৃত্তির লোকও সব অঞ্চলেই মেলে। দুঃসাহসী বিক্রমবিলাসী মানুষ বাঘ-সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদ ধরে ও পোষে যে আনন্দে, সাপও ধরে পোষে সেই একই বিক্রম-প্রকাশানন্দে। প্রতিহিংসা বশে ও নিরাপত্তার উপায় হিসেবে কোন কোন আরণ্য মানব সাপ খায়, সাপ তাই তাদের ভয় পায়। শুনেছি সাপের বিষ তাদের দেহে ক্রিয়া করে না।

আমরা যেহেতু আত্মপ্রত্যয়হীন ও শক্তের ভক্ত, সেহেতু আমাদের দেশে স্তুতিতে-তোয়াজে-পূজায় সাপকে বশ করে প্রাণের নিরাপত্তা কামনা করা হয়েছে। এই নিষ্ক্রিয়-ভীরুতা বশেই এ দেশের মানুষ জীবন ও জীবিকার অরি-শক্তিকে প্রমূর্ত করে মা-বাপ ডেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছে—গণেশ মনসা শীতলা ষষ্ঠী প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। এখানেই শেষ নয়, বিপজ্জনক বুনো পশু পাখি এবং জলজ জন্তুও মা-বাবা-মামা সম্বোধনে পূজ্য হয়ে রয়েছে।

কাজেই মনসাকে অন্যদেশে ও ভিন্ন সমাজে সন্ধান করা নিরর্থক। জীবন-প্রতিবেশ থেকেই প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনে স্বদেশেই মনসার উদ্ভব। এর অনার্য

নাম জাঙ্গুলী ব্যাজোক্তিমূলক সাধারণ নাম বিষহরী, শীতলা গণেশ কিংবা বাভূত্তু প্রভৃতির তাৎপর্য স্মর্তব্য। আবার 'বিশাল অক্ষি' বা 'বিষাল অক্ষি' অর্থে বিশালাক্ষী বা বিষালাক্ষীও বটে। পৌরাণিক মর্যাদা দানের জন্যেই শিবের মনোজ [তথা কামজ তুল: স্মর] 'মনসা' এবং এ সূত্রে বানানো কাহিনী অনুসারে শিবের পদ্মে স্খলিত শুক্র থেকে জন্ম বলে তার অন্যনাম পদ্মা বা পদ্মাবতী। [কালীদহে কৃষ্ণের কালীয় নাগ দমনেও হয়তো আমাদের প্রাচীন দেহতাত্ত্বিক সাধারণ কামবিষ বিনাশতত্ত্ব নিহিত রয়েছে। কালীদহের কমল বনেই অহিভূষণ কামুক শিবের বিচরণ, এসূত্রে বজ্রকমল বা দেহের চতু: বা ষড় পদ্ম স্মরণীয়]

অতএব 'মনসা' পূজার উৎস আর্য নাগ, দ্রাবিড় মঞ্চ অম্মা প্রভৃতির পূজাতত্ত্বে সন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন। তবে নৌকায় পূজার আয়োজন থেকে মনে হয় জলের তথা গঙ্গার সঙ্গেও সাপের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, বিশেষত মনসার জলপদ্মে জন্ম। এটি আদি জলজ সৃষ্টির স্মারক।

রক্তহীন সাপ শীতে কাবু থাকে। বৈশাখের উষ্ণতা পেয়ে শীতাবাস গর্ত থেকে সাপ বের হতে থাকে। লোক বসতি অঞ্চলে তখন থেকেই তার উপদ্রব শুরু হয়। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ অবধি মনসা পূজার কাল। তারপর শ্রাবণ মাস অবধি প্রবল বর্ষণের তোড়ে অরণ্য-পার্বত্য অঞ্চলে বন্যার স্রোতে পড়ে সাপ সমতল লোকালয়ে আশ্রয় নেয়। তাই এই সময়েই সর্পভয় সার্বক্ষণিক শঙ্কায় পরিণত হয়। সব সাপকে স্তুতি-পূজা করবার জন্যে পাওয়া যাবেনা, তাই সাপের মতো দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের অসূয়া পরায়ণা কোপনস্বভাবা নারীপ্রতীক কল্পনা করা হয়েছে। অষ্ট্রিক মানুষ সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বে আসক্ত, তা ছাড়া আদি মাতৃতান্ত্রিক সংস্কারের প্রভাবেও তারা নারী দেবতা প্রবণ। ঘট দিয়ে মনসা পূজার শুরু এবং কালে সমূর্ত পূজায় পরিণতি। বাঙলা-আসাম-বিহার ও উড়িষ্যায় মনসা পূজা হয়। তবে আসাম ও পূর্ব বাঙলার মতো কোথাও এমন গুরুত্বসহকারে ঘরে ঘরে হয় না। তার কারণ বোধ হয় বাঙলা-আসামের নিম্নাঞ্চলেই ব্রহ্মপুত্র-যমুনা-মেঘনা বাহিত আরণ্য-পার্বত্য সাপ বর্ষাকালে আশ্রয় নেয়, জল প্লাবিত বর্ষাকালে এখানকার বিচ্ছিন্ন ভিটেগুলো মাত্র শুষ্ক থাকে। তাই বাড়ি-ঘরে ঝোপে-ঝাড়ে সাপ আশ্রিত হয়। সেজন্যে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ অবধি মনসা পূজার বিধান থাকলেও এ অঞ্চলে শ্রাবণ মাসেই গীত-বাদ্য সহযোগে রজনী জাগরণে মহাড়ম্বরে মনসার পূজা ও স্তুতি গান হয়। চাঁদ-বেহুলার কাহিনীও বিশেষ করে আসাম ও পূর্ব বাঙলার। তুর্কী বিজয়ের পরেই যে এ কাহিনীর বিশেষ বিকাশ তা চাঁদ-চরিত্রে নয় শুধু ঐ 'সদাগর' নামেতেও প্রকাশ।

মনসা পাঁচালীর উদ্ভব এবং বিকাশও পূর্ব বাঙলায়—কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও দ্বিজবংশীদাসের কাব্য উল্লেখ্য। রাঢ় অঞ্চলে আঠারো শতকের শেষ

পাদের কিংবা উনিশ শতকের প্রথম পাদের আগে মনসা পাঁচালী রচিত হয় নি। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' নামে মনসার পূজাপদ্ধতির একমাত্র গ্রন্থের খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে।[১] এটি সংস্কৃতে রচিত এবং স্মৃতি বিষয়ক সংকলন গ্রন্থ। মনসারই অপর নাম ব্যাড়ী, বিষহরী ও সুরসা। পদ্মা নামটি নেই। ব্যাড়ী ভক্তি-তরঙ্গিণীই প্রাপ্ত প্রাচীনতম মনসার পূজাপদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ। খণ্ডিত ব্যাড়ী ভক্তি তরঙ্গিণীর দুটো অংশ—'ক প্রমাণ তরঙ্গ ও খ. প্রয়োগ তরঙ্গ'। প্রমাণ খণ্ডে তিনি বিভিন্ন পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি গ্রন্থের সমর্থন ও সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন; যথা—কাশী খণ্ড, জৈমিনি গৃহসূত্র, বিষ্ণুপুরাণ, দেবীপুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, অমরকোষ, ব্রহ্মপুরাণ গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মযামল, পঞ্চরাত্র, কালিহৃদয়, প্রপঞ্চসার, অগ্নিপুরাণ, নারদ স্মৃতি বিষ্ণুধর্মতত্ত্ব, ভট্টভাষ্য, হেমাদ্রি, শুদ্ধদীপিকা, গৌড়মিথিল প্রাচ্যাদি কৃত্যসার, বিশারদ, ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট, শ্রীপতি, মহাকপিল পঞ্চরাত্র, গোভিলসূত্র, নির্ণয়ামৃত, দ্বৈত নির্ণয়, সারদাতিলক, কৃত্যচিন্তামণি, রাঘবভট্ট, গৌড়াদি সংগ্রহ, যজ্ঞপার্শ্ব, মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশ, হরি শর্মা ও শান্তিদীপিকা।

আর প্রয়োগ অংশে সামান্য মাত্র আছে। লিপিকরই অসমাপ্ত রেখেছেন, হয়তো তাঁর আদর্শ পুথি খণ্ডিত ছিল, অথবা কোন কারণে তিনি পুরো পুথি নকল করার সময় ও সুযোগ পাননি।

ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণীতে বাঙলা পাঁচালীর আদল পাওয়া যায়। যেমন পাত্র-পাত্রীর মধ্যে চন্দ্রধর (চাঁদ সদাগর), স্বর্ণরেখা (সনকা, সোনকা), লক্ষ্মীধর (লখীন্দর), বিপুলা (বেহুলা), জ্যোতিষী যশোধর (যশাই), শ্রীধর (পুরোহিত), কর্ণধার দুর্লভ (দুলাই), রজকী (নেতা ধোপানী), সুগন্ধা প্রভৃতি ছাড়াও জরৎকারু, আস্তীক, অষ্টনাগ প্রভৃতিও আছে। অন্যসব দেবতা ও মনসার সঙ্গে এদেরও পূজা করতে হবে।

গ্রন্থে মধুকর ডিঙ্গা ও শিব সমীপে বেহুলার নৃত্যের উল্লেখও রয়েছে। ঋদ্ধি এবং নৈরুজ্য প্রাপ্তির জন্যে, সর্পভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এবং ঐহিক বিবিধ ভোগ ও পারত্রিক স্বর্গলাভের জন্যে শান্তিকামী হয়ে মনসা দেবীর প্রীতি উৎপাদন উদ্দেশ্যে পূজা করা হবে।

নৌকায় পূজা করাই উত্তম। সেকালে নৌকার নিম্নতম দৈর্ঘ্য ছিল চৌদ্দ হাত আর উচ্চতম দৈর্ঘ্য ছিল একশ' হাত। বিদ্যাপতি বলেছেন—বিশহাতি নৌকা নিকৃষ্ট, চল্লিশ হাতি নৌকা মাঝারি, ষাটহাতি উত্তম আর শতহাতিই শ্রেষ্ঠ নৌকা।

---

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত। ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত এবং ইতিহাস (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা: ভাদ্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ সন) পত্রিকায় প্রকাশিত, ঢাকা পৃঃ ১৫৫—৯৬

পূজা-পার্বণ সম্পদসাপেক্ষ বলেই মনসাপূজা কেবল ঘট বসিয়ে করার বিধান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ঘটা করে মহোৎসব করার বিধানও। চৌদ্দ থেকে শতহাত লম্বা নৌকায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পার্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, কালীয় নাগ, অষ্ট নাগ, জরৎকারু, আস্তীক, অষ্টপদাতিক, ভাণ্ডারী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার সবাহন মূর্তি এবং চাঁদ থেকে নেতা ধোপানী অবধি সব সংশ্লিষ্ট মানুষের প্রতিমা গড়ে মহাড়ম্বরে সবলি মনসাপূজা করাই বিত্তবানদের কর্তব্য। এ পূজা বৈশাখে, আষাঢ়ে ও শ্রাবণে করা বিধেয়। প্রতিমা হত পটে, মণ্ডপে ও ঘটে, বিচিত্রাও সম্ভবত বিচিত্র পট। মূর্তি হত সোনার, রূপার, তামার কিংবা মাটির। নির্বলি পূজার যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি রয়েছে ছাগাদি পশু বলির বিধানও। দ্বিজে-দরিদ্রে দানও করতে হয় সাধ্যমত।

বোঝা যাচ্ছে, পনেরো শতকের প্রথমার্ধেও চাঁদ-বেহুলার কাহিনী পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করেছিল, কাজেই তেরো শতকের শেষার্ধে অন্তত: এটি জনপ্রিয় কথকতার অবলম্বন ছিল। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের গায়েন বর্ণিত পালাকে 'রয়ানী' বলে। রজনীতে গীত হয় বলেই কি রয়ানী বা রয়হানি? 'ব্যাড়ী-ভক্তিতরঙ্গিণীতে' পাই—"অথ রয়হানি :, দর্শনাপায়তে যস্যায়হানিস্ত অখিলাং। রয়হানিরিতি প্রোক্তা প্রতিমা ভব্যদায়িনী।—শুদ্ধি দীপিকায়াং।" আভীরদের রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কাহিনীর মতো চাঁদ-বেহুলা-লখীন্দর কাহিনীরও হয়তো কোন গ্রামের সর্পহন্তা সাপুড়ে চন্দ্রধরের সর্পদংশনে মৃতকল্প অবস্থা এবং পরিণামে পুনর্জীবিত হওয়ার রোমাঞ্চকর ঘটনাই ভিত্তি।[১] অথবা দেবী মাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়োজনে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর মতো চাঁদ-বেহুলার কাহিনীও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তাই বাঙলা-আসাম-উড়িষ্যার সর্বত্র নেতার ঘাট, চাঁদের ভিটে, লখীন্দরের বাসর দেখা যায়। এগুলো আসলে মনসাপূজা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত স্থান, যেমন ঈদ-পড়া ময়দান ঈদগাহ, বারোয়ারী অনুষ্ঠানের স্থান বারোয়ারী তলা, ইট পোড়ানো স্থান ইটখোলা হয়, এ-ও তেমনি নামসার। আবার ময়মনসিংহ গীতিকার 'আয়নাবিবি' গাথার নায়ক সূর্য-উজ্জ্বল চাঁদ সদাগরের

১. ত্রিশ বছর আগে চট্টগ্রামের দলঘাট গাঁয়ে এক বালক সর্প দংশনে মারা যায়। এক সাধু ঐ বালককে বাচিয়ে তোলার ভরসা দিয়ে প্রায় একমাস রুদ্ধদ্বার তাঁবুতে মৃতদেহ নিয়ে বাস করে। তখনো গুজব রটেছিল যে বালকটির দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে, পুরো সুস্থ হতে সময় লাগবে, চট্টগ্রাম দোহাজারী ট্রেনের প্রতিটি কক্ষে এ নিয়ে খুব আলোচনা হত। অবিশ্বাসীর চেয়ে আস্থাবানের সংখ্যাই ছিল বেশী; তারপর বোধ হয় একদিন ঐ সাধু পালিয়ে যায়।

বংশধর বলে আখ্যাত। 'অকথা কথা হয় লোকে ঘোষিলে।' দুনিয়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর নায়ক-নায়িকারা যেমন বাস্তব মানুষের চেয়েও বাস্তব এবং প্রখ্যাত হয়, চাঁদ, বেহুলা, লখীন্দর, চম্পা, উজানিনগরও তেমনি বাস্তব এবং প্রসিদ্ধ। কাজেই ঐতিহাসিকতা সন্ধান করা নিরর্থক।

মনসা মঙ্গলের দেবখণ্ড সবার জানা না থাকলেও 'সিনেমা' প্রভৃতির মাধ্যমে মনসা-চাঁদ-বেহুলা-লখীন্দর খণ্ড মোটামুটি সবারই জানা। কাজেই এখানে আমরা পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর ইঙ্গিতবহ কাঠামোটি তথা বিষয়সূচীটাই দিচ্ছি: কামুক শিবের শুক্র পদ্ম পত্রে স্খলিত হলে তা থেকে মনসার জন্ম ও যুবতীরূপ ধারণ, অচেনা কন্যার রতি কামনা, পিতা-কন্যার পরিচয়, চণ্ডীর ভয়ে সসঙ্কোচে কন্যা পদ্মাবতীকে (মনসাকে) গৃহে আনয়ন, চণ্ডীর রোষ ও পদ্মাকে প্রহার, চণ্ডীর হাতে পদ্মার চক্ষু নষ্ট। রুষ্ট পদ্মার বিষদৃষ্টিতে চণ্ডীর মূর্ছা, শিবের অনুরোধে মনসা কর্তৃক চণ্ডীকে চেতনা দান জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ, দাম্পত্য কলহে স্বামীবিচ্ছেদ, সমুদ্রমন্থনে উত্থিত বিষ পানে মহাদেবের চৈতন্যলুপ্তি, মনসা কর্তৃক চৈতন্যদান, সৎমা চণ্ডীর প্রতিকূলতায় পদ্মার নির্বাসন ও পুরী নির্মাণ। কন্যা বিচ্ছেদে কাতর শিবের অশ্রু থেকে নেতার জন্ম, পদ্মার সহচরী হিসেবে তার স্থিতি। দেবী খণ্ড এখানেই শেষ।

মর্ত্যে মনসার পূজাপ্রচার বাঞ্ছা দিয়ে মর্ত্যখণ্ডের শুরু। রাখালদের প্রথমে অস্বীকৃতি পরে পূজা দান, হাসান-হোসেনের মনসা নিন্দা ও পরে স্বীকৃতি ও আনুগত্য, চাঁদের অস্বীকৃতি—চাঁদের উদ্যান-বিনষ্টি, ধন্বন্তরী (গারুড়ী) বধ, চাঁদের ছয় পুত্রের প্রাণনাশ, চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা ও পণ্য বিনিময়, চৌদ্দ ডিঙ্গা নিমজ্জন, লখীন্দরের জন্ম, চাঁদের ঘরে প্রত্যাবর্তন, লখীন্দরের বিয়ের উদ্যোগ, লোহার বাসর নির্মাণ, বিয়ে, বাসরে সর্প দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু, ভেলায় মৃত স্বামী নিয়ে বেহুলার যাত্রা, ঘাটে ঘাটে নানা বিপজ্জাল, অবশেষে স্বর্গে উপস্থিতি, নৃত্য গীতে কামুক শিবকে তুষ্ট করে তাঁর সুপারিশে পদ্মাকে বশ করে স্বামীর জীবন নয় শুধু, ছয় ভাশুর ও সপণ্য চৌদ্দ ডিঙ্গাও পুনঃপ্রাপ্তি। চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করাবে—এই অঙ্গীকার করে বেহুলা-লখীন্দরের দেশে প্রত্যাবর্তন। ডোমের ছদ্মবেশে বেহুলা-লখীন্দরের বাড়ি প্রবেশ, চাঁদকে বুঝিয়ে মনসার পূজায় রাজি করানো এবং পূজা শেষে মনসার মন্দির নির্মাণ ও মনসার পূজা প্রচার শেষে বেহুলা-লখীন্দর রূপী দেবতা ঊষা-অনিরুদ্ধের সশরীর স্বর্গারোহণে পাঁচালী সমাপ্ত। তবে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় সংক্ষেপণ-বিস্তৃতি, গ্রহণ-বর্জন-সংযোজন প্রভৃতি রয়েছে বিভিন্ন মনসামঙ্গল কাব্যে। কাহিনীর ঋজুতা ও পারম্পর্য বোধ হয়

বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণেই' বিশেষভাবে রক্ষিত হয়েছে। হিন্দু পুরাণানুগ করে রচনার চেষ্টা থাকলেও বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ও ক্ষেমানন্দের পাঁচালীতে সৃষ্টিপত্তন ও ধর্মঠাকুর সম্পৃক্ত উক্তিতে বৌদ্ধ প্রভাব স্পষ্ট। বিজয় গুপ্তে কেবল ডাকিনী-যোগিনী-কামরূপ-কামাখ্যার মন্ত্রশক্তির প্রভাব মাত্র স্বীকৃত। চাঁদের ছয় পুত্র মারা গেলেও ছয় বধূর 'সহমরণের' ব্যবস্থা নেই। বিজয় গুপ্ত-বিপ্রদাস-নারায়ণদেবের কাহিনীতে স্থূল ঐক্য মেলে, কিন্তু ক্ষেমানন্দের পাঁচালীতে বিভিন্ন কাহিনীর লঘুত্ব-গুরুত্ব চেতনা স্বতন্ত্র। যেমন তাঁর 'ঊষাহরণ' পালা, এটি কোন কোন পাঁচালীতে নেই, তার জায়গায় রয়েছে 'যম-মনসার যুদ্ধ'। চৌদ্দ ডিঙ্গার নামেও—মধুকর প্রভৃতি দুই একটা ছাড়া—পার্থক্য রয়েছে বিভিন্ন পাঁচালীতে। এবং রসপ্রাধান্য ও সমাপ্তি চিত্র প্রায়ই ভিন্ন। রূপ-প্রকৃতি-সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতির স্থূল অভিন্নতার মধ্যে রূপগত, বর্ণনাগত ও রসগত পার্থক্য স্পষ্ট। অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্য না থাকলে একই বিষয়ে একাধিক কবির পাঁচালী রচনা নিরর্থক হত।

আর একটি কথা, সেকালে সাধারণ লোকের ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল না বললেই চলে। দেশ-দুনিয়ার কিছু নাম তারা রূপকথার মতোই শুনত। তাই কবিরাও ভৌগোলিক জ্ঞানের কিংবা পণ্য দ্রব্যের বাস্তব পরিচয় দিতে পারেননি। কেউ কেউ পুরোনো বাণিজ্য বন্দরের ও রাজধানী গৌড়ে যাতায়াত পথের কিছুটা সন্ধান জানতেন, তাই কয়েকটি গঞ্জ ও নৌকাঘাটের নাম উল্লেখ করতে পেরেছেন।

১০

কানা হরিদত্ত

পদ্মা পুরাণ বা মনসামঙ্গল রচয়িতা হিসেবে কানা হরিদত্তের নাম প্রথম শোনা যায় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, যখন বিজয়গুপ্তের 'পদ্মা পুরাণ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে এবং জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত 'কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে' (ক. বি. ১৯৬২ স)

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত।
হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে
জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর।

গীতে মতি না দেয় কেহ মিছে লাফ ফাল
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল।

(প্যারীমোহন দাসগুপ্ত সম্পাদিত বিজয় গুপ্তের
পদ্মাপুরাণ ১৩০৮ সাল)

জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত বিধৃত পাঠ :

সর্বলোকে গীত না বোঝে মাহাত্ম্য
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত।
হরি দত্তের গীত লোপ পাইল এই কালে
জোড়া গাথা নাহি কিছু ভাগে বোলে চালে।
গীতে মতি না দেয় কেহ ভাবে বোলে চাল
তাহা দেখি পুত্র মোর উপজে বিশাল।

সামান্য পাঠান্তরে বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের' আদ্যে অখণ্ডিত সব পুথিতে মূল বক্তব্যে অভিন্নতা মেলে। তা এই, বিজয়গুপ্তের কালে কানা হরি দত্তের পাঁচালীর বা গীতির লিখিত পাঠ লুপ্ত হয়ে গেছে। শ্রুতি-স্মৃতি-নির্ভর অজ্ঞ গায়েনেরা হরি দত্তের বিলুপ্ত-বিস্মৃত পাঠ সাধ্যমত বানিয়ে বানিয়ে গায়, তাতে সাধারণত সঙ্গতি, পারম্পর্য ও ছন্দ বজায় রাখা সম্ভব হয়না। এজন্য লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে হরি দত্তের বাঁধা গীত আর শুনতে চায়না, অথবা অজ্ঞ কানা হরি দত্ত গীত রচনায় পটু ছিলেন না, ফলে তাঁর রচনায় কাহিনীগত সঙ্গতি-পারম্পর্য এবং নির্ভুল ছন্দ-বিন্যাস ছিলনা। তাই অনাদরে কালে সে গান লোপ পেয়েছে, [আসলে লুপ্তপ্রায়]। বিজয়গুপ্তের কালেও যে একেবারে লোপ পাইনি তার প্রমাণ বিজয়গুপ্ত তাঁর রচনার কৈফিয়ত স্বরূপ কানা হরি দত্তের ত্রুটি দেখাচ্ছেন। তিনি নিজে না দেখলে বা না শুনলে রচনার ত্রুটির কথা বলতে পারতেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের (১০৯১ সংখ্যক) পুথিতে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'নারায়ণ দেবের' মনসা মঙ্গলের ৬৫৩৭ সংখ্যক পুথিতে হরি দত্তের ভণিতায় পাঠাংশ পাওয়া যায়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার অন্যের রচিত মনসামঙ্গলের পুথিতে হরিদত্তের ভণিতায় পদ্মার সর্পপূজা অংশ পেয়েছিলেন :

১ ক. দুই হস্তে শঙ্ক হইল গরল শঙ্খিনী... (বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য ৮ম সং পৃঃ ১০-১১)

খ. ক্ষীরোদ জলে চান্দ লখায়রে ভাসাইয়া
বিস্তর করিছে বিষাদ। (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়
পৃঃ ১৭৪-৭৫)

গঃ ওলা শনি আদ্যের কাহিনী
মুই হেন সেবকে শরণ লইলাম গো

ঘ. বিচিত্র নাগে করে দেবী গলাই সুতলী
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলী

(গ ও ঘ বাইশ কবির মনসা মঙ্গল-আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৫৪ সন। পৃ-০১)

২. কানা হরি দত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়, (ঢা. বি.)

৩. পদ্মার চরণে গতি হরি দত্তে কয়
মনসা পুজিয়ে সভে ধন পুত্র পায়। (ক. বি.)

এতটুকু নিঃসন্দেহে জানা গেল যে কানা (এক চক্ষু বিহীন) হরি দত্ত নামের এক কবি বা গায়েন বিজয় গুপ্তের এক পুরুষ আগে (হয়তো পঞ্চাশ/ষাট বছর আগে কেননা বিজয় গুপ্তের পাঁচালী রচনার কালে হরিদত্তের রচনা লুপ্তপ্রায়) পাঁচালী বা গীত রচনা করেছিলেন, এবং গায়েনেরা তা সর্বত্র গেয়ে বেড়াত। নিরক্ষর মূর্খ জ্ঞানহীন গায়েনেরা স্মৃতি ভ্রষ্ট হয়ে সে গীতে বিকৃতি ঘটায়।

অতএব আজ অবধি জানা মনসাগীতির রচকদের মধ্যে কানা হরি দত্তই প্রাচীনতম। আমরা জানি বিজয় গুপ্ত ১৪৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে (সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ ওরফে হোসেন শাহর আমলে) তাঁর পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। অতএব কানা হরি দত্ত পনেরো শতকের প্রথম পাদে বা প্রথমার্ধে পদ্মাপুরাণ বা মনসা গীতি রচনা করেছিলেন এবং তিনি বিজয় গুপ্তের এলাকার তথা চন্দ্রদ্বীপ বা বরিশালের অধিবাসী ছিলেন।

গাঁয়ে গাঁয়ে শ্রাবণ মাসে মনসার 'ঘট' বসিয়ে রাত জেগে মনসার পাঁচালী পড়ার বা গাওয়ার রেওয়াজ ছিল, এখনো আছে। সে প্রয়োজনে বিভিন্ন কবি রচিত পাঁচালী থেকে উৎকৃষ্ট অংশ সংকলিত করে পাঠ করা হত, এমনি করে শেষে বাইশ কবির 'মনসা মঙ্গল'ও তৈরী হল' অর্থাৎ ২২ জন কবির রচনা থেকে সংকলিত গ্রন্থের নাম হল 'বাইশ কবির মনসা মঙ্গল'। মনে হয় সংকলন পেশাদারী গায়েন-কথকেরাও করত, আবার বার্ষিক প্রয়োজনে গাঁয়ের উদ্যোগী গায়কও করত। এ বোধ হয়

প্রাচীন নিয়ম, তাই বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশী বদন প্রভৃতির রচিত পুথিতে অন্য কবির ভণিতা সম্বলিত অংশও মেলে। এ ভাবে হয়তো কালে আদি রচয়িতা হরি দত্তের পাঁচালী অনুলিপির অভাবে-অনাদরে হারিয়ে গেছে, এবং কিছু কিছু পাঠ হয়তো স্বনামে-বিনামে অন্যের রচনায় আজো আত্মরক্ষা করছে। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য দিয়ে আলোচনা শেষ করছি: 'মনসা মঙ্গল' বাঙ্গালীর রামায়ণ। বেহুলা ইহার সীতা, চাঁদ সদাগর ইহার রাবণ, সে জন্যই ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। অতএব বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্যের যিনি আদি কবি কেবল মাত্র ইতিহাসের মধ্যেই তাঁহার স্থান নহে, সমগ্র জাতির হৃদয়-পদ্মের উপর তাঁহার অধিষ্ঠান—তাহা লক্ষ্য গোচর নহে বলিয়া উপেক্ষণীয়ও নহে (বাইশ কবির 'মনসা মঙ্গল' পৃঃ ১৮৮)।

১১

বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্তের আত্মপরিচয় সূত্রে প্রকাশ তিনি বর্তমান বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন—হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয় (পাঠান্তরে হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বাস করেন বিজয়)। বর্ণে বৈদ্য। পিতা মাতার নাম নেই, তবে গাঁয়ের ভৌগোলিক অবস্থান ও সমাজ পরিচিতি রয়েছে।

> মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গোড়া তকসিম [পাঠান্তর-তমসিক]
> পশ্চিমে গর্গর নদী পূর্বে ঘন্টেশ্বর
> মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।

কবি আলাউল সূত্রে আমরা জানি সতেরো শতকে ফরিদপুরে ছিল এই মুলুক ফতেহাবাদের শাসনকেন্দ্র। এই পরগনার পশ্চিমে ঘাগর নদী, পূর্বে ঘন্টেশ্বর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে (?) বাঙ্গোড়াতকসিম (প্রশাসনিক উপ-বিভাগ) অবধি বিস্তৃত।

সে গাঁয়ে চতুর্বেদীব্রাহ্মণ, চিকিৎসাশাস্ত্র কুশল বৈদ্য, লিখন পটু কায়স্থ এবং এবং বৃত্তি নিপুণ অন্যান্য নানা জাতির বাস। কারণ—'স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।' কবির কাব্যে সমকালীন গৌড়-সুলতানের নাম আছে এবং সেই সঙ্গে রচনাকালও—

১. ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক—১৪০৬ শক=১৪৮৪-৮৫ খ্রী:
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক।

রচনাকালের দুটো পাঠান্তর মেলে কোন কোন পুঁথিতে, তা নিম্নরূপ:

২. ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক। ...১৪১৬ শক=১৪৯৪-৯৫ খ্রী:
৩. ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক। —১৪০০ শক=১৪৭৮ খ্রী:
সনাতন হোসেন শাহ নৃপতি তিলক।

প্রথমোক্ত পাঠই বেশী পাওয়া গেছে, ঐটিই যথার্থ। কিন্তু দ্বিতীয় পাঠেই বিদ্বানদের আগ্রহ বেশী, কারণ তাঁদের লক্ষ্য সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালের নাগাল পাওয়া। আর তৃতীয়টি বোধ হয় কোন চতুর লিপিকর আদর্শপুঁথিতে প্রথম পদের অভাব কিংবা পদটি দুষ্পাঠ্য দেখে নিজে বুদ্ধি করে 'ছায়া' লিখেছেন। এখানে আমরা 'ছায়া' বাদ দিলে পরবর্তী অংশ ১ ও ৩ সংখ্যক ভণিতায় অভিন্ন পাই। কাজেই প্রথম পাঠই বিশুদ্ধ বলে মনে করি, অর্থাৎ ১৪০৬ শকে বা ১৪৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে বিজয় গুপ্ত তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' রচনা শুরু করেন। এটি সমাপ্তি জ্ঞাপক নয়। কারণ কালজ্ঞাপক চরণটি গ্রন্থের গোড়ার দিকে পাওয়া যাচ্ছে। এ সময়েও একজন হোসেন শাহ গৌড় সুলতান ছিলেন, তিনি রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র ভাই এবং নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহর অন্যতম পুত্র।

রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্‌র পরে ইউসুফ শাহ্‌র পুত্র সিকান্দর শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে ইনি গৌড় সুলতান হন এবং হাবসী প্রধানদের হাতে 'তখত' হারান। এঁর জনপ্রিয় ও লোক-প্রচলিত নাম ছিল হোসেন শাহ, যদিও সুলতান হিসেবে ইনি জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ নাম গ্রহণ করেন, কিন্তু ঐ নাম সাধারণ্যে চালু ছিল না হয়তো, বিজয় গুপ্ত এই হোসেন শাহ ওরফে জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮১-৮৭ খ্রী) নামই উল্লেখ করেছেন। আর সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র নাম উল্লেখিত হয়েছে বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসা বিজয়ে'।

জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ ওরফে হোসেন শাহর প্রশংসা রয়েছে:

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক
সুলতান হুসন রাজা পৃথিবী পালক।
সমরে দুর্জয় রাজা বিপক্ষের যম
দানে কল্পতরু রাজা রূপে কাম সম।
যাহার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে 'বিক
মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গ রোর সিক।

শেষ পাঁচ চরণের পাঠান্তর—

সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে 'ধিক(অপর পাঠান্তর 'নিত')
মুলক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া সিম।

'তকসিম', তক সীম'-ও হতে পারে, [তক-পর্যন্ত, সীম-সীমা।] অর্থাৎ মুলুকের একদিকের (উত্তর দিকের) সীমা বাঙ্গরোড়া অবধি, এটিই বোধ হয় সঙ্গত পাঠ। কিন্তু পূর্ব চরণের শেষ পদ 'ধিক' বা 'নিত' হলে অন্ত্যানুপ্রাসের খাতিরে 'শিক' বা অন্য 'ত' প্রান্তিক শব্দ দরকার, কারণ অমিল পয়ার অসম্ভব।

পদ্মাপুরাণের সর্বশেষ সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ সনে। সম্পাদক জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত। তাঁর সম্বল ছিল পাঁচটা পুথি, সবগুলোই উনিশ শতকের এবং ১৮৩৭ থেকে ১৮৯৫ সনের মধ্যে অনুলিখিত। সারা পাঁচালীর পাঠ বিস্তৃত পাঠান্তর-কণ্টকিত। এতেও বোঝা যায় বিজয়গুপ্ত প্রাচীন কবি। দীর্ঘ কাল-পরিসরে গায়েন-কথক-লিপিকর পরম্পরায় এই জনপ্রিয় পাঁচালীর পাঠের বিকৃতি ও বিভিন্নতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল পাঠ, কোন্ অংশই বা প্রক্ষিপ্ত—বুঝবার সাধ্য নেই। ফুল্লশ্রী গাঁয়ে প্রাপ্ত ও ঐ গাঁয়েই লিখিত প্রতিলিপি (না তৈরী পাণ্ডুলিপি ?) পুথিকেও সম্পাদক আদর্শ করেননি, সম্পাদক তাঁর আদর্শ পুথির পাঠই গ্রহণ করেছেন প্রায় নির্বিচারে এবং সম্পাদনাকালে শিক্ষিত কবির লিখিত রচনার ভাষাকে ফুল্লশ্রী গাঁয়ের লোকের বর্তমান উচ্চারণানুগ করে বিকৃত করার দুর্বুদ্ধির কথাও তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তাই 'বিজয় গুপ্ত'ও 'বিজগে গোপ্ত' হয়েছে, বিজয় গুপ্ত কি নিজের নামটাও শুদ্ধ করে লেখেননি ?

স্পষ্টত সম্পাদক 'বিজএ'-এর 'এ'-র উচ্চারণ 'য়ে' ধরেছেন। অথচ প্রাচীন পুথিতে 'এ' ও 'য়' উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন, যথা— ছএ=ছয়, কএ=কয়, ভএ=ভয় ইত্যাদি। আবার চাহে(চাহএ)—ভয়ে(ভএ) মিলও দেখা যায়, এমনকি ভারতচন্দ্রেও। গীত হিসেবে সুর করে পড়া হত বলে সুরানুগ করে লেখা হত। যেমন—কর্‌এ (করে), ধর্‌এ (ধরে), চল্‌এ (চলে)। আধুনিক বিদ্বানেরা এ তথ্য স্মরণে রাখেন না বলেই তাঁদের পড়ার সুবিধের জন্যে—করয় , ধরয়, চলয়—লেখেন। ফলে সম্পাদিত গ্রন্থে বিজয় গুপ্ত কতখানি আছেন নিশ্চয় করে বলা যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

রক্ষিত পুথিগুলো ব্যবহৃত হলে পাঠ সম্বন্ধে সংশয় অনেক কমত। তবু আমরা জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্তের সম্পাদিত পাঠই অনুসরণ করব।

বলেছি সেকালে রক্ষণশীল শাস্ত্রপন্থীর নিন্দাভয়ে কোন উচ্চবর্ণের কবিরই 'স্বপ্নাদিষ্ট' না হয়ে লোকায়ত দেবতার মাহাত্ম্যকথা রচনার উপায় ছিল না। তাই বিজয়গুপ্তও স্বপ্নাদিষ্ট। তপ্ত কাঞ্চনজ্যোতি গৌরবর্ণা ব্রাহ্মণনারী বেশে মনসা স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়ে কবির পিঠে হাত দিয়ে বললেন—'হরিদত্তের গীত লুপ্ত পাইল কালে'। অতএব—'নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত।'

কাব্যের বর্ণিত বিষয়সূচী হচ্ছে: বন্দনা, স্বপ্নাধ্যায়, মনসার জন্ম, চণ্ডীর সঙ্গে শিবের বিবাদ, মনসাকে চণ্ডী কর্তৃক প্রহার, পদ্মার বিবাহ, স্বামীর সঙ্গে মনসার কোন্দল ও বিচ্ছেদ, সমুদ্র মন্থন, পদ্মার বনবাস, রাখাল বাড়ির পূজা, কাজির সঙ্গে যুদ্ধ, গুয়াবাড়ি কাটা, মহাজ্ঞান হরণ, শঙ্কুর গাড়ুরি নিধন, ছয় কুমার বধ, ঝালবাড়ি পূজা, বর বর্ণন, অনিরুদ্ধ-উষাহরণ ও যমযুদ্ধ, চাঁদের দক্ষিণ পাটন গমন, পণ্যবদল, ডিঙ্গাডুবি, লখীন্দরের জন্ম, লখীন্দরের বিবাহ ব্যবস্থা, লোহার বাসর, লখীন্দরের বিবাহ ও দংশন–ভাসান-জিয়ান। চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বের মূল কারণ: লোভে পূজা খাইতে গেলাম চাঁদের গোচরে। দুই হস্ত পাতিয়া মাগিলাম ফুলপানি/হেলায় না দিল দান আর ডাকে কানি/অধিকন্তু—পুষ্পজল মাগিতে চাহে স্তুতি দান। কাজেই চাঁদের গুরুতর অপরাধ ছিল—'আমায় না পূজিয়া চাঁদ সর্বদেব পূজে।' বিজয় গুপ্ত গ্রামবাসী কবি। নিম্নবিত্তের নির্জিত নিরক্ষর মানুষের মধ্যেই তাঁর বাস। তাই নিঃস্বলোকের অন্তরের ক্ষোভ ও যন্ত্রণার খবর তাঁর জানা ছিল, ছদ্ম পরিহাসের আবরণে সেই ব্যর্থ-সাধের বেদনাকরুণ অভিব্যক্তি মেলে নিঃস্ব বাঙালী গৃহস্থ-প্রতীক হর-গৌরীর পদ্মার বিবাহোৎসব সংক্রান্ত সংলাপে:

গৌরী বোলে কর কাজ তোমার মুখে নাহি লাজ
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
আইয় (এয়ো) আসিবে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে
তৈল সিন্দূর পাইব কোথায়।
হাসি বোলে শূলপাণি আইয় ভাঁড়াইতে জানি
লেংটা হইয়া মধ্যে দাঁড়াইব
দেখিয়া আমার ঠান আইয়র উড়িব প্রাণ
লজ্জা পাইয়া যাবে পলাইয়া।

কাজেই পান-গুয়া-তেল-সিন্দুর লাগবে না—অথচ মঙ্গলগানের উৎসব দিনে পরসার হয়ে যাবে। কত দরিদ্র হলে মানুষ কন্যার বিয়েতেও এমন ছলনা-প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়।

কামুক স্বামী ভ্রমরের মতো নানা নারী-পুষ্পের খোঁজে বেড়ায়, স্ত্রীর মনে স্বস্তি থাকে না, সতর্ক পাহারায় রাখতে হয় স্বামীকে। তাই—

'শিবেরে চঞ্চল দেখি জিজ্ঞাসে পাবর্তী
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবা কোন্ ঠাঁই?
কপট করিয়া কথা কহ নানা ছলে
তাই গৌরী দৃঢ় মুষ্টে ধরিলেক শিবের আঁচলে।
তথাচ রাখিতে নারে পাগল শিবাই।'

কিন্তু লম্পটদেরও ছলনার অভাব হয় না। এদিকে 'পুষ্পবনে জন্মিল কন্যা বাপে নাহি জানে', তাই পদ্মাকে 'কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত'। একেত ভিখারী, তার উপর লম্পট, এমন লোকের ঘরনীর নিত্য জ্বালা—তাই অকথ্য ভাষায় গালি পাড়ে আর শাপ-শাপান্ত করে স্বামীকে এবং দুষে নিজের অদৃষ্টকে—'পাপ কপালের ফলে পতি পাইলাম ভাল। চণ্ডী বোলে সখী মোর দুখের নাহি ওর। বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর।'[১] এমন স্ত্রীও ধৈর্য ধরে বেশিদিন ভাল থাকতে পারে না, তাই গৌরীও ডোমনী-জেলেনী-পাটনী হয়ে ছলনায়-বেহায়াপনায় স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দেন—'ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী হইল উলঙ্গ'। গৌরীও 'কপট করিয়া' 'সাঁচা মিছা কথা কইয়া, 'সই পাতিয়া' কাজ হাসিল করতে জানেন। শিব প্রায় সব সময়েই—'ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান কামে অচেতন' থাকেন এবং কখনো কখনো 'বলে ধরিতে চাহে অতি মনত্রাসে।' এমন স্বামীর স্ত্রীরা ঘরে কপট দিয়ে বসে থাকে 'কোপ করি মন।'

১. জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্ম ফলে।
—বৈষ্ণবপদ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আছে—

যে ডাল করেঁা মো ভরে
সে ডাল ভাঙ্গিআ পড়ে।

শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ পেখি।

সৎমা-সৎসন্তানের দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-কোন্দল চিরকালের ও প্রায় সর্বজনীন, তাই দেবতাও মুক্ত নয় এ দোষ থেকে। পদ্মাবতীকে ভালবেসে নয়,—স্বামীর 'বিক্রম জানিয়া পালেন দেবী মহামায়া।' তাই পদ্মার সন্তান হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন চণ্ডী।

পদ্মার বিয়েতে : তারযন্ত্রে গাহে গীত গাহে নাচে সুললিত
পরম সুন্দর দিব্য নারী।

চারদিকে পঞ্চ স্বরে বাদ্য বাজে। এয়ো নারীরা 'বরণের সজ্জা লইয়া দাঁড়াইল সারি সারি।' তিল-তৈল-আমলকী-হরিদ্রা-পিঠালি গায়ে লেপে স্নান করায়, অগুরু চন্দন-চুয়া দিয়ে প্রসাধন করে। দেব-স্বামীরাও স্ত্রীকে বাপ তুলে গালি দেয়—'ভাঙ-ড়ার ঝি তুই কিসে অপমান।' কুলীন বাপের মেয়েও দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়,—'বাপুর প্রসাদে আমি রাজভোগে ভোগী। বনপুষ্প দূর্বা আমি কভু নাহি তুলি'—এমন দাম্পত্য টেকে না। তাই পদ্মার স্বামী জরৎকারু পালায়। বলে—পদ্মা হেন স্ত্রীতে আমার নাহি কিছু কাম।' বনবাস যাত্রাকালে সঙ্গী বাপ সৎমার ঘরের কন্যার কাঁদনে কাঁদে—'পদ্মার কাঁদনে কাঁদে দেব ত্রিলোচন।'—এ অশ্রু থেকেই 'নেতা'র জন্ম।

সে যুগে কবিরা পরিবেশ-সচেতন ছিলেন। মধ্যযুগে মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এক জাতের লোক দেবতা-বিদ্বেষী কিংবা দেবতার প্রতি উদাসীন থাকলে চলে না। ধর্মীয় সহনশীলতার ভিত্তিতে গাঁয়ে গাঁয়ে পরস্পরের ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব নিয়ে সহাবস্থান করলেই স্বস্তি, শান্তি ও কল্যাণ। তাই আদি পাঁচালী 'মনসামঙ্গলে' 'হাসান হুসেন' পালার ব্যবস্থা, তাই চণ্ডীমঙ্গলে মুসলিম বসতির ব্যবস্থা। হাসান-হুসেন পালায় প্রথমে নিন্দা-অবজ্ঞা-দ্বন্দ্ব, পরে স্বীকৃতি ও শান্তি এবং সহাবস্থান। এ সূত্রে ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ খণ্ড' ও স্মর্তব্য।

এখানেও 'হাসান-হুসেন' দুই কাজির নন্দন।
ধর্ম কর্ম দেব-নিন্দা করে ঠাঁই ঠাঁই।
তুলসীর পত্র পায় যাহার মাথাত
চুলে ধরি আনে তারে আপনা সাক্ষাৎ।
সোগার তলে মাথা থুইয়া মারে উভা কিল
ঝড়ে যেন আকাশ হতে পড়ে দারুণ শিল।
পরেরে মারিতে পরের নাহি ব্যথা
চোপড় চাপর মারে আর ঘাড় গাতা।

ব্রাহ্মণে অপমান করে পৈতা পাইয়া কাছে
প্যাদা সকলে তারা হাতে পায়ে বান্ধে।
তকাই নামে মোল্লা বেটা কাজির সাক্ষাতে
ইজার পৈরনে তার কালা তক্যা মাথে।
কাজির প্রতাপে বেটা বড়ই দুরন্ত'।

এ অংশের পাঠান্তর কিংবা প্রক্ষিপ্ত পাঠও রয়েছে, তাতে বোঝা যায়, এগুলো সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রথাসিদ্ধ অভিব্যক্তি মাত্র। হিন্দু রাখালেরাও কম যায় না, তারাও তুর্কী শাসকের স্বজাতি মোল্লাকে—

'দাড়িতে ধরিয়া কেহ মারে ঘাড় গাতা
ইজার চিরিয়া কেহ করে ফেতা ফেতা।
মাথার তক্যা কেহ ঘষে দুই পায়ে
বলি দেয়া — ছাগলের রক্ত তার দিল সর্বগায়ে।'

বলা বাহুল্য, এগুলো হচ্ছে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের অতিশায়িত চিত্র, ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ সাধারণত সহিষ্ণু ও প্রীতিপরায়ণ, বিধর্মী-বিধর্ম বিদ্বেষ তাদের বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবনে তেমন প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু সম্প্রদায়গত মননে-আচরণে বিজাতি-বিধর্মী-বিদেশী-বিভাষী বিদ্বেষ কারণে-অকারণে প্রকাশ পায়। এখানে যে চিত্র মিলছে, সেরূপ চিত্র চৈতন্যচরিতে, মুসলিমবিরল মিথিলার হিন্দু রাজার সভাপণ্ডিত বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতায়', অন্নদামঙ্গলে, ও অন্য মনসামঙ্গলেও মেলে। শাসকের স্বধর্মী বলে যদি এরূপ দৌরাত্ম্য ওরা সত্যই করত, তাহলে তুর্কী-মুঘল আমলে রচিত গ্রন্থে এসব চিত্রই থাকত না। বরং চৈতন্যদেব কর্তৃক কাজীর উপর হামলা কিংবা পদ্মাপুরাণে মোল্লার উপর হামলা সম্ভবই হত না। কীর্তিলতা ছাড়া অন্যত্র এ-সব দ্বন্দ্ব-পীড়নের পরিণাম আপোসে ও সদ্ভাবে অবসিত দেখতে পাই। যবনের চৈতন্যভক্তি ও পীরপাঁচালী এ সূত্রে স্মর্তব্য।

এখানেও শেখ-সৈয়দ-পাঠান-কাজি-মোল্লা-জোলা-কারিগর—সব দাড়ি-গোঁফ-ওয়ালা সাদা পাগড়ী-কুর্তা-ইজার পরে ছুটল—গায়ের জোরে গরুর 'গোস্ত খিলাইয়া হিন্দুর জাতি নাশ' করবার জন্যে। পরিণামে কিন্তু মনসাকে স্বীকার করে, তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে দিয়ে কাজীর দল ঘরে ফিরেছে। এখানে কবির তীক্ষ্ন বিদ্রূপ বাণ বর্ষিত হয়েছে দেশী-জোলা ও বহুপত্নীক কাজীর প্রতি। কাজীর 'ছোট বিবি লড় পাড়ে। মাঝিয়া বিবি গড়ি পড়ে। বড় বিবিকে খাইল বিষম ঠাঁই'—এরূপে 'কাজীহাটি জোলাহাটি মরিল সকল।'

পর্যুদস্ত কাজী 'নিত্য নিত্য পূজার সজ্জা দেয় পাঠাইয়া।' বিনিময়ে সব মানুষ বেঁচে উঠল। লক্ষণীয়, পনেরো শতকে জোলাদি নিম্ন শ্রেণীর লোক দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। এ সব ধর্মত্যাগীদের হিন্দুরা সুনজরে দেখছে না—ঘৃণা-বিদ্বেষ-বিদ্রূপ তাই একটু তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পাঠান্তরে দেখা যায়—হুসেনের মাও 'আছিল হিন্দুর বেটি' এবং 'তুরুকের ঘরেও হিন্দুয়ানী মানে।' আচারিক জীবনের সব ঘটনাই মনসামঙ্গলে সুলভ।

বেহুলা-লখীন্দরের বিয়ের উদ্যোগে-আয়োজনে ও বিয়ের আসরে ঘরোয়া ও সামাজিক আচার-সংস্কার ও নিয়ম-নীতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিজয় গুপ্ত সর্বত্র ঘরোয়া ও গ্রামীণ পরিবেশে কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দেবতার হিংসা-ঘৃণা, পতিনিন্দা ঝগড়া-বিবাদ, কাপট্য-ষড়যন্ত্র, প্রতারণা প্রভৃতিও গ্রাম্য। ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ আচরণও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এগুলোকে তিনি সাহিত্যের সামগ্রী করে নিয়েছেন। যেমন—'প্রভাত সময়ে কাক ডাকে চারি ভিতে' কিংবা বলদের 'গলায় বান্ধিল ঘণ্টা করে ঠন্ ঠন্', অথবা গোদা বলে বরশি বাহিয়া দিব বড় পাঙ্গাশ' এমনি আরো নানা কথায় ও বর্ণনায় বিজয় গুপ্তের পরিপার্শ্ব-চেতনা সুস্পষ্ট—

পরেরে মারিতে পরের নাহি ব্যথা।
কর্পূরে তাম্বুলে মুখ শুদ্ধ করি করিল শয়ন।
সোনাকা কাঁদে তবে ভূমিতে পড়িয়া।
আর পুরুষ চাঁদ সওদাগর কাঁদে বিলাপ করিয়া।
আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।
কালু বলে মালু দাদা আসিতে পড়িল বাধা
আজুকার জালে ভাগ্য নাই।
সুত খেও উঠা-উঠি মৎস নাহি এক বুটি
জাল লইয়া চলো ঘরে যাই।

শিব বেহুলার রতি চাইলে সে বলে,
'আমি নারি পতিব্রতা অন্য লোক বাপের সমান।

শুভাশুভ : আচম্বিতে আসিল কাক নহে দেখি ভাল।
জাতে কৈবর্ত বেটা দীঘল মাথার চুল
সর্বগায়ে চাঁদ যেন শিমূলের কাঁটা।'

পণ্য বিনিময়ে বিক্রয়-কৌশল, বস্তুর গুণ বর্ণন প্রভৃতিও একাধারে ধূর্ততা ও রসিকতার পরিচায়ক।

স্বামী আলিঙ্গন চাইলে সাড়ে বারো বছর বয়স্কা বেহুলা কিন্তু পাকা গিন্নির মতোই বলে— 'অখণ্ড কলিকা প্রভু নহেত প্রকাশ/বিকশিত কমলে ভ্রমরে করে আশ' এবং যদিও 'শিশুমতি বেউলা সুরতি নাহি জানে', তবু ভরসা দেয়—'পরন্তু ভুঞ্জিব রতি পালঙ্কে বসিয়া।' পৌরাণিক আবরণ দিতে চেয়েও কবি 'বৌদ্ধ সংস্কার' থেকে মুক্ত হতে পারেননি। পদ্মা-পুরাণে বৌদ্ধ যুগের ডাকিনী যোগিনী, মন্ত্র-তন্ত্র ও কামরূপ-কামাখ্যা ছাড়া স্বয়ং মনসাও মারতে-বাঁচাতে পারে না। ধন-পুত্র ফিরে পেয়ে বেহুলার ও পরিজন-হিতৈষীদের অনুরোধে চাঁদ অনিচ্ছায় রাজি হয়েছিল মনসাকে পূজা করতে। তাই বলল 'বাম হস্তে পূজা আমি করিব তাহনে'। কিন্তু চণ্ডী যখন দেবতাদের অদ্বয় সত্তা ও অদ্বৈততত্ত্ব ব্যাখ্যা করে দিলেন, চাঁদ তখন চণ্ডী ও মনসার অভিন্নরূপ দেখতে পেল, তাই 'ভূমে পড়ি অষ্ট অঙ্গে করে নমস্কার।'

সম্পাদক জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত বলেন, 'দ্বিজ বিপ্রদাসের রচনা পাণ্ডিত্যের আলোকে ভরপুর। বিভিন্ন সামগ্রীর বর্ণনা এবং রচনা-কৌশলের ভিতরে কবির শাস্ত্রজ্ঞান এবং অপরিসীম পাণ্ডিত্যের···ছন্দের বাঁধনি এবং বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের ভিতরেও সর্বত্র পণ্ডিতজনোচিত বিবৃতির পরিচয় আছে। কিন্তু কবি বিজয় গুপ্তের রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম। ছন্দের বাঁধন কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রাপ্ত।···কিন্তু পূর্বাপর বিচার করিলে গল্পাংশের স্বাভাবিকতায় এবং রচনার সরলতায় ও পারিপাট্যে, সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বিজয় গুপ্তের রচনা অতুলনীয়।'' (পৃঃ ৪৶০/৩০,)

১২

কবি বিপ্রদাস পিপিলাই

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের পাঁচালীর তিনখানি খণ্ডিত ও একখানি সম্পূর্ণ পুথি মিলেছে। তিনখানি খণ্ডিত পুথির দুখানি এশিয়াটিক সোসাইটির, অন্যখানা বর্ধমান সাহিত্য সভার। পূর্ণাঙ্গ পুথিটি বিশ্বভারতীর। এই চারখানা পুথির প্রাপ্তিস্থান চব্বিশ পরগনা জেলার বশির হাট মহকুমা। এখানে কবির 'নিবাস' বলে উল্লেখিত 'বাদুড্যা' গ্রামের অভিন্ন নামে বাদুড়িয়া থানাও আছে। আবার নাদুড্যা <নাদুড়িয়া নামে একটি ছোট গ্রামও আছে। চারখানা পুথিতেই গ্রন্থারম্ভ পালায় অভিন্ন রচনাকাল মিলেছে। চারখানা পুথিরই লিপিস্থান একই এলাকা। পুথির লিপিতে 'র'-এর নীচে বিন্দু রয়েছে যখন, তখন লিপিকাল নিশ্চিতই উনিশ শতক, ছাপা খানা প্রবর্তিত হওয়ার পরে অনুলিখিত। ঐ স্থানে প্রচলিত কোন আঠারো শতকী পুথির এগুলো উনিশ

শতকী প্রতিলিপি হওয়া সম্ভব। কবিও ঐ অঞ্চলের, মনে হয় বিপ্রদাসের খ্যাতি অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করেনি কখনো। রচনার কালটি এই—

'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।'

অতএব ১৪১৭ শকে তথা ১৪৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' বা 'মনসা বিজয়' রচিত হয়। চারখানা পুথিতেই যখন অভিন্ন রচনা কাল মেলে, তখন এ তারিখ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা চলে। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা ও গ্রন্থোক্ত কিছু তথ্য পুথির সামগ্রিক অকৃত্রিমতায় প্রবল সন্দেহ জাগায়। যেমন—চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা পথের বর্ণনায় খড়দহে শ্রীপাট, কলকাতা এবং ব্রিটিশ আমলে খ্যাত হুগলী, ভাটপাড়া, পাইকপাড়া, বিসিড়া, কোন্নগর, কামার হাটি, চিৎপুর, বারুইপুর প্রভৃতি জায়গার নাম উল্লেখিত হয়েছে।

আবার পনেরো শতকে অজ্ঞাত তামাকুর কথাও আছে—'কেহ আনন্দিত হইয়া/সুবর্ণের হুকা লৈয়া/তামাকু ভরিয়া দেয় আগে', আবার বাবুরের ভারত বিজয়ের ত্রিশ বছর আগেই সপ্তগ্রামে মোগল (মুঘল) বাসিন্দা প্রত্যক্ষ করেন কবি—'নিবসে যবন যত/তাহা বা বলিব কত/মোগল পাঠান মোকাদীম'।

আর ভাষাতো প্রায় সর্বত্র সংস্কৃত শব্দবহুল এবং ক্রিয়াপদ আধুনিক কথ্য রীতির আদল প্রাপ্ত। এ-সব কারণে বিদ্বানেরা বিপ্রদাস পিপিলাইকে প্রাচীন কবি বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন। তবে রচনা কালটা আঠারো শতকের শেষপাদের বা উনিশ শতকের প্রথম পাদের কোন চতুর লিপিকরের সংযোজন কিনা—তাও নির্ণয় করবার উপায় নেই। বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়ের' সম্পাদক ডক্টর সুকুমার সেন সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করেছেন নানা যুক্তি দিয়ে। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন কবি 'সাতটি' পালাই লিখেছিলেন, পরবর্তী লিপিকর বা গায়েনদের প্রক্ষিপ্ত রচনায় ১৩টি পালায় পাঁচালীটি স্ফীতকলেবর হয়েছে। তাঁর এ অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে কাব্যোক্ত এই তথ্যটি: 'সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত/কহিল মঙ্গলগীত/বিস্তারে কহিব সপ্তনিশি'। এমনি অনুমান ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যও করেছিলেন। (পৃঃ ২৫১ ৩য় সংস্করণ)

বলা বাহুল্য, এ অনুমানের পক্ষে যুক্তি নিতান্ত দুর্বল, সপ্তনিশির জন্যে 'সাত' পালাই প্রয়োজন এমন কোন কথা নেই। তবে প্রক্ষিপ্ত উপাদানে যে পাঁচালীটি স্ফীত কলেবর ও আধুনিকতা পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। আমরা বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণের' জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত সংস্করণে দেখতে পাই প্রক্ষিপ্ত পাঠ গ্রন্থের

মূল পাঠের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কাজেই বিপ্রদাসের পাঁচালীর বেলায়ও হয়তো এমনটিই ঘটেছে। বিপ্রদাস ও ক্ষেমানন্দের রচনায় বৌদ্ধ সংস্কারের প্রভাবই সাক্ষ্য দেয় যে, হিন্দু পুরাণের প্রভাব সর্বগ্রাসী হবার আগেই এগুলো রচিত।

'দেব নিরঞ্জনে বন্দো ত্রিদেবের নাথ/ডাকিনী-যোগিনী বন্দো মোর ধর্ম-মা/নিরঞ্জন কার ভেদ সর্বশাস্ত্রে জানি/ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া নাম হৈল ব্রহ্মাণী/মহাজ্ঞান দিলা যদি দেব শূলপাণি/' যোগেশ্বরী নাম আর সরসা যোগিনী/জাগিয়া জাগুলী নাম শিব বৃক্ষে স্থিতি—ইত্যাদি বৌদ্ধ তত্ত্ব ও সংস্কার লক্ষণীয়।

সৃষ্টিপত্তন অংশও বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বানুগ:

যখন না ছিল গোসাঁঞি সৃষ্টি স্থিতি লয়
পবন আকার গোসাঁঞি ছিল জ্যোতির্ময়।
আদ্যা শক্তি সৃজন করিলা মহাশয়/···
ধবল ছত্র ধরি শিরে/উলকে করিয়া আরোহণ/ধর্মের বদন দেখি/
গঙ্গা ধবল মুখী/দেখি নিরঞ্জন কায়/আন্তরীক্ষে ধর্মরায়/
গঙ্গে দিলা পরিচয়···/বল্লুকায় দুঃখ পায় ক্লেশ যাতনা—

ধর্মের চরণ দেখবার জন্যে হর পুষ্প তোলে বার বছর ধরে।

বিপ্রদাসও মনসার স্বপ্নাদিষ্ট:

শুক্লাদশমী তিথি বৈশাখ মাসে
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।

কবির আত্মপরিচয় সূত্রে জানা যায়:

মুকুন্দ পণ্ডিত-সুত বিপ্রদাস নাম
চিরকাল বসতি নাদুড়্যা বটগ্রাম।
বাৎস্য গোত্র পিপলায় পঞ্চ প্রবর
সামবেদ কুতুব শাখা চারি সহোদর।

অতএব, দ্বিজ বিপ্রদাসের পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। তাঁরা সামাবেদী ব্রাহ্মণ, কুতুব (কৌথুম) শাখ, গোত্রে বাৎস্য, কুলবাচী—পিপিলাই। নিবাস নাদুড়্যা (বাদুড়্যা) বটগ্রাম। বর্তমান বশিরহাট মহকুমায় কবির নিবাস হলে, তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের (রাঢ়ের) কবি বলে দাবী করা চলে না।

পদ্মার নব নির্মিত পুরীতে—

প্রথমে ব্রাহ্মণ বৈসে জানে শাস্ত্র নীত

বাসিন্দারা— ক্ষেত্রি বৈশ্য বৈদ্য বৈসে কায়স্থ হরষিত।
ভট্ট দৈবজ্ঞ গোপ বারই কুমার
পঞ্চ বণিক বৈসে আর কর্মকার।
বাদ্য পূরক কলু কুশলি কাঠুর্যা
শাঁখারি কাঁসারি বৈসে তামলি সেকরা।
তাঁতি যুগী মালাকার রজক নাপিত
ছুথার গাড়ার বৈসে হৈয়া হরষিত।
ধীবর তিয়র মালা বৈসে নদী কূলে।'

এই কাব্যে হাসান-হুসেন 'তুরুক' (তুর্কী) বটে, কিন্তু অভিজাত বিত্তবান গৃহস্থ। শতেক গোলাম কৃষাণ নিয়ে জমি চাষ করায়। 'জোয়ালি জুড়িয়া গরু লৈল খেদাইয়া/হরিষে চলিল পথে পাচনি লইয়া।' কিন্তু পরবর্তী বর্ণনায় নগরই হয়ে গেছে, গ্রাম আর গ্রাম নেই। এখানে আক্রমণকারী অর্থাৎ বিরোধ বাধায় রাখালেরা— অকারণে তারা গোলামকে তাড়া করে। 'ক্রোধযুক্ত হৈল সবে তুরুক দেখিয়া/ ধর ধর ডাক ছাড়ি গেল খেদাড়িয়া'। গোলাম পালিয়ে গিয়ে সর্দার কৃষাণ গোরা মিনাকে খবর দিল, রাখালেরা—'করিছে ভূতের থানা দরক্তের তলে। ঘন ঘন তসলিম করএ বহুতর।' কবি বহু তুরুকের নাম উল্লেখ করেছেন—এই নামেই বিদ্রূপ প্রকট—সাহাতন, পয়তন, গয়তন সেবদিন-মুজদিন-খরদিন-তকদিন ইত্যাদি বান্দিদের নাম চিরা বিবি, হারি, আরজায় কালাফুলি, বুলবুলি, দুলদুলি, নাজিবি, টগরী ইত্যাদি। এর মধ্যে টগরী প্রভৃতি দেশী নাম।

হাসান-হুসেনের হাসাননগর অতি সমৃদ্ধ—

'সুবর্ণ রচিত পুরী ঘর শোভে সারি সারি
নৃত্য গীত আনন্দ বিস্তরে।
শতেক বিবির সঙ্গে হাসন আনন্দ রঙ্গে
রভসে নিবসে সর্বক্ষণ।
কর্পূর তাম্বুল খায় কস্তুরী-চন্দন গায়
গোলামে যোগায় ঘনে ঘন।
কেহ মলে অঙ্গ পদ কেহ করে খোসামদ
কেহ শ্বেত চামর দোলায়।
কেহ আনন্দিত হৈয়া সুবর্ণের হুক্কা লৈয়া
তামাকু ভরিয়া দেয় আগে।

কাজি মজলিস করি কেতাব কোরান ধরি
খণ্ডাখণ্ডনা-তজবিজ করে।
যতেক সৈয়দ মোল্লা জপয়েত বিসমল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব।
হিন্দুত কালিমা দিল মুসলমানি শিখাইল
তথা বৈসে জত মুসলমান।
শিখাএ নামাজ অজু, সদাই মস্তকে রুজু
নিরন্তর কলিপা জোগান।
নিকা-বিভা ঘনে ঘন তথা করে সর্বজন
সদা খোসালিত অতিশয়।
মোকাদিমে লৈয়া যায় কলিমা কোরান তায়
ফএতা পড়িয়া সাঙ্গ হয়।
কোথা মোল্লা ডাকি লয় পীরের হাজত দেয়
শিরনি ফয়েতা কুতুহলে।
মিঞা যদি ফৌত হৈল গোলামেরে খোষ পাইল
বিবি লৈয়া পলাইতে চায়'—

এতে তুর্কী আমলের মুসলিম গাঁয়ের নয়, পরবর্তী কালের হিন্দুর চোখে মুসলিম সমাজের একটি স্থূল চিত্র মেলে। উচ্চবিত্তের মুসলমান গোলাম-বাঁদী দিয়েই সব কাজ করাত, গাঁয়ে দেশজ মুসলমানের সংখ্যাই ছিল বেশী। শাস্ত্রীয় শিক্ষা গাঁয়ে গাঁয়ে চালু ছিল, পীরের দরগায় ফাতেহা সিন্নি হত। বহু বিবাহও বিরল ছিল না, তালাকও ছিল অবিরল। বর্ণনার মধ্যে অবশ্য প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রয়েইছে।

'মনসামঙ্গলগীত' অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতি:

'এ সব সম্পূর্ণ কথা শুনে যেই জন
ধন জন বৃদ্ধি হয় বিঘ্ন বিনাশন।
সর্প হইতে কভু তার না হয় বিনাশ
ইহকালে সুখে বঞ্চে মৈলে স্বর্গবাস।...
যে জন পদ্মার ব্রত গায়ে বা গাওয়ায়
সর্বক্ষণ বিষহরি তাহার সহায়।
যাহার কল্যাণে মো তোমার ব্রত গাই
মনোনীত বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে সদাই।' ইত্যাদি।

১৩

জয়েনউদ্দীন

সূচনা

কবি জয়েনউদ্দীনের 'রসুল বিজয়' কাব্যের একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। সংগ্রাহক মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। এর পর সত্তর বছর গত হয়েছে, কিন্তু এ কাব্যের আর কোনো পাণ্ডুলিপি কারো চোখে পড়েনি। সাহিত্য বিশারদ ১৩২০ সালে[১] এই পাণ্ডুলিপির বিস্তৃত পরিচয় দেন এবং তখন থেকেই বিদ্বানদের মধ্যে এ বিবরণ-ভিত্তিক আলোচনা শুরু হয়।

কাব্যের নাম

পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত বলে নাম-পৃষ্ঠা কিংবা পুষ্পিকা সূত্রে কাব্যের নাম জানা যায়নি। তবে ভণিতা দেখে মনে হয় কাব্যের নাম 'রসুল বিজয়'। যেমন :

ক. শ্রীযুত ইছুপ খান জ্ঞানে গুণবন্ত
রসুল বিজয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত।

খ. রসুল বিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি
মনে প্রীতি বাসিল সভান।

গ. রসুল বিজয় বাণী সুধারস ধার
শুনি গুণিগণ মন আনন্দ অপার।

পীর ও আদেষ্টা

আলোচ্য পাণ্ডুলিপির গোড়ার আট পাতা নেই। মনে হয় এতে রেওয়াজ মতো হামদ, না'ত, পীর-প্রশস্তি, প্রতিপোষক-পরিচিতি ও কবির আত্মপরিচয়াদি লেখা ছিল। এখন ভণিতা কয়টিই আমাদের সম্বল, এগুলো থেকেই আমরা কবির ও কাব্যের এবং পীরের ও পৃষ্ঠপোষকের নাম পাচ্ছি। কবির নাম জনুদ্দীন, জয়দ্দিন, জএনুদ্দিন, জএনুলদ্দিন রূপে লেখা রয়েছে। কাব্যের নাম রসুল বিজয়, পীরের নাম শাহ মুহম্মদ খান আর আদেষ্টা বা প্রতিপোষক হচেছন ইউসুফ খান ; তিনি 'রাজরত্ন, রাজেশ্বর, নায়ক ও সুনায়ক' বলে আখ্যাত হয়েছেন। কবি পষ্ট করে বলেছেন যে,

---

১. ক. বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ: ১০৬—৮। খ. মৎসম্পাদিত রসুলবিজয়, সাহিত্য পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৩৭০ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্রষ্টব্য।

রাজরত্ন শ্রীযুত ইউসুফ খানের আরতির জন্যে পীর শাহ মোহাম্মদ খানের চরণ ধ্যান করে 'পাঞ্চালি' রচনা করেছেন। ভণিতাভাগে কবি অনেক বিশেষণ প্রয়োগ করে পীরের ও ইউসুফ খানের গুণপণার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাতে স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে আমাদের মনের সংশয় ঘোচে না। আমরা এখানে ভণিতাগুলো উদ্ধৃত করলাম।

১. হীন জএনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালির ছন্দ।
শুনি গুণীগণ মনে ঝরে মকরন্দ।

২. দানে ধর্মে হরিচন্দ্র মান্যগুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছুপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিলুঁ পাঞ্চালি সন্ধান।।
ভাবে ভব কল্পতরু জ্ঞানে শুক্রজ্ঞানে গুরু
ধ্যানে হয় মহেশ সমান।
শান্তদান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
পীর শাহা মোহাম্মদ খান।।
তান পদ-রজ-পঙ্ক ভালে তিল পরি রঙ্গ
কহে জএনুদ্দিন [ইহ] লোকে।
ধর গিয়া সে চরণ জয় দিব নিরঞ্জন
কিসকে ভাব মন দুখে।।

৩. করুণা সাগর পীর গুণের সাগর।
অসীম মহিমা পীর ধীর সিন্ধুবর।।
শাহা মোহাম্মদ পীর রূপে পঞ্চবাণ।
অনন্ত কি কহিব অন্ত তাহার বাখান।।
কমল চরণ রেণু শিরেত করিয়া।
হীন জনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালি রচিয়া।।
শ্রীযুত ইছুফ খান জ্ঞানে গুণবন্ত।
রসুল বিজয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত।।

৪. রসুল বিজয় বাণী অমৃতের ধার।
শুনি মনে সব 'ধিক আনন্দ অপার।।

সদয় হৃদয়ময় দয়াশীল নিধি ।।
শাহা মোহাম্মদ খান সর্বগুণ নিধি ।।
তানপাদপদ্মে বন্দি ধেয়ানে ধেয়াই সার ।
শিশু জএনুলদ্দিনে কহে পাঞ্চালি পয়ার ।।

৫. দানে কর্ণ মানে কুরু জ্ঞানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু
ধ্যানেত শঙ্কর সম জান ।।
শান্ত দান্ত গুণবন্ত ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত
পীর মোহাম্মদ খান জান ।
তান পদ রেণু লৈয়া নয়ানে কাজল দিয়া
জয়দ্দিনে রচিল পয়ার ।।

৬. শ্রীযুত ইছুপ খান রাজেশ্বর গুণবান
সুরুচির সুবুদ্ধি সুঠাম ।
রসুল বিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি
মনে প্রীতি বাসিল সভান ।।
কলেবরে কম্পন ধীর যেন কল্পতরু বর
জ্ঞান ধ্যান অতি ধীর জন ।
ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত অনন্ত কি কহিব অন্ত
পীর শাহ মোহাম্মদ জান ।।
তান পদযুগ ধরি শিরে শিরত্রাণ করি
পাঞ্চালি রচিল শিশুবুদ্ধি ।

৭. হীন জএনুলদ্দিনে কহে নবীর চরণ
ভজিয়া শরণ মাগি উদ্ধার কারণ ।।

৮. রসুল বিজয় বাণী সুধারস ধার ।
শুনি গুণিগণমন আনন্দ অপার ।।
সুধীর সুজ্ঞানবন্ত [অতি] সুনায়ক ।
শুনি পরিতোষ ভেল ইছুপ নায়ক ।।

৯. শাহা মোহাম্মদ পীর তান পদে মনস্থির
সেই পদ প্রসাদে পয়ার ।
জএনুলদ্দিনে কহে আর কেবা পারে মারিবার
যাহারে রাখএ করতার ।।

১০. হীন জএনুলদ্দিনে কহে ভাবি একেশ্বর
কে বুঝিতে পারে তার অনন্ত মহিমার।

১১. আমীর উদ্ধার বাণী শুনি গুণসার
শ্রীযুত ইছুপ মন আনন্দ অপার।
শিশু জনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালি পয়ার
কে মারিতে পারে যারে রাখে করতার।

মোট এগারোটি ভণিতায় : ক. দুটোতে কবির নাম নেই,
খ. দুটোতে কবির নাম জএনুদ্দিন,
গ. তিনটেতে জনুদ্দিন,
আর ঘ. চারটেতে জএনুলদ্দিন রয়েছে।

অতএব কবির প্রকৃত নাম "জএনুলদ্দিন" ছিল বলেই অনুমান করতে হয়। তবে 'জএনুদ্দিন ও জনুদ্দিন'কে অভিন্ন মনে করলে অর্থাৎ 'জনুদ্দিন' জএনুদ্দিনের বিকৃতি বলে ধরে নিলে কবির নাম 'জয়নুদ্দীন' বলেই মানতে হয়।

ক. তিনটে [২,৩,৬] ভণিতায় পীর ও পৃষ্ঠপোষকের নাম যুগপৎ উল্লেখিত হয়েছে।

খ. তিনটে [৪,৫,৯] ভণিতায় কেবল পীরের চরণ বন্দনাই রয়েছে।

গ. দুটোতে [৮,১১] কেবল প্রতিপোষকের উল্লেখ আছে।

ঘ. তিনটেতে [১,৭,১০] পীর বা প্রতিপোষকের নাম নেই।

ঙ. দুটোতে [৬,৮] কবির নাম নেই ।

সুতরাং পীরের নাম ছয়বার, পৃষ্ঠপোষকের নাম পাঁচবার এবং কবির নাম নয়বার পাচ্ছি।

১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত কবি মুহম্মদ খানের "মক্তুল হোসেন" কাব্যে চট্টগ্রামের খ্যাতনামা পীরগণের নাম আছে। সেখানে শাহ মুহম্মদ খানের নাম নেই।

২,৬,৮ সংখ্যক ভণিতায় ইউসুফ খানকে যথাক্রমে রাজরত্ন, রাজেশ্বর (রাজশ্বর), নায়ক ও সুনায়ক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আমরা পরাগলী মহাভারতে সেনাপতি ও যুবরাজ অর্থে 'নায়ক' ব্যবহৃত হতে দেখেছি। আবার শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দরে 'যুবরাজ'কে রাজা এবং শাহ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে :

ক. শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিধান।

খ. ছিরি পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
গ. রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।

রচনাকাল

আলোচ্য খণ্ডিত কাব্যে রচনাকাল পাওয়া যায়নি। পাণ্ডুলিপিটিও অর্বাচীন। কবির পীরও সম্ভবত কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। বাহ্য কোন তথ্য প্রমাণেও কবির আবির্ভাব কাল নির্ণয়ের উপায় নেই। অবশ্য অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান সে চেষ্টাও করেছেন। আমরা তা যথা সময়ে আলোচনা করব। অভ্যন্তরীণ কোনো তথ্যও আমাদেরকে কোনো প্রত্যয়ে পৌছায় না, যদিও অনুমানের অবকাশ দেয়। আর ভাষা বিচারে কোনো নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত করা যায় না।

প্রথমেই ভাষার কথা ধরা যাক। রসুলবিজয়ের ভাষায় প্রাচীনতার নিদর্শন দুর্লক্ষ্য। রাজাক, আলিক, জানসি, চিনসি প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বরং গোড়ার কয়েক পাতায় নিকলি, মালুম, চালিয়া, খোসাল, নেহাল, হদ, দিল, বাত, ফরমাইল, ফেকিরা প্রভৃতি দোভাষীপুথি সুলভ শব্দের ব্যবহার পাই। তবে কি রসুল বিজয় কোন সময় বটতলায় ছাপা হয়েছিল? ভাষা দেখে কাল নির্ণয় সবক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। কেননা মানুষ বিশেষে রচন-শৈলী বিভিন্ন। বিশেষ করে গঠন যুগে (Formative period এ) ভাষা প্রতিভাবানের হাতে নতুনত্ব পায়। ১৮৪৩ থেকে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের বাঙলা ভাষার লেখকগণের বিভিন্ন লিখন-ভঙ্গীর কথা স্মরণ করলে আমরা এর সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হব। আমাদের হাতে অন্য প্রমাণও আছে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কবি মুহম্মদ দানিশ[১] তাঁর 'জ্ঞান বসন্ত বাণী' গ্রন্থে এবং আঠারো শতকের শেষ পাদের কবি মুহম্মদ জীবন[২] তাঁর 'বানুহোসেন-বাহরামগোর' উপাখ্যানে পনের-ষোল শতকের ভাষার রূপ রক্ষা করেছেন। যেমন মুহম্মদ জীবনের কাব্যে ক্রিয়ারূপ: কহোঁ, নহোঁ, আসিছোঁ, কহসি, চিনসি, বদএ। কর্মে 'ক' বিভক্তি—কন্যাক, মোক, তোক, তাক প্রভৃতি। সর্বনাম তুহ্মু, মোত প্রভৃতি। আবার কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাষা কত অর্বাচীন; ভাষা-নির্ভর সিদ্ধান্ত যে অচল, এ যুগেও তার প্রমাণ রয়েছে। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের রচনা-পড়ুয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী যে বাঙলা লিখতেন, তাতে তাঁদেরকে আজকের দিনের লেখক বলে চালিয়ে দেয়া যায়, আবার এখনকার অনেক

১. মাহেনও—ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সন।
২. বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৬৭ সাল।

লেখক উনিশ শতকী ঢঙে আজো লেখেন। আর এক কথা, জনপ্রিয় রচনার ভাষা লিপিকর পরম্পরায় পরিবর্তিত হয়েও আধুনিক রূপ লাভ করে। প্রমাণ, বৈষ্ণব পদাবলী, ডাক-খনার বচন ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ। কাজেই ভাষার প্রমাণে কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নইলে চোখ বুঁজে বলা যেত, 'রসুলবিজয়' আঠারো শতকের রচনা।

এবার বাহ্য প্রমাণের কথা বলি। অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়া-নই এই তত্ত্বের উদ্ভাবক। তাঁর মতে "জইনউদ্দীন ছিলেন বারবক শাহের সভা কবি।[১] জইনউদ্দীনের প্রকৃত নাম জইনউদ্দীন খান—জাতিতে পাঠান। তিনি ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও বাংলা ভাষাতে কাব্য রচনা করিয়াছেন।...... জইনউদ্দীনের জন্মস্থান হিরাট। তাঁহার আর একটি নাম ছিল ফতেখান। ফারসী কবিতায় তিনি নাকি ফতেখান বলিয়াই প্রচলিত ছিলেন। এই কারণেই 'রসুল বিজয়ের' রচয়িতা যে আমীর জইনউদ্দীন তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সেকালে ফারসীতে সুপণ্ডিত অনেক মুসলমান পাঠান কবিই বাংলায় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আলাওল খান ও মোহাম্মদ খান বিশেষ পরিচিত। বারবক শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেই যুবরাজ ইউসুফ খান আমীর জইনউদ্দীনকে রসুলের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিতে বলেন। ইহার ফলেই 'রসুল বিজয়' কাব্য সৃষ্টি হয়।... বিজয় কাব্য-গুলির মধ্যে 'রসুল বিজয়' প্রাচীনতম বটেই এমন কি চণ্ডীদাস হইতে জইনউদ্দীন প্রাচীনতর হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।"[২] সুফিয়ান সাহেবের এই বিবৃতিতে কোন তথ্য নেই, আছে তত্ত্ব। তত্ত্ব দিয়ে ইতিহাস হয় না।

আমীর জইনউদ্দীন হারুয়ী বারবক শাহর (১৪৫৯—৭৬ খ্রীস্টাব্দ) সভা-কবি ছিলেন। 'শরফনামা' নামক অভিধান রচয়িতা ইব্রাহীম কায়ুম ফারুকী তাঁকে 'মালেকুল শোয়ারা' বা রাজকবি বলে উল্লেখ করেছেন। কোন ফারসী কবির হিরাট থেকে এসে রুকনউদ্দীন বারবক শাহর সভাকবি হতে বাধা নেই। কিন্তু হিরাটে যাঁর জন্ম তিনি বাঙলা দেশে এসে বাঙলা শিখে বাঙলা ভাষায় একটি যুদ্ধ কাব্য লিখলেন, (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবন্ধ বা প্রকীর্ণপদ হলেও না হয় বিশ্বাস করা যেত) এ কথা বিশ্বাস করতে হলে কল্পনার ও সম্ভাব্যতার সীমাও বাড়িয়ে দিতে হয়।

১. ডক্টর এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ মনে করেন : এই বারবক শাহ সম্রাট বাহলুল লোদীর পুত্র জৌনপুরের সামন্ত শাসক বারবক শাহ। J. A. S. P., vol. v, pp 214-15.

২. মাহেনও—মার্চ ১৯৫৭, 'কবি জইনুদ্দিন'।

বিশেষ করে এ জয়েনউদ্দীন খান হারুয়ীই যদি 'রসুল বিজয়' কাব্য লিখতেন, তাহলে তাঁর কাব্যে হিন্দুয়ানি উপমাদি অলঙ্কার, রত্ন প্রভৃতি চরিত্র এবং বাঙলার আবহ এমনি ভাবে পেতাম না। কর্ণ-দ্রোণ-শুক্র প্রভৃতিরও ঠাঁই হত না। ভাষাও হত দোভাষী। এ সূত্রে আমীর খুসরুর হিন্দি রচনার কথা স্মর্তব্য। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও দুই জয়েনউদ্দীনকে অভিন্ন ভাববার প্রবণতা দেখিয়েছিলেন; "এঁকে (আমীর জৈনুদ্দীন হরউয়ি) এবং 'রসুল বিজয়' রচয়িতা জৈনুদ্দীনকে অভিন্ন মনে করা যেতে পারে।"[১] পরে অবশ্য তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন[২] এবং জয়েনউদ্দীনকে সৈয়দ সুলতানের (১৫৮২ খ্রী:) পরবর্তী বলে বিশ্বাস করেছেন।[৩] আমাদের ধারণায় নাম-সাদৃশ্য ছাড়া দু'জনকে অভিন্ন ভাববার আর কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তবে ইউসুফ খানকে কেন্দ্র করে দু'জনকে বড় জোর সমকালের বলে মনে করা যেতে পারে।

এবার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের সন্ধান করা যাক। কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ইউসুফ খানকে 'রাজরত্ন, রাজেশ্বর (রাজস্বর), নায়ক ও সুনায়ক' বলে অভিহিত করেছেন। এতেই আমাদের অনেকের মনে আশা জেগেছে, হয়তো বা ইনি গৌড়ের সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র (১৪৫৯-৭৬ খ্রী:) সন্তান ইউসুফ খান। ডক্টর সুকুমার সেন ইউসুফ খানকে কোনো জমিদার বলে অনুমান করেছেন। এ অনুমানের পেছনে যুক্তিও রয়েছে। গত শতকের এমনি সময়ে কক্সবাজারের রামু থানার অন্তর্গত মিঠাসরাহ গাঁয়ের জমিদার আলী হোসেন চৌধুরী (জন্ম ১৮১৫—মৃত্যু ১৮৬৬ খ্রী:) কবি-পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর আশ্রয়পুষ্ট চারজন কবির সন্ধান জানি। এঁরা এই সাধারণ বিত্তশালী ব্যক্তিকে তোয়াজের ভাষায় 'নৃপতি, সুলতান, শাহা, রাজেশ্বর' প্রভৃতি বলে অভিহিত করেছেন।[৪] পড়ে কারুর বুঝবার সাধ্য নেই যে আলী হোসেন একজন সাধারণ ধনী মাত্র। তোয়াজ-তোষামোদের ভাষায় চিরকালই এমনি বাড়াবাড়ি থাকে। কৃষ্ণনগর-নাটোর-বর্ধমানের সামন্ত জমিদাররা চিরকাল যে-সব বিশেষণে বিভূষিত হয়েছেন, তাতে মনে হবে মর্যাদায় ও দাপটে তাঁরা দিল্লীর বাদশাহ্‌রও বড়। তোয়াজস্তুতির রেওয়াজ মতো

১. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, ১ম সং, (১৩৩৮—১৫৩৮ খ্রী:) ২য় খণ্ড—পৃ: ১২২।
২. দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন পৃ: ২১৫।
৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম পৃ: ১৯৫।
৪. বাঙলা সাহিত্যের প্রতিপোষক—বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৬ সন।

যে কেউ "সসাগরা পৃথিবীর" অধীশ্বর হতে পারেন। কাজেই ইউসুফ খানের কোনো জমিদার হওয়া অসম্ভব নয়।

অপর পক্ষে ইউসুফ খানকে গৌড়ের শাহজাদা বলেও অনুমান করা যায়। যেমন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক[১] প্রমুখ করেছেন।

ক. 'ইউসুফ খান' নাম থেকেই বোঝা যায় তিনি তখনো শাহ্ হন নি।

খ. ইউসুফ তখনো যুবরাজ বলেই গৌড় দেশ বা রাজ্যের উল্লেখ নেই। এবং এ কারণেই তাঁকে সুনায়ক, রাজরত্ন ও রাজেশ্বর আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে, —গৌড়াধিপ বা সুলতান প্রভৃতি যথার্থ রাজযোগ্য উপাধি প্রযুক্ত হয় নি। কেন না যে-কোনো জমিদার ও সুলতানের পারিষদ রাজা, মহারাজা, রাজরত্ন বা রাজেশ্বর উপাধি পেতে পারতেন যেমন হিন্দু সামন্ত ও পারিষদরা চিরকাল পেয়েছেন। কাজেই উক্ত সব শব্দ সার্বভৌমত্ব (sovereignty) জ্ঞাপক নয়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচয়িতা গুণরাজখান মালাধর বসু[২] ও রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস ওঝা[৩] রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র (১৪৫৯—৭৬ খ্রীঃ) প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন। কাজেই অনুমান করা যায় পরমত-সহিষ্ণু উদার-হৃদয়[৪] পিতা বারবক শাহ্ যখন দুই হিন্দু কবি দিয়ে দু'জন অবতারের (কৃষ্ণ ও রাম) মাহাত্ম্যকথা রচনা করিয়েছিলেন, তখন বিধর্মদ্বেষী ও স্বধর্ম-নিষ্ঠ[৫] পুত্র ইউসুফ খান পিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রসুল-মাহাত্ম্য লিখবার জন্যে কোনো এক বাঙালী কবি জয়েনউদ্দীনকে প্রবর্তনা দিয়েছিলেন। কবির ভণিতা দেখে মনে হয়, কবি নিজে ইউসুফ খানের সভায় তাঁর কাব্য পড়ে শুনাতেন।

১. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ৬০—৬২।

২. ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ), ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১২৩।

খ. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮—২৫৩৮ খ্রীঃ), সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১০২।

৩. ক. ঐ— পৃঃ ১০২।

খ. কৃত্তিবাস—সুখময় মুখোপাধ্যায়।

গ. History of Bengali literature : Dr. Sukumar Sen, p. 68.

৪. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮—১৫৩৮) : সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ—১৭/১, ১১৯।

৫. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩—১৫৩৮) : সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১২১।

আমাদের এ অনুমানের স্বপক্ষে আরো একটি নজির আছে। পিতা পরাগল খান যখন কবি পরমেশ্বরকে দিয়ে মহাভারত সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়েছিলেন, তখন পুত্র ছুটি খান[১] শ্রীকর নন্দীকে নিযুক্ত করেছিলেন অশ্বমেধ পর্ব রচনায়। কাব্যের গোড়ার দিকে যে-আট পাতা নেই, তাতে হয়তো পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় প্রসঙ্গে গৌড় ও গৌড়রাজদরবারের বর্ণনাও ছিল। কাজেই শাহ্‌জাদা ইউসুফ খানের আগ্রহে 'রসুলবিজয়' রচিত হওয়ার সম্ভাব্যতাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আবার এই ইউসুফ খান যদি তাজখান কররানীর পুত্র, আত্মীয় বা সহযোগী হন, তাহলেও এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৫৭-৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। এ. তি. এম. রুহুল আমিনের মতে ইউসুফ খান তাজ খানের (১৫৬৪-৬৫) পুত্র।[২]

১. অতএব, ইউসুফ খান যদি কোন জমিদার হন এবং ভাষার অর্বাচীনতায় যদি গুরুত্ব দিই, তা হলে জয়েনউদ্দীনকে আঠারো শতকের কবি বলে মানতে হয়।

২. আর যদি ইউসুফ খান তাজ খানের পুত্র হন, তা হলে জয়েনউদ্দীন ষোল শতকের মধ্যকালের কবি।

৩. পীর মীর কবি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য কবি মুহম্মদ খান (১৬৪৬ খ্রীঃ) যদি জয়েন উদ্দীনের পীর হ'ন, তাহলে 'রসুল বিজয়' কাব্য সতেরো শতকের তৃতীয় পাদে রচিত। অবশ্য এ নিতান্তই অনুমান। ইনিই জয়েন উদ্দীনের পীর হলে পীরস্তুতিতে পীরের কবি খ্যাতিরও উল্লেখ থাকত।

৪. আর যদি ইউসুফ খানকে গৌড়ের সুলতান-পুত্র বলে স্বীকার করি, তা হলে জয়েনউদ্দীনের কাব্যরচনার কাল ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দ। এবং তখন এও মানতে হবে যে রসুলবিজয়ের পূর্বে ১৪৭৩—৭৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা শুরু হলেও ওটি সমাপ্ত হয় [১৪৮০ খ্রীঃ] রসুলবিজয় কাব্য রচিত হওয়ার পরে। সুতরাং রসুলবিজয়ই বারবক শাহর আমলের আদি গ্রন্থ। অবশ্য 'কৃত্তিবাসী রাম পাঁচালী' যদি তাঁর আমলের প্রথম গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি পায়, তা হ'লে 'রসুলবিজয়' হবে দ্বিতীয় গ্রন্থ। আর সেক্ষেত্রে এটিই আদি জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্যও।

। বিজয় কাব্য ।

আমাদের আগের অনুমান অনুসারে 'রসুলবিজয়' বিজয়কাব্যেরও আদি হয়ে দাঁড়ায়; যদিও ডক্টর সুকুমার সেন বলেন "বিজয়কাব্য" মানে দেবতার জয়যাত্রা

---

১. ডক্টর সুকুমার সেনের মতে শ্রীকর নন্দীর আদেষ্টা পরাগল—তাঁর পুত্র ছুটি খান নন। বাঃ সাঃ ইঃ (পূর্বার্ধ), পৃঃ ২৫১।

২. মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৭১ সন, পৃঃ ৭১০।

বা জয় কাহিনী। কল্যাণের দিক দিয়া দেখিলে 'মঙ্গল', ভক্তির চোখে দেখিলে বিজয়। মঙ্গল ও বিজয় দুই স্বতন্ত্র কাব্য বলিয়া ধারণা করা অত্যন্ত ভুল।"[১] 'গমন বা যাত্রা' অর্থে 'বিজয়' শব্দের ব্যবহার সুপ্রাচীন। বিজয়াদশমীও দেবীর যাত্রা বা গমন অর্থে ব্যবহৃত। বৈষ্ণব সাহিত্যে এ অর্থে বিজয় বহুল ব্যবহৃত। যেমন 'নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়। বিজয় যেন করিলা নন্দ ঘোষের বালা'। 'জয় জয় বিজয় কুঞ্জে কুঞ্জর বরগামিনী।'

সৈয়দ সুলতান তাঁর নবীবংশের 'ওফাৎ-ই-রসুল' অংশে প্রতিনিধি কিংবা উত্তরাধিকারী অর্থে 'বিজএ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন, ''তানে (আবুবকরকে) আহ্মি আপনার 'বিজএ' করিল/পালিবা আহ্মার বাক্য রাজা তানে দিল।' পাঠান্তরে 'তানে আপনার মুই 'বিজএ' করিলুম/পালিবারে জগৎ তানে ভার দিলুম।'

কিন্তু কোনো কোনো কাব্যে বিশেষ করে মুসলিম রচিত কাব্যে 'বিজয়' শব্দটি সামান্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামের পুরো অর্থ-সঙ্গতি রয়েছে; অতএব মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ-বিজয়, কবি মুকুন্দের জগন্নাথবিজয়, মীর ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় ও সত্য-পীরবিজয় কিংবা কবিশেখরের গোপালবিজয় কাব্যের নাম ডক্টর সুকুমার সেনের সংজ্ঞানুগ হলেও জয়েনউদ্দীন, শাবিরিদ খান ও শেখ চাঁদের রসুলবিজয় ও বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পাণ্ডববিজয় এবং ফয়জুল্লাহ্র গাজীবিজয়-এ 'বিজয়' শব্দটি আক্ষরিক অর্থেই প্রযোজ্য ও প্রযুক্ত।

কেউ কেউ মনে করেন 'বিজয়' নামের মোহে পড়েই পরবর্তী কবিগণ কাব্যের নাম 'বিজয়' রাখেন। এতে কিছু সত্য আছে বলে মনে করি। কেননা আমরা দেখেছি গত শতকের—'নীলদর্পণ' নামের অনুকরণে বহু দর্পণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর আগেও 'রঘুবংশ' নামের অনুস্মৃতি পাই 'হরিবংশ' ও 'নবীবংশ'-এ। এ ভাবে আমরা 'রসুলবিজয়' (তিনটি), শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোপালবিজয়, গোপীনাথ-বিজয়, গৌরাঙ্গবিজয়, পাণ্ডববিজয়, গাজীবিজয়, গোরক্ষবিজয়, মনসা-বিজয় প্রভৃতি পেয়েছি। এরূপ বহুল প্রযুক্ত আরো দুটো নাম পাই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে—একটি 'মঙ্গল' অপরটি 'চরিত।'

। জীবনী সাহিত্য ।

আবার এই রসুলবিজয় দিয়েই বাঙলা ভাষায় চোখে দেখা রক্ত-মাংসের মানুষের জীবন-কথা বা চরিত-কথা লেখারও শুরু। এ ধরনের রচনাকে বলা চলে

---

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ), পৃঃ ১০৩।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কাল্পনিক রূপায়ণ বা অনৈতিহাসিক জীবন-চিত্র। দ্বিতীয় স্তরে চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলোতে লৌকিক ও অলৌকিক এবং সত্য ও কল্পনার সমতা রক্ষিত হয়েছে।

। কবির নিবাস ।

কবির ভণিতায় প্রকাশ তিনি স্বয়ং ইউসুফ খানকে তাঁর কাব্য পাঠ করে শুনাতেন। ইউসুফ খান যদি গৌড়ের শাহজাদা হন, তা'হলে কবি গৌড়বাসী বা গৌড়প্রবাসী ছিলেন। রসুলবিজয়ের একটা চরণে আছে—"পদ্মাকূল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ।" এ উৎপ্রেক্ষা থেকে মনে হয় নদীবহুল বাঙলা দেশে পদ্মাই কবির বিশেষ পরিচিত ছিল। সুদীর্ঘ পদ্মার কোন্ তীরে কোন্ অঞ্চলে তাঁর নিবাস ছিল, তা অনুমান-সাধ্য নয়। আবার কাব্যে 'হমাইতে, উয়াস, থু, থোন, ধাবাম, বুড়তি, আতাক্ষ্যা, পোলাদি প্রভৃতি বিশেষভাবে চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দও রয়েছে।

অনুমানের অশ্ব ছুটিয়ে অনেক দূর এগুলাম। যা কিছু সম্ভব সব তুলে ধরেছি। কিন্তু তথ্য-প্রমাণ না মিললে ইতিহাস কিছুই গ্রাহ্য করে না, সে দিক দিয়ে এ পণ্ডশ্রম মাত্র। তবু তথ্য-নির্ধারণে এগুলো কিঞ্চিৎ দিশা দিতেও পারে, এ ক্ষীণ আশা রইল। নিঃসংশয়ে তথ্য-প্রমাণ যোগে সত্য নিরূপণ করতে হলে 'রসুলবিজয়'-এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি কিংবা অন্য কোনো সূত্রে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া প্রয়োজন। নইলে ইতিহাস-গ্রাহ্য কিছুই নিশ্চয় করে বলা যাবে না।

। কাব্যের বিষয়বস্তু ।

হযরত মুহম্মদের সঙ্গে ইরাকরাজ জয়কুমের লড়াই-ই এ কাব্যের বর্ণিত বিষয়। এটি যে ঐতিহাসিক কোনো যুদ্ধ নয়, তা কাকেও বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। সৈয়দ সুলতানও তাঁর 'নবীবংশে' এ যুদ্ধ কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এ কাহিনী 'জয়কুম রাজার লড়াই' নামে একটি স্বতন্ত্র পুথিরূপেও চালু ছিল। শাহ বারিদ খানের 'রসুলবিজয়ে'র বিষয়ও এ লড়াই। 'মুসানামা'র কবি মুহম্মদ আকিলেরও এ নামের একটি রচনা রয়েছে। ফারসীতে এবং উর্দুতেও এঁদের কিসসা রয়েছে। জয়কুম সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি নাকি ইরাক কিংবা আরমেনিয়ার রাজা ছিলেন।[১] বাঙলা কাব্যে বর্ণিত এ যুদ্ধ হয়তো

১. Brumhardt : Zaqqum, king of Armenia. কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'জঙ্গনামা' ও 'জঙ্গনামা-ই-পাদশাহ-ই জকুম' নামে দুটি ফারসী পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

ফারসী কাব্যের স্বাধীন অনুসৃতি বা অনুকৃতি। জয়েনউদ্দীন, সৈয়দ সুলতান ও শাহ বারিদ খানের বর্ণনায় তাই সাদৃশ্য অনেক।

হযরত মুহম্মদ জীবনে অনেক যুদ্ধেই নেতৃত্ব দিয়েছেন, কোনো কোনো যুদ্ধে তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করেছেন। বদর, ওহুদ, খয়বর প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে 'জঙ্গনামা' রচিত হয়েছে। 'জঙ্গনামা' নামটি আজকাল বাঙলায় যোগরূঢ় হয়ে উঠেছে এবং 'জঙ্গনামা' বলতে সাধারণত কারবালা কাহিনীই নির্দেশ করে। মূলত যে-কোনো যুদ্ধ-কাহিনীই ফারসীতে 'জঙ্গনামা' নামে পরিচিত। আমাদের খোন্দকার নসরুল্লাহর 'জঙ্গনামা'টি হযরত আলীর দিগ্বিজয় বিষয়ক।

সেকালে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ছিল বহির্মুখী। তারা জৈব ও মানস প্রয়োজনে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উত্তেজনা খুঁজত বাহ্য ঘটনায়। সেকালের রচনাও তাই বস্তুমুখী (objective)। সেকালের সাধারণ লোক ইতিহাস পড়ত না, রূপকথা, ইতিকথা ও কিংবদন্তীই তাদেরকে ইতিহাসপাঠের ফলশ্রুতি দান করত। সেদিনের কল্পনা-প্রিয় মানুষের কাছে যুক্তি ও বুদ্ধির মূল্য বেশী ছিল না; মনের প্রবণতাই তাদের জীবন-প্রয়াসে প্রেরণারূপে কাজ করত। রূপকথার যুগের পরে সাধারণ লোকের উত্তেজনা ও উদ্দীপনার উৎস হল যুদ্ধ। এর মধ্যে যে thrill বা রোমাঞ্চ আছে, তা সে-যুগে আর কিছুতেই মিলত না। তাই যুদ্ধের বর্ণনা এযুগে আমাদের কাছে একঘেঁয়ে, নীরস ও অসহ্য লাগলেও সেকালের শ্রোতার পক্ষে উপভোগ্য ছিল। এ জন্যেই সুরাসুরের যুদ্ধ দিয়ে শুরু হয়ে রূপকথার রাজপুত্রের লড়াইতে তা শেষ হয় নি, রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডেসী, শাহনামা প্রভৃতি দুনিয়ার সব প্রখ্যাত গ্রন্থেরও উপজীব্য হয়েছে। আসলে দ্বন্দ্ব-সংঘাতেই যে জীবনানুভূতির স্ফূর্তি, তা মানুষ গোড়া থেকেই অবচেতন মনে উপলব্ধি করেছে। নানা ক্রীড়ার মাধ্যমে আমরা এই দ্বান্দ্বিক জীবনই কৃত্রিমভাবে উপভোগ করি। যুদ্ধ ও adventure হল এর বাস্তব পন্থা, আর 'ষড়যন্ত্র ও মামলা' হল ইতর পন্থা, মধ্য পন্থা হচ্ছে প্রতি-যোগিতা। তাই আগেকার দিনে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ লোকের এত প্রিয় ছিল। এ যুগের আগে যুদ্ধ কোনোকালেই ঘৃণ্য ছিল না বরং মহান জীবন-চর্যার অবলম্বন ছিল। অকাতর যোদ্ধাই ছিল বীর। জনগণের সম্মান-শ্রদ্ধা, প্রীতি-ভীতি ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক ছিল সে। বসুন্ধরা আজো বীরভোগ্যা। তা ছাড়া অজ্ঞতাবশে সে-কালের মানুষ ছিল অতি মাত্রায় কল্পনাপ্রিয়, দৈবনির্ভর ও স্বাপ্নিক। তাদের মনোজগতে বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট। যুক্তি-বুদ্ধির প্রভাব ছিল সামান্য। তাদের কাছে রূপকথা মনে হত বাস্তব আর বাস্তব ঘটনাও তাদের বর্ণনায় হয়ে উঠত রূপকথা। কেননা তারা ভূত-প্রেত-দেও-দানুতে বিশ্বাস রাখত, ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক ও

দারু-টোনাতে ভরসা পেত। রোগে-শোকে, সুখ-সৌভাগ্যে ও দুর্যোগে-দুর্দিনে তারা অনুভব করত অলৌকিক শক্তির অদৃশ্য হাতের লীলা। এর ফলে তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের প্রসার ছিল ত্রিভুবন ব্যাপী। সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন ছিল না মনে। তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতিচ্ছবি পাই তাদের আচরণে ও সাহিত্যে। বিমানে চড়ার পর আজকের কেউ পক্ষীরাজ ঘোড়ার কল্পনা করবে না, মেঘদূত-পবনদূতের কর্তব্য ভার নিয়েছে সরকারী ডাক ও তার বিভাগ। আজকের দিনে কল্পনার ক্ষেত্র হয়ে গেছে নিতান্ত সংকীর্ণ। মানস-উদ্ভাবনের বস্তুও হয়েছে দুর্লভ। মানুষের কোন আচরণ কিংবা মানস অভিব্যক্তিই স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক প্রভাব বিযুক্ত নয়। কাজেই সেকালীন সাহিত্যে সমকালের মানুষের বিশ্বাস-ভরসা, ভয়-ভাবনা, আশা-আরজু ও ভাব-কল্পনার আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে। সে-সাহিত্য তাদের জীবন-মুকুর। আজ আমরা তাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি অনেক দূর। ব্যবধান এমনি দুস্তর হয়ে উঠেছে যে অনেক ব্যাপারেই তাদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্ব মুছে গেছে, এমন কি স্বাজাত্যবোধও হয়ে উঠেছে আবছা। তাই তাদের কালের সত্য ও তথ্য আমাদের কাছে আজগুবী। মাটির মায়াসক্ত, বস্তুনিষ্ঠ, মনস্তত্ত্বপ্রিয়, যুক্তিবাদী ও জীবনরসিক আজকের পাঠক সেকালীন সাহিত্যের অলৌকিক-অবাস্তব জগতে বিচরণ করতে যেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। সেকালীন বিস্ময়বোধ আমাদের উপহাসের সামগ্রী, সেকালের রোমান্টিক ভাব-কল্পনা আমাদের চোখে অজ্ঞ অপরিণত মনের হাস্যকর বিলাস মাত্র! তাদের স্থূলতা পীড়াদায়ক, তাদের অজ্ঞতা অনুকম্পা প্রত্যাশী, তাদের প্রত্যয়-ঋজু উক্তি নিদারুণ অর্বাচীনতা; তাদের আন্তরিকতায় উজ্জ্বল বর্ণন-ভঙ্গীও মনে হয় বালভাষণের মতো তুচ্ছ। শালীন সাহিত্য হলেও তা লোকায়ত। কেননা, মনন সৌন্দর্যে ও সূক্ষ্মতায় সাহিত্য তখনো বিচিত্র ও অসামান্য হয়ে ওঠে নি।

আর একটি কথা, মানুষের প্রবৃত্তিতেই নিহিত রয়েছে অতি-ভাষণের বীজ। তার নিদর্শন পাই তার ভাষায়, তার অলঙ্কার প্রয়োগ-প্রবণতায় ও বাগ্বিধিতে। এই বাড়াবাড়ির ফলে এক বস্তু-নামের অনেক প্রতিশব্দ তৈরী হয়েছে, যাদের সঙ্গে বস্তু-স্বরূপের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। অথচ রূপে কিংবা গুণে সাদৃশ্য ও অভিন্নত্ব কল্পনা করা হয়েছে। এ ভাবেই চাঁদ হল শীতাংশু, সুধাংশু, সুধাকর, শশোদর, শশধর, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক ইত্যাদি। মানুষের এই অতিভাষণেই তো কাব্য-কবিতার জন্ম!

তেমনি নিন্দায় কিংবা প্রশংসায় মানুষের একই বৃত্তি বা প্রবৃত্তির ভিন্নমুখী প্রকাশ ঘটে। শ্রদ্ধা বা ঘৃণা মানুষকে অতিকথনে এবং দোষগুণের বিকৃতি সাধনে প্রবর্তনা দেয়। ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশয্য যেমন অতিভাষণের প্রবণতা জাগায়, তেমনি

ঘৃণা বা অবজ্ঞার আত্যন্তিকতা তিলকে তাল করে দেখার প্রেরণা যোগায়। ফলে মিথ্যা ভাষণ, অতিরঞ্জন ও তথ্যের বিকৃতি সাধন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ভক্তের অভিভূতির গভীরতা যেমন মনোময় কল্পনার প্রশ্রয় দেয়, বিদ্বেষের তীব্রতাও তেমনি মনগড়া দোষের ফিরিস্তি বাড়ায়। লোক-চরিত্রের এই প্রবণতা শ্রদ্ধেয় জনকে করেছে অতি-মানুষ আর ঘৃণ্যজনকে বানিয়েছে অমানুষ। একারণে মানুষের ইতিহাস, চরিত-কথা ও কিংবদন্তী যুক্তি-বুদ্ধি, বাস্তব-অবাস্তব এবং সম্ভব-অসম্ভবের সীমা পেরিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপকথাকেও হার মানায়। ভক্ত ও বিদ্বিষ্ট মনের স্তুতি-নিন্দার চোটে সত্য গেছে সরে, মানুষের ইতিহাস হয়েছে বিকৃত; সত্যসন্ধ হয়েছে বিড়ম্বিত। সভ্যতা হয়েছে অর্থহীন।

এজন্যেই ফকীর-দরবেশ ও সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তি নির্বিচারে স্বীকৃত হয়। আমাদের দেশেই প্রায় পাঁচিশ' বছর আগের মানুষ কৃষ্ণগত প্রাণ বিশ্বম্ভর মিশ্র কৃষ্ণাবতার রূপে অপ্রাকৃত বিভূতিতে ভূষিত হয়েছেন। এ যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবশক্তি এবং অরবিন্দের যোগ-বিভূতির কথা পল্লবিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে। তেমনি রসুলের জীবৎকালেই তাঁর নবুয়ত ও ওহিপ্রাপ্তি এবং এ দুটোর অঙ্গীকার স্বরূপ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করণ ও মে'রাজ ছাড়াও তাঁর আরো নানা মোজেজার কথা ভক্তসমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেগুলো তাঁর চরিতগ্রন্থে, এমনকি সহি হাদিসেও ঠাঁই পেয়েছে। যেমন, আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর বলেছেন, একদিন হযরত মুহম্মদ একটি বকরীর কলিজা ও গোস্ত ১৩০ জন লোককে খাওয়ালেন এবং তারপরেও কিছু অবশিষ্ট ছিল।[১] গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ সম্বন্ধেও রয়েছে এমনি কাহিনী।

কাজেই উত্তরকালে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে তার অতিমানবিক শক্তির কাহিনীও বক্তার রুচি, বুদ্ধি, খেয়াল ও প্রয়োজন মতো কলেবরে ও সংখ্যায় বাড়তে থাকবে এ-স্বাভাবিক।

আগেই বলেছি, হযরত মুহম্মদ জীবনে ছোট বড় অনেক যুদ্ধেই উপস্থিত ছিলেন। কোনো কোনো লড়াইয়ে তিনি অংশও গ্রহণ করেছেন। সেই সূত্র ধরেই রসুলবিজয় কাব্যগুলোতে তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে দিগ্বিজয়ী ইসলাম প্রচারকরূপে, বাস্তবের ক্ষীণসূত্র ধরে বোনা হয়েছে উপকথার জাল। আরব দেশ অনেক দূরে, রূপকথার ভাষায় বলা চলে সাত-সমুদ্রের ওপারে। তাই সে-দেশের মানুষের জীবন, জীবিকা ও আচার সম্বন্ধে এ দেশের লেখকগণের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কাজেই

১. তজরীদুল বুখারী—বাঙলা একাডেমী, হাদিস সংখ্যা—১১৫৭, পৃঃ ৪৯৩।

এঁদের কাব্যে আরবীয় পরিবেশ অনুপস্থিত। মরুভূ আরবের বিনামে তাঁরা অজ্ঞাতে দেশী আবহই তৈরী করেছেন। তাই আরবেরা ভাত খায়, ছেলের নাম রাখে রত্ন, লড়াই করে ভারতীয় অস্ত্রে; আর চতুর্বেদ তাদেরও ধর্মগ্রন্থ। মাছের ব্যবসাও চলে সেখানে।

বলাবাহুল্য, রসুলবিজয় মৌলিক কাব্য নয়। তাই বলে অনুবাদও নয়। পূর্ববর্তী কোনো ফারসী কাব্যের স্বাধীন অনুসৃতি। কবি বলেছেন: পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে—

১. "বিস্তর আছিল যুদ্ধ কিতাবে লিখন
কিঞ্চিত লিখিল লোকে জানিতে কারণ।"

২. তেকারণে না লিখিল সে সব কথন
কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে কহি শুন গুণিগণ।

৩. যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গে:

ক. সে সব কহিতে বাড়ে পুস্তক বহুল।

খ. পুস্তক বিশাল দেখি না লেখিল আন।

এই লড়াইয়ে চার খলিফা, হাসান-হোসেন, হানিফা প্রভৃতি সব বীরই যোগ দিয়েছেন। তবে আলীই প্রধান যোদ্ধা। মধ্যযুগের সাহিত্যে মোহাম্মদ হানিফার খুব নাম-ডাক। ইনি আলীর স্ত্রী হানুফার গর্ভজাত পুত্ররূপে পরিচিত। সাহিত্যে এ সম্পর্ক নিঃসংশয়ে স্বীকৃত এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ইতিহাসেও সমর্থিত।[১] ইনি খলিফা আবদুল মালেকের সময়ে রাজনীতিতে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এই সূত্রে তিনি কালে নানা উপকথার পাত্ররূপে লোকশ্রুতিতে প্রখ্যাত হয়ে যুদ্ধ-কাব্যের নায়ক হয়েছেন। হযরত আলীর,তাঁর পিতৃব্য হামজার ও পুত্র হানিফার বীরত্ব ও দিগ্বিজয় কাহিনী পরিকীর্তিত হয়েছে আরবী, ফারসী, উর্দু ও বাঙলা ভাষার বিপুল সংখ্যক কাব্যে। অবশ্য সবই বানানো। আগেই বলেছি যুদ্ধকাব্য নানাকারণে লোকপ্রিয় ছিল। তাই এর এত প্রসার। বস্তুমুখী (objective) কাব্যে তথা বর্ণনাত্মক ও কাহিনী মূলক (descriptive and narrative) রচনায় ঘটনার চমক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটানোর জন্যেই এত অদ্ভুতের সমাবেশ।

ইসলামের উন্মেষ যুগের এসব বিজয় কাহিনী রচনার সময় কবিদের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠাকালীন ঘটনা ও চিত্র। তাই কাফের মাত্রেই হিন্দু, রাজাও হিন্দুর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এসব যুদ্ধা-

১. Annals of the Early Caliphate by S. W. Muir, p. 414.

ভিযানের মূলে ধন বা রাজ্য লোভ নেই, আছে কেবল আল্লাহর নাম প্রচার ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস। তাই বশীভূত বা পরাজিত কাফের নৃপতি সপ্রজা ইসলাম কবুল করলেই তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে বিনাশর্তে। এ সূত্রে আরো একটি কথা উল্লেখ্য, এক হাতে কোরআন ও অপর হাতে তরবারী নিয়ে মুসলমানরা ইসলাম প্রচার করেছে বলে যে-কথা চালু আছে, একালের মুসলমানরা তা বিধর্মীর বিদ্বিষ্ট মনের তৈরী বলেই জানে। অথচ দেশ-দুনিয়ার এক শ্রেণীর মুসলমানও একেই মুসলিম জীবনের গৌরবময় আদর্শ ও নৈষ্ঠিক ব্রত বলে প্রচার করতে দ্বিধাবোধ করে নি। তার প্রমাণ রয়েছে রসুলবিজয়, আমীরহামজা, (আলীর) জঙ্গনামা, হানিফার লড়াই, জৈগুনের কেচছা, সোনাভান প্রভৃতি কাব্যে। নিন্দা কিংবা প্রশংসা করতেও যে যোগ্যতার প্রয়োজন, নইলে তা যে ব্যাজস্তুতি হয়ে দাঁড়ায়, এ-ই তার প্রমাণ।

। ছন্দ ।

জয়েনউদ্দীনের ছন্দবোধ সুষ্ঠু নয়। পয়ার অনেক ক্ষেত্রে অসমাক্ষর। ত্রিপদীও ক্বচিৎ তাই।

১. পদান্ত মিলের অভাব :

মনেতে গৌরব ধরি আশীর্বাদ কৈলা নবী
প্রশংসিয়া দিয়া সম্ভাষণ।

২. র-ল পদান্ত মিল :

ক. ইমান আনিয়া তবে কহে জোনাবীল
আজ্ঞা দেঅ মহাশয় করিতে সমর।

খ. চলি যায় ইমাম আলি হইয়া যে স্থির
মওতের কালে তোরে না করিলুম কবুল।

এ ছাড়া চাহে, নহে, কহে, প্রভৃতির সঙ্গে 'উড়াএ, ভএ, চলএ'-এর মিল অন্যান্য কবির মতো ইনিও দিয়েছেন।

ভাষায় ব্যাকরণগত কোন উল্লেখ্য প্রাচীনতা নেই।

। কাব্যালোচনা ।

যুদ্ধ-কাব্যে কবিত্ব প্রকাশের অবকাশ কম, তবু কাব্যের স্থানে স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য দুর্লভ নয়। কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি :

১. লেখাচিত্র :

ক. অঙ্গুলী পরশি ওষ্ঠ হইলা চিন্তিত।

খ. সিংহ ব্যাঘ্র চমকিত ধাএ কর্ণ তুলি।

গ. রুহিত বরণ হৈল দোহান বদন
দ্বিজরাজ মিশি যেন উদিত তপন।

ঘ. কণ্ঠে চিবুক দিয়া নাসা দিষ্টি ধেয়াইয়া ইত্যাদি।

ঙ. তা দেখিয়া বীরবরে খেদিয়া খেদিয়া মারে
যেন সব বরাহের গতি।

২. বীরের শপথ :

পাষাণেত রেখা রাখ প্রভাত সমএ দেখ
সব সৈন্য করিমু সংহার।

৩. যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা :

ক. আছিল লক্ষ গজ তার কলেবর
কুম্ভকর্ণ সম দৈত্য মূর্তি ভয়ঙ্কর।

খ. কি রাম যুদ্ধ কিবা পাণ্ডবের রণ
হেন মল্লযুদ্ধ না দেখিছি কদাচন।

গ. যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার
গদা তুলিল দেখি ধাইত সত্বর।
কিবা কৃপাচার্য যে বিরাট অভিমন্যু
সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য।

ঘ. যদি বা পড়এ পুত্র পিতৃএ তারে দেখি
আর মুখা হই ধাএ আপনাকে রাখি।

৪. উপমাদি অলঙ্কার :

ক. কেহ কেহ বোলে এই নহে পদাঘাত
আকাশ বিদারি যেন হইল বজ্রপাত।

খ. গরুড় সদৃশ শর বিদ্যুৎ সঞ্চার

গ. [দুলদুলকে] গরুড় সদৃশ দেখি নাগ বেয়াকুল।

ঘ. ব্রহ্ম সম তেজবন্ত মৃগেন্দ্র সমান।

ঙ. আনলের মাঝে যেন পতঙ্গ জলি মরে।

চ. দুগ্ধ দিয়া কাল সর্প ঘরেত আনিলা।

ছ. দেখিলাম অসিধার ফণীসম দুই জিহ্বা তার।

জ. কুলিশ-বিধানে অশ্ব সুসজ্জ করিয়া।

ঝ. সিংহের সৌরভে যেন পলাএ কুরঙ্গ।

ঞ. গদাগদা ঘরিষণে উল্কা পড়ে খসি
দীপ্তিমান হই গেল অন্ধকার নিশি।

ট. ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ
পদ্মাকুল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ।

ঠ. হেনকালে দিনমণি তিমির ভক্ষিয়া পুনি
প্রকাশে আকাশ উপর।

ড. সৃষ্টি নষ্ট হৈল রক্ত-স্নান কৈল ক্ষিতি।

এবার পুথির অন্তরের কিছু পরিচয় দিচ্ছি :

জয়কুম রাজার দূত যখন আপত্তিকর ভাষায় হযরত মুহম্মদকে রাজার বাণী জানাল, তখন :

এই কথা শুনি নবী কহিতে লাগিলা
অনল বরণ হই গর্জিয়া উঠিলা।
কোটলা তুড়িয়া আলি করিব বাদশাই
অন্দরেত যাই আলী জব' করিব গাই।
অন্দরেত যাই আলী জব' করিব গরু
সেই শের-খোন দিমু তোমার রাজার জরু।
কলিমা পড়াইয়া সব ভজাইমু জিগির
বলি হীন শাস্ত্র পূজা না রাখিমু ফিকির।

এ কথাগুলোতে মুসলিমবিজয় কালীন ঘটনার আভাস আছে। সসৈন্যে রসুলের যুদ্ধযাত্রা :

কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ দিব্য রথে
সুসজ্জ হইলা সব সংগ্রাম করিতে।
তার পাছে সুসজ্জ হইলা নবীবর
আকাশে উদিত যেন হইল শশধর।
ধবল অশ্বেতে নবী আরোহিলা যবে
আকাশের মেঘে ছায়া ধরিয়াছে তবে।

নিঃসরিলা নবীবর সঙ্গে অশ্ববার
প্রচণ্ড মৃগেন্দ্র যেন সাতাইশ হাজার। ..
চলিল সকল সৈন্য করিয়া যে রোল
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিল্লোল।
পদধূলি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডল
তর্জিয়া গর্জিয়া রণে গেলেন্ত সকল।

একটি যুদ্ধের দৃশ্য :

পদাতিক পদধূলি ঢাকিল আকাশ
দিনে অন্ধকার, নাহি রবির প্রকাশ।
গজে গজে যুদ্ধ হৈল দন্ত পেশাপেশি
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হৈল দুই মেশামেশি।
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ
বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন।
অস্ত্রজালে ভরি গেল গগন মণ্ডল
বীরের গর্জনে ভূমি করে টলমল।
গদা গদা ঘরিষণে উল্কা পড়ে খসি
দীপ্তিমান হই গেল অন্ধকার নিশি।
খড়গ খড়গ যুদ্ধ করে উঠে খরখরি
ভিন্‌সূর্য হই যেন চমকে বিজুরি।
অন্যে অন্যে মল্ল করে হই জড়াজড়ি
বাঝিল তুমুল যুদ্ধ ভূমিতলে পড়ি।

মুসলমানেরা কাফেরদের বোঝাচ্ছে :

কৃপার সাগর নবী আসিছে নিকট
ঝাটে করি ভেট আসি তাহার নিকট।
তোহান কলিমা কহএ মন্ত্র জপএ
কোটি জন্মের পাপ সেইক্ষণে ক্ষএ। ..
কিথা চারি বেদ মধ্যে শাস্ত্র সব জান
কলিমা বাখান জান আছে তান স্থান।
বিলম্ব করহ কেনে কাফিরের গণ
অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ।

'অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ' —এ কথা বলবার সুযোগ করে নেবার জন্যেই দ্বিগ্বিজয়। কয়েকস্থানে সৈয়দ সুলতান ও জয়েনউদ্দীনের কাব্য ভাষায় ও বক্তব্যে প্রায় অভিন্ন। এ গায়েন-লিপিকরের দান কিংবা কবির অনুকৃতিজাত অথবা অভিন্ন-মূলের অনুবাদ প্রসূত তা' আপাততঃ বলা যাবে না।

সেকালের সাহিত্যের প্রায়-সব বৈশিষ্ট্যই রসুলবিজয় কাব্যে বর্তমান। অবশ্য আমরা চৌতিশা, বিলাপ প্রভৃতি পাইনি। পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত। কাজেই এগুলোও যে ছিল না, তা' জোর করে বলা যাবে না। 'রসুলবিজয়' কাব্যটি স্বধর্মনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও জাতীয় ঐতিহ্যগর্বী মানুষের এবং অদ্ভুত কল্পনাপ্রিয় স্বাপ্নিক মনের পরিচয় বহন করে। ইসলামের মর্মে অধিকার ছিল না এ সব লোকের, তাই ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি লোকায়ত স্থূলবোধের প্রতিচ্ছবি পাই এই শ্রেণীর কাব্যে। দিবসের কর্মে ক্লান্ত অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত লোকেরা রাত জেগে বহুকাল ধরে পরম আগ্রহে শুনে আসছে এ ধরনের কাহিনী। ইসলামের উন্মেষ কালের এ সব বীরত্ব ও মহত্ব জ্ঞাপক উপকথাই যুগ যুগ ধরে সাধারণ পাঠক ও শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী সংস্কৃতির একটি অমার্জিত অতি স্থূল বোধ ও রূপ। সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি হয় সমাজ কল্যাণ, তবে স্বীকার করতে হবে, এই শ্রেণীর কাব্য বাঙালী মুসলমানদের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভে সহায়ক হয়েছে।*

কাব্যের রচনাকাল বিতর্কিত বলেই আলোচনা দীর্ঘ করতে হল।

১৪
বিদ্যাপতি

ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণীর ভণিতায় কবি বিদ্যাপতি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,—সমস্ত প্রক্রিয়ালঙ্কৃত ভূপতিবর সমরবিজয়ী বীর শ্রীদর্পনারায়ণের আগ্রহে তিনি ব্যাড়ীভক্তি-তরঙ্গিণী রচনা করেছেন। তাঁর ভাষায় "ইতি সমস্ত প্রক্রিয়ালঙ্কৃত ভূপতিবর বীর শ্রীদর্পনারায়ণ দেবেন সমরবিজয়িনাজ্ঞাপ্ত শ্রীবিদ্যাপতি কৃতৌ শ্রীব্যাড়ীভক্তি-তরঙ্গিণ্যাস প্রমাণ তরঙ্গ প্রথমঃ। শ্রীব্যাড়ীচরণে মন্তক্তিরস্তু।"**

* মৎসম্পাদিত রসুল বিজয়, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৭০ সন।
** আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'ব্যাড়ী ভক্তিতরঙ্গিণী'তে বিস্তৃত আলোচনা (ইতিহাস পত্রিকা ১৩৭৫ সন, ঢাকা) দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল তথা জীবৎকাল নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি আজো। মুখ্যত লক্ষ্মণ সংবৎই এর জন্যে দায়ী। মিথিলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সংবৎ গণনার চারটি ভিন্ন রীতি ছিল ষোল-সতেরো শতক অবধি। মোটামুটিভাবে কোনটির সঙ্গে ১০৮০, কোনটির সঙ্গে ১১০৮, কোনটির সঙ্গে ১১১৯-২০ এবং কোনটির সঙ্গে ১১২৯ বছর যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ মেলে।[১]

আমরা বিদ্যাপতি-রচিত গ্রন্থে ও পদাবলীতে মিথিলার ও প্রতিবেশী রাজ্যের রাজপুরুষ, রানী ও রাজাদের নাম পাই। ভোগীশ্বর, গণেশ্বর, কীর্তিসিংহ, বীরসিংহ, ভবসিংহ, দেবসিংহ, হরসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, নরসিংহ, রাঘবসিংহ, ভূপতি সিংহ, রাজ বল্লভ, রুদ্রসিংহ, ধীরসিংহ, মিথিলারাজ ভোগীশ্বর-পত্নী পদ্মাদেবী, দেবসিংহ-পত্নী হাসিনী দেবী, শিবসিংহ-পত্নী লক্ষ্মীদেবী, পদ্মসিংহ-পত্নী বিশ্বাসদেবী, নারায়ণ-পত্নী মেনকা দেবী, রেনুকা দেবী, রাজা অর্জুন, চন্দ্রসিংহ, রূপিনী দেবী, ভূপতিনাথ, কংসনারায়ণ ও তৎপত্নী সুরমা দেবী, রাঘব সিংহ-পত্নী-স্বর্ণমতী দেবী, পুরাদিত্য লক্ষীনারায়ণ-পত্নী চন্দল দেবী প্রভৃতি এবং আরসালান, মালিক বাহারুদ্দিন, গিয়াসুদ্দিন, আলম শাহ, নসরত শাহ, ইব্রাহীম শাহ, হুসেন শাহ, ফিরোজ শাহ প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যের সুলতান ও রাজপুরুষদের নাম রয়েছে কবির গ্রন্থে ও পদাবলীতে।

ঐনবার বংশের কামেশ্বর-পুত্র রাজা ভোগীশ্বরই বিদ্যাপতির রচনায় প্রথমোল্লেখিত ব্যক্তি।[২] ভোগীশ্বর দিল্লীর তুঘলক সুলতান ফিরোজশাহর (১৩৫১-৮৮) সমসাময়িক ও প্রিয় বন্ধু ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন বিদ্যাপতি :

"ভোগী সরাঅ বর ভোগ পুরন্দর।...
পিঅ সখা ভণি পিঅরোজ সাহ সুরতান সমানল।"[৩]

এই ভোগীশ্বরের রাজত্বকালেই যে বিদ্যাপতি গান রচনা শুরু করেন, তার প্রমাণ—এঁর পূর্বেকার মিথিলার কোন রাজা বা রাজপুরুষের নাম মেলে না বিদ্যাপতির পদে। ভোগীশ্বরের পত্নীর নাম ছিল পদ্মাদেবী। বিদ্যাপতি বলেন :

১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : লক্ষ্মণ সংবৎ রহস্য : ১৯৫৮ পৃঃ ২১-৩২।

২. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী (২য় খণ্ড) : মহাকবি বিদ্যাপতির পদাবলী : বসুমতী সাহিত্য মন্দির : ১৩৪২ সন, পৃঃ ২১২, পদসংখ্যা ১৭।

৩. কীর্তিলতা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, পৃঃ ৪।

বিদ্যাপতি কবি গাবিআরে
তোঁকে অছু গুণক নিধান
রাউ ভোগিসর গুণ নাগরা রে
পদমা দেবী রমাণ।[১]

ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বরের সঙ্গে ২৫২ লক্ষ্মণ সংবতে আরসালান (আসলান) নামের এক রাজ্যলোভী তুর্কীর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে আরসালান পরাজিত হন। কিন্তু পরে এক সময় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এবং সে-সুযোগে আরসালান গণেশ্বরকে হত্যা ক'রে মিথিলার শাসক হন।[২] কীর্তিলতা সূত্রেই আমরা এ তথ্য জানতে পাই :

লখ্খন সেন নরেশ লিহিঅ জবে পখ্খ পঞ্চবে
তন্মুহমাসহি পঢ়ম পখ্খ পঞ্চমী কহি অজে।
রজ্জলুদ্ধ অসলান বুদ্ধি-বিক্কম বলে হারল
পাস বইসি বিসবাসি রাএ গএনেসর মারল।[৩]

এর থেকে আমরা দুটো বিষয়ে ইঙ্গিত পাই, ক. ২৫২ সংবতের তথা ১৩৮১ (২৫২+১১২৯) খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই ভোগীশ্বরের মৃত্যু হয় আর ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দের পরে কোন সময়ে গণেশ্বর আরসালানের হাতে প্রাণ হারান। খ. এবং ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই গান লেখার মতো বয়স হয়েছিল বিদ্যাপতির। অতএব বিদ্যা-পতির জন্ম হয় ১৩৬০-৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

---

১. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী (২য় খণ্ড), মহাকবি বিদ্যাপতির পদাবলী।

২. তীন সের বিহার চাপিন: কীর্তিলতা: পৃ: ৫০-৫১। - সাকসেনা। ১৩৭১ বা ১৩৮১ (২৫২ ল. সং) খ্রীস্টাব্দে যদি আরসালানের হাতে গণেশ্বর নিহত হন, তা হলে তাঁর সন্তানেরা ৩০ বা ২০ বছর পরে ইব্রাহিম শর্কীর সহায়তায় হৃতরাজ্য (১৪০১-০২ খ্রী:) উদ্ধার করেন। এত কাল পরে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের আকস্মিক প্রয়াসের নজির ইতিহাসে দুর্লক্ষ্য। কাজেই আরসালান ২৫২ ল. সংবতের (১৩৮১ খ্রী:) যুদ্ধে পরাজিত হন এবং অনেককাল পরে তৈমুরের ভারত আক্রমণ কালে (১৩৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দে) বন্ধুত্বের সুযোগে গণেশ্বরকে হত্যা করে ত্রিহুত দখল করেন, এই ধারণাই সঙ্গত। বিশেষত আরসালান কর্তৃক ২০-৩০ বছর ধরে মিথিলা শাসনের সাক্ষ্য নেই। এবং 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' মতে খানজাহান শর্কীই তখন কনৌজ, আগ্রা, অযোধ্যা, ত্রিহুত, বিহার প্রভৃতির অধিপতি। Elliot vol. IV, p. 29-

৩. কীর্তিলতা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, দ্বিতীয় পল্লব।

কীর্তিলতা থেকেই জানা যায়, গণেশ্বর-পুত্র বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিম শর্কীর (১৪০১-৪০ খ্রীস্টাব্দ) আশ্রয় ও সহায়তা পেয়েছিলেন।[১] অতএব অন্তত ১৪০১ খ্রীস্টাব্দ অবধি মিথিলা আরসালানের অধিকারে ছিল।

ইব্রাহিম শর্কী গণেশ্বর-পুত্র কীর্তিসিংহকে মিথিলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।[২] কীর্তিসিংহের আগ্রহে তাঁর বীরত্বকথা বর্ণিত ব'লেই গ্রন্থের নাম 'কীর্তিলতা'। কীর্তিসিংহের পরে মিথিলার রাজা হন কামেশ্বরের অপর পুত্র ভব সিংহ। তাঁর পরে রাজত্ব করেন তাঁর পুত্র দেবসিংহ। পিতৃদ্রোহী শিবসিংহ পিতা দেবসিংহকে তাড়িয়ে নিজেই রাজা হলেন। শিবসিংহের পিতা দেবসিংহ আবার সিংহাসন পেয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অপর পুত্র পদ্মসিংহ রাজা হন। অবশ্য এঁদের কেউ বেশী দিন রাজত্ব করেন নি। তবে শিবসিংহ প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে গৌড়ের রাজা গণেশের মিত্রতা ছিল এবং তিনি সম্ভবত মিথিলাকে জৌনপুরের প্রভাব মুক্ত করেন।[৩] শিবসিংহের আমলেই বিদ্যাপতি তাঁর অধিকাংশ পদ এবং গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কাজেই শিবসিংহ ও বিদ্যাপতির যশ ও খ্যাতি পারস্পরিক প্রীতি ও গুণগ্রাহিতার ফল। গণেশের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম শর্কীর গৌড় অভিযান কালে (১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে) শিবসিংহ ইব্রাহিম শর্কীর হাতে নিহত অথবা বন্দী হন। এবং শর্কী দেবসিংহকে আবার রাজা করেন।[৪] কাজেই ১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে শিবসিংহের রাজত্ব শেষ হয়। শ্রীধরের 'কাব্য প্রকাশ' গ্রন্থের পুষ্পিকা সূত্রে বলা যায় (২৯১ লঃ সং+১১১৯) শিবসিংহ ১৪১০ সনের দিকে পিতৃসিংহাসন দখল করেছিলেন।[৫] দেবসিংহের পরে তাঁর অপর পুত্র পদ্মসিংহ

---

১. শিরি ইবরাহিম শাহ গুণে, নহি চিন্তা নহি শোক—কীর্তিলতা, সাকসেনা পৃঃ ৩৮।

২. ইব্রাহিম শর্কীর (১৪০১-৪০) সহায়তায় যদি কীর্তিসিংহ মিথিলার সিংহাসন পেয়ে থাকেন, তা হলে ১৩৯৯ খ্রীস্টাব্দে (ল. সং ২৯৩, শক ১৩২১, বিক্রম সং ১৪৫৫, ফসলী সন ৮০৭) রাজা হিসেবে শিব সিংহ বিদ্যাপতিকে বিসফী গ্রাম দান করতেই পারেন না।

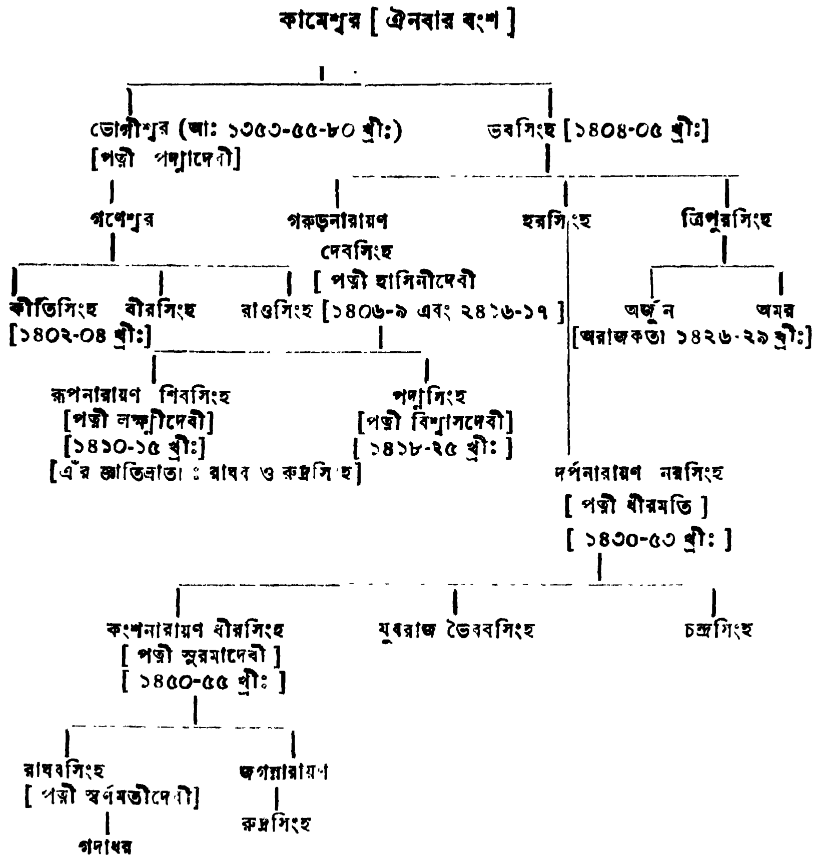
৩. *Bengal, Past & Present* : LXVII 1984 note 31.

৪. ibid.

৫. "ইতি তর্কাচার্য ঠক্কুর শ্রীশ্রীধর বিরচিতে কাব্য প্রকাশ বিবেক দশম উল্লাসঃ। শুভমস্তু। সমস্ত বিরুদাবলী মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ শিবসিংহদেব সংভুজ্যমান তীরভুক্তৌ শ্রীগজরথপুর নগরে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতীনামাজ্ঞয়া খৌয়াল সং শ্রীদেবশর্ম বলিয়াসসং শ্রী প্রভাকরাভ্যাং লিখিতৈ যা হস্তাভ্যাং ল. সং ২৯১ কার্তিক বদি ১০। পুস্তক লিখন পরিশ্রম বিদ্বজ্জনো নান্যঃ। সাগর লঙ্ঘনখেদং হনুমানে কঃ পরঃ বেদ।" India govt. MS., folio-117A.

রাজা হন। পদ্মসিংহের পরে হয়তো দেবসিংহের ভাই ত্রিপুর সিংহের (নৃপনারায়ণ) পুত্র অর্জুন ও অমর সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন। এই সুযোগে নেপালের সপ্তরী জনপদের পুরাদিত্য অর্জুন ও অমরকে পরাজিত ও হত্যা করে দ্রোণবারে স্বাধীন রাজা হন। তাঁর সভাতেই বিদ্যাপতি এই বিপর্যয়ের সময় আশ্রয় পান। হয়তো শিবসিংহের পরিবারও রাজাবনৌলি গ্রামে বিদ্যাপতির তত্ত্বাবধানে ছিলেন।[১] পদ্মসিংহের পরে দেবসিংহের ভাই হর বা হরিসিংহের পুত্র নরসিংহ বা নৃসিংহ রাজত্ব পেয়েছিলেন। এই নৃসিংহ বা নরসিংহের একটি শিলালিপি মিলেছে মাধিপুরা মহকুমার কানাদাহা গাঁয়ে। এতে 'শক শরাশ্ব মদন:' তথা ১৩৭৫ শক বা ১৪৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়।[২] অতএব নরসিংহ অন্তত ১৪৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন। নরসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি 'বিভাগসার', তাঁর স্ত্রী ধীরমতির আগ্রহে 'দানবাক্যাবলী', পুত্র ভৈরব সিংহের আজ্ঞায় 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেন। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে কবি নরসিংহ ও তাঁর পুত্র বীর সিংহকে 'রাজা' বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব পিতার জীবিত কালেই পুত্র রাজা বা যুবরাজ হয়েছিলেন। নরসিংহেরই বিরুদ ছিল দর্পনারায়ণ। এই দর্প নারায়ণের আদেশেই কবি 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেন। শিবসিংহের দুই জ্ঞাতি ভ্রাতার নাম ছিল রাঘবসিংহ ও রুদ্রসিংহ এবং ধীরসিংহের পুত্র ও পৌত্রেরও যথাক্রমে এ দুটো নাম ছিল। বিদ্যাপতির তিনটে পদে রাঘব সিংহের ও দুটো পদে রুদ্র সিংহের নাম আছে। ধীর সিংহের সময়েই তাঁর পুত্র-পৌত্রকে পাওয়া যায়, কাজেই রাঘব ও রুদ্র শিবসিংহের জ্ঞাতি ভ্রাতা না হয়ে যদি ধীরসিংহের পুত্র এবং পৌত্রও হন, তাতে বিদ্যাপতির জীবৎকালের পরিসরে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। অতএব, বিদ্যাপতি আনুমানিক ১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি গ্রন্থ ও পদ রচনা করেছেন। আমরা উপরে যা আলোচনা করেছি, ছকে তা এরূপ দাঁড়ায়:

১. Radha Krishna Chowdhury : *Oinwaras of Mithila* : *Journal of Bihar Research Society*=vol XL. pt, 2,1954, pp. 117-20.
২. ঐ, 1934, pp. 15-19.



ভোগীশ্বর থেকে রুদ্রসিংহ অবধি কামেশ্বর বংশীয় সব রাজা, রাজকুমার ও রানীর প্রশংসাসূচক ভণিতা দিয়েছেন বিদ্যাপতি তাঁর রচিত পদে। গ্রন্থগুলোও রচিত হয়েছে তাঁদের কারো না কারো নির্দেশে। বংশ তালিকাটি দীর্ঘ হলেও কাল-পরিসর দীর্ঘ নয়। খুব দীর্ঘায়ু না হয়েও এমনি স্বল্পজীবী অনেক সুলতানের [গিয়াসুদ্দীন বলবন থেকে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক অবধি] প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন কবি আমীর খুসরুও [১২৫৩-১৩২৬ খ্রী:]। ভোগীশ্বর থেকে রুদ্রসিংহ অবধি কালের বিস্তৃতি হবে মোটামুটি ৭৫ বছর [আনু: ১৩৮০-১৪৫৫খ্রীস্টাব্দ]। বিদ্যাপতি

দীর্ঘজীবী ছিলেন বলে লোকশ্রুতি আছে। অতএব, বিদ্যাপতির আয়ু (১৩৬৭-১৪৫৪ খ্রীঃ) নব্বই বছর হলেই ভোগীশ্বর থেকে রুদ্রসিংহ অবধি সবাই তাঁর জ্যেষ্ঠ, সমবয়স্ক কিংবা কনিষ্ঠ সমসাময়িক হতে পারেন।

আমাদের ধারণা দর্পনারায়ণ নরসিংহের রাজত্বকালেই যুবরাজ ছিলেন ধীরসিংহ এবং ভৈরবসিংহ রাজত্ব করেছেন পনেরো শতকের শেষদশকে [মুদ্রার প্রমাণে]। ধীরসিংহের পুত্র রাঘব কিংবা পৌত্র রুদ্রসিংহ দর্পনারায়ণ নরসিংহের আমলেই যথাক্রমে প্রৌঢ় ও যুবক ছিলেন। আর সৌজন্যের ভাষায় রাজপরিবারের লোকমাত্রই 'রায় বা রাজা'। এই জন্যে তাঁরা যথার্থ রাজা ছিলেন বলে মনে করা অসঙ্গত। এ প্রসঙ্গে দীর্ঘজীবী আওরঙজেবের বংশধারা—বাহাদুর শাহ-আজিমুশশান-ফররুখশিয়র প্রভৃতি স্মর্তব্য। আওরঙজেবের মৃত্যু কালে প্রপৌত্র ফর্‌রুখশিয়রই প্রায়-প্রৌঢ়। উল্লেখ্য যে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে (১৬৫৮-১৭১৩ খ্রীঃ) আমরা শাহজাহান-ফররুখশিয়র—এই পাঁচপুরুষের জীবৎকাল পাই।

বিদ্যাপতি যে-সব গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলোর আদেষ্টানুক্রমিক তালিকা এরূপ:

গ্রন্থ	আদেষ্টা
১. কীর্তিলতা	কীর্তিসিংহ [১৪০২-০৪]
২. কীর্তিপতাকা	রূপনারায়ণ শিবসিংহ [১৪১০-১৫ খ্রীঃ]
৩. পুরুষ পরীক্ষা	রূপনারায়ণ শিবসিংহ [১৪১০-১৫ খ্রীঃ]
৪. গোরক্ষ বিজয় [নাটক]	রূপনারায়ণ শিবসিংহ [১৪১০-১৫ খ্রীঃ]
৫. ভূপরিক্রমা	গরুড়নারায়ণ দেবসিংহ [১৪১৬-১৭ খ্রীঃ]
৬. শৈবসর্বস্বসার	পদ্মসিংহ ও তৎপত্নী বিশ্বাসদেবী [১৪১৮-২৫ খ্রীঃ]
৭. গঙ্গাবাক্যাবলী	পদ্মসিংহ ও তৎপত্নী বিশ্বাসদেবী [১৪১৮-২৫ খ্রীঃ]
৮. লিখনাবলী	দ্রোণবারের রাজা পুরাদিত্য [ল. সং ২৯৯+১১২৯=১৪২৮ খ্রীঃ] [দ্রষ্টব্য: JASB, 1915, p. 422.

৯. বিভাগসার — দর্পনারায়ণ নরসিংহ

১০. দানবাক্যাবলী — নরসিংহ পত্নী ধীরমতী

১১. দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী — কংসনারায়ণ ধীরসিংহ
ভৈরবসিংহ [রূপনারায়ণ ও হরিনারায়ণ] — অ: ১৪৩০-৫৫ খ্রী:

১২. ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী — দর্পনারায়ণ নরসিংহ

১৩. বর্ষকৃত্য বা ক্রিয়া—অপ্রাপ্ত।

১৪. গয়াবাক্যাবলী বা গয়াপত্তন—অপ্রাপ্ত।

বিদ্যাপতি 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী'তে প্রসঙ্গক্রমে 'দুর্গা ভক্তিতরঙ্গিণী'র উল্লেখ করেছেন—"অনুক্তং যদন্যাম দুর্গাভক্তিতরঙ্গিন্যাম অনুসন্ধেয়ং গ্রন্থ কলেবর শঙ্কয়াএ পুনর্লিখিতমিতি"—অধ্যাপক গণেশচরণ বসুর মতে স্মৃতিকারেরা নিজের রচনার উল্লেখ প্রসঙ্গেই সাধারণত 'অনুসন্ধেয়ং শব্দটি প্রয়োগ করতেন।[১]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী' 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী'র পরে রচিত। বিদ্বানদের মতে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ভৈরব সিংহের আদেশে প্রণীত। ভৈরব সিংহের পিতা নরসিংহ দর্পনারায়ণ যে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর তাম্রশাসন। কাজেই এ সময়ে বা এর কিছু আগে কিংবা পরে যে 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী' রচিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সম্ভবত এটিই বিদ্যাপতির শেষ গ্রন্থ।

সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন তুগলকই (১৩২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দে) মিথিলার কর্নাট-বংশের উচ্ছেদ সাধন করে রাজপণ্ডিত কামেশ্বরকে মিথিলার সিংহাসন দান

১. *New Indian Antiquary*, vol. VIII, nos. 3 & 4, 1944, p. 50.
গণেশচরণ বসু নিম্নলিখিত স্মৃতি গ্রন্থগুলো থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন :
(ক) স্মৃতিতত্ত্ব - রঘুনন্দন রচিত, জীবানন্দ সম্পাদিত : পৃ: ৬, ১৫, ৫৯, ৬৮, ১১৩, ১৩৪, ১৫০, ১৫২, ১৬৫, ১৬৭।
(খ) শুদ্ধি কৌমুদী, গোবিন্দানন্দ, পৃ: ১৬০, ১৬২, ১৭৪, ৩২৫।
(গ) শ্রাদ্ধ কৌমুদী (বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা) পৃ: ৮৫, ৩২৩, ৩৪০, ৩৪২, ৩৫৮, ৩৮০।
(ঘ) বর্ষক্রিয়াকৌমুদী (ঐ) পৃ: ২০, ২২, ১১১, ২১৬, ২১৬।
(ঙ) দুর্গোৎসববিবেক (শূলপাণি ssp), পৃ: ২, ৭, ৮, ১৫, ২১, ২৩ ইত্যাদি।

করেন। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্ব কালে হাজী ইলিয়াস ওর্ফে গৌড় সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪৫-৪৬ খ্রীস্টাব্দে বিহার জয় করে হাজীপুর শহরের পত্তন করেন। পরে ফিরোজ তুঘলক ইলিয়াস শাহকে বিতাড়িত করে মিথিলার রাজ্য করলেন কামেশ্বর-পুত্র ভোগীশ্বরকে। হয়তো তাঁর ভাই ভবসিংহও বিহারের এক অংশ শাসনের অধিকার পান, এবং কীর্তিসিংহের পর ভবসিংহের পুত্র শিবসিংহ বাহুবলে বিহারের একচ্ছত্র অধিপতি হন।[১]

এক বিদ্বানের অনুমান, —আরসালান কর্তৃক গণেশ্বর নিহত হওয়ার পরে হয়তো গণেশ্বরের পুত্র বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ দিল্লী ও গৌড় সুলতানের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর সাহায্য গ্রহণ করেন এবং পরেও নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে মিথিলারাজকে হয়তো বিভিন্ন দরবারে ধর্ণা দিতে হয়েছে। এ সূত্রেই মিথিলার দরবারী কবি বিদ্যাপতি—গৌড়-সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ, গৌড়ের সূফী-পীর আলম শাহ (হযরত নূর্ কুতুব-ই-আলম) অথবা দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতান আলম শাহ (১৪৪৪-৪৮ খ্রী:) দিল্লীর তুঘলক সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ (১৩৯৪-৯৯ খ্রী:), গৌড় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৫৯ খ্রীস্টাব্দ), হুসেন শাহ শর্কী বা দ্বারবঙ্গের [দ্বারভাঙ্গা] মখদুম সুলতান হুসেন শাহ, মালিক বাহারুদ্দীন প্রভৃতির প্রশস্তি যোগ করেছেন তাঁর রচিত পদাবলীতে।[২]

যথা:

১. নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ (তুঘলক)

কবি শেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমল মুখি।

অথবা, (গুপ্ত ৩৪৯, মিত্র-মজুমদার ৯১২)

বিদ্যাপতি ভানি অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নাসির মধুপ ভুলে কমলবাণী
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সং ২৩৫৩)

২. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (গৌড়)

নাসির শাহ ভাণে
মুঝে হানল নয়ন বাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভণে।
(গুপ্ত; ৪৪, মিত্র-মজুমদার ৯৩১)

১,২ Radha Krishna Chowdhury : পাণ্ডুক, পৃ: ১০৬, ১১১।

পাঠান্তর ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুথি সং ২৬৪৮

সাহা হুসেন ভাণে
জাকে হানল মদন বাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

৩. গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (গৌড়)
বিদ্যাপতি কবি ভাণ
মহলম যুগপতি চিরেজীব জীবথু
গ্যাসদেব সুলতান।
(গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ: ৭৪, পদ সং ২৯)

৪. হুসেন শাহ শর্কী বা দ্বারবঙ্গের মখদুম শাহ সুলতান হোসেন:
ভণই বিদ্যাপতি নব কবিশেখর
পুহবী [পৃথিবী] দোসর কহাঁ
সাহ হুসেন ভৃঙ্গসম নাগর
মালতী সেনিক জহাঁ।
(গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ: ১৩১, পদ সং ১৫১)

৫. মালিক বাহারুদ্দীন:
বিদ্যাপতি কবি রভসে গাব
মালিক বহারদিন বুঝই ভাব।
(গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ: ১২০, পদ সং ১১০)

৬. আলম শাহ:
দশ অবধান ভন পুরুষ প্রেম গুণি
প্রথম সমাগম ভেলা
আলম শাহ পহু ভাবিনি ভজি রহু
কমলিনি ভমর ভুললা।

(রাজতরঙ্গিণী, পৃ: ৮৬, গুপ্ত, সাহিত্য পরিষৎ সং পদ ৬ পৃ: ৫২৯, মিত্র-মজুমদার ভূমিকা, পৃ: ১৸৴০)

অবশ্য উক্ত সুলতানগণকে গৌড়ের আলাউদ্দীন হোসেন শাহ আর তাঁর পুত্র নুসরত শাহ ও গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ বলে অনুমান করে এগুলোকে সহজেই

শ্রীখণ্ডবাসী বাঙালী কবি বিদ্যাপতির (কবিশেখর, কবিরঞ্জন) পদ বলেও প্রমাণ করা যায়, এবং অনেকেই তা করেওছেন।[১] কিন্তু তা করবার প্রয়োজন নেই। কেননা এগুলোকে মৈথিল কবির রচনা বলে গ্রহণ করতে বাধা দেখিনে।

আমাদের ধারণায় বিদ্যাপতি ১৩৬০—৬৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পরলোক গমন করেন। আমরা এ-ও বিশ্বাস করি যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির অভিনব জয়দেব, নব কবিশেখর (কবিশেখর), কবিরঞ্জন, কবিকণ্ঠহার, পণ্ডিত ঠক্কুর, সদুপাধ্যায়, রাজপণ্ডিত প্রভৃতি উপাধি ছিল।

আর আমাদের ধারণায় বিদ্যাপতি শৈবই ছিলেন। আমাদের বৈষ্ণব বিদ্বানেরাই বিশেষ করে এঁকে বৈষ্ণব বলে ভাবতে চান। তার কারণও রয়েছে।

চৈতন্যদেব স্বয়ং বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করতেন, সেই থেকে বিদ্যাপতি হয়েছেন মহাজন ও গোস্বামী। পাঁচশ' বছর পরে আজ যদি বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন বলে কেউ দাবী করেন, তাহলে বৈষ্ণবের ভক্তি-বিশ্বাসের ভিতেই যেন ফাটল ধরে, পায়ের নীচের চোরাবালি যেন সরে যায়। কেননা সাধন-ভজনের পবিত্র বাহন আকস্মিকভাবে যেন আদিরসের পঙ্কমণ্ডিত হয়ে উঠে। তাই বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব রাখতেই হয়, অথচ বিদ্যাপতি ছিলেন রাজপণ্ডিত ও স্মার্ত। সমাজকে স্মৃতির শাসনে রাখা তাঁর পবিত্র দায়িত্ব বলেই তিনি জানতেন। তাই কীর্তিলতা, কীর্তি-পতাকা, পুরুষ পরীক্ষা ও গোরক্ষবিজয় নাটক ছাড়া তাঁর সব রচনাই স্মৃতি গ্রন্থ। আর রাধাকৃষ্ণ পদ তাঁর মানবিক প্রণয়সঙ্গীত। তার প্রমাণ তাঁর বিবিধ বিষয়ক গানও আদিরসাত্মক। যেমন :

অপনা মন্দির বৈসলি অছলহু
ঘর নহি দোসর কেবা
তহিখনে পহিয়া পাহুল আয়ল
বরিষয় লাগল দেবা।
কে জান কি বোলতি পিসুন পরৌসিনী
বচনক ভেল অবকাশে।

ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিদ্যাপতিশতক পৃঃ ।/০-।৶০।
খ. ঐ—বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড, ২য় স) পৃঃ ৭২-৭৩।
গ. খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমান বিহারী মজুমদার : বিদ্যাপতির পদাবলী : ভূমিকা পৃঃ ৬৶০।
ঘ. সুখময় মুখোপাধ্যায় : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : পৃঃ ৪৭।

ঘর অন্ধার নিরন্তর ধারা
দিবসহি রজনী ভাণে
কওোনক কহব হমে কে পতিয়াওত
জগত বিদিত পচবাণে।
(নগেন্দ্র গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ: ২৩৮ পদ সং ১৫)

অথবা বালম নিঠুর বসয় পরবাস
চেতন পড়োসিয়া নাহি মোর পাশ।
ননদী বালক বোলউ ন বুঝ।
পহিলহি সাঁঝ শাও নহি সুঝ।
হসে ভরে যৌবতী রজনী অন্ধার
স্বপনেহুঁ নহি পুর ভম কোটবার। ইত্যাদি
(গুপ্ত পৃ: ২৩৯-৪০ পদ সং ২১)

এসব পদও বৈষ্ণবপদের মতোই। কেবল রাধা-কৃষ্ণের নাম নেই। তা ছাড়া বিদ্যাপতির হরগৌরী বিষয়ক পদ, প্রহেলিকা পদ, গঙ্গা ও রাম-সীতা বিষয়ক পদ, আর রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদে পার্থক্য দুর্লক্ষ্য। রসিক কবি সব দেবতাকে সমভাবেই ভক্তি করেন, বিদ্রূপও করেন অকাতরে। কাজেই পদাবলীতে বিদ্যাপতির ধর্মীয় আবেগ নয়,—রসবোধই অভিব্যক্তি পেয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। অতএব রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ তাঁর বৈষ্ণব মতের পরিচায়ক নয়। প্রেম-সঙ্গীতের জন্যে বিষয় হিসেবে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাই আকর্ষণীয় বলে কবি রাধা-কৃষ্ণলীলার পদই অধিক রচনা করেছেন। কবি, রসিক, পণ্ডিত ও ভাষার যাদুকর বিদ্যাপতি সংস্কৃত অবহট্‌ঠ ও মৈথিল বুলিতে তাঁর জ্ঞান, চিন্তা, রসবোধ ও কাব্য-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন অবলীলায়।

এবার বিদ্যাপতির জন্ম-মৃত্যুর কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন বিদ্বানের মতগুলো এখানে তুলে ধরছি:

১. সারদাচরণ মিত্র: খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই তাঁহার পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। (বিদ্যাপতির পদাবলী ১৮৭৮ খ্রী:)

২. জি, এ, গ্রিয়ার্সন : Vidyapati flourished and was a celebrated author during at least the first half of the 15th century (Introduction, p. 11, *puruhsha pariksa*)

৩. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : [ক] বিদ্যাপতি ১৩৫৮ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু হয় ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দে (বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী, ব: সা: প: সং ভূমিকা পৃ: ৵০ ।)

[খ] বিদ্যাপতি সাতাশী-অষ্টাশী বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ।—মহাকবি বিদ্যাপতির পদাবলী, বসুমতি সাহিত্য মন্দির পৃ: ১ ।

৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : জীবৎকাল ১৩৪৭-১৪৫৬ খ্রীস্টাব্দ (কীর্তিলতা, ভূমিকা পৃ: ১৷৷-১৷৵০)

৫. কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ : জন্মসন ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ (বিদ্যাপতি কি পদাবলী পৃ: ১১, ৩১)

৬. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : End of 14th, begining of 15th century. (*Origin and Development of Bengali language*), vol. 1)

৭. দীনেশ চন্দ্র সেন : জন্মসন ১৩৫৮ কিংবা তদ্রূপ কোন সময় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

৮. বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় : জন্ম ১৩৭২, মৃত্যু ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দে, (*journal of the Department of Letters*, Calcutta, vol XVI, p. 36)

৯. অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ : জন্ম : ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দের পর নিকটবর্তী কোন সময়। (বিদ্যাপতির পদাবলী : ভূমিকা)

১০. খগেন্দ্র নাথ মিত্র : (ক) জন্ম চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে, (পদামৃত মাধুরী ৪র্থ খণ্ড পৃ: ৪৮) । (খ) জন্ম : ১৩৯০ খ্রীস্টাব্দ (বৈষ্ণব রসসাহিত্য)

১১. সতীশচন্দ্র রায় : জন্ম ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দে এবং শতাধিক বৎসর সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিয়া নানা গ্রন্থ রচনা করেন (পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড পৃ: ১৬৬-১৬৭)

১২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : জন্ম ১৩৫৪ এবং ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দেও বিদ্যাপতি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে বিদ্যমান ছিলেন । রুদ্রসিংহের রাজত্বকালে (১৪৭৫ থেকে শুরু বিদ্যাপতির মৃত্যু হয়। ক. বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড পৃ: ৭২-৭৬ । খ. বিদ্যাপতি শতক, ভূমিকা পৃ ৵০-।০)

১৩. সুকুমার সেন ক. ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের পর বিদ্যাপতি বেশীদিন জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়না (বিদ্যাপতি গোষ্ঠী, পৃ : ২২-২৩)

খ. বিদ্যাপতি ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত, সমর্থ ও অধ্যাপনরত ছিলেন (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় সং ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩৮৩)।

১৪. বিমান বিহারী মজুমদার: ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বিদ্যাপতির জন্ম এবং ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন প্রমাণিত হইতেছে। (বিদ্যাপতির পদাবলী, ভূমিকা পৃঃ ৩।।-৩।।/)

১৫. উমেশ মিশ্র: কবির জীবৎকাল ১৩৬০ থেকে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাপতি ঠাকুর (হিন্দুস্থানী একাডেমি, এলাহাবাদ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ, পৃঃ ৩৬-৩৭)

১৬. শিবনন্দন ঠাকুর: জন্ম: ১৩৫১ ও মৃত্যু ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দ। (মহাকবি বিদ্যাপতি পৃঃ ৩৭-৩৯)

১৭. জয়কান্ত মিশ্র: জন্ম ১৩৬০ ও মৃত্যু ১৪৩৭ খ্রীস্টাব্দ (*History of Maithili literature*)

১৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়: জন্ম ১৩৭০ ও মৃত্যু ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের মতো সময়ে।" (বাংলা সাহিত্যের কালক্রম পৃঃ ৪৭-৪৮)

১৯. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: জন্ম আঃ ১৩৮০ ও মৃত্যু আঃ ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮-৭৯)

২০. সুভদ্র ঝা: মৃত্যু ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের পরে (*Songs of Vidyapati, Introduction*)

লক্ষণীয়, এর মধ্যে অনেকেই বিদ্যাপতির মৃত্যুসন ১৪৪৮ অথবা ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ ধরেছেন। যারা ১৪৪৮ সন বলে মনে করেন তাঁদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে বিদ্যাপতির রচনা বলে অনুমিত একটি পদ:

সপন দেখল হম শিবসিংহ ভূপ
বতিস বরস পর সামর রূপ।
বহুত দেখল হম গুরুজন প্রাচীন
অব ভেলহু হম আয়ু বিহীন।

[নগেন্দ্র গুপ্ত: বসুমতী সং পৃঃ ২৩৮, পদ সংখ্যা—১৯, মিত্র ও মজুমদার পদ সংখ্যা ৯১৪]

এঁরা শিবসিংহের মৃত্যু সন ধরেছেন ১৪১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দ এবং বিশ্বাস করেছেন পদোক্ত স্বপ্নফল অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ১৪১৬+৩২=১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দেই বিদ্যাপতির মৃত্যু হয়েছিল। কেননা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-মতে স্বপ্ন মিথ্যে হবার নয়।

আর যাঁরা বিদ্যাপতির মৃত্যু সন ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ বলে নিরূপণ করেছেন তাঁদের দলিল হচ্ছে একটি পুথির লিপিকাল। হলায়ুধ মিশ্রের 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি তৈরী করেছিলেন বিদ্যাপতির ছাত্র রূপধর। পুষ্পিকায় লিপিকাল ও জীবিত বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে। যথা:

"লসং ৩৪১ মুড়িয়ার গ্রামে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় নিজকুল কুমুদিনী চন্দ্রবাদি মণ্ডভ সিংহ পরম সচ্চরিত্র পবিত্র শ্রীবিদ্যাপতি মহাশয়েভ্যা পঠিতা ছাত্র শ্রীরূপ ধরেণ। লিখিত মদ: পুস্তকম।"

৩৪১ লক্ষণ সংবতের সঙ্গে ১১১৯ যোগ করেই তাঁরা ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছেন। কিন্তু ৩৪১ এর সঙ্গে ১০৮০, ১১০৮ কিংবা ১১২৯ যোগ করলে যথাক্রমে ১৪২১, ১৪৪৯ এবং ১৪৭০ খ্রীস্টাব্দও পাওয়া যায়। তবে পুষ্পিকা সূত্রে মনে হয় বিদ্যাপতি তখন যশ ও মানে অনন্য, কাজেই লিপিকাল ১৪৪৯ খ্রীস্টাব্দ ধরাই সঙ্গত। বিশেষ করে যিনি নেপালের দ্রোনবাররাজ পুরাদিত্যের আশ্রয়ে (রাজাবনৌলি গাঁয়ে) থেকেও জীবিকার্জনের জন্যে 'লিখনাবলী' রচনা করেছেন ২৯৯ লং সংবতে তথা (২৯৯+১১২৯) ১৪২৮ খ্রীস্টাব্দে[১] বা তৎপরে, তাঁর তখনো খ্যাতি-প্রতিপত্তি উক্ত সব বিশেষণের আনুপাতিক হয়ে না উঠারই সম্ভাবনা।

বিদ্যাপতি নাকি তালপাতায় একখানি ভাগবতের প্রতিলিপি তৈরী করেছিলেন। তার পুষ্পিকায় বিদ্যাপতির নাম ও অস্পষ্ট লিপিকাল রয়েছে: 'শুভমস্তু সর্ব্বর্থগতা সংখ্যা লং সং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে রাজাবনৌলি গ্রামে শ্রীবিদ্যাপতেলিপিরিযমিতি।" [দ্বারবঙ্গের রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত]

বিসফী গাঁয়ের কবি বিদ্যাপতি কিংবা রাজসভার কবি ও রাজপণ্ডিত বিদ্যাপতি ১৪৩৮ সনেও রাজাবনৌলি গাঁয়ে বসে ভাগবত নকল করেছেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। পদ্মসিংহের মৃত্যু ও নরসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির সন্ধিকালে হয়তো রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে কবি নেপালে দ্রোনবারের রাজার আশ্রয় নিয়েছিলেন। লিখনাবলী সূত্রে বোঝা যায় তিনি ১৪২৮ খ্রীস্টাব্দেও সেখানে ছিলেন। কিন্তু তাই বলে আরো দশবছর সেখানে বাস করার কথা নয়। কেননা, তিনি নরসিংহ পরিবারের প্রীতি অর্জন করেছিলেন। কাজেই উক্ত প্রতিলিপি হয়তো অন্য কোন বিদ্যাপতির কৃতি। নাম-সাদৃশ্যে গুরুত্ব আরোপ না করাই সঙ্গত। আর (৩০৯+১১২৯=)

১. JASB, 1915, p. 422.

১৪৩৮ খ্রীস্টাব্দেই এ পুথি লিপীকৃত। কেননা ঐ বছরের শ্রাবণ মাসের শুদি ১৫ বা পূর্ণিমা তিথি মঙ্গলবারে পড়েছিল এবং ঐদিন তারিখ ছিল ৫ই আগস্ট।[১]

এ ছাড়া বিদ্যাপতি রচিত 'দানবাক্যাবলীর' একটি প্রতিলিপি রয়েছে নেপাল-রাজ গ্রন্থাগারে। ওটি নাকি বিদ্যাপতির স্বহস্তে সংশোধিত। নকলের তারিখও রয়েছে লং সং ৩৫১। এর সঙ্গে ১০৮০, ১১০৮, ১১১৯ ও ১১২৯ যোগ করলে যথাক্রমে ১৪৩১, ১৪৫৯, ১৪৭০ ও ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ হয়। তবে ১৪৩১ খ্রীস্টাব্দ ধরাই সমীচীন।

১৩০৭ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বিনোদবিহারী কাব্য-তীর্থ বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত একটি অবহটঠপদ উদ্ধৃত করেছিলেন। পদটি নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের বিদ্যাপতি পদাবলীর বসুমতী সংস্করণে বিধৃত রয়েছে (পৃঃ ২৩৬-৩৭ পদ সং ৯ ও পরিষৎ সং ; পদ সং ৫৩১)। পদটির শুরু এ ভাবে :

অনল রন্ধ্রকর লকখন নরবই সক সমুদ্দকর অগিনি সসী
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিও বার বেহপএ জাউলসী।
দেবসিংহে জং পুহবী ছড্ডিঅ সুররাএ সরু
দুহু সুরতান নীন্দে অবে শোয়উ তপন হীন জগতিমিরে ভরু।

শেষ— আরম্ভিয় অন্তেষ্টি মহামখ রাজসূয় অসমেধ যঁহা
পণ্ডিতঘর আচার বখানিয় যাচক কাঁ ঘর দান কঁহা।
বিদ্যাপতি কবিবর এহু গাবয় মানব মন আনন্দ ভয়ও
সিংহাসন শিবসিহ বইঠ্‌ঠো উচ্ছব বৈরস বিসরি গয়েও।

এখানে প্রদত্ত সন (অনল-৩, রন্ধ্র-৯, কর-২)=ল সং ২৯৩ এবং শক (সমুদ্র-৪, কর-২, অগ্নি-৩, শশী-১)=১৩২৪ শক।

ল. সংবত থেকে ১৩৭৩, ১৪০১, ১৪১২ বা ১৪২২ খ্রীস্টাব্দ মেলে আর শকাব্দ থেকে পাই ১৪০১-০২ খ্রীস্টাব্দ। কাজেই ১৪০১-০২ খ্রীস্টাব্দই নির্দেশিত হয়েছে

[১] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ: ৩৯। জয়কান্তমিশ্র ও রমানাথ ঝা—উভয়ে একসঙ্গে গিয়ে পুথি পরীক্ষা করে ল. সং ৩০৯ পেয়েছেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বর্ণিত ল. সং ৩৪৯ এবং উমেশমিশ্র কথিত ল. সং ৩৮৯ গ্রহণীয় নয়। Jayakanta Misra, p. 185, *History of Maithili literature.*

বলে মানতে হয়। কেউ কেউ শকাব্দের 'কর' স্থলে 'পুর' ধরে একে ১৩৪৩ শক বা ১৪১২ খ্রীস্টাব্দ পেতে চান। এই সন শিবসিংহের ['কাব্যপ্রকাশবিবেক' সূত্রে সিংহাসন আরোহণ ১৪১০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে] রাজত্বকালে পড়ে। কিন্তু এ পদটি অনেকের মতেই জাল। কেননা প্রথমত দেবসিংহের মৃত্যুর আগেই পিতৃদ্রোহী শিবসিংহ পিতাকে তাড়িয়ে রাজ্য দখল করেন, এ সংবাদ আমরা মোল্লা তাকিয়ার 'বয়ায' সূত্রে জানতে পাই।[১] দ্বিতীয়ত, 'পুরুষ পরীক্ষা' সূত্রে বোঝা যায়, এই গ্রন্থ রচনাকালে দেবসিংহ জীবিত ছিলেন, "ভাতি যস্য জনকোরণজেতা দেবসিংহ গুণরাশিঃ।[২] তৃতীয়ত নৈমিষারণ্যে আশ্রিত দেবসিংহের আদেশেই যে বিদ্যাপতি ভূপরিক্রমা রচনা করেছিলেন, তা 'ভূপরিক্রমা' থেকেই জানা যাচ্ছে। অতএব শিবসিংহের রাজত্বকালে দেবসিংহ মৃত নয়, নির্বাসিত অথবা পলাতক ছিলেন।

কেউ কেউ কীর্তিলতার দুটো শ্লোকের তাৎপর্য অনুসরণে বিদ্যাপতির জন্ম সন ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দ নিরূপণে প্রয়াসী। শ্লোক দুটো এরূপ :

১. বালচন্দ্র বিজ্জাবই ভাসা
দুহু নহি লগ্‌গেই দুজ্জন হাসা ।
ও পরমেসর হরশির সোহই
ঈ নিশ্চই না অর - মন মোহই।

১. ক. Raja kans, a Hindu Zamindar, acquiring ascendency in Bengal, oppressing the Muslims ond instigating Sheosinge, the rebellious son of Devasingh, the Raja of Tireut, to commit depredations upon the Muslims .... Sultan Ibrahim Sharqi of Jaunpur marched against Bengel but had to face the opposition of Sheo Singh in Tirhut. The latter was defeated and pursued and captured ...... his (Sheo Singh's) father, the disposed Rajr of Tjrhut was restored to power on cOndition of allegiance and looalty. *Bengal, Past & Present* : LXVII 1943.

খ. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩০৭ সন, পৃঃ ২৯, বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের প্রবন্ধ।

গ. বিমানবিহারী মজুমদার : বিদ্যাপতির পদাবলী : ভূমিকা : পৃঃ ১৮/-২৮.।

২. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : পৃঃ ৪৩-৪৫।

"বালচন্দ্র ও বিদ্যাপতির ভাষা-এ দুইয়ের কোনোটিতেই দুর্জনের উপহাস লাগিবে না। যেহেতু চন্দ্র পরমেশ্বর মহাদেবের মস্তকে লাগিয়া থাকে, আর বিদ্যাপতির ভাষা নাগরজনের মনোমোহন করে।" [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

২. মাধুর্য প্রসবস্থলী গুরু যশো শিক্ষাসখী
যাবদ্বিশ্বমিদঞ্চ খেলনকবেবিদ্যাপতের্ভারতী।

"মাধুর্যের প্রসবস্থলী স্বরূপ যশোবিস্তারের শিক্ষাসখী সদৃশ 'খেলন কবি' বিদ্যাপতির কবিতা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক।" [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

প্রথমটাতে বালচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাষা তুলিত হয়েছে। বিদ্বানরা মনে করেছেন বিদ্যাপতি তখনো তরুণ। আর দ্বিতীয় 'খেলনকবি' অর্থে (খেলুড়ে—বাল্য-ক্রীড়ার বয়স অতিক্রান্ত হয়নি যার) বালক কিংবা কিশোর কবি নির্দেশ করা হয়েছে বলেই তাঁদের ধারণা। কীর্তিলতা ১৪০১-০৪ সনের মধ্যে রচিত। কাজেই এঁদের মতে এটি কবির বিশ-বাইশ বছর বয়সের রচনা। এ জন্যে তাঁরা কবির জন্ম সন ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমান করেন।

আগে কয়েকটি গীত রচনা করলেও পূর্ণাঙ্গ কাব্য হিসেবে কীর্তিলতাই বিদ্যাপতির প্রথম কৃতি। এ জন্যেই কবি এই নব প্রয়াসকে নবচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন: নবচন্দ্র যেমন নতুন ও ক্ষীণকায় বলে নিন্দনীয় নয়, তেমন নতুন কবির প্রথম কাব্য বলে কীর্তিলতাও অবহেলার বস্তু নয়। এমনি তাৎপর্যেও উক্ত শ্লোকটি গ্রহণ করা সম্ভব।

সম্প্রতি 'খেলনকবেবিদ্যাপতের্ভারতী পাঠ কেউ কেউ অশুদ্ধ ও অর্থহীন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে শুদ্ধ পাঠ হবে খেলতু 'কবেবিদ্যাপতের্ভারতী'।[১] অতএব যা ছিল বিনয়বচন, তা গর্বিত আহ্বানে হল পরিণত। কাজেই উক্ত দুই শ্লোক অপরিণত অল্প বয়সের সাক্ষ্য নয়। বিশেষ করে পদে রাজা ভোগীশ্বরের উল্লেখ রয়েছে। জীবিত রাজা ভোগীশ্বরের প্রশস্তিই গেয়েছেন কবি তাঁর ভণিতায়। ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দের আগে ভোগীশ্বরের মৃত্যু হয়। কাজেই এসময়ে বিদ্যাপতির বয়স ১৫-২০ না হলে পাঠযোগ্য পদ রচনা সম্ভব হত না।

১. ক. Subhadra Jha : *Songs of Vidyapati*, p. 26.
খ. সুখময় মুখোপাধ্যায় : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃ: ৪২।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি চৈতন্য দেবের জন্মের প্রায় একশ পঁচিশ বছর আগে আবির্ভূত। কিন্তু পরে প্রায় তিনশ' বছর ধরে তিন শতাধিক কবি পদ রচনা করলেও বিদ্যাপতির পদাবলী, প্রতিভা ও প্রভাব কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি বললে সত্যের অপলাপ হয় না। তাই এই অবৈষ্ণব কবি বৈষ্ণব-পূজ্য মহাজন ও গোস্বামী হয়ে রয়েছেন বৈষ্ণব সমাজে। সত্য বটে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ শ্লোকে-আর্যায়-গাথায় রাধা-কৃষ্ণের কাম-প্রেম লীলা আগে অনেক রচিত হয়েছিল, জয়দেবও প্রিয় বটে, কিন্তু নারী-পুরুষের কাম-প্রেম সম্পৃক্ত এমন সূক্ষ্ম, বহুধা ও বিচিত্র অনুভব জগতের আর কোন সাহিত্যে মেলে না। রূপ-কাম-প্রেম সম্পর্কিত যত গভীর ও যত প্রকার অনুভব, উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি মানুষের পক্ষে সম্ভব, পদাবলীতে বিভিন্ন কবি সার্থক ভাবে তা' প্রকট করেছেন। বিশেষ ছাঁচের ও বিশেষ উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতা নিয়ে পুনপৌনিকতা দুষ্ট হয়েও তা' বিশ্ব-সাহিত্যে অনন্য। সীমিত অর্থে গীতি কবিতা হয়েও তা' মানব বৃত্তি-প্রবৃত্তির, বাসনা-কামনার, আনন্দ-বেদনার, রূপ-অরূপের অভিব্যক্ত আধার ও আকররূপে চির-সৌন্দর্যের ও চির-মাধুর্যের উৎস হয়ে রয়েছে। মধ্যযুগের হয়েও তা' চির নতুন রূপ-রসের ভাষাবিগ্রহ ও ভাব-মূর্তি। বিদ্যাপতিই এক অর্থে এই কাম-প্রেম রসের বিচিত্র বর্ণালী জগতের প্রথম ও প্রধান সার্থক স্রষ্টা। গত পাঁচশ বছর ধরে কাম-প্রেমানুভূতির জগতে বোধে, অনুভবে, উপায়ে, উপকরণে, ভাষায়, ছন্দে, রূপে, রসে ও চাওয়া-পাওয়ায় বিদ্যাপতিই ছিলেন আদর্শ ও দিশারী, বৈষ্ণব কবিরা কেবল কোথাও সার্থকভাবে কোথাও বা অসঙ্গতরূপে তাদের সাধনতত্ত্বের ছোপ লাগিয়েছেন কিংবা রাধাস্বভাবে চৈতন্য-আকৃতির রঙ যোগ করেছেন মাত্র। বিদ্যাপতির বর্ণনা অনুধাবনে আমরা মানসচক্ষে যন্ত্রধৃত চলমান জীবন্ত নারী-পুরুষ ও পরিবেষ্টনী দেখতে পাই। বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ আধুনিক শহুরে নিঃসঙ্কোচ দুরন্ত কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী—যারা যথার্থ প্রেমিক। বয়ঃসন্ধি, সম্ভোগ, অভিসার, বিরহ ও প্রার্থনার পদ যেন প্রমূর্ত মাধুরী। আলঙ্কারিক কবি বিদ্যাপতি চিত্রশিল্পীও বটে। তাঁর মানসপটে বিধৃত চিত্র তিনি লেখনী মুখেও জীবন্ত করে অঙ্কিত করতে পারতেন। বিদ্যাপতির নানা উপাধি বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

কেননা কবিবল্লভ, রায়শেখর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি উপাধিধারী ভিন্ন ভিন্ন পদকারও ছিলেন। বিদ্যাপতির মৈথিল পদের বাঙলা রূপান্তরই বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

বিদ্যাপতির নানা রসের বহু সুন্দর পদের কয়েকটি :

o কি কহব রে সখি কানুক রূপ

বয়ঃসন্ধি o শৈশব যৌবন দরশন ভেল

o দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন

o যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই

o সখী হে ভাল কয়ি পেখন না ভেল

o যব গোধূলিসময় বেলি

o শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল

o ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই

o সুধামুখী কে বিধি নিরমিল বালা

o আর এক লাজ তোহে কি কহব মাই

o অপরূপ পেখলুঁ রামা

অভিসার o গেলি কামিনী গজহু গামিনি

o অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ

o লাখে তরুবর কোটিহি লতা

o সুন্দরী মাধব তুয়ে অনুরাগী

o ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর

o নব অনুরাগিনী রাধা

o চল চল সুন্দরী হরি অভিসার

o রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী

o রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম

o শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ

মিলন o কি কহব হে সখি কহইতে লাজ

o কি কহব হে সখি আছুক বিচার

মান o হমর বচন সুন সজনি

o এতদিন ছল পিয়া তোহ হম

o মাধব করিয় সুমখি সাবধানে

বসন্ত o নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
o আএল ঋতুপতিরাজ বসন্ত
o মধু ঋতু মধুকর পাঁতি

বিরহ o হরি কি মথুরাপুর গেল
o হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা
o নাহ দরশ সুখে বিহি কৈলে বাদ
o প্রেমক অঙ্কুরজাত আত ভেল
o অব মথুরাপুর মাধব গেল
o এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর
o চীর চন্দন হার উরে না দেলা
o যেদিন মাধব
o মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব
o অনুখন মাধব মাধব সুমরইত
o কতদিনে ঘুচব ইহ
o যেদিন মাধব পয়াণ করল

ভাবসম্মিলন o কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
o পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে
o অজতনে আওব যব রসিয়া
o আজু রজনী হম ভাগে গোমায়ওল
o দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল
o হাথক দরপণ মাথক ফুল

প্রার্থনা o মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
o তাতল সৈকত বারি বিন্দু সম,

পাঁচশ বছর ধরে মুখে মুখে উচ্চারিত ও বিকৃত হয়ে হয়ে বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী বাঙলায় ও ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

কারো কারো মতেগগনে অব ঘন মেহ দারুণ/সঘনে দামিনী ঝলকত' এবং 'এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর' শ্রীখণ্ডবাসী বাঙালী কবি রায় শেখরের রচনা এবং 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' নামের প্রখ্যাত ও অতুল্য পদটি চৈতন্য-শ্যালক কবিবল্লভ উপাধিধারী মাধবের রচনা।

১৫

কবিচন্দ্র মিশ্র

বিশ্বভারতীর 'পুঁথিপরিচয়ের' তৃতীয় খণ্ডে সংকলক ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল পনেরো শতকের এক কবির খণ্ডিত কাব্য 'গৌরীমঙ্গল'-এর প্রাপ্ত পুরোপাঠ প্রকাশিত করেছেন এবং ভূমিকায়ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কবি ও কাব্য সম্পর্কে। (ভূমিকা, পৃ: ৬-১২, পাঠ: পৃ: ৪৭-৭৫)। এই কবির নাম কবিচন্দ্র মিশ্র। এই নামের কবির রচিত একখানি সম্পূর্ণ 'গৌরীমঙ্গল' পুথি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অর্ধশতাব্দীরও আগে চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। সেই কবিচন্দ্রের আদেষ্টা এক পরমেশ্বর দাস। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। এই পাঁচালী চণ্ডীর চরিত বটে তবে কাহিনী কেবল পৌরাণিক, এখানে কালকেতু-ধনপতি উপাখ্যান নেই। দক্ষযজ্ঞ থেকে মহিষ, মধুকৈটভ, রক্তবীজ, শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুর বধই বর্ণিত বিষয়। তাই বোধ হয় পাঁচালীর নাম 'গৌরীমঙ্গল'।

আলোচ্য কাব্যটি বিশ্বভারতীর ১০২৮ সংখ্যক পুথি। অন্তে খণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ২১। ১-২২ পত্রের মধ্যে ১৩ সংখ্যক পত্র নেই। পুথির আকার ১৪"/৫", লিপিকাল নেই, দু'শ বছরের পুরোনো বলে সংকলক কর্তৃক অনুমিত। এই একুশ পত্রের পাঠ নানা রাগে বা ছন্দে বিভক্ত। এবং প্রতি রাগ বা ছন্দান্তর্গত পাঠের অন্তে উপান্তচরণে বা শেষচরণে ভণিতা রয়েছে। তাই ভণিতার সংখ্যাও ৩৯। কাব্যের ২য় পৃষ্ঠায় 'কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডীর চরিত।' এবং ২য় ক-এ 'চণ্ডের চরিত্র কিছু কবিচন্দ্রে ভণে।' —কথাটা থাকলেও অন্য ৩৭টি ভণিতায় কাব্যের নাম 'গৌরী মঙ্গলগীত' অথবা কেবল 'গৌরীমঙ্গল'। ৩৯টি ভণিতার মধ্যে ২৪টায় পুরোনাম 'কবিচন্দ্র মিশ্র' বলে বা ভণে রয়েছে। ১১টায় 'কবিচন্দ্র ভণে', তিনটায় আছে 'কবিচন্দ্র বিরচিত।' অন্য একটি ভণিতা নিম্নরূপ:

"পরম ভকতি। দৃঢ় একমতি। শঙ্কর কিঙ্কর ভণে। গৌরীমঙ্গল। দেই ইষ্টফল। কবিচন্দ্র মিশ্র সুরচনে" ('পুঁথি পরিচয়' পৃ: ৬৬)। ঐ ২৪টা ভণিতার একটায় আছে: "শঙ্কর কিঙ্কর। ভক্তি তৎপর। শুন লোক একমনে। গৌরীমঙ্গল। দেই ইষ্টফল। কবিচন্দ্র মিশ্র ভণে।" (ঐ পৃ: ৭০) এবং অন্য

একটায় পাই : "হর গৌরি চরণে কমল মধুকর। কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল"। বিশেষত কবির আত্মকথায় যখন পাই— "তথা গুণিজন সভে করিয়া সমাজ। কবিচন্দ্র মিশ্র আনিঞা বলিলেক কাজ" (ঐ পৃ: ১০)। তখন কবির প্রকৃত নাম সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। তা ছাড়া অনেক ভণিতায় রয়েছে 'ভক্তি রচক হরগৌরীর চরণে।' অতএব কবির নাম যে 'কবিচন্দ্র মিশ্র' তাতে সন্দেহের কিছু মাত্র অবকাশ নেই। কবি শাক্ত। হরগৌরীর চরণাশ্রিত। তাই তিনি 'শঙ্কর কিঙ্কর' ও 'হরগৌরীর চরণকমল মধুকর।' অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কবির নাম 'শঙ্কর কিঙ্কর মিশ্র' বলে বিশ্বাস করেন, তাঁর যুক্তি—কবিচন্দ্র কারো নাম হতে পারে না। ঐটি উপাধি এবং শঙ্করকিঙ্কর মিশ্রই কবির নাম। ('মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', পৃ: ৯-১১)। কিন্তু মুসলিম সমাজে 'শায়ের' আহমদ প্রভৃতি নাম মধ্যযুগেও চালু ছিল। যেমন এ যুগে মেয়েদের নাম 'কবিতা' রাখা হয়।

কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরীমঙ্গলের উপক্রমে বন্দনা ও গ্রন্থোৎপত্তি বর্ণন শেষেই ভণিতাংশে রচনাকাল (তথা রচনারম্ভ কাল) উল্লেখ করেছেন, 'নব শশী সুর ইন্দ্র সক পরিমিত। কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডির চরিত।'

এই 'নব শশী সুর ইন্দ্র' শব্দের মধ্যে 'সুর' (দিকপাল অর্থে—৪ ধর্মপূজা-বিধান অনুসারে) ধরে ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল ১৪১৯ শকাব্দ তথা ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছেন। কিন্তু শুধু 'ইন্দ্রও ১৪ সংখ্যার প্রতীক" নব-৯, শশী-১, ইন্দ্র-১৪ (প্রাগুক্ত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ: ৯, সুর ইন্দ্রের বিশেষণ ও আঙ্কিক অর্থহীন) থেকেও ১৪১৯ শকাব্দ বা ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দ মেলে। কবির 'বন্দনাংশে পঞ্চগৌড়েশ্বর হোসেন শাহরও (১৪৯৩-১৫১৯) প্রশংসা রয়েছে। অতএব এ রচনাকাল অকৃত্রিম। কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসাবিজয়ের বছর দুয়েক পরে এ পাঁচালী রচিত। বর্ণিত বিষয় দৃষ্টে মনে হয়, এটি মানিক দত্ত, দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের বা চণ্ডী পাঁচালীর কাহিনী জনপ্রিয় হওয়ার অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে রচিত। চৈতন্যপূর্বে যে লোকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে' বলে চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ আছে, এই গৌরীমঙ্গল সেই 'চণ্ডীগীত' কি-না বলা যাবে না। কবি দেবতা, সিদ্ধা, বাল্মীকি, ব্যাস, পরাশর প্রভৃতি দেব-দ্বিজ-মুনি-ঋষি ও গুরু বন্দনার সঙ্গে পিতামাতারও বন্দনা করেছেন। বিশ্বভারতীর পুথিতে গুরু ও পিতার নাম নেই, মায়ের নাম আছে, পিতার পাণ্ডিত্য ও প্রসিদ্ধির উল্লেখও রয়েছে :

ধরণী লোটাইয়া বন্দোঁ মাতা নিলাবতি।
বাপের চরণ বন্দোঁ গুণের নিধান
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ভারতি অধিষ্টান,
সসিষ্য পণ্ডিত নাম অতি সুচরিত
যাহার বিমল জশ জগত বিদিত।

এর পরে ভণিতাংশ এবং তারপরে রয়েছে রাজ-প্রশংসা :

পৃথিবীর সার রাজ্যে পঞ্চগৌড় নাম
নৃপতি হুসেন সাহা কলিজুগে রাম।
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজা প্রতাপে তপন
জার ভয় কপিত (ভয়ে কম্পিত) সকল নৃপগণ।

অতএব গৌড়সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌র আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) ১৪৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দে কবিচন্দ্র মিশ্র তাঁর 'গৌরীমঙ্গল' পাঁচালী রচনা শুরু করেন।

এরপরে কবি তাঁর নতুন নিবাসগ্রাম 'বালাণ্ডার' পরিচয় দিয়েছেন। কবি ছিলেন অন্য কোন ভিন্ন গ্রামের বা পরগনার অধিবাসী। সপ্তগ্রামের অন্তর্গত 'বালাণ্ডার' পূর্বে যমুনা, পশ্চিমে সুরেশ্বরী গঙ্গা, উত্তরে চক্রতীর্থ গ্রাম এবং দক্ষিণে পবিত্র বিদ্যাধরী (নদী) জল। এই বালাণ্ডা গাঁয়ে নৃপতিপূজিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, বৈশ্য, ও শূদ্রের বাস, এবং সবাই সজ্জন। এই গাঁয়ের—

তথা গুণিজন সবে করিয়া সমাজ
কবিচন্দ্র মিশ্র আনিঞা বলিলেক কাজ।
গন্ধমাল্য দিয়া তবে করিল সম্মান
সভে মিলিআ বলিলেক পাঁচালী বিধান।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচ গৌরীমঙ্গল
তোমার মহিমা জেন ভ্রমে মহিতল।
ভক্তি করিয়া জেন সর্বলোকে পূজে
পুরাণ বচন জেন সর্বলোকে বুঝে।
নব সসি সুর ইন্দ্র সক পরিমিত
কবি চন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডির রচিত।

'গন্ধমাল্য দিয়া তবে করিল সম্মান' এবং 'তথা'—শব্দ প্রয়োগ দেখে মনে হয় ঐটি কবির নিজ গাঁ নয়। এতে মনে হয় 'গৌরীমঙ্গল' রচনার আগেই তাঁর

কবিখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই তাঁকে বালাণ্ডা গাঁয়ে ডেকে এনে সাদরে বসতি করতে দিয়ে পাঁচালী রচনার জন্যে অনুরোধ করে গ্রাম-প্রধানরা।

কবি গ্রন্থের উপক্রমে বর্ণিতব্য বিষয়-সূচীও দিয়েছেন: দক্ষের উৎপত্তি, সতীর জন্ম, বৈশ্রবণের কুবের হওয়ার বিবরণ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ ও গিরিগৃহে জন্ম, মদন ভস্মের বৃত্তান্ত, গৌরীর তপস্যা ও বর লাভ, হরগৌরীর বিবাহ, বারাণসী পুরী সৃষ্টির বৃত্তান্ত, সুরথরাজার কাহিনী, মধুকৈটভ, মহিষ, ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীর্য, চামুণ্ডা, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুর বধ এবং সুরথ রাজার রাজ্যপ্রাপ্তি বর্ণনে পাঁচালী সমাপ্ত।

এই পাঁচালী পাঠের পুণ্য নিম্নরূপ:

অন্ধ কুষ্ঠ দারিদ্র্য হরে ধনুপুত্র পাই
শত্রুক্ষয় মিত্রজয় দীর্ঘ পরমাই।
রাজঘরে সম্মান বাড়ে ঠাকুরাল
লোকের যশ উজ্জ্বল সম্পদে যায় কাল।
রণে বনে প্রান্তরে খাণ্ডাএ অখণ্ডিত
যে যেই বর মাগে পাইব সকল।

রূপ বর্ণনায় কোন নতুনত্ব নেই। উরু রামকদলী, চরণ-দীপ্তি স্থলকমলের, দেহবর্ণ দুগ্ধ-অলক্তের, নিতম্ব রথচক্রের, গতি রাজহংসের, স্তন হেমকটোরা, বাহু সুবলিত লতা, অঙ্গুলি নবমঞ্জরী, অধর বিম্বফল, নাসা তিলফুল, নয়ন কমল ইত্যাদি। তবু 'মাঝাখানি গোসাঞীর ত্রিবলি সুঠান। এ নব যৌবন গোসাঞীর হইল সোপান' পাঠককে চমকিয়ে দেয়। কাব্যটি পনেরো শতকের শেষ দশকের বলেই একটু বিস্তৃত পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে।

ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল এই প্রাচীন কাব্য আবিষ্কারের উল্লাস বশে একটি অনবধানতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি কবিচন্দ্র মিশ্রকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে মনে করেছেন। দুই ভাইয়ের জীবন-কালের মধ্যে প্রায় একশ' বছরের ব্যবধান কল্পনাতীত।[১]

মঘীসন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভুল। চট্টগ্রাম প্রায় হাজার বছর ধরে আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। তাই চট্টগ্রামে বৈষয়িক জীবনে ও রাজস্বাদি ব্যাপারে মঘীসনই আজো চালু রয়েছে, ত্রিপুরা-ফেনীতে যেমন রয়েছে ত্রিপুরা সন। এবং মঘীসন শুরু হয় ৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে আর বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয় ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে। কাজেই বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৪৫ বছর যোগে—বিয়োগে নয়—মঘীসন মেলে।

॥ ২ ॥

সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিটি চট্টগ্রামের এবং ১১৯৬ মঘীসনের অর্থাৎ ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত। এই গৌরীমঙ্গল রচয়িতাও দ্বিজ কবিচন্দ্র মিশ্র। পুথিটি ১-৫২ পত্রে সমাপ্ত। কবির আদেষ্টা এক শ্রীপরমেশ্বর দাস। এই পরমেশ্বর দাস কবীন্দ্র পরমেশ্বরও হতে পারেন। কেননা পুথি চট্টগ্রামের এবং পরমেশ্বর দাসও চট্টগ্রামের পরগনাশাসক লস্কর পরাগল খাঁর সভাকবি ছিলেন। আসলে বোধ হয় পদস্থ কর্মচারীরূপেই সপ্তগ্রামের বালাণ্ডা থেকে পরমেশ্বর চট্টগ্রামে যান, যদিও তাঁর কবিখ্যাতির উল্লেখ ভণিতাগুলোতে মেলে না। কবিচন্দ্র মিশ্র ভণিতায় সুবুদ্ধি, গম্ভীর ধীর, গুণী এবং চণ্ডীভক্ত বলে পরমেশ্বর দাসের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিতে কবিচন্দ্র মিশ্র প্রায় সব ভণিতায় পরমেশ্বর দাসের নাম উল্লেখ করেছেন। পরমেশ্বর দাস যে চণ্ডীভক্ত ছিলেন, তার নিঃশংসয় উল্লেখ রয়েছে এই কাব্যে। যথা—

"চণ্ডীর চরিত্র ছাড়ি আন নাহি চিত।
পুরাণ ভারতে শুনে দেবীর চরিত ॥"
চণ্ডীপূজে চণ্ডীজপে চণ্ডীভাবে মনে
গোঞাএ দিবসরাত্রি চণ্ডীর ধেয়ানে।

বিশ্বভারতীর পুথিতে আদেষ্টা বলে পরমেশ্বর দাসের উল্লেখ নেই। বালাণ্ডা গাঁয়ের গুণীজনদের যৌথ অনুরোধে কাব্য রচনা করেন কবি। কিন্তু কাব্যে নৃপতি হোসেন শাহ্‌র উল্লেখ আছে।

সাহিত্যবিশারদের পুথিতে পরমেশ্বর দাসই আদেষ্টা। এখানে বালাণ্ডা গ্রামের পরিবর্তে পাঠ 'রণ্ডা' এবং হোসেন শাহ্‌র নাম যে চরণে থাকার কথা সেই চরণটি লিপিকর প্রমাদে বাদ পড়েছে।

কোন জনপ্রিয় নাম একই কালে ও স্থানে অনেক লোকের থাকে। পরমেশ্বর দাসও হয়তো অন্য এক ধনী-মানী ব্যক্তি—কবীন্দ্র পরমেশ্বর নন। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, পরমেশ্বর দাস নিজে মহাভারত অনুবাদ করার ও 'কবীন্দ্র' উপাধি লাভের আগেই স্ব-গ্রাম বালাণ্ডার বাসকালে কবিচন্দ্রকে কাব্য রচনায় প্রতিপোষণ দান করেন। সাহিত্যবিশারদের পুথিতে পাই—পরমেশ্বর দাসের সভা ছিল :

একদিন সভা মধ্যে বসি মহাসএ।
কবিচন্দ্র মিশ্র আনি বুলিল বিনএ ॥

পাঞ্চালি প্রবন্ধ রচ চণ্ডির চরিত
তোমার কবিত্ব জেন ভ্রমে প্রিথিমিত।

এই অংশের সঙ্গে বিশ্বভারতীর পুথি থেকে পূর্বে উদ্ধৃত অংশের ভাবগত মিল আছে। কিন্তু তথ্যগত পার্থক্য স্পষ্ট।

সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিতে কবির 'আত্মপরিচয়' অংশের পাঠ নিম্নরূপ। বক্তব্য মোটামুটি অভিন্ন, তবে পাঠ বিকৃতিজাত বিভিন্নতা সর্বত্র প্রকট। এ বিকৃতি কতকাংশে আঞ্চলিকও।

১. লুটাইআ বন্দম মাতা নিলাবতি।
বাপের চরণ বন্দম গুণের সাগর
সর্বসাস্ত্রে পণ্ডিত ভারতে তৎপর।
বসিস্ট পণ্ডিত নামে অতি সুচরিত
জাহার বিমল জস জগত বিদিত।

২. পৃথিবীর সার রাজ্য পঞ্চম গৌর নাম
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজা প্রতাপেত পাম (?)
জার তরে কম্পিত সকল নৃপগণ
মহাসত্য নরপতি প্রজার পালন।
গৌর মধ্যে পুণ্য তির্থ সপ্তগ্রাম নাম
ত্রিপিনির তিরে সপ্ত রিষির বিশ্রাম।
তথা সপ্ত রিষি তপ কৈলা ম[হা] সুখে
তেকারণে সপ্তগ্রাম নাম লোকমুখে।
সেই সপ্তগ্রাম মধ্যে ত্রিবেণী নামে পুরী
পূর্বে জাএ জমুনা পচিচমে সুরেশ্বরী।
উত্তরেত চণ্ড [চক্র] তির্থ নামে পুণ্যস্থান
দেবচক্রপাণি তথা নিত্য অধিষ্ঠান।
দক্ষিণে পবিত্র জল নামে বিদ্যাধরে
জার জল ছুইলে সকল পাপ হরে।
অনেক পণ্ডিত তথা বৈসে মহাজন
কুলে সিলে গুণের নিধান দ্বিজগণ।
নিজ ধর্মে সাবহিত নৃপতি পূজিত
ক্ষেত্রি বৈস্যগণ বৈসে অতি সুচরিত।

শুদ্রগণ বৈসে বিপ্র সেবনে তৎপর
নৃপতির হিত করে সুবুদ্ধি সাগর।
সর্বগুণে থাকে সেই উজ্বল সমাজ
তথা পতি মহা মহিত্তণরাজ।
হরগৌরী চরণে কমল মধুকর
দ্বিজগুরু ভকত ধর্মেত তৎপর।
দানে দারিদ্র্য হরে সর্ব্বসিদ্ধি সার
জাহার বিমল জস করি কন্ঠহার।
পিতাসুত...ছিল প্রকৃতি সুন্দর
মহাধীর মহাসত্ত বুদ্ধিএ সাগর।
সুবুদ্ধি গম্ভীর ধীর তাহান তনএ
শ্রীপরমেশ্বর দাস মহাশএ।
চণ্ডির চরণ ছাৱি আন নাহি চিত
পুরাণ ভারতে সুনে দেবীর চরিত।
চণ্ডি পূজে চণ্ডি জপে চণ্ডি ভাবে মনে
গোআএ দিবস রাত্রি চণ্ডির ধেআনে।
একদিন সভা মধ্যে বসি মহাশএ
কবি চন্দ্র মিশ্র আনি বুলিল বিনএ।
পাঞ্চালি প্রবন্ধে রচ চণ্ডির চরিত
তোমার কবিত্ব জেন ভ্রমে পৃথিমিত।
পরম ভকতি জেন সর্ব্বলোক পূজে
পুরাণ বচন জেন সাবধানে বুঝে।
নব সিন্ধু সিন্ধু ইন্দু সব নিজোজিত
কবিচন্দ্র মিশ্র বোলে চণ্ডির চরিত।

উভয় পুথির পাঠ পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে :

১. বিশ্বভারতীর পুথির 'আদর্শ পাঁচালী'-র ভণিতায় পরমেশ্বর দাসের নামোল্লেখ ছিল না। অথবা কালে পরিত্যক্ত হয়েছে। যদি দ্বিতীয় অনুমান সত্য হয় তা হলে ভণিতাংশ লিপিকর কিংবা গায়েন-কথক পুনর্নির্মাণ করেছেন বলে মানতে হবে। কবির মূল রচনায় যদি পরমেশ্বর দাসের নাম উল্লেখিত না হয়ে থাকে, তা হলে বলতে হবে চট্টগ্রামের পুথিতে পরমেশ্বর দাসের নাম পরে সংযোজিত হয়েছে।

কিন্তু এমন অনুমানের ভিত্তি নেই বরং রাঢ়ে অজ্ঞাত পরিচয় পরমেশ্বর দাসের নাম বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হয়েছে বলে ধারণা করাই সঙ্গত। কেননা একটি প্রক্ষিপ্ত নাম শতোর্ধ্ববার সংযোজিত করা অধ্যবসায় সাপেক্ষ—তেমন জালিয়াতির অধ্যবসায় স্বয়ং পরমেশ্বর দাস ব্যতীত আর কারো থাকার কথা নয়। চট্টগ্রামের পুথিতে পরমেশ্বর দাসের পিতৃপরিচয়ও রয়েছে। যদিও নামটি দুষ্পাঠ (সুতম্বাদ?)। অথবা সেই নাম মহিগুনরাজ। বিশেষত বিশ্বভারতীর পুথিতে হোসেন শাহ্র নাম যখন মিলছে, তখন তাঁর সমকালের ও তাঁর লস্কর পরাগল খানের সভাকবি মহাভারতের অনুবাদক ও কবিচন্দ্র মিশ্রের আদেষ্টা পরমেশ্বর দাস অভিন্ন ব্যক্তি বলে মানতে বাধা নেই।

২. সাহিত্যবিশারদের পুথির পাঠে স্পষ্টতই লিপিকর-প্রমাদ ঘটেছে। তার ফলেই 'হোসেন শাহ্'র নামের চরণটি বাদ পড়েছে। এবং পদ মিলানোর জন্যে পরবর্তী লিপিকর গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়েছেন। 'নৃপতি হুসেন শাহা কলিযুগ রাম', বাদ পড়ায় 'নাম' এর সঙ্গে পদান্ত মিল দানের জন্যে তৃতীয় চরণের 'প্রতাপে তপন'কে 'প্রতাপেত পাম' করা হয়েছে এবং চতুর্থ চরণের সঙ্গে পদান্ত মিল দেয়ার গরজে 'মহাসত্ব নরপতি প্রজার পালন' চরণটি যোগ করতে হয়েছে।

৩. সাহিত্যবিশারদের পুথিতে 'বালাণ্ডা' পুরী 'রণ্ডা' হয়েছে। চট্টগ্রামের লিপিকরদের 'বালাণ্ডা' পরগনা জানা ছিল না, তাই লিপিপরম্পরায় বালাণ্ডা 'রণ্ডা'-য় পরিণত হয়েছে। ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়ে এ পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়।

৪. চট্টগ্রামের পুথিতে কবিচন্দ্রের পিতার নাম বশিষ্ঠ পণ্ডিত। বিশ্বভারতীর পুথিতে 'বশিষ্ঠ' স্থলে 'সশিষ্য' পাঠ রয়েছে। এই পাঠ স্পষ্টতই ভুল। কবির মাতার নাম নীলাবতী, এটি 'লীলাবতী'র বিকৃতিও হতে পারে।

৫. পরমেশ্বর দাসের অস্তিত্ব বা সম্পর্ক স্বীকৃত হয়নি বলেই বিশ্বভারতীর পুথিতে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ নির্দেশ অংশের পাঠ পরিবর্তিত হয়েছে। সেখানে আদেষ্টা ব্যক্তি নন—গাঁয়ের গুণিজন সমাজ।

৬. সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিতেও কাব্য রচনার কাল রয়েছে 'নবসিন্ধু সিন্ধু ইন্দু সব নিজোজিত।—এই পাঠ যে বিকৃত তাতে সন্দেহ নেই। অতএব, নব শশী সুর ইন্দ্র শক কিংবা 'নব শশী সুর ইন্দু শক' পাঠ ধরলে হোসেন শাহ্ ও পরমেশ্বর দাস—উভয়ের সমকালীন কবি কবিচন্দ্র মিশ্রের কাব্য রচনার অভিন্ন সন মেলে।

অতএব, কবিচন্দ্র মিশ্র পনেরো শতকের অস্তিমলগ্নের কবি। আরো একটি রহস্যজনক বিষয় রয়েছে ৫২ পত্রের এই পুথির ঠিক ৩৯ক পাতায় শেষ বারের মতো আদেষ্টা পরমেশ্বর দাসের উল্লেখ রয়েছে, পরবর্তী তেরো পাতায় নেই। পুথির ঠিক তিনভাগে আছে শেষভাগে নেই। অথচ গ্রন্থ সমাপ্তিকালে অন্তত আর একবার আদেষ্টার প্রশস্তি না হোক, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছিল স্বাভাবিক সৌজন্যের বিষয়।

এ থেকে আমাদের মনে হয়, শেষপর্যায়ে পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে কবির মনোমালিন্য ঘটে বা বিবাদ বাধে। তাই ভণিতায় আদেষ্টার নাম আর যোগ করা হয়নি, এবং নিজের রচনা বলেই মমতাবশে গ্রন্থের প্রথমাংশও সংশোধিত হয়নি, অথবা রচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপোষক পরমেশ্বর দাসকে প্রতিলিপি দেয়া হত বলে পরমেশ্বর দাসের হস্তগত প্রতিলিপির 'প্রশস্তি ও ভণিতা' সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। এবং এই প্রতিলিপি সঙ্গে নিয়েই বালাণ্ডাবাসী পরমেশ্বর দাস চট্টগ্রামে পরাগল খানের অধীনে রাজকার্যে যোগদান করেন। কিন্তু পরে প্রতিলিপি তৈরী কালে স্বয়ং কবিই ভণিতা সংশোধন করেছিলেন এবং আদেষ্টা-প্রশস্তি অংশ একেবারে বাদ দিয়ে গাঁয়ের জনগণের আগ্রহ ও অনুরোধজ্ঞাপক অংশ যোগ করেছেন। বিশ্বভারতী সংগৃহীত পুথির আর একটি প্রতিলিপি পাওয়া গেলে এবং শেষ তেরোপাতাস্থ ভণিতায় ভাষাগত মিল পাওয়া গেলে আমাদের আপাত-অনুমান সত্য হয়ে উঠবে।

১৬

রামাই পণ্ডিত

রামাই পণ্ডিত যে ভারতে বাঙলায় ও বৌদ্ধ-বিলুপ্তির চরম মুহূর্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। বারো শতকের শেষার্ধে বা শেষপাদে তিনি জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। বাঙলায় ও ভারতে তখন যে চিহ্নিত ও প্রকাশ্য বৌদ্ধ সমাজ ছিল না, তার প্রমাণ শূন্যপুরাণোক্ত 'ধর্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান' উক্তিটি। বৌদ্ধ ত্রিশরণের অন্যতম 'ধর্ম'-এর মূল তাত্ত্বিক তাৎপর্য তখন বাঙলায় অস্পষ্ট ও বিস্মৃতপ্রায়, তাই তথাগত বা গৌতমবুদ্ধের পরিবর্তে ধর্মই বৌদ্ধমত ও বুদ্ধজ্ঞাপক সাংকেতিক পরিভাষায় পরিণত। এবং নিরঞ্জন' ও 'শূন্য' নির্বাণতত্ত্বের প্রতীক—'শূন্য পূজয় হরিচন্দ্র বিষাদ ভাবিয়া মতি।' রামাই পণ্ডিতের

সময়ে বৌদ্ধমত হাড়ি-ডোম-বাগদী-কৈবর্তের মধ্যে নিবদ্ধ। তাই অশিক্ষাজাত অজ্ঞতার ফলে এ সমাজে ধর্মতত্ত্ব ও শাস্ত্র বিকৃত, অস্পষ্ট, পারম্পর্যহীন অসমন্বিত অসমঞ্জস শ্রুতি-স্মৃতি মাত্র। তাই পাঁচধ্যানী বুদ্ধও পাঁচপণ্ডিতে পরিণত— সেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই ও গোসাঞি—এঁরা যুগন্ধর ও যুগাবতার। শূন্যপুরাণ প্রভৃতি নামে, আগমপুরাণে ও ধর্মপূজাবিধানে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব প্রবল ও গভীর—এ প্রভাব স্বীকার করেই প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্মরক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল তাদের পক্ষে। তাই গণ্ডার, অশ্ব, মহিষ, অজ, হংস ও পায়রা বলি চালু করতে হয় এবং ধর্মও হতে থাকেন সমূর্ত।

শূন্যপুরাণের ভাষায় সর্বত্র প্রাচীন রূপ রক্ষিত নেই সত্য, কিন্তু উচ্চারণে অর্বাচীন অবহট্‌ঠরূপ রক্ষিত। ষোল শতকের রচনা হলে বম্ভা (ব্রহ্মা), বিষ্টু (বিষ্ণু), বন্ন (বর্ণ), নহি (নাহি), থল (স্থল), ভরমন (ভ্রমন), বিসাই (বিশ্বকর্মা), জানে (ধ্যানে), বলস্তি, চিরাই (চিরায়ু) প্রভৃতি আমাদের লেখ্য ভাষা সংস্কৃত শব্দ-বহুল হওয়ার পূর্বস্তরের সাক্ষ্য। শূন্যপুরাণের গদ্যরূপ নিতান্ত অশিক্ষাপ্রসূত নয়—প্রাচীনতার নিদর্শন।

চৌদ্দ-পনেরো শতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরাও যখন আত্মপরিচয় বিস্মৃত, যখন ধর্মপন্থী, নাথপন্থী, সহজপন্থীরা নিজেদের হিন্দু সমাজভুক্ত বলেই জানে ও মানে, তখন শূন্যপুরাণ বা ধর্মপূজাবিধান অব্রাহ্মণ শাস্ত্র ও তত্ত্ব প্রচারের জন্যে রচিত হওয়ার কথা নয়। তাই আমরা রামাই পণ্ডিতের আদি শূন্যপুরাণ বারো শতকের বা তেরো শতকের গোড়ার দিকের রচনা বলেই বিশ্বাস করি, কালান্তরে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে তা ক্রমে ভাবে ভাষায় আচারে ও তত্ত্বে রূপান্তর ও বর্ধিত কলেবর পেয়েছে।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

নির্ঘণ্ট

পরিশিষ্ট—গ

[সংশোধনী]

গুরুতর কয়েকটি ভুলের সংশোধন :

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
২	১	ননা	কেননা
৭	২০	সংখ্যা	সাংখ্য
১৯	১১	আর্যগাথা	আর্যা/এবং 'ধোয়ী'র পরে শরণ, উমাপতিধর
২৬	১৩	আন্দোলন ব্যতীত:	আন্দোলন ব্যতীত এ স্বাতন্ত্র্য নির্মূল হবে না।
৩২	১৫	ত্রিশ	ছত্রিশ
৫২	১১	বেণের	বেণেরা
৬১	'ট'	—	যুক্ত হবে—আদিলশাহ/শামসুদ্দীন মুহম্মদ গাজী/গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (১৫৫৬-৫৯)
৬১	'ঠ'	—	যুক্ত হবে— ১· তাজখান কররানী
৮৮	১৭	তেরো	সতেরো
১০২	৪	কাই	হ্নাই
১২৫	১১	একচ্ছত্র	একচ্ছত্র শাসনে
	১২	প্রাকৃত শাসনে	প্রাকৃত
১৩৭	১৮	আত্মরক্ষা	আত্মরক্ষার
১৯২	২২	প্রাকৃত-অবহট্‌ঠও	প্রাকৃত-অবহট্‌ঠের
১৯৩	২০	সবটাই	সবটারই
১৯৬	২২	গভীর ভক্তিবাদ	গভীর। ভক্তিবাদ
২২৯	১১	সুফল	মুকল
২৩১	৮	নিয়ন্ত্রণ সাধনারই	নিয়ন্ত্রণ সব সাধনারই
২৫০	৮	এলং মাওাধর	এবং মালাধর
২৬২	৯	মোইনি। মৎস্য	মোইনি মৎস্য

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
২৮১	৬	৩য় বন্ধনী	যুক্ত হবে—রাউত—অশ্বারোহী সৈন্য—আইসন্ত রাউত সব অশ্বে আরোহণ ধবল অশ্বেত চড়ি খর্গ চর্ম ধরি নীলবাস পরি আইসে হাতে শূল করি। রসুল চরিত (পৃঃ ১৫৮), সৈয়দ সুলতান
২৯০	শিরোনাম	[পনেরো শতক)	পনেরো শতক অবধি
৩০৪	পাদটীকা	—	২. বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ)
৩১৭	শিরোনাম	কাব্যস্বরূপ	কাব্যরূপ
৩২৫	পাদটীকা-১	—	যুক্ত হবে—'ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও 'চণ্ডীদাস' নামের কবি-বৈরাগী দেখেছেন, গোপাল হালদারকে লিখিত পত্র ৪।১২।৩২ 'সুনীতিকুমার' স্মরণ সংখ্যা, 'পরিচয়' আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সন, পৃঃ ৭।
৩৩০	৮	আমলে	আমলেই
৩৭৩	২১	জান-প্রাণ	জান-মাল
৪০১	২	চিন্তা-চেতন	চিন্তা-চেতনা
৪৭৪	৪	—	অনুমিত পাঠ : 'তথাপতি মহা-মহিম গুণরাজ'
৪৭৬	১৯	ভারতে বাঙলাও	ভারতে ও বাঙলায়
৪৭৭	১৭	অব্রাহ্মণ	অব্রাহ্মণ্য

পরিশিষ্ট—ঘ

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থের তালিকা

এ যাবৎ রচিত সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ, উঁচুমানের কিংবা নীচুমানের তথ্যমূলক কিংবা মূল্যায়নমূলক, গবেষণাধর্মী কিংবা পাঠ্য বা প্রবন্ধমূলক, জীবনী ও পরিচিতিমূলক, বিশেষ শাখা বা পর্বপরিচিতমূলক বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত ইংরেজী ও বাঙলা ইতিহাস-গ্রন্থের ও প্রণেতার নাম এখানে সংগৃহীত হল। আমাদের দেশে গ্রন্থপঞ্জীর একান্ত অভাব, অথচ গবেষণার জন্যে তা' আবশ্যিক। তাই এ প্রয়াস।

ক. উনিশ শতকে প্রবন্ধাকারে কিংবা পুস্তিকার আকারে সাহিত্যের ধারাবাহিক পরিচিতি-প্রয়াস:

১. কাশী প্রসাদ ঘোষ —Bengali Works & Writers আলোচনা। লিটারারি গেজেট পত্রে প্রকাশিত, ১৮৩০।

২. রাজেন্দ্রলাল মিত্র —'বিবিধার্থ সংগ্রহে' সাহিত্য সমালোচনা (১৮৫১)

৩. হরচন্দ্র দত্ত —Bengali Poetry (১৮৫২)

৪. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় —বাঙালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২) বীটন সোসাইটির অধিবেশনে পঠিত ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

৫. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত —'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' এবং প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত, ১৮৫৩-১৮৫৫।

৬. হরিশ্চন্দ্র মিত্র —কবি কলাপ ১ম খণ্ড (১৮৬৬)

৭. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় —কবি চরিত (১৮৬৯)

৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় —Bengali Literature, 'Calcutta Review' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৭১)

৯. মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় —বঙ্গভাষার ইতিহাস (১৮৭১)

১০. রাজনারায়ণ বসু —বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮)। কোলকাতার বঙ্গভাষা সমালোচনী সভার অধিবেশনে পঠিত এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

১১. গঙ্গাচরণ সরকার — বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা। ঢাকা কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৮৭৯; পুস্তকাকারে প্রকাশিত, ১৮৮০ সন।

১২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — ক. বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য (১৮৮১) এটি 'বাঙ্গালা সাহিত্য' নামে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত—পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় উক্ত নাম গৃহীত হয়।

খ. Vernacular Literature of Bengal Before the introduction of English Education (1891)

১৩. কৈলাসচন্দ্র ঘোষ — বাঙ্গালা সাহিত্য (১৮৮৪)

খ. পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ :

১. রামগতি ন্যায়রত্ন — বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। Discourse on the Bengali language & literature.
[১৮৭২ সনে ১ম ভাগ প্রকাশিত হয়। ১ম ও ২য় ভাগ মিলে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে।] এটি 'বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস গ্রন্থ'।

২. রমেশ চন্দ্র দত্ত — The literature of Bengal (১৮৭৭)।
[An attempt to trace the progress of the national mind in its various aspects as reflected in the nation's literature from the earliest time to the present day.]

৩. দীনেশ চন্দ্র সেন — ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬)
সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির আলোচনা সম্পৃক্ত প্রথম সার্থক ইতিহাস গ্রন্থ।
খ. History of Bengali Language & literature (১৯১১)

গ. The Vaishnava literature of Medieval Bengal (১৯১৭)

ঘ. The Folk literature of Bengal (১৯২০)

ঙ. Bengali Prose style : 1800-1757 (১৯২১)

৪. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় —বঙ্গভাষার লেখক (১৯০১)

৫. হারান চন্দ্র রক্ষিত —ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯১১)

৬. সুশীল কুমার দে —History of Bengali literature in the nineteenth Century (১৯১৯)

৭. সুকুমার সেন —ক. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (১৯৩৪)

খ. History of Brajabuli literature (১৯৩৫)

গ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪ খণ্ড, ৫টি বই ; ১ম খণ্ড ১৯৪০, ২য় খণ্ড ১৯৪৩, ৩য় খণ্ড ১৯৪৬, ৪র্থ খণ্ড ১৯৫৮)

ঘ. History of Bengali literature (১৯৬০)

ঙ. ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৫১)

৮. মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ —আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৩৫)

৯. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় —বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত সার (১৯৩২)

১০. জহরলাল বসু —বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৩৬)

১১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় —ক. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৯৩৯)

খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (১৯৪৬)

গ. বাংলা উপন্যাস (১৯৪৭)

ঘ. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (১৯৫৯)

১২. আশুতোষ ভট্টাচার্য —ক. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (১৯৩৯)

খ. বাংলার লোক সাহিত্য (৬ খণ্ড) [১ম ১৯৫৪, ২য় ১৯৬৩, ৩য় ১৯৬৫ ৪র্থ ১৯৬৬, ৫ম ১৯৭১, ৬ষ্ঠ ১৯৭২]

গ. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২ খণ্ড, ১ম খণ্ড ১৯৫৫)
ঘ. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৬০)
ঙ. বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস (২ খণ্ড, ১ম খণ্ড ১৯৬৪)
চ. বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন (১৯৬৪)

১৩. কালিদাস রায় —ক. বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৩৮)
খ. প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (২ খণ্ড, ১৯৪৩)
গ. বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ১ম খণ্ড (১৯৫৭)

১৪. Kalipada Mukherjee —Studies in Bengali Literature (১৯৩৮)

১৫. Annada Sarkar Roy & Lila Roy — Bengali literature (১৯৪২)

১৬. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত —বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪০)

১৭. প্রিয়রঞ্জন সেন —বাঙ্গালা সাহিত্যের খসড়া (১৯৪৪)

১৮. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ —সাহিত্য সাধক চরিত মালা (১-১১ খণ্ড) ১ম খণ্ড প্রকাশ (১৯৩৯)

১৯. নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী —বাংলা সাহিত্যের কথা (১৯৪২)

২০. বিভাস চৌধুরী —নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা

২১. মণীন্দ্র মোহন বসু —বাঙ্গালা সাহিত্য (২ খণ্ড, ১ম ১৯৪৬, ২য় ১৯৪৭)

২২. সজনীকান্ত দাস —বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (গদ্যের প্রথম যুগ), (১৯৪৬)।
পরের সংস্করণের নাম 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস'।

২৩. মনোমোহন ঘোষ —ক. বাংলা গদ্যের চার যুগ (১৯৪২)
খ. বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৫৫)

২৪. কনক বন্দ্যোপাধ্যায় —ক. বাঙলা কাব্য সাহিত্যের কথা (১৯৪৪)
খ. বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ (১৯৬১)
গ. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬১)

২৫. অজিতকুমার ঘোষ —বাংলা নাটকের ইতিহাস (১৯৪৬)

২৬. J. C. Ghosh —Bengali Literature (১৯৪৮)

২৭. Buddhadev Bose —An Acre of Green Grass (১৯৪৮)

২৮. প্রমথনাথ বিশী —ক. বাংলার লেখক ১ম খণ্ড (১৯৫০)
বিজিতকুমার দত্ত সহ —খ. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক (১৯৬১)

২৯. তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত —প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৫১)

৩০. আবদুল লতিফ চৌধুরী —বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, প্রাচীন ও মধ্যযুগ, ১৯৫১)

৩১. নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী —বাংলা ছোট গল্প (১৯৫০)

৩২. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান —বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস (১ম খণ্ড, ১৯৫০, দুই খণ্ড ২য় সং ১৯৬৫)

৩৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ —ক. বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রাচীন যুগ ১৯৫৭)
খ. বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ, ১৯৬৫)

৩৪ কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় —বাংলা সাহিত্যের কথা ও কাহিনী (১৯৫৩)

৩৫ Lila Roy —A Challenging Decade: Bengali Literature in the forties (১৯৫৩)

৩৬. গোপাল হালদার —বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড ১৯৫৪, ২য় খণ্ড ১৯৫৯)

৩৭. ভূদেব চৌধুরী —ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম খণ্ড ১৯৫৪, ২য় খণ্ড ১৯৫৭)
খ. বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৫৯)
গ. বাংলা ছোট গল্প ও ছোটগল্পকার (১৯৬২)
ঘ. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক পর্যায়) (১৯৬৩)
ঙ. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রসঙ্গ

৩৮. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত —বঙ্গের প্রাচীন কবি (১৯৫৩)
বঙ্গের মহিলা কবি

৩৯. কল্যাণ নাথ দত্ত —আধুনিক বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা (১৯৫৪)

৪০. তারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায় —বাঙলা সাহিত্যের পরিচয় (১৯৫৬)

৪১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান —বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৫৬)

৪২. মুহম্মদ এনামুল হক —মুসলিম বাঙলা সাহিত্য (১৯৫৭)

৪৩. ভোলানাথ ঘোষ —বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা (১৯৫৭)

৪৪. তারাপদ মুখোপাধ্যায় —আধুনিক বাংলা কাব্য (১৯৫৪)

৪৫. অচ্যুত গোস্বামী —বাংলা উপন্যাসের ধারা (১৯৫৭)

৪৬. দেবেন্দ্র কুমার ঘোষ —প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস (১৯৫৭)

৪৭. দেবকুমার বসু —বাঙলা নাটক (১৮৫২-১৯৫৭) (১৯৫৭)

৪৮. দীপ্তি ত্রিপাঠী —আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় (১৯৫৮)

৪৯. বৈদ্যনাথ শীল —ক. বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা (১৯৫৭)
খ. বাংলা সাহিত্যে লঘু নাট্যের ধারা (১৯৬৯)

৫০. সুখময় মুখোপাধ্যায় —ক. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম (১৯৫৮)
খ. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম (১৯৭৫)
গ. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় (১৯৭৩)

৫১. শশিভূষণ দাস গুপ্ত —বাংলা সাহিত্যের একদিক

৫২. হরপ্রসাদ মিত্র —বাংলা কাব্যে প্রাক-রবীন্দ্র (ভারতচন্দ্র থেকে বিহারীলাল পর্যন্ত বাংলার কাব্যপ্রবাহের পরিচিতি)

৫৩. জনার্দন চক্রবর্তী —নব পরিচয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৫৮)

৫৪ খগেন্দ্রনাথ মিত্র —শতাব্দীর শিশু সাহিত্য (১৯৫৮)

৫৫. প্রভাময়ী দেবী —বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য (১৯৫৮)

৫৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪ খণ্ড) [১ম খন্ড ১৯৫৯, ২য় খন্ড ১৯৬২, ৩য় খণ্ড ১৯৬৬, ৪র্থ খণ্ড ১৯৭০]
খ. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (১৯৬০)

৫৭. মন্মথমোহন বসু —বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (১৯৫৯)
৫৮. রণজিৎ কুমার সেন —বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য (১৯৫৯)
৫৯. সাধনকুমার ভট্টাচার্য —বাংলা নাটক ও নাট্যকার (৩ খন্ড)
৬০. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় —বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ
৬১. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন —বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (৩ খন্ড) [১ম ১৯৬০, ২য় ১৯৬৪, ৩য় ১৯৬৬]
৬২. অপর্ণা প্রসাদ সেনগুপ্ত —বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৯৬০)
৬৩. অরবিন্দ পোদ্দার —বাঙলা সাহিত্য : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৬০)
৬৪. ক্ষেত্র গুপ্ত —আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬১)
৬৫. রমণী মোহন চক্রবর্তী —বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাল (১৯৬১)
৬৬. যতীন্দ্র সেন ও অতুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় —বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১৯৬১)
৬৭. কাজী আবদুল মান্নান —ক. আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম সাধনা (১৯৬১)
খ. The Emergence & Development of Dobhasi Literature in Bengali (১৯৬৬)
৬৮. তারাপদ ভট্টাচার্য —বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস [প্রাচীন পর্ব] (১৯৬২)
৬৯. আশা দেবী —বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৬২)
৭০. অধীর দে —আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (১৯৬২)
৭১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় —বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (১৯৭৩)
৭২. বিজিত কুমার দত্ত —বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৯৬৩)
৭৩. অনাথ বন্ধু বেদজ্ঞ —সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি (১৯৬৩)
৭৪. আনিসুজ্জামান —মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৪)
৭৫. নীলিমা ইব্রাহিম —ক. উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক (১৯৬৪)
খ. বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা (১৯৭২)
৭৬. গোলাম সাকলায়েন —বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য (১৯৬৪)
৭৭. রণেন্দ্রনাথ দেব —বাংলা উপন্যাসের আধুনিক পর্যায় (১৯৬৪)
খ. প্রাচীন বাংলা কাব্য প্রদক্ষিণ

৭৮. শিশির কুমার দাস —ক. বাংলা ছোট গল্প (১৯৬৩)

খ. Early Bengali Prose (Carey to Vidyasagar)

৭৯. চিত্তরঞ্জন মাইতি —বাংলা কাব্য প্রবাহ (১৯৬৪)

৮০. শক্তি ভট্টাচার্য —বাংলা ঐতিহাসিক নাটক (১৯৬৭)

৮১. কাজী দীন মুহম্মদ —বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪ খন্ড ১৯৬৮-৬৯)

৮২. ওয়াকিল আহমদ —ক. সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য (১৯৬৮)

খ. বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান (১৯৭০)

৮৩. সুফী মোতাহার হোসেন —বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬৮)

৮৪. সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় —আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬৮)

৮৫. আজহার ইসলাম —বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ [আধুনিক যুগ] (১৯৬৯)

৮৬. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় —আধুনিক বাংলা কাব্যের রূপরেখা (১৯৬৯)

৮৭. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন —বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা (১৯৭০)

৮৮. আবুল হাসানাত —মুসলিম রচিত বাংলা উপন্যাস (১৯৭০)

৮৯. সুলতান আহমেদ ভূঁইয়া —বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১৯৭১)

৯০. জয়ন্ত গোস্বামী ও মায়াঞ্জনা গোস্বামী —বাংলা গদ্য প্রসঙ্গ (১৯৬৮)

৯১. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত —ক. বাংলা নাটক ও নাট্যকার (১৯৬৯)

খ. বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য (১৯৭৬)

৯২. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য —বাংলার লোকনাট্য সমীক্ষা (১৯৭২)

৯৩. সুরেশচন্দ্র মৈত্র —বাংলা নাটকের বিবর্তন (১৯৭৩)

৯৪. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী—ক. দুই বিশ্বযুগের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য (১৯৭৩)

খ. বাংলা কথা সাহিত্য প্রসঙ্গ

৯৫. মনসুর মুসা — পূর্ববাংলার উপন্যাস (১৯৭৪)
৯৬. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — কালের প্রতিমা (১৯৭৪)
৯৭. কমলকুমার সান্ন্যাল — বাংলা নাটক সমীক্ষা (১৯৭৬)
৯৮. মাহবুবুল আলম — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৮৩)
৯৯. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার — রবীন্দ্রোত্তর কাল (১ম পর্ব)
১০০. গিরীন্দ্রনাথ দাশ — বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা
১০১. শাহেদ আলী — বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের দান (১৯৬৮)
১০২. আহমদ শরীফ — বাঙলার সূফী সাহিত্য (১৯৬৯)